'তারিখুল কাদ্বায়ী ফিল ইসলাম' গ্রন্থের অনুবাদ

ইসলামি বিচারব্যবস্থার ইতিহাস

ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আয-যুহাইলি

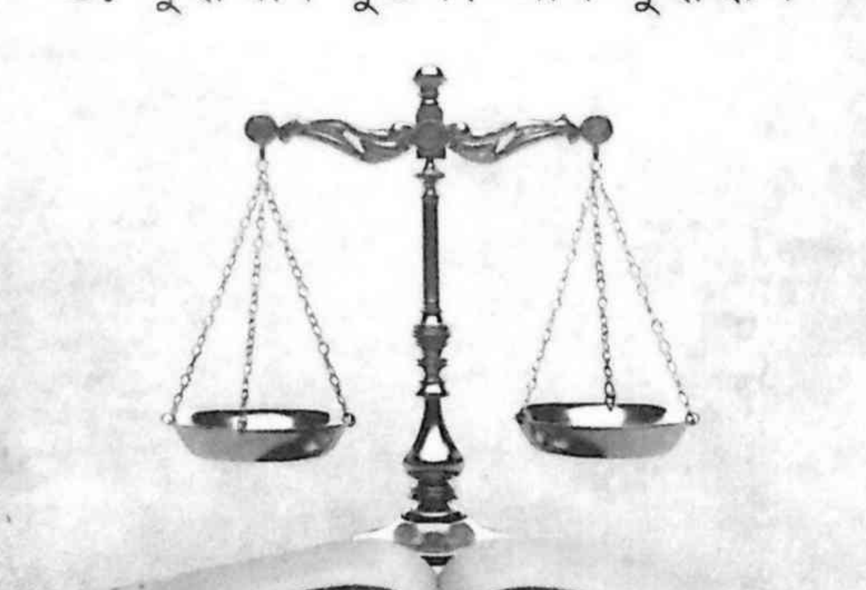

সন্দীপন

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ১৯

সম্পাদকের কথা ২২

পূর্বকথা ২৪

বিচারব্যবস্থার ইতিবৃত্ত ২৮

☑ القضاء-এর শাব্দিক অর্থ ২৮

☑ পারিভাষিক অর্থ ৩০

☑ বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ৩৩

☑ ইসলামে বিচারব্যবস্থার বৈধতা ৪০

কুরআনের ভাষ্য ৪০

হাদিসের আলোকে বিচারব্যবস্থা ৪৬

ইজমার ভিত্তিতে ৫০

যুক্তির নিরিখে ৫১

☑ ইসলাম-পূর্ব আরবে বিচারব্যবস্থা ৫২

ইসলামের জন্য আরবকে নির্বাচনের কারণ ৫২

আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন ৫২

জাহিলি যুগে প্রচলিত আইনকানুন ৫৩

আরবদের জীবনযাত্রায় অন্য জাতির প্রভাব ৫৩

সালিশি বৈঠক ৫৪

গণকদের বিচারকার্য ৫৬

দাবির সপক্ষে দলিল-প্রমাণের পদ্ধতি ৫৬
মোকদ্দমা এবং বিচারের ক্ষেত্র.. ৫৬
মক্কায় ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ৫৭

নববি যুগের বিচারব্যবস্থা ৫৮

☑ ইসলামের আবির্ভাব.. ৫৮
☑ নববি যুগের পরিচয়..৬১
☑ নববি যুগে বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব..............................৬১
☑ নববি যুগে বিচারের ব্যবস্থাপনা..............................৬৪
নবিজির বিচারকার্য পরিচালনা.......................................৬৪
বিচারক নিয়োগ প্রদান ৬৫
নিয়োগের পদ্ধতি...৬৯
বিচারের পরিধি নির্দিষ্টকরণ ৬৯
নববি যুগে বিচারব্যবস্থার উৎস.................................. ৭০
অভিযোগের তদন্ত এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত বিচার............... ৭৩

☑ নববি যুগে বিচার পদ্ধতি ৭৪
বিচারব্যবস্থার সহজতা..৭৪
অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি..৭৫
নববি যুগে প্রমাণ সাব্যস্ত করার পদ্ধতি ৭৬
বিচারের রায়.. ৭৮
বিচার বাস্তবায়ন..৭৯
বিচারের স্থান এবং সময় ৮০

☑ নবিজির বিচার-ফয়সালা ৮২
ক. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ফয়সালা.........৮২

খ. ঋণের ক্ষেত্রে ফয়সালা ৮৩
গ. ভূমি-সংক্রান্ত ফয়সালা ৮৪
ঘ. ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ফয়সালা ৮৪
ঙ. স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষেত্রে ফয়সালা ৮৬
চ. হত্যার ক্ষেত্রে ফয়সালা ৮৬
ছ. পানি সেচ দেওয়ার ক্ষেত্রে ফয়সালা ৮৬

☑ নববি যুগের বিচারক ৮৭
আলি ইবনু আবি তালিব ৮৮
আবু মূসা আশআরি ৮৯
মুআয ইবনু জাবাল ৮৯
আলা ইবনুল হাদরামি ৯১
আত্তাব ইবনু উসাইদ ৯২
আমর ইবনুল আস ৯২
হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ৯৩

☑ নববি যুগের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ৯৬

রাশিদুন যুগে বিচারব্যবস্থা ১০০

☑ রাশিদুন যুগের সময়কাল ১০০
ক. আবু বকর ১০১
খ. উমর ফারুক ১০২
গ. উসমান ইবনু আফফান ১০৩
ঘ. আলি ইবনু আবি তালিব ১০৪

☑ রাশিদুন যুগের মহত্ত্ব ১০৪
☑ বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ১০৫

খলিফাগণের বিচারিক দায়িত্ব গ্রহণ ১০৬
বিচারক নিয়োগ প্রদান ১০৭
স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ ১১১
দুর্নীতির বিচার এবং তদন্ত বিভাগ ১১৪
বিচারকদের বেতন-ভাতা ১২৫
বিচারের কার্যালয় এবং বন্দিশালা ১২৭
☑ রাশিদুন যুগে বিচার বিভাগের গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা........ ১২৯
বিচার-সংক্রান্ত বিভিন্ন চিঠিপত্র ১২৯
বিচারের উৎস ১৩৭
☑ রাশিদুন যুগে বিচারের পরিধি ১৪৫
☑ বিচারের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি....................১৫০
☑ রাশিদুন যুগের বিচারক ও মোকদ্দমা ১৫১
আবু বকরের জামানার বিচারকগণ....................১৫২
আবু বকরের জামানার মোকদ্দমা ১৫৪
উমরের জামানার বিচারকগণ....................১৫৫
উমরের যুগের মোকদ্দমা....................১৫৮
উসমানের জামানার বিচারকগণ....................১৬০
উসমানের যুগের মোকদ্দমা....................১৬২
আলির জামানার বিচারকগণ....................১৬৪
আলির মোকদ্দমার উদাহরণ....................১৬৫
☑ রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ১৭১
উমাইয়া যুগের বিচারব্যবস্থা....................১৭৫
☑ উমাইয়া বংশের খলিফাগণ....................১৭৫

☑ উমাইয়া যুগের বৈশিষ্ট্য ১৭৬
☑ রাশিদুন যুগের সাথে উমাইয়া যুগের সম্পর্ক.................. ১৭৮
☑ উমাইয়া যুগে বিচারব্যবস্থার কাঠামো ১৭৯
বিচারব্যবস্থা পৃথকীকরণ.................................... ১৭৯
বিচারক নিয়োগ ১৮০
বরখাস্তকরণ এবং স্বেচ্ছায় পদত্যাগ ১৮৪
মসজিদ এবং অন্যান্য জায়গায় বিচার-সালিশ ১৮৬
বিচারকের পদ থেকে দূরে থাকা ১৮৭
বিচারকদের বেতন-ভাতা...................................... ১৯১
বিচারালয়ের কিছু চিত্র....................................... ১৯৪
উমাইয়া যুগে দুর্নীতির বিচার ১৯৬
নজরদারি এবং জবাবদিহিতা ২০০
☑ উমাইয়া যুগে বিচারের গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা................ ২০৩
উমাইয়া যুগে বিচারের বিধিবিধানের উৎস.................. ২০৩
রায় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকদের ইজতিহাদ ২০৫
কার্যনির্বাহী বিচারক ও নির্দিষ্ট বিচার ২০৬
বিচারকের আরও কিছু দায়-দায়িত্ব ২০৭
বিচারকগণ এবং বিভিন্ন দায়িত্ব ২০৯
☑ উমাইয়া যুগের বিচারকগণ ২১২
ক. দামিস্কের বিচারকগণ ২১৩
খ. মদীনার বিচারকগণ ২১৫
গ. বসরার বিচারকগণ... ২১৯
ঘ. উমাইয়া যুগে কুফার বিচারকগণ............................ ২২২
ঙ. উমাইয়া যুগে মিশরের বিচারক............................. ২২৪
চ. অন্যান্য শহরের বিচারক..................................... ২২৮

☑ উমাইয়া যুগে বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য ২২৮

আব্বাসি যুগের বিচারব্যবস্থা ২৩২

☑ আব্বাসি যুগের ইতিহাস ২৩২

আব্বাসি খলিফাগণ...২৩৫

পূর্বের যুগের সাথে আব্বাসি যুগের সম্পর্ক ২৩৯

☑ আব্বাসি যুগে বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা........ ২৪১

প্রথম টার্মের আব্বাসি যুগের বিচারক........................ ২৪২

দ্বিতীয় টার্মের আব্বাসি যুগের বিচারক.......................২৪৩

বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা.................................. ২৪৪

বিচারক বরখাস্ত করা ২৪৮

বিচারের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকা ২৪৯

প্রধান বিচারপতি..২৫৬

বিচারকের সহকারী ২৬০

আব্বাসি খলিফাগণ এবং অন্যায়ের বিচার ২৬২

আব্বাসি যুগে 'হিসবাহ' বিচার..................................২৬৫

সামরিক বাহিনীর বিচার..২৬৮

বিচারকের ভাতা...২৬৯

বিচারের স্থান ২৭১

একাধিক বিচারকের পদ.. ২৭২

বিচারকার্য এবং মোকদ্দমার পদ্ধতি...........................২৭৮

☑ আব্বাসি যুগের গঠনমূলক বিচারব্যবস্থা ২৮২

ফিকহি মাযহাবের প্রচলন ২৮২

মাযহাব অনুসারে বিচারক ২৮৪

বিচারিক বিধিবিধানের উৎস ২৮৬

ফিকহি গ্রন্থাবলি সংকলন ২৮৯
অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ২৯২
পরিধি নির্দিষ্টকরণ ২৯২
বিচারকদের অন্যান্য দায়িত্ব ২৯৫
আব্বাসি যুগে বিচারব্যবস্থার অধঃপতন ২৯৯
বিচারব্যবস্থার সংস্কার ৩০০
বিচারকের সংশোধন বিষয়ক পত্রাবলি ৩০৩

☑ আব্বাসি যুগের বিচারকগণ ৩০৮

কাযি ইবনু শুবরুমাহ ৩১০
কাযি ইবনু আবি লাইলা ৩১১
কাযি শারীক আন-নাখায়ি ৩১২
কাযি সাওয়্যার ৩১৩
আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ বিচারক ৩১৪
মিশরের কয়েকজন বিচারক ৩১৫

☑ আব্বাসি যুগের বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য ৩১৬

আন্দালুসে ও মরক্কোতে বিচারব্যবস্থা ৩২০

☑ ঐতিহাসিক সারাংশ ৩২১

আফ্রিকা বিজয় ৩২২
আন্দালুস বিজয় ৩২৩
প্রশাসকদের যুগ ৩২৩
উমাইয়া নেতৃত্ব ৩২৪
আন্দালুসে উমাইয়া খিলাফত ৩২৫
মুলূকুত তাওয়াইফ বা আঞ্চলিক রাজা ৩২৬
আল-মুরাবিত রাজবংশ ৩২৬

মুওয়াহহিদদের রাজত্ব ৩২৭
আল-আহমার/আন-নাসর বংশের রাজত্ব ৩২৭
মরক্কো এবং উত্তর আফ্রিকা ৩২৯
☑ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে বিচার বিভাগের সম্পর্ক ৩৩০
☑ বিচারব্যবস্থার তুলনামূলক অবস্থান ৩৩৩
☑ বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ৩৩৬
বিচার-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ৩৩৬
আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারকগণ ৩৪৪
বিচারক নিয়োগ এবং নিয়োগের শর্তাবলি ৩৪৫
বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি ৩৪৮
বিচারকদের বেতন-ভাতা ৩৫১
বিচারকদের বেশ-ভূষা ৩৫৫
বিচারকদের সহায়ক ৩৫৭
বিচারক অপসারণ ৩৫৮
বিচারের জায়গা ৩৫৯
বিচারের সময় ৩৬০
☑ বিচারের গঠনমূলক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ৩৬২
বিচারের উৎস ৩৬৩
মালিকি মাযহাবের প্রসার ৩৬৪
বিচার-সংক্রান্ত পরিধি ৩৭০
বিচারকদের অতিরিক্ত দায়িত্ব ৩৭৫
মোকদ্দমার পদ্ধতি ৩৭৮
বিচার বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা ৩৮২
বিচার বিভাগের উপদেষ্টা পরিষদ ৩৮২

☑ আন্দালুস এবং মরক্কোর বিচারকবৃন্দ ৩৮৮
কয়েকজন প্রসিদ্ধ বিচারক ৩৮৯
আলিম বিচারক... ৩৯৬
☑ আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য ৩৯৭
মামলুক জামানার বিচারব্যবস্থা ৪০২
☑ মামলুক শাসনামলের ব্যাপারে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা......৪০২
মামলুক সাম্রাজ্যের সূচনা ৪০৩
প্রসিদ্ধ মামলুক শাসকগণ ৪০৪
মামলুক সাম্রাজ্যের অবসান..৪০৯
মামলুক সাম্রাজ্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক ৪১০
☑ বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা........................ ৪১২
ফিকহি মাযহাব অনুসারে চারজন বিচারক ৪১৩
সামরিক বিচারক.. ৪১৫
বিচারকদের সহযোগী..৪১৬
অন্যায় ও দুর্নীতির আদালত ৪১৬
হিসবাহর বিচার ৪১৭
বিচারব্যবস্থার অধঃপতন ৪১৮
বিচারকদের অপসারণ এবং তাদের অব্যাহতি ৪১৯
☑ বিচার বিভাগের গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা ৪২১
চার মাযহাব অনুসারে বিচার...................................... ৪২১
তাতারিদের আইন... ৪২১
বিচারকদের বাড়তি দায়িত্ব.. ৪২২
☑ মামলুক জামানার প্রসিদ্ধ বিচারকগণ ৪২৩

দামিস্কের শাফিয়ি বিচারকগণ..............................৪২৩
দামিস্কের হানাফি বিচারকগণ..............................৪২৫
দামিস্কের মালিকি বিচারকগণ..............................৪২৫
দামিস্কের হাম্বলি বিচারকগণ..............................৪২৫
মিশরের বিচারকগণ..............................৪২৫
ন্যায়পরায়ণ এবং অসৎ বিচারক..............................৪২৭
বিচারকার্য থেকে বিরত থাকা..............................৪৩০

☑ বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য..............................৪৩২

উসমানি যুগে বিচারব্যবস্থা ৪৩৪

☑ উসমানিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং পর্যালোচনা..............৪৩৪

উৎপত্তি এবং উত্থান..............................৪৩৪
মামলুকদের ওপর আধিপত্য..............................৪৩৬
উসমানি খিলাফত প্রতিষ্ঠা..............................৪৩৬
উসমানি সুলতানদের পরিচয়..............................৪৩৮
খিলাফতের রাজনৈতিক এবং আইনি পরিস্থিতি..............৪৪০
বিদেশিদের সুযোগ-সুবিধা..............................৪৪২
উসমানি যুগে ধর্মীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ..............৪৪৫

☑ উসমানি যুগে বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা..............৪৪৬

বিচারক নিয়োগ..............................৪৪৬
বিচারক হওয়ার শর্তাবলি..............................৪৪৮
উসমানি যুগে বিচার পদ্ধতি..............................৪৪৯
বেসামরিক আদালত প্রতিষ্ঠা..............................৪৫১
মিশরে আদালত এবং দ্বৈত বিচার বিভাগ..............৪৫৩

একাধিক বিচারক..৪৫৪
বিচারের একাধিক ধাপ ৪৫৪
বিচারকার্য পরিচালনার স্থান....................................৪৫৫
বিচারকার্য হানাফি মাযহাবের মাঝে সীমাবদ্ধকরণ ৪৫৬

☑ উসমানি যুগে গঠনমূলক বিচারব্যবস্থা ৪৫৮

পশ্চিমাদের থেকে গৃহীত উসমানি আইন......................৪৫৮
উসমানি যুগে ইসলামি আইন................................ ৪৬০
মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ.......................... ৪৬০
আদালত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় দ্বৈত পরিস্থিতি ৪৬২
উসমানি যুগে শারঈ বিচারকের পরিধি.......................৪৬৪
উসমানি যুগে বিচারের উৎস....................................৪৬৬
বিদেশি সুযোগ-সুবিধার প্রভাব..................................৪৬৭
বিচারব্যবস্থার অধঃপতন ৪৬৮
সংস্কারের ডাক এবং বিচার-বিভাগীয় একাডেমি.............৪৭০

☑ উসমানি যুগের বিচারকগণ.......................................৪৭২
☑ উসমানি যুগের বিচারব্যবস্থার গুণাবলি ৪৭৪

বর্তমান যুগে শারঈ বিচারব্যবস্থা ৪৭৮

☑ উসমানি যুগের সাথে বর্তমান যুগের সম্পর্ক ৪৭৯
☑ সিরিয়ায় শারঈ বিচারব্যবস্থা.....................................৪৮১

সিরিয়ার আইন প্রণয়নে বিচার বিভাগ.........................৪৮২
সাধারণ বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ৪৮২
সিরিয়ার সাধারণ বিচার বিভাগের আদালত....................৪৮৩
শারঈ আদালতের পরিধি.. ৪৮৬

সিরিয়ার শারঈ বিচারকের শর্তাবলি..........................৪৮৭

☑ মিশরে শারঈ বিচারব্যবস্থা ৪৮৮

শারঈ আদালতের বিলুপ্তি...৪৮৯

বিভিন্ন শ্রেণির আদালত ৪৯০

ব্যক্তিগত অবস্থার সমাধানে নগর-আদালতের পরিধি ৪৯১

ব্যক্তিগত অবস্থার উদ্দেশ্য..৪৯৩

☑ ইরাকে শারঈ বিচারব্যবস্থা.................................৪৯৪

বিচারব্যবস্থা এবং একক বিচার বিভাগ ৪৯৪

আদালতের বিন্যাস..৪৯৫

শারঈ আদালতের পরিধি...৪৯৮

☑ জর্ডানে শারঈ বিচারব্যবস্থা...................................৫০০

আদালতের ধরন ৫০০

শারঈ বিচার বিভাগ...৫০২

শারঈ আদালত গঠন ৫০৫

শারঈ আদালতের পরিধি.. ৫০৫

শারঈ বিচারব্যবস্থার রায়ের উৎস ৫০৭

শারঈ বিচারকদের সহকারী......................................৫০৭

☑ ফিলিস্তিনে আদালত গঠন ৫০৭

☑ সৌদি আরবে শারঈ বিচারব্যবস্থা..........................৫০৮

বিচারের আইনি ব্যবস্থাপনা ৫০৯

বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ....................................৫১০

স্বাধীন বিচার বিভাগের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ৫১১

শারঈ আদালত ৫১৩

☑ বিভিন্ন আরব দেশে শারঈ বিচারব্যবস্থা......................৫১৪

লিবিয়ায় শারঈ বিচারব্যবস্থা ৫১৫
কাতারের শারঈ বিচারব্যবস্থা ৫১৭
লেবাননের শারঈ বিচারব্যবস্থা....................................৫১৯
☑ আধুনিক যুগে শারঈ বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ৫২১
☑ পরিশিষ্ট ৫২৩
☑ কিছু সুপারিশ এবং আবেদন ৫২৬
সহায়ক গ্রন্থ ৫২৮

০৭

বিচারব্যবস্থার ইতিবৃত্ত

এই অধ্যায়ে প্রথমে الْقَضَاءُ-এর আভিধানিক এবং পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ করা হবে। এরপর আমরা এটার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করে পর্যায়ক্রমে তার বৈধতার সপক্ষে কুরআনের আয়াত এবং হাদিস উল্লেখ করব। এরপর আমরা লক্ষ করব, কিভাবে তা স্বাভাবিক গতিতে ঐতিহাসিক পূর্ণতা লাভ করেছিল ও উন্নতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। এরপর দেখব, ক্রমাগত অবনতি ও অধঃপতনের ফলে কিভাবে তা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ল।

الْقَضَاءُ-এর শাব্দিক অর্থ

الْقَضَاءُ শব্দটি ক্রিয়ামূল। এর বহুবচন হলো أَقْضِيَةٌ; *আল-কামূসুল মুহীত* গ্রন্থে আছে, الْقَضَاءُ প্রলম্বিত এবং সংক্ষিপ্ত দুই ধরনের হয়। শব্দটি عَلَى অব্যয়যোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। رَجُلٌ قَضِيٌّ অর্থ দ্রুত ফয়সালাকারী। اسْتَقْضَى الرَّجُلُ অর্থ সে বিচারক হলো।[৭]

الْقَضَاءُ শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন :

☑ ১. কোনো বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া। এ অর্থে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ

> বনি ইসরাইলের জন্য আমি নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম।[৮]

☑ ২. অবসর লাভ করা। যেমন বলা হয়, قَضَى حَاجَتَهُ অর্থাৎ প্রয়োজন সমাধা করে অবসর লাভ করেছে।

---

[৭] আল-কামূসুল মুহীত : ৪/৩৭১

[৮] সূরা ইসরা, ১৭ : ৪

☑ ৩. আবশ্যক করে দেওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا

> তোমার প্রতিপালক আবশ্যক করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং বাবা-মায়ের সাথে সদাচার করবে।[৯]

☑ ৪. আদায় বা পরিশোধ করা এবং পৌঁছে দেওয়া। এ অর্থেই قَضٰى دَيْنَهُ অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করেছে বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَضَيۡنَاۤ اِلَيۡهِ ذٰلِكَ الۡاَمۡرَ

> এবং তাঁর কাছে আমি এ বার্তা পৌঁছে দিলাম।[১০]

অন্য আয়াতে আছে,

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانۡتَشِرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ

> নামাজ আদায়ের পর তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে।[১১]

☑ ৫. বাধা দেওয়া। যেমন قَضَيْتُ عَلَى السَّفِيْهِ অর্থাৎ অবুঝের ব্যাপারে রায় দিয়েছি। অবুঝের ব্যাপারে রায় দেওয়ার অর্থ তাকে হস্তক্ষেপ করতে বাধা দেওয়া। বিচারককে القَاضِيْ (কাযি) বলার কারণ, তিনি জালিমকে জুলুম করতে বাধা দিয়ে থাকেন। قَضَى الْحَاكِمُ অর্থ, বিচারক ন্যায়কে যথাযথ স্থানে প্রয়োগের মাধ্যমে অনুপযুক্তকে বাধা দিয়েছেন। বিচারকার্যে ন্যায়কে যথাযথ স্থানে প্রয়োগের জন্য হিকমত তথা প্রজ্ঞার প্রয়োজন পড়ে বিধায় القَضَاءُ-কে الْحُكْمُ বলে।

☑ ৬. এগুলো ছাড়াও القَضَاءُ শব্দটির আরও অনেক অর্থ আছে। যেমন: قَضَى الشَّيْءَ অর্থ তৈরি করল, قَضَى أَجَلَهُ অর্থ পৌঁছে গেল এবং قَضَى نَحْبَهُ অর্থ মৃত্যুবরণ করল। এ অর্থে আল্লাহ তাআলা বলেন,

مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ رِجَالٌ صَدَقُوۡا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيۡهِ ۚ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ قَضٰى نَحۡبَهٗ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّنۡتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوۡا تَبۡدِيۡلًا ﴿۲۳﴾

> মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, আবার কেউ কেউ প্রতীক্ষায় আছে। তারা

[৯] সূরা ইসরা, ১৭ : ২৩
[১০] সূরা হিজর, ১৫ : ৬৬
[১১] সূরা জুমুআ, ৬২ : ১০

নিজেদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।[১২]

☑ ৭. قَضَى অর্থ আবশ্যক করে নিয়েছে। আবুল বাকা লিখেন, 'ভাষাবিদরা القَضَاءُ-এর অনেক অর্থ লিখেছেন। এ ব্যাপারে কথায় এবং কাজে তাদের বক্তব্য পরিপূর্ণ।'[১৩]

আমাদের বইতে القَضَاءُ-এর শাব্দিক অর্থ বিচার করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ

ফিকহবিদগণ القَضَاءُ-এর অনেকগুলো সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলো প্রায় একই রকম। সবগুলোই একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোনো ধরনের নতুনত্ব তাতে পাওয়া যায় না।

শাফিয়ি ফিকহবিদগণ القَضَاءُ (বিচার)-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে—'দুই বা ততোধিক বাদী এবং বিবাদীর মাঝে আল্লাহ তাআলার বিধান অনুসারে ফয়সালা করে দেওয়া।'[১৪] তারা আরও বলেন, 'القَضَاءُ অর্থ কোনো জিনিস বাস্তবায়ন করা, মজবুত ও সুদৃঢ় করা।'[১৫]

মালিকি ফিকহবিদ ইবনু রুশদ বলেছেন, 'আবশ্যকভাবে শরীয়তের বিধান জানিয়ে দেওয়া।' ইবনু ফারহুন এ সংজ্ঞাটি বর্ণনা করে তার সাথে একাত্মতা পোষণ করেছেন।[১৬]

ইবনু আরাফাহ বলেছেন, 'القَضَاءُ এমন একটি বিশেষ গুণ বা অবস্থা, যা তার বিশেষায়িত ব্যক্তির ওপর শারঈ বিধান বাস্তবায়ন আবশ্যক করে। যদিও সেটা তাদিল-তাজরিহ তথা নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে হয়। তবে এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন মুসলিমদের সামগ্রিক বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।'[১৭] এই সংজ্ঞার মাধ্যমে সালিশি ব্যবস্থা, পুলিশের কর্তব্য-সহ অন্যান্য সরকারি দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব নাকচ হয়ে যায়।

হাম্বলি ফিকহবিদ বাহুতির মতে, 'القَضَاءُ হচ্ছে শারঈ বিধান পালনে বাধ্য করা এবং বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি করা।'[১৮]

---

[১২] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২৩

[১৩] আল কুল্লিয়্যাত : ৪/৮। এ ছাড়াও মুগনিল মুহতাজ : ৪/৩৭১, হাশিয়াতুশ শারকাভি : ২/৪৯১, হাশিয়াতুদ দুসুকি : ৪/১২৮, কাশফুল কিনা : ৬/২৮৫ এবং ফাতহুল কাদীর : ৫/৪৫৩ দেখা যেতে পারে।

[১৪] মুগনিল মুহতাজ : ৪/৩৭১, হাশিয়াতুশ শারকাভি : ২/৪৯১

[১৫] আল বুজাইরামি আলাল খতিব : ৪/৩১৭

[১৬] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ২/৮

[১৭] ইবনু আরাফাহ, শারহু হুদূদ লিররসা : ৪৩৩

[১৮] কাশফুল কিনা : ৬/২৮৫

সানআনি বলেন, 'القَضَاءُ হলো বিবাদ বা মামলা-মোকদ্দমা উপস্থাপনের পর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক তাতে আবশ্যক বিধান আরোপ করা।'[১৯]

এসব সংজ্ঞার সারসংক্ষেপ দাঁড়ায় এমন, القَضَاءُ বা বিচার হচ্ছে মোকদ্দমা এবং দাবির ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম জানিয়ে দিয়ে বাদী-বিবাদীর মাঝে ন্যায়বিচার প্রকাশ করা। অতএব বিচারক হলেন আল্লাহ তাআলার প্রকৃত বিধানের সংবাদদাতা ও প্রকাশকারী মাত্র। তিনি নিজ থেকে কোনো বিধান প্রণয়ন করেন না। বিচারকের অবস্থান এ ক্ষেত্রে ফতোয়া-প্রদানকারীর মতো। তবে বিচারক ও ফতোয়াদাতার মাঝে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন :

- ☑ ক. বিচারকের নির্দেশ বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষই মানতে বাধ্য।
- ☑ খ. কোনো হুকুমের ব্যাপারে বিচারকের সংবাদ প্রদান আবশ্যকভাবে হয়। অর্থাৎ বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষই বিচারকের দেওয়া নির্দেশ মেনে নিতে এবং বাস্তবায়ন করতে বাধ্য।

এটাই হচ্ছে বিচারক, ফতোয়াদাতা এবং সালিশের মধ্যকার পার্থক্য। উল্লেখ্য, বাধ্যবাধকতা হচ্ছে আইনি ক্ষমতার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত; যা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশবিশেষ।

القَضَاءُ বা বিচারের সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন হানাফি ফিকহবিদগণ। ইবনু আবিদীন শামী বলেছেন, 'কুরআন-হাদিস থেকে আহরিত শারঈ বিধানের মাধ্যমে মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া, যাতে বিবাদের কারণ দূরীভূত হয় এবং বিতর্কের দরজা রুদ্ধ হয়ে যায়।'[২০]

এই সংজ্ঞা থেকে দুটি প্রধান বিষয় স্পষ্ট হয় :

- ☑ **১. শারঈ বিচারব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য :** বিবাদ নিরসন এবং বিতর্কের দরজা বন্ধ করা القَضَاءُ বা বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূল লক্ষ্য। আর এটা পূর্ণ হতে আবশ্যককারী শক্তি এবং রাষ্ট্র থেকে পাওয়া বিচার ক্ষমতা প্রয়োজন।
- ☑ **২. কুরআন-সুন্নাহর মাঝে থাকা আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিধান বাস্তবায়ন :** সেটা হতে পারে দলিল-প্রমাণ এবং ব্যক্তিগত গবেষণার মাধ্যমে কিংবা সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে যেসব ইঙ্গিতপূর্ণ দলিল নাযিল করেছেন, সেগুলোর মাধ্যমেও হতে পারে। এ ছাড়া ব্যক্তি এবং সমাজের সংশোধনের জন্য আরও যেসব শারঈ দলিলের উৎস তিনি রেখেছেন, সেসবের মাধ্যমে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

---

[১৯] সুবুলুস সালাম : ৪/১১৫

[২০] হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন মাআশ শরাহ : ৫/৩৫১

ওপরিউক্ত সবগুলো সংজ্ঞা প্রকৃত বিধানদাতা মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর বিধানই সুদৃঢ় করে। কারণ, القضاء বা বিচারব্যবস্থা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার শারঈ বিধান। এর মাধ্যমে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

وَاَنِ احۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ

> আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী আপনি বিচার-ফয়সালা করুন; তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।[২১]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوۡكَ فِيۡمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُوۡا فِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُوۡا تَسۡلِيۡمًا ﴿٦٥﴾

> না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের বিচারক্ষমতা আপনার ওপর ন্যস্ত না করবে; তারপর আপনার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা না রেখে সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেবে।[২২]

وَمَنۡ لَّمۡ يَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤٮِٕكَ هُمُ الۡكٰفِرُوۡنَ ﴿٤٤﴾

> আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।[২৩]

وَمَنۡ لَّمۡ يَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤٮِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿٤٥﴾

> আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, তারাই জালিম।[২৪]

وَمَنۡ لَّمۡ يَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤٮِٕكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿٤٧﴾

> আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক।[২৫]

তবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এই সংজ্ঞাগুলো কেবল সাধারণ القضاء বা বিচারব্যবস্থাকে বুঝিয়ে থাকে, যা কোনো দাবি উত্থাপনের পর দুপক্ষের মাঝে ফয়সালাস্বরূপ হয়ে থাকে। জুলুম এবং বিভিন্ন অপরাধের বিচার, লেনদেন তথা হিসাবনিকাশের বিচার এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। এই বিচার দুটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ অধিকারের সুরক্ষা দেওয়া এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সমাজে

---

[২১] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৯

[২২] সূরা নিসা, ৪ : ৬৫

[২৩] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৪

[২৪] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৫

[২৫] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৭

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং ঈমান-আকীদা, ইবাদত, মুআমালাত ও মুআশারাতের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান আঁকড়ে ধরা। সর্বোপরি মানবজীবনের সমস্ত অঙ্গনে ইসলামের আলোকিত শরীয়তের বাস্তবায়ন ঘটানো। যদিও জীবনে কোনো মামলা-মোকদ্দমা, ঝগড়াবিবাদ কিংবা মতবিরোধ না থাকে। তাই اَلْقَضَاءُ বা বিচারব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক একটি সংজ্ঞা এখানে পেশ করা বাঞ্ছনীয় মনে হচ্ছে—**'বিচারব্যবস্থা হচ্ছে শরীয়তের বিধিবিধানের মাধ্যমে বাদী-বিবাদীর মাঝে ফয়সালা এবং সাধারণ অধিকার রক্ষার সক্ষমতা।'**[২৬]

অতএব اَلْقَضَاءُ হচ্ছে বাদী-বিবাদীর মাঝে ফয়সালা করার এমন ক্ষমতা, যা ফয়সালাকৃত হুকুম পালনে বাধ্য করবে। আর তা রাষ্ট্রের এমন এক ক্ষমতা, যা মানুষের অধিকার রক্ষা ও শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য আইনকানুন আঁকড়ে ধরার জন্য মানুষকে বাধ্য করার নাম। যার মাধ্যমে শাসক কিংবা শাসিত, সরকারি কর্মচারী বা সাধারণ নাগরিক নির্বিশেষে সকলের জন্য ক্ষতিকর সবকিছু প্রতিহত করা হবে।

বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব

বিচারব্যবস্থা শরীয়তের একটি অংশ মাত্র। শরীয়তের সাধারণ বিশেষণ, বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষত্ব এই বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বিচারব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামি ফিকহের একটি অধ্যায়, যা সব মাযহাবের ফকিহগণ এবং উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ফিকহের কিতাবে উল্লেখ করে থাকেন।

বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য হলো সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়ের শাসন বাস্তবায়ন করা। মানুষের জান, মাল, সম্মান এবং অধিকার রক্ষার পাশাপাশি সাধারণ প্রতিরক্ষা নীতির প্রচলন ঘটানো। শরীয়তের বিধিবিধান এবং শিক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দণ্ডবিধি কায়েম করা। বিশুদ্ধ চরিত্র সংরক্ষণ করার মাধ্যমে সব ধরনের অন্যায়, অনাচার এবং সীমালঙ্ঘনের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবি-রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। এই ইনসাফের মাধ্যমেই আসমান ও জমিন টিকে আছে। ইনসাফের লক্ষণগুলো যেখানে যে-পদ্ধতিতে প্রকাশ পাবে, সেখানেই আল্লাহর দ্বীন এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত

[২৬] এটা ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে লিখিত اَلْقَضَاءُ-এর পরিচয়। সাধারণ অর্থ বিবেচনায় এটা اَلْقَضَاءُ-এর অর্থের বেশি কাছাকাছি। অর্থাৎ 'সাধারণ দায়িত্ব থেকে প্রকাশিত আবশ্যককারী কথা।' এই সংজ্ঞাতে স্বাভাবিক বিচার এবং শারঈ বিধানের পাবন্দির ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা না থাকলেও স্বাভাবিক বিচার, অভিযোগের তদন্ত, নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত বিচার এই সংজ্ঞার অধীনে চলে আসে। — আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া : ৩/৩০৬ দ্রষ্টব্য।

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং ঈমান-আকীদা, ইবাদত, মুআমালাত ও মুআশারাতের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান আঁকড়ে ধরা। সর্বোপরি মানবজীবনের সমস্ত অঙ্গনে ইসলামের আলোকিত শরীয়তের বাস্তবায়ন ঘটানো। যদিও জীবনে কোনো মামলা-মোকদ্দমা, ঝগড়াবিবাদ কিংবা মতবিরোধ না থাকে। তাই اَلْقَضَاءُ বা বিচারব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক একটি সংজ্ঞা এখানে পেশ করা বাঞ্ছনীয় মনে হচ্ছে—**'বিচারব্যবস্থা হচ্ছে শরীয়তের বিধিবিধানের মাধ্যমে বাদী-বিবাদীর মাঝে ফয়সালা এবং সাধারণ অধিকার রক্ষার সক্ষমতা।'**[২৬]

অতএব اَلْقَضَاءُ হচ্ছে বাদী-বিবাদীর মাঝে ফয়সালা করার এমন ক্ষমতা, যা ফয়সালাকৃত হুকুম পালনে বাধ্য করবে। আর তা রাষ্ট্রের এমন এক ক্ষমতা, যা মানুষের অধিকার রক্ষা ও শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য আইনকানুন আঁকড়ে ধরার জন্য মানুষকে বাধ্য করার নাম। যার মাধ্যমে শাসক কিংবা শাসিত, সরকারি কর্মচারী বা সাধারণ নাগরিক নির্বিশেষে সকলের জন্য ক্ষতিকর সবকিছু প্রতিহত করা হবে।

বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব

বিচারব্যবস্থা শরীয়তের একটি অংশ মাত্র। শরীয়তের সাধারণ বিশেষণ, বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষত্ব এই বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বিচারব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামি ফিকহের একটি অধ্যায়, যা সব মাযহাবের ফকিহগণ এবং উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ফিকহের কিতাবে উল্লেখ করে থাকেন।

বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য হলো সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়ের শাসন বাস্তবায়ন করা। মানুষের জান, মাল, সম্মান এবং অধিকার রক্ষার পাশাপাশি সাধারণ প্রতিরক্ষা নীতির প্রচলন ঘটানো। শরীয়তের বিধিবিধান এবং শিক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দণ্ডবিধি কায়েম করা। বিশুদ্ধ চরিত্র সংরক্ষণ করার মাধ্যমে সব ধরনের অন্যায়, অনাচার এবং সীমালঙ্ঘনের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া।

ইবনুল কাইয়িম ﷀ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবি-রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। এই ইনসাফের মাধ্যমেই আসমান ও জমিন টিকে আছে। ইনসাফের লক্ষণগুলো যেখানে যে-পদ্ধতিতে প্রকাশ পাবে, সেখানেই আল্লাহর দ্বীন এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত

---

[২৬] এটা ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে লিখিত اَلْقَضَاءُ-এর পরিচয়। সাধারণ অর্থ বিবেচনায় এটা اَلْقَضَاءُ-এর অর্থের বেশি কাছাকাছি। অর্থাৎ 'সাধারণ দায়িত্ব থেকে প্রকাশিত আবশ্যককারী কথা।' এই সংজ্ঞাতে স্বাভাবিক বিচার এবং শারঈ বিধানের পাবন্দির ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা না থাকলেও স্বাভাবিক বিচার, অভিযোগের তদন্ত, নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত বিচার এই সংজ্ঞার অধীনে চলে আসে। — আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া : ৩/৩০৬ দ্রষ্টব্য।

হবে।'[২৭]

অতীতের বিভিন্ন শরীয়ত এবং দ্বীনের ইতিহাস দেখলে আমরা নিশ্চিত হয়ে যাব, নবি-রাসূলদেরকে আল্লাহ তাআলা বিধিবিধান দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে মানুষের জীবন আলোকিত করা। মানুষ যাতে নিজের যথাযথ প্রাপ্য বুঝে নেয় এবং নিজের করণীয় বুঝতে পেরে তা পালন করে।

প্রতিটি মানুষকে নিজের হক বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি অন্যের হক সম্পর্কে সচেতন করাই শরীয়তের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যেই শরীয়ত মানুষের মাঝে দণ্ডবিধির প্রচলন করেছে। মানুষকে জুলুম থেকে বিরত রাখার জন্য শরীয়ত প্রণয়ন করেছে আয়-ব্যয়ের নীতিমালা। মানুষকে বাধ্য করেছে তা মানতে। তাই মুসলিম অপর মুসলিমের হক নষ্ট করতে পারে না। অপরের হকের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা তার জন্য বৈধ নয়। কোনো মুসলিম স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। শরীয়তের মাধ্যমেই প্রতিটি মানুষ নিজের করণীয় দিক জানতে পারে। এর মাধ্যমেই জীবন হয়ে ওঠে সুখময়, নিশ্চিন্ত এবং নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ।

কিন্তু মন্দের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মানুষের স্বভাব। সত্য থেকে সে সরে যায়। সীমালঙ্ঘন করা তার রীতি। অন্যের ওপর জুলুম করা তার অভ্যাস। মানুষের হাতে থাকা জিনিসের প্রতি তার লোভ চিরাচরিত। কর্তব্য পালনে সে পশ্চাৎপদ। নিজের হকের ক্ষেত্রে সে সীমালঙ্ঘন করেই চলে। এ কারণেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিচারব্যবস্থা আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন।

খতিব শারবীনি ﷺ বলেছেন, 'সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ জুলুম করতে এবং অপরের হক নষ্ট করতে অভ্যস্ত। অল্পসংখ্যক মানুষই পারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে।'[২৮]

এ কারণেই আইনের প্রবর্তন ঘটেছে। প্রণীত হয়েছে বিধিবিধান। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিচারব্যবস্থা। ঐশী আইন হোক বা জাগতিক, উভয়টিই দুভাগে বিভক্ত। কিছু আইনের প্রয়োগ থাকে না। মানুষের অধিকারের সুবিধার্থে এসব আইন কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার কিছু আইন এমন, যা মানুষের অধিকার, সীমারেখা এবং নিয়মনীতির সুরক্ষায় প্রণয়ন করা হয়। এ-ধরনের আইন কার্যকরী।

এই দুটি প্রকার একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি না থাকলে অপরটিও পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান এবং গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, এই সম্পর্কটি সামগ্রিকভাবে সত্য এবং তার সহায়কের সম্পর্ক। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিধান প্রতিষ্ঠার কাজের সুবিধার্থে এই সহায়ক প্রাপ্ত হয়। রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিচারক হওয়ার কারণে নবি ﷺ-ও এই সহায়ক পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা

---

[২৭] আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ : ১৪। এই কথাগুলো ইবনুল কাইয়িম তাঁর অনেক কিতাবেই উল্লেখ করেছেন। যেমন বাদায়িউল ফাওয়াইদ : ৩/১৫৩, আ'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ৪/৩৭৩।

[২৮] মুগনিল মুহতাজ : ৪/২৭২

বলেন,

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ

> আমি তো আপনার প্রতি সত্য-সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন, সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করেন।[২৯]

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ

> আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী আপনি ফয়সালা করুন; তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।[৩০]

নবি ﷺ-এর পর এই কর্তৃত্ব তাঁর খলিফা এবং অন্যদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর বিজ্ঞজনের দূরদর্শিতা ও প্রাজ্ঞজনের বুদ্ধিমত্তার সম্মিলনে সৃষ্ট বিচার-বিষয়ক সূক্ষ্ম নীতির মাধ্যমে তার প্রচার-প্রসার ঘটেছে। বিচারক এটার মাধ্যমেই শাসকের প্রতিনিধিরূপে শক্তিমত্তা প্রকাশ করেন এবং প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। মোটকথা, বিচারব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনগণের জান, মাল এবং অধিকার রক্ষার পাশাপাশি সমাজের শৃঙ্খলা ও বিধিবিধান রক্ষার দায়িত্ব বিচারব্যবস্থার ওপর। এর ফলেই সমাজে স্থিরতা বিরাজ করে। প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি এবং ইনসাফ।

জাতির নেতৃত্ব এবং স্বকীয়তার প্রতীক হলো বিচারব্যবস্থা। বিচারব্যবস্থা ছাড়া জাতির মাঝে কোনো ধরনের অধিকার বা ন্যায়বিচার নেই। প্রত্যেক জাতির বিচারব্যবস্থার ইতিহাস তার জন্য সম্মানজনক এবং গৌরবময়। এর মাধ্যমে তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং চিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটে। বিচারব্যবস্থা এবং ইনসাফের মাধ্যমে রাষ্ট্র এবং সরকারের সঠিক চিত্র ফুটে ওঠে। এর মাধ্যমে বুঝে আসে—সরকারের প্রতি জনগণ কতটা আস্থাশীল এবং জনগণের প্রতি সরকার কতটা সচেতন। বিচারব্যবস্থা এবং ইনসাফ হচ্ছে দায়িত্বশীল, নেতৃবৃন্দ এবং শাসকগোষ্ঠীকে পরিমাপ করার সূক্ষ্ম মানদণ্ড।

ইনসাফের কারণেই আসমান ও জমিন টিকে আছে। এটাই সমৃদ্ধির ভিত। বিচারব্যবস্থা হচ্ছে ইনসাফের সর্বোত্তম প্রকাশস্থল। এরিস্টটলের ভাষায় যাকে 'বিশ্বের ভর' বলে। সেটাই রাজত্বের ভিত্তি এবং নিরাপত্তার শক্তিশালী স্তম্ভ। এর মাধ্যমেই হয় আইনের প্রচলন, সমাজের উন্নতি ঘটে এবং জাতির অগ্রগতি হয়।

সাআলাবি বলেছেন, 'সরকারের সিদ্ধান্তে জনগণ সংশোধিত হয় আর

---

[২৯] সূরা নিসা, ৪ : ১০৫
[৩০] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৯

সুবিচারের মাধ্যমে রাজত্ব হয় সুসংহত। রাজ্যে ইনসাফ থাকলে সহায়কের অভাব থাকে না। যে শাসক ন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট, জনগণ তার প্রতি মনোযোগী। কাজেই, শাসনক্ষমতা হাতে পেলে ন্যায়বিচার করা উচিত। কারণ জনগণকে ধরে রাখার উপায় হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা। শাসক অন্যায় করতে থাকলে রাজ্যের সবাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে শাসক ন্যায়পরায়ণ হলে কেউ জুলুমের দুঃসাহস দেখাতে পারে না।'

সাআলাবি আরও বলেন, 'জুলুম করলে নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অন্যায় হলো শাস্তির কারণ। অত্যাচারীর পতন খুব নিকটে। মজলুমের দুআ অব্যর্থ। যে শাসকের সীমালঙ্ঘন যত বেশি, তার ক্ষমতা তত দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। জালিমের কাছে থাকা লোকেরাই তার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে থাকে। যার জুলুম আর সীমালঙ্ঘন বাড়ে, তার পতন ঘনিয়ে আসে। মজলুমের বিপক্ষে গিয়ে জালিমের সমর্থনকারী ব্যক্তি জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট।'

ইনসাফ বাস্তবায়ন করার জন্যই যুগে যুগে নবি-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন এবং তাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। ইনসাফের প্রতি ইসলাম বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ
لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

> অবশ্যই আমার রাসূলদের আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব আর ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।[৩১]

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهٖ

> আর তোমরা যখন মানুষের মাঝে কোনো বিচার করবে, তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দান করেন, তা কতই-না উত্তম।[৩২]

মুসলিমরা বিচারব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এ কারণেই আবু বকর ؓ বলেন, 'আপনাদের মধ্যে থাকা দুর্বল ব্যক্তিটি আমার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী, যতক্ষণ না তার অধিকার আমি ফিরিয়ে দিতে পারি।

---

[৩১] সূরা হাদিদ, ৫৭ : ২৫
[৩২] সূরা নিসা, ৪ : ৫৮

আবার আপনাদের মধ্যকার শক্তিশালী ব্যক্তিটি আমার কাছে সবচেয়ে দুর্বল, যতক্ষণ না আল্লাহর ইচ্ছায় তার থেকে অপরের অধিকার আদায় করতে পারি।'

উমাইর ইবনু সাদ ﷺ ছিলেন উমর ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত হিমসের প্রশাসক। নিয়োগের পরে প্রথম ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'মনে রাখবেন, ইসলাম হচ্ছে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং একটি মজবুত দরজা। ইসলামের প্রাচীর হলো ইনসাফ এবং তার দরজা হলো ন্যায়পরায়ণতা। দেয়াল ভেঙে ফেলা আর দরজা ধসিয়ে দেওয়ার অর্থ ইসলামকে পরাজিত করা। ইসলাম ততক্ষণ নিরাপদ থাকবে, যতক্ষণ তার কর্তৃত্ব থাকবে সুসংহত। কর্তৃত্ব সুসংহত থাকার অর্থ তরবারির মাধ্যমে হত্যা বা চাবুক দিয়ে আঘাত করা নয়। বরং কর্তৃত্ব সুসংহত থাকা মানে ন্যায়বিচার করা এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।'[৩৩]

এ কারণেই উলামায়ে কেরাম, ফুকাহা এবং শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ বিচারকার্যের জ্ঞানকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সম্মানিত এবং শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, এই জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি মানুষের জান-মাল এবং অধিকার রক্ষা করে থাকেন। জালিম আর সীমালঙ্ঘনকারীকে নিবৃত্ত করার পাশাপাশি হালাল-হারাম বাতলে দেন, যা ছিল স্বয়ং নবি-রাসূলগণের কর্তব্য।[৩৪] আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ
لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

> হে দাউদ! আপনাকে আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি, অতএব আপনি মানুষের মাঝে সুবিচার করুন, তবে খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। কেননা তা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।[৩৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾

> আর যদি বিচার করো, তবে তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করবে।[৩৬]

নবি ﷺ বলেছেন,

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এমন জাতিকে (গুনাহ থেকে) পবিত্র করেন না, যারা তাদের মধ্যকার দুর্বলদের অধিকার দেয় না।'[৩৭]

---

[৩৩] তবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৭৫

[৩৪] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/২-৩

[৩৫] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ২৬

[৩৬] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪২

[৩৭] আল মুজামুল কাবীর লিত তবারানি, হাদিস নং : ১০৫৩৪

অন্য বর্ণনামতে, নবি ﷺ বলেছেন,

> 'আল্লাহ এমন জাতিকে কিভাবে (গুনাহ হতে) পবিত্র করবেন, যাদের সবলদের থেকে দুর্বলদের প্রাপ্য আদায় করে দেওয়া হয় না?'[৩৮]

ইনসাফের সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারাকে ঈর্ষণীয় নিয়ামত আখ্যা দিয়ে নবি ﷺ বলেছেন,

> 'দুজন ব্যক্তিকেই কেবল ঈর্ষা করা যায়। প্রথমত সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন। তারপর সেটা বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রজ্ঞা দান করেছেন। যার মাধ্যমে সে বিচার-ফয়সালা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।'[৩৯]

এ সম্পর্কিত আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি মানুষ বিচারব্যবস্থার সাথেই থাকে। আম্বিয়ায়ে কেরামের অন্যতম মিশন এবং কাজ ছিল এই বিচারব্যবস্থা। নেককার আর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময় নেতৃত্ব, দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অনেক সময় এই পদ অলংকরণ করেছেন। ইসলামের আলোকে বিচারব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা এ সংক্রান্ত অনেক আয়াত এবং হাদিস দেখব ইনশা-আল্লাহ।

অর্জিত হওয়া এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া মহৎ উদ্দেশ্যের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব বুঝে আসে। বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামে যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস চালানো হয় সেটা হচ্ছে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, সকলের অধিকার সংরক্ষণ, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, জান-মালের সুরক্ষা, জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের প্রতিরোধ, দণ্ডবিধি কায়েম, অপরাধীকে পাকড়াও এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা। যাতে অপরাধী নিজেও নিষিদ্ধ অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয়, আবার অন্য কেউ যাতে অমন কাজ করার সাহসও না দেখায়। কারণ বুদ্ধিমান লোক অপরের অবস্থা দেখে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। শাস্তি এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা প্রত্যক্ষ করে কেউ অপরাধে লিপ্ত হওয়ার আগে দশ বার ভাবতে বাধ্য হয়। এভাবেই বিচারব্যবস্থা অপরের অধিকার সংরক্ষণ করে, প্রতিহত করে সীমালঙ্ঘন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ছিনিয়ে নেওয়া অধিকার তার হকদারের কাছে ফিরিয়ে দেয় কিংবা যে-কোনোভাবে তার বিনিময় প্রদান করে থাকে। সেইসাথে সাধারণ নিয়ম, প্রচলিত শিষ্টাচার এবং উম্মতের মূল্যবোধ ও আদর্শ ঠিক রাখে। আর আল্লাহর আইন, দ্বীন এবং বিধানাবলির বাস্তবায়ন তো বিচারব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

---

[৩৮] সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস নং : ৪০১০

[৩৯] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩, ৭৩১৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৮১৬

ছোট-বড়, গরিব-ধনী সমস্ত মানুষই বিচারব্যবস্থার আওতাধীন। ক্ষমতাধর কিংবা সাধারণ মানুষ, নারী কিংবা পুরুষ কেউই এর গণ্ডির বাইরে নয়। ধর্মীয় বা জাতিগত কিংবা গোত্রীয় ভেদাভেদ এখানে হয় না। শত্রু-মিত্র এবং কাছে-দূরের সবাই এখানে বরাবর। কারণ বিচারব্যবস্থা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা বাস্তবায়ন। তিনি বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى
اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যদিও সেটা তোমাদের নিজেদের অথবা বাবা-মা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।[৪০]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَ لَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۫ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
۫ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۸﴾

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্য প্রদানে অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করো, এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী, আর আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।[৪১]

وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۴۲﴾

> আর যদি বিচার করো, তবে তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করবে।[৪২]

وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

> তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায্য কথা বলবে, যদিও তোমাদের আত্মীয়দের সাথে হয়।[৪৩]

---

[৪০] সূরা নিসা, ৪ : ১৩৫
[৪১] সূরা মায়িদা, ৫ : ৮
[৪২] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪২
[৪৩] সূরা আনআম, ৬ : ১৫২

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ

> আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক আমাকে ইনসাফের আদেশ দিয়েছেন।[৪৪]

এখন আমরা ইসলামের আলোকে বিচারব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে আলোচনা করব।

ইসলামে বিচারব্যবস্থার বৈধতা

বিচারব্যবস্থা শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম শক্তি। কুরআন-হাদিসের আলোকে এবং মুসলিমদের ইজমার ভিত্তিতে বিচারব্যবস্থার বৈধতা প্রমাণিত। তদ্রূপ যুক্তির নিরিখেও তা সমর্থিত।

কুরআনের ভাষ্য

ফয়সালা এবং বিচারকার্যের সপক্ষে কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে। মানুষের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করে দেওয়া ছিল সাধারণভাবে নবিগণের ওপর এবং বিশেষভাবে নবি ﷺ-এর জন্য আবশ্যক। এটা ছিল তাঁদের দায়িত্বের অংশ। কুরআনের ভাষ্য অনুসারে আল্লাহর দ্বীনের বিধান কবুল করা এবং তা বাস্তবায়ন করাই কেবল যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত অনুসারে ফয়সালার ওপরও ঈমান নির্ভরশীল। এখানে আমরা এ সম্পর্কিত কুরআন কারীমের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ
وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا

> আমি তো আপনার প্রতি সত্য-সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছে সে অনুসারে লোকদের মাঝে আপনি ফয়সালা করেন। আর আপনি খিয়ানতকারীদের পক্ষে তর্ককারী হবেন না।[৪৫]

মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করা তো এমনিতেই রিসালাতের অন্যতম লক্ষ্য। আর যে-কোনো ধরনের লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেওয়ার ব্যাপারে নবি ﷺ যে আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষভাবে আদিষ্ট ছিলেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

তু'মা নামক একজন আনসারি তার প্রতিবেশী কাতাদার কাছ থেকে একটি বর্ম

---

[৪৪] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৯
[৪৫] সূরা নিসা, ৪ : ১০৫

চুরি করে। তারপর সেটি জনৈক ইহুদির কাছে লুকিয়ে রাখে। পরে খোঁজ করা হলে স্বাভাবিকভাবেই তু'মার কাছে বর্মটি পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া সে শপথ করে বর্মটি না নেওয়ার কথাও জানায়। অবশেষে ইহুদিটির কাছ থেকে বর্মটি উদ্ধার করা হয়। সে তখন জানায়, তু'মাই তার কাছে বর্মটি রেখে গেছে। এ ছাড়া আরও কয়েকজন ইহুদিও একই কথা বলে। তখন তু'মার গোত্রের কয়েকজন নবি ﷺ-এর কাছে গিয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে। তারা তু'মার পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য নবিজিকে অনুরোধ করে। নাহলে বিষয়টি মুসলিমদের জন্য লজ্জাজনক হবে, আবার ইহুদিও ছাড় পেয়ে যাবে। নবিজিও তখন তু'মার পক্ষে রায় দিয়ে ইহুদিকে শায়েস্তা করবেন বলে ভাবছিলেন। এমন সময় আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করে আল্লাহ তাআলা সত্য এবং সঠিক বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন।[৪৬]

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ
لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

> হে দাউদ! আপনাকে আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি, অতএব আপনি মানুষের মাঝে সুবিচার করুন, তবে খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। কেননা তা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।[৪৭]

মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা এবং মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি একজন নবির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহর জমিনে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করা অত্যাবশ্যক। এই আয়াতের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। সামনের আয়াতের মাধ্যমে তা আরও জোরালোভাবে স্পষ্ট হবে।

এই আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুসলিমার প্রথম সম্পর্ক ঊর্ধ্বজগতের সাথে। তারপর নবি-রাসূলের ইতিহাসের সাথে। পূর্ববর্তীদের এবং আমাদের দেওয়া বিধান ও শরীয়ত এই দিক থেকে এক হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের মূলনীতি বিশেষজ্ঞ আলিমদের কারও দ্বিমত নেই। আর ইসলামে বিচারব্যবস্থার অর্থ আল্লাহর নীতি বাস্তবায়ন, আল্লাহর বিধান প্রয়োগ এবং পূর্ববর্তী নবি-রাসূলের কাজকে পরিপূর্ণ করা।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ
لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

---

[৪৬] বিস্তারিত ঘটনা জানতে আসবাবুন নুযূল লিলওয়াহিদি : ১৫২ দেখুন।

[৪৭] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ২৬

> অবশ্যই আমার রাসূলদের আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর আমি লোহা দিয়েছি, যা-তে আছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন যে, কে না-দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী।[৪৮]

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে রাসূলগণের প্রতি কিতাব ও ন্যায়নীতি অবতীর্ণ করার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর ন্যায়নীতি অবতীর্ণ করার কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। পাশাপাশি লোহা দেওয়ার কথা বলে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, বিধান বাস্তবায়নের জন্য শক্তিরও প্রয়োজন আছে। তবেই আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করবে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

> না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের বিচারক্ষমতা আপনার ওপর ন্যস্ত না করবে; তারপর আপনার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা না রেখে সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেবে।[৪৯]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈমানকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিচারের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। বুখারি এবং মুসলিমের বর্ণনামতে আলোচ্য আয়াতটি যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﷺ এবং তার বিবাদীর জমিতে পানি সেচ দেওয়ার বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল।[৫০]

কুরআন কারীম এখানে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নবি ﷺ-কে বিচারক মেনে নেওয়ার বিষয়টি ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

> ঈমানদারদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিতে পারেন, তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয়

---

[৪৮] সূরা হাদিদ, ৫৭ : ২৫

[৪৯] সূরা নিসা, ৪ : ৬৫

[৫০] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৪৫০৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৩৫৭; আসবাবুন নুযূল : ১২৮

> যে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।[৫১]

এই আয়াত থেকে বুঝে আসে, আল্লাহর দ্বীন এবং শরীয়তের ডাকে সাড়া দেওয়াই ঈমানের দাবি। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেওয়া, ন্যায়সংগত কথা মান্য করা এবং তাঁর কথার বাস্তবায়ন ঈমানদারদের কর্তব্য। সুতরাং বিচারকার্যও ছিল নবি ﷺ-এর অন্যতম কর্তব্য। যা তাঁর পরে তাঁর খলিফা এবং বিচারকদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে।[৫২]

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ

> আপনার প্রতি আমি সত্য-সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা তার আগে অবতীর্ণ হওয়া কিতাবের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর সংরক্ষক। অতএব আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুসারে তাদের মাঝে আপনি বিচার-ফয়সালা করুন। আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।[৫৩]

এর পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

> আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী আপনি বিচার-ফয়সালা করুন; তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। তাদের ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকুন। তারা যেন আপনাকে এমন-কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।[৫৪]

আয়াত দুটিতে কেবল লোকদের মাঝে বিচার-ফয়সালার আদেশই দেওয়া হয়নি; বরং এটাও নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

---

[৫১] সূরা নূর, ২৪ : ৫১

[৫২] প্রখ্যাত তাফসিরবিদ কুরতুবি লিখেছেন, 'মুজাহিদ রহ.-সহ একদল আলিম বলেছেন, "যারা তাগুতকে বিচারক মানে তাদেরকে এই আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেবল আল্লাহর বিধানই চলবে; আর তা হবে রাসূলের সামনে।" সুতরাং শারঈ বিধানের সমালোচকের তাওবা করা আবশ্যক। আর বিচারকের সমালোচককে শাস্তি দেওয়া হবে। তবে বিচারক চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।' — আল জামিউ লিআহকামিল কুরআন: ৫/২২৬-২২৭

[৫৩] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৮

[৫৪] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৯

পাশাপাশি মানুষের খেয়াল-খুশি এবং আল্লাহর নীতির সাথে সাংঘর্ষিক মানবরচিত বিধানের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কেননা এসব বিধান কুফরি, জুলুম বা পাপাচার। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

> আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।[৫৫]

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

> আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, তারাই জালিম।[৫৬]

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

> আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক।[৫৭]

ওপর্যুক্ত আয়াত তিনটি আল্লাহর কিতাবে নাযিলকৃত বিধান ও শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করার আবশ্যকীয়তা বোঝায়। তবে সেটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, সেখানকার বিচারব্যবস্থার নীতি অনুসারে মামলা-মোকদ্দমার ফয়সালা করার ক্ষেত্রে এবং ইনসাফ বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল। আয়াতগুলো থেকে এটা প্রমাণিত হয়—আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিরোধিতাকারী যদি নিজের বিরোধিতার প্রতি আস্থা রেখে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। সে যদি আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ভিন্ন বিধান অনুসারে ফয়সালা করে, তবে সে জালিম হবে। আর যদি সে আল্লাহর বিধান অনুসারে ইনসাফ ও সুবিচার থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যায় আর জুলুম করে, তবে সে ফাসিক বলে গণ্য হবে।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ তার প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেবে। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে ফয়সালা করবে, তখন সুবিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের কত সদুপদেশ দান করেন। আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৫৮]

---

[৫৫] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৪

[৫৬] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৫

[৫৭] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৭

[৫৮] সূরা নিসা, ৪ : ৫৮

এ আয়াতে নবি ﷺ-সহ সমস্ত মুসলিমকে যথাযথ প্রাপকদের কাছে আমানত পৌঁছে দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে। আর দায়িত্বশীলদের বলা হয়েছে, তোমরা মানুষের মাঝে সুবিচার করো। এটাই সমস্ত বিধানের উৎস। এ কারণেই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেছেন, 'আলোচ্য আয়াতটি প্রাপকের কাছে আমানত পৌঁছে দেওয়া এবং সুবিচার করার নির্দেশনা। সুতরাং এ দুটিই হলো ন্যায়-নীতি এবং সঠিক দায়িত্বের সমষ্টি।'[৫৯]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

> আল্লাহ তো ন্যায়বিচার, সদাচার এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন। আর অশ্লীলতা, অসৎ কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।[৬০]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ন্যায়, হক প্রদান এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে সদাচারের আদেশ আর অসৎ কাজ ও অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেছেন। এখন মানুষ আল্লাহর নির্দেশনা মেনে নিলে লাভবান হবে। তার উদ্দেশ্যও সাধন হবে। তখন মানুষ সঠিক ও ন্যায়সংগত পথে থাকবে। দুনিয়ার শান্তি-সুখের পাশাপাশি সীরাতে মুসতাকিমের ওপর থাকতে পারবে। ফলশ্রুতিতে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে লাভ করবে সওয়াব এবং বিনিময়। নাহয় শরীয়ত হয়ে যাবে কাগজের ওপর কলম দিয়ে লেখা মাত্র। চটকদার স্লোগান আর অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই তখন থাকবে না। জালিম আর সীমালঙ্ঘনকারীরা তখন মানুষের অধিকার নিয়ে খেলায় মেতে উঠবে। সুতরাং রাষ্ট্রের নীতি আর বিচারব্যবস্থা আল্লাহর শরীয়ত আর দ্বীন অনুসারে পরিচালনাই হলো মানুষের মাঝে ইনসাফ কায়েম আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একমাত্র কার্যকর পন্থা।

এখানে ন্যায় বলে সুবিচার, ইনসাফ এবং সাম্যের কথা বোঝানো হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেছেন, 'কুরআনের এই আয়াতটিতে সব ধরনের ভালো-মন্দ বিষয়ের কথা এসে গেছে।'

কাতাদা رحمه الله বলেছেন, 'জাহিলি যুগের লোকদের সব রকম উত্তম চরিত্র, যত ধরনের ভালো কাজ তারা করত, এমনকি যেসব কাজ তারা পছন্দ করত সে-সবকিছুর প্রতিই এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে। শুধু তাদের অপছন্দনীয় কাজগুলোই নয়; বরং সব ধরনের নিন্দনীয় চরিত্র এবং কাজের প্রতিই এ আয়াতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।' নিন্দনীয় কাজের মাঝে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হলো জুলুম,

---

[৫৯] আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ ফী ইসলাহির রায়ি ওয়ার রাইয়্যাহ : ৯

[৬০] সূরা নাহল, ১৬ : ৯০

অবাধ্যতা এবং সীমালঙ্ঘন করা।

তৎকালীন আরবে বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত আকসাম ইবনু সাইফি এই আয়াত শুনে বলেছিল, 'আমার মনে হয়, সর্বোত্তম চরিত্রবান হওয়ার আদেশ এবং নিকৃষ্টতম চরিত্রের অধিকারী হতে নিষেধ করা হচ্ছে। সুতরাং এ আদেশ পালনের ক্ষেত্রে তোমরা অগ্রগামী হও। এ ব্যাপারে তোমরা পিছিয়ে থেকো না।'

নবি ﷺ এই আয়াতটি ওয়ালিদ ইবনু মুগিরার সামনে তিলাওয়াত করলে সে বলল, আবার বলো দেখি। নবি ﷺ তখন দ্বিতীয়বার তিলাওয়াত করলে সে বলল, 'আল্লাহর কসম, কথাটা বলতেও ভালো লাগে, আবার শুনতেও ভালো লাগে! নির্দেশনা যেমন চমৎকার, তার কার্যকারিতাও তেমনি দারুণ হবে। এটা কোনো মানুষের কথা হতে পারে না।'[৬১]

এ ছাড়া অন্য আরও অনেক আয়াতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জোর দেওয়া হয়েছে। যার অধীনে বিচারব্যবস্থা থাকবে। তবেই আল্লাহর বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রয়োগ হবে। নাহয় বিধানাবলি তার কার্যকারিতা হারাবে। শরীয়ত অচল হয়ে পড়বে। উদাহরণস্বরূপ সূরা মায়িদা নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। সুবিচার, ন্যায় এবং ইনসাফের নির্দেশনা নিয়ে এই সূরাতে অনেকগুলো আয়াত আছে। এসব নির্দেশনা নবি ﷺ এবং তাঁর খলিফাদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। আধুনিকভাবে তার বাস্তবায়ন করতে হবে বা আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে—এমন কোনো চিন্তার সুযোগ নেই। কুরআনে থাকা বিধান-সংবলিত প্রতিটি আয়াত থেকেই পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের অপরিহার্যতা বুঝে আসে। বিশেষভাবে বিচারব্যবস্থা এবং ফয়সালা সংক্রান্ত আয়াত না থাকলেও সাক্ষ্য এবং লিখে রাখা সংক্রান্ত আয়াত তো কুরআনে সুস্পষ্টই আছে।

۞ হাদিসের আলোকে বিচারব্যবস্থা

এ বিষয়ে অনেক হাদিস আছে। যা কুরআন কারীমের ব্যবহারিক দিক। এসব হলো আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা। মূলত এগুলোর মাধ্যমেই ইসলামি বিচারব্যবস্থা ও ফয়সালা বাস্তবায়িত হয়। বিচারব্যবস্থার বৈধতা পূর্ণতা পায়। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। তৈরি হয় বিচারব্যবস্থার নীতিমালা আর কার্যপদ্ধতি। যার মাধ্যমে জানা যায় বিচারকের মাঝে কী কী গুণাবলি থাকতে হবে, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্তাবলি কী, কেমন করে মামলা রুজু করতে হয়, বিচারক কিভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন, মোকদ্দমার মাঝে শরীয়তের বিধানাবলি প্রকাশ কিভাবে করতে হয় এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতিই বা কী হবে।

এখানে বিচারব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে নবি ﷺ-এর বক্তব্য যেমন উল্লেখ করব,

---

[৬১] তাফসিরুত তাবারি, ১৪ : ১৬২-১৬৩

তেমনি তাঁর কর্মসূচক হাদিসও আমরা আলোচনা করব। ফলে আমরা জানতে পারব—তিনি কিভাবে বিচার করতেন, তাঁর কাছে কিভাবে মোকদ্দমা দায়ের করা হতো এবং বিভিন্ন শহরে তিনি কিভাবে বিচারক নিয়োগ দিতেন। নববি যুগে বিভিন্ন দেশ এবং শহরে বিচারব্যবস্থার পদ্ধতি এবং বিচারকের অবস্থা কেমন ছিল—তা জানার পাশাপাশি সাহাবিদের কিছু বিচারের কথাও আমরা জানতে পারব, যা নবি ﷺ সমর্থন করেছিলেন। তবে হ্যাঁ, সমস্ত হাদিসই যে আমরা উল্লেখ করব, তা কিন্তু নয়। বরং কিছু হাদিস উল্লেখ করব, আর কিছু হাদিসের দিকে আমরা শুধু ইঙ্গিত করব। আমর ইবনুল আস ؓ সূত্রে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

> 'কোনো বিচারক গবেষণা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার জন্য রয়েছে দুটি পুরস্কার। পক্ষান্তরে বিচারের ক্ষেত্রে কোনো বিচারক যদি গবেষণায় ভুল করে, তবুও সে একটি পুরস্কার লাভ করবে।'[৬২]

উম্মু সালামা ؓ বলেছেন, একবার দুজন লোক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির মোকদ্দমা নিয়ে নবি ﷺ-এর কাছে আসলো। সম্পত্তিটি ছিল নিশ্চিহ্নপ্রায়। আবার তাদের দুজনের কারও কাছেই নিজেদের সপক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ ছিল না। তখন নবি ﷺ বললেন,

> 'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে তোমরা মোকদ্দমা নিয়ে আসো। হয়তো তোমাদের কেউ অপরজন থেকে প্রমাণ পেশের ব্যাপারে বেশি বাকপটু। তখন আমি যেমন শুনি, তার ভিত্তিতেই ফয়সালা করে থাকি। কাজেই আমি যদি কারও জন্য তার ভাইয়ের হক সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দিই, তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা তার জন্য আমি যে অংশ নির্ধারণ করেছি, তা তো কেবল এক টুকরা আগুন।'[৬৩]

নবি ﷺ-এর কথা শুনে লোক দুজন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার ভাইয়ের জন্য আমার দাবি ছেড়ে দিচ্ছি। তখন নবিজি বললেন, 'ঠিক আছে। যাও, ওই সম্পত্তি তোমরা নিজেরা ভাগাভাগি করে নাও।' বর্ণনাকারী বলেছেন, তখন তারা দুজন আপসে ভাগ করে নিয়ে অপর ভাই যে অংশ ভোগ করছেন তা বৈধ করে দিলেন।[৬৪]

হাবীবা বিনতু সাহল ؓ ছিলেন সাবিত ইবনু কায়স ؓ-এর স্ত্রী। নবি ﷺ-এর কাছে এসে জানালেন, তিনি আর এ স্বামীর অধীনে থাকতে চান না। বিনিময়ে স্বামীর দেওয়া সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। নবি ﷺ তখন সাবিত ؓ-কে ডেকে

---

[৬২] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৭৩৫২; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৮১৬

[৬৩] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৬৭৪৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭১৩

[৬৪] প্রাগুক্ত

বললেন, সম্পত্তিটা নিয়ে স্ত্রীকে ছেড়ে দাও। তারপর হাবীবা ﵂ নিজ পরিবারের কাছে ফিরে গেলেন।[৬৫] এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খোলা তালাক।

ফাতিমা বিনতু কায়স ﵂-কে তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছিলেন। কিন্তু খোরপোশ দেননি। নবিজিকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি ফয়সালা দিয়েছিলেন যে, ফাতিমা কোনো খোরপোশ পাবেন না।

জনৈক মহিলাকে তার স্বামী তালাক দেওয়ার পর সন্তানকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। অগত্যা মহিলাটি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানটি আমার গর্ভজাত। আমার বুকের দুধ সে পান করছে এবং আমার কোলই তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়ে একে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে।' রাসূল ﷺ তখন বললেন,

> 'যতদিন পর্যন্ত তুমি পুনরায় বিবাহ না করবে, ততদিন তুমি সন্তানের প্রতি বেশি অধিকার রাখো।'[৬৬]

এ ছাড়া কর্মচারীর ঘটনার ক্ষেত্রে হদ,[৬৭] সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার চাদর চুরি হয়ে যাওয়ার ঘটনায় হদ,[৬৮] নাদরের মেয়ে কর্তৃক থাপ্পড় দিয়ে বাঁদির দাঁত ফেলে দেওয়ার ঘটনায় কিসাস[৬৯] এবং মায়িয ﵁ আর গামিদি মহিলাকে হদস্বরূপ[৭০] রজম করার ফয়সালা নবি ﷺ দিয়েছিলেন। যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﵁ এবং এক আনসারির মাঝে ফয়সালা করার ঘটনা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আবার তিনি যিহারের ফয়সালা করেছেন, দাস-দাসীকে প্রহারের ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন। জিযিয়া ও গনিমতের ব্যাপারেও তাঁর ফয়সালা রয়েছে।

কয়েকজন সাহাবিকে নবি ﷺ তাঁর সামনেই মোকদ্দমার ফয়সালা করতে বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সাহাবির ফয়সালা এবং ইজতিহাদের যোগ্যতা যাচাই করা। যেমনটা আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ সূত্রে বর্ণিত আছে, একবার নবি ﷺ-এর কাছে দুজন ব্যক্তি মোকদ্দমা নিয়ে এলে তিনি সামনে থাকা আমর ﵁-কে ফয়সালা করার নির্দেশ দিলেন। আমর ﵁ তখন আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপস্থিতিতে আমি কিভাবে ফয়সালা করতে পারি!' নবি ﷺ তখন ফয়সালার জন্য জোর নির্দেশ দিলে আমর ﵁ এই কাজের সওয়াব জানতে চাইলেন। উত্তরে নবি ﷺ বললেন,

---

[৬৫] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ২২২৭

[৬৬] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ২২৭৬

[৬৭] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৬৭৭০

[৬৮] সুনানুন নাসায়ি, হাদিস নং : ৪৮৮১

[৬৯] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৬৮৯৪

[৭০] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৬৪৩৪ এবং সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৪৫২৮

> 'তাদের মাঝে সঠিক ফয়সালা করলে তুমি দশটি নেকি পাবে। আর যদি ইজতিহাদ (গবেষণা) করে ভুল করো, তাহলেও একটি নেকি পাবে।'[৭১]

নববি যুগের বিচারব্যবস্থার আলোচনায় আমরা এ সংক্রান্ত আরও উদাহরণ দেখতে পাব।

কয়েকজন সাহাবিকে নবি ﷺ বিভিন্ন শহরে বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের কেউ কেউ একইসাথে প্রশাসক এবং বিচারক ছিলেন। আবার কেউ কেউ ছিলেন শুধু বিচারক। যেমন আলি ইবনু আবি তালিব رضي الله عنه বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে বিচারক হিসেবে প্রেরণ করছিলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বিচারক বানিয়ে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি তো উঠতি-যুবক! বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই।' তিনি বললেন,

> 'অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরকে সঠিক সিদ্ধান্তের পথ দেখিয়ে দেবেন এবং তোমার কথা সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। বাদী-বিবাদী তোমার সামনে বসলে তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শুনবে, সেভাবে অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনে কোনো রায় নেবে না। এতে তোমার সামনে মোকদ্দমার স্বরূপ উন্মোচিত হবে।'

আলি رضي الله عنه বলেন, তারপর আমি বিচারকার্য পরিচালনা করতে থাকি। কখনোই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধায় পড়তে হয়নি।[৭২]

মুআয ইবনু জাবাল رضي الله عنه-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'তোমার কাছে কোনো মোকদ্দমা আনা হলে তুমি কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কিতাব মোতাবেক।' নবি ﷺ বললেন, 'যদি আল্লাহর কিতাবে এর কোনো ফয়সালা না পাও?' মুআয رضي الله عنه বললেন, 'তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে করব।' নবি ﷺ বললেন, 'যদি রাসূলের সুন্নাহয় বা আল্লাহর কিতাবে সেটার ফয়সালা না পাও?' তখন মুআয رضي الله عنه বললেন, 'তাহলে আমি গবেষণা (ইজতিহাদ) করব; কমতি করব না।' নবি ﷺ তখন মুআযের বুক চাপড়ে বললেন,

> 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে আল্লাহর রাসূলের মনঃপূত কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন।'[৭৩]

কম বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও মাকিল ইবনু ইয়াসার رضي الله عنه-কে নবি ﷺ ইয়ামানের বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর আত্তাব ইবনু উসাইদ رضي الله عنه-কে

[৭১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং : ১৭৮২৪

[৭২] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৩৫৮২

[৭৩] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৩৫৯২

সেখানকার প্রশাসক এবং বিচারক বানিয়েছিলেন। তদ্রূপ আবু মূসা আশআরি ﷺ ছিলেন ইয়ামানের একাংশের প্রশাসক এবং বিচারক।[৭৪] নববি যুগের বিচারব্যবস্থার আলোচনায় এ সংক্রান্ত আরও উদাহরণ থাকবে।

একবার কিছু লোক একটি কুঁড়েঘরের মালিকানা নিয়ে নবি ﷺ-এর কাছে মোকদ্দমা দায়ের করল। নবি ﷺ তাদের মাঝে মীমাংসার জন্য হুযাইফা ﷺ-কে পাঠালেন। যাদের রশি দিয়ে ঘর বাঁধা ছিল, তিনি তাদের পক্ষে রায় দিলেন। তারপর ফিরে গিয়ে নবি ﷺ-কে জানালে তিনি বললেন, 'তুমি সঠিক ফয়সালা করেছ এবং বিচার চমৎকার হয়েছে।'[৭৫]

এগুলো ছাড়াও ইনসাফভিত্তিক ফয়সালার ব্যাপারে উৎসাহব্যঞ্জক হাদিস যেমন আছে, তেমনি আন্দাজে ফয়সালা করা এবং অন্যায় ফয়সালার ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শনমূলক হাদিসও আছে। সবগুলোর মাধ্যমেই বিচারব্যবস্থার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

ইজমার ভিত্তিতে

বিচারব্যবস্থার বৈধতার ব্যাপারে মুসলিমগণ একমত। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করেননি। সাহাবায়ে কেরাম বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়ে এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপও করেছেন। অনেকে তো এই দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অপরের থেকে তা প্রত্যাশাও করেছেন। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র-সহ যেসব জায়গায় ঈমান এবং ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল, খুলাফায়ে রাশিদিন এবং তাঁদের পরবর্তী শাসকেরা সেসব স্থানে বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আবু বকর ﷺ খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর উমর ﷺ-কে বিচারের দায়িত্ব প্রদান করে বলেন, 'আপনি লোকদের মাঝে বিচারকার্য সম্পাদন করবেন। কারণ আমি তো একটি কাজ নিয়ে আছি।'

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর উমর ﷺ অনেক সাহাবি এবং তাবিয়িকে বিভিন্ন স্থানে বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। আবুদ দারদা ﷺ-কে প্রথমে মদীনার বিচারক নিযুক্ত করলেও পরে দামিস্কে পাঠিয়ে দেন। আবু মূসা আশআরি ﷺ-কে বসরার বিচারক এবং শুরাইহ ইবনুল হারিস আল-কিন্দি ﷺ-কে কুফার বিচারক নিযুক্ত করেন। শুরাইহ সেখানে দীর্ঘ ষাট বছর যাবৎ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। বিচারকার্য পরিচালনা এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আলি ﷺ ছিলেন বিশেষভাবে পারদর্শী। খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের পর উমাইয়া যুগ, আব্বাসি যুগ-সহ ইসলামি খিলাফতের শেষ অবধি এভাবেই নানান স্থানে বিচারক নিযুক্তির

---

[৭৪] সুবুলুস সালাম : ৪/১৬১

[৭৫] সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস নং : ২৩৪৩

প্রচলন ছিল। এ ব্যাপারে আমরা অচিরেই আলোচনা করব।

আলিমদের অনেকেই বিচারব্যবস্থার বৈধতা-সংক্রান্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। উমর ﷺ-এর একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'বিচারব্যবস্থা একটি শক্তিশালী আবশ্যক বিধান এবং অনুসরণীয় রীতি।' অর্থাৎ এই বিধানটি রহিত হয়নি। আর কেউ এর বিরোধিতাও করেননি।

ইবনু কুদামা ﷺ বলেছেন, 'বিচারক নিয়োগ দেওয়া এবং লোকদের মাঝে ফয়সালা করার ব্যাপারে মুসলিমদের মাঝে ইজমা রয়েছে।'[৭৬]

খতিব শারবীনি ﷺ বলেছেন, 'বিচারব্যবস্থা কার্যকরের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই একমত।'[৭৭]

যুক্তির নিরিখে

সমাজবদ্ধতা মানুষের স্বভাব। মানুষের জীবন সমাজকেন্দ্রিক। স্বাভাবিকভাবেই একটি বিচারব্যবস্থার প্রয়োজন, যার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তি করবে। কারণ মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই স্বার্থপর, বিজয়লিপ্সু এবং লোভী। তীব্র লালসার কারণে একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। এ কারণেই সে অন্যের ওপর হামলা করে, পরস্পরে ঝগড়া হয় এবং একজন অন্যজনের ওপর অত্যাচার করে। শরীয়ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব-সংক্রান্ত আলোচনায় এ বিষয়ে কথা হয়েছে। সুতরাং এগুলোর মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে একটি বিচারব্যবস্থার অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক প্রমাণিত হয়। যা মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে। এটাই হচ্ছে যুক্তির দাবি।

বাস্তবতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রমাণ এবং ইতিহাস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী। সুতরাং সুবিচার প্রতিষ্ঠায় এবং শরীয়তের বিধিবিধান বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রয়োজন এমন বিচারক, যিনি নিপীড়িত মজলুমের সাথে ইনসাফ করবেন। অন্যথায় মানুষের অধিকার খর্ব হবে। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ বলেছেন, 'মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য একজন (ন্যায়পরায়ণ) বিচারকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।'

---

[৭৬] আল মুগনি : ১০/৩২
[৭৭] মুগনিল মুহতাজ : ৪/৩৭২

ইসলাম-পূর্ব আরবে বিচারব্যবস্থা

ইসলামের জন্য আরবকে নির্বাচনের কারণ

ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে মক্কা মুকাররমায়। মক্কা হলো জাযিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপে থাকা সমস্ত জনপদের কেন্দ্রবিন্দু। তৎকালীন সমস্ত আরব গোত্রের একমাত্র ঠিকানা ছিল এই মক্কা। ইসলামের সুমহান পয়গাম বহনের জন্য আল্লাহ তাআলা আরব জাতিকে বাছাই করেছেন। কারণ আরব জাতির মাঝে অনেক গুণ এবং বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। অবশ্য কিছু বৈশিষ্ট্য বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। আবার কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল শিরক ও পৌত্তলিকতা মেশানো। কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের উৎস ছিল গোত্রের সাম্প্রদায়িক চেতনা। আবার কতক বৈশিষ্ট্যের মূলে ছিল কেবলই আঞ্চলিকতা বা বর্বরতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা—যা নিয়ে তাদের অহংকার ও গর্বের সীমা ছিল না।

তারপর সৌন্দর্য, কল্যাণ এবং বিস্ময় প্রতিষ্ঠার বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে মহান শরীয়তের আগমন ঘটে। সব ধরনের কলুষতা, খারাবি এবং নিন্দনীয় জিনিসকে দূর করাই যার লক্ষ্য। মূল্যবোধ ও আদর্শের পরিমার্জন করে তার উৎস প্রকাশ করা যার উদ্দেশ্য। যাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে চেতনা আর আদর্শকে নিষ্কলুষ মূল্যবোধ, ফলদায়ক ও উপকারী করা যায়। এজন্যই আমরা ইসলাম-পূর্ব আরবের বিচারব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চলেছি। যাতে এর পরে আমরা ইসলাম এবং জাহিলিয়াতের মধ্যকার সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে পারি।

আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন

সবার আগে আমাদের জানা থাকতে হবে, আরব উপদ্বীপে আরবের একক কোনো জাতি বসবাস করত না। তাদের স্বতন্ত্র কোনো রাষ্ট্র ছিল না। বরং তাদের জীবন চলত গোত্রীয় জীবনব্যবস্থার অধীনে। বড় বড় শহর, শহরতলি, গ্রাম এবং গ্রাম্য জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই ছিল এই গোত্রব্যবস্থার আধিপত্য। আর গোত্রগুলো বিভিন্ন শাখা ও উপশাখায় বিভক্ত থাকত। যুদ্ধ-সন্ধি, মানুষের অধিকার, বিচারব্যবস্থা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকত গোত্রপতির কাছে। আর পরিবারপ্রধানের থাকত বিশেষ ক্ষমতা। সে যুগে নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। বরং অধিকাংশ মানুষ নারী জাতিকে ভোগ্য সামগ্রীর চেয়ে বেশি কিছু ভাবত না। কখনো-বা নারীকে ঈষৎ সম্মানের জায়গায় স্থান দেওয়া হতো। পরিবারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করা হতো। বিশেষত তার বিয়ের ব্যাপারে। সে যুগে কবিতা, সাহিত্য, লড়াই এবং জীবিকা নির্বাহের কাজে মহিলারাও পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করত।

❁ জাহিলি যুগে প্রচলিত আইনকানুন

আরবদের কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল না। ছিল না কোনো বিধিবিধান ও আইনকানুন। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের মাঝে গোত্রভিত্তিক নানান রীতিনীতি, হরেক রকম শহুরে ও গ্রামীণ প্রথা এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। এসবের ভিত্তিতেই তারা বিচার-আচার করত। যার মূল ছিল সাম্প্রদায়িক চেতনা। এর ভিত্তিতেই তারা একে অপরকে সাহায্য করত। চাই সে জালিম হোক কিংবা মজলুম। তারা ছিল ভয়ংকর প্রতিশোধপ্রবণ জাতি। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা সীমালঙ্ঘন করত। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে কেবল জালিম ও অপরাধীর প্রতি আক্রমণে তারা সীমাবদ্ধ থাকত না। বরং ওই গোত্রের নিরীহ মানুষদেরকেও নির্বিচারে হত্যা করত। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে গোত্রপ্রধানকেও তারা ছাড় দিত না। সীমালঙ্ঘন করত। একপর্যায়ে তাদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে যেত। প্রতিশোধ-স্পৃহা বেড়েই চলত। এমনকি তা ধারাবাহিকভাবে বংশপরম্পরায় চলে আসত।

রক্তপাত বন্ধের জন্য সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়ে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে মুক্তিপণ দেওয়া হতো। বিভিন্ন ধরনের বিবাহ-পদ্ধতি এবং নারী-বন্দির প্রথা প্রচলিত ছিল। তাদের মতে তালাকের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা ছিল না। কেবল প্রভাবশালী পুরুষরাই উত্তরাধিকার হতো। বঞ্চিত হতো শিশু এবং নারীরা। তাদের মাঝে পালকপুত্র গ্রহণ এবং মৈত্রী-চুক্তির রেওয়াজ ছিল। বেচাকেনা, হাদিয়া-তোহফা, মিরাস, ওসিয়ত, জবরদস্তি, দখলদারি, আক্রমণ এবং যুদ্ধের মাধ্যমে তারা মাল অর্জন করত। দাসদাসীর প্রথা তাদের মাঝে প্রচলিত ছিল। চলমান কঠিন যুদ্ধ এবং দীর্ঘ লড়াই থেকে বাঁচতে তারা মিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হতো। রুটি-রুজি, পশুখাদ্য, পানি এবং বৃষ্টির সন্ধানে প্রতিনিয়ত জায়গা বদল করা ছিল তাদের স্বাভাবিক বিষয়।

❁ আরবদের জীবনযাত্রায় অন্য জাতির প্রভাব

আরব জাতি হাবাশা, রোম এবং পারস্যের মতো প্রতিবেশী কিছু জাতির জীবনব্যবস্থার মাধ্যমে প্রভাবিত ছিল। তবে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কিছু প্রাচীন রীতিতে নির্ভরশীল হওয়ার বিরল উদাহরণও পাওয়া যায়।

পরিবারগুলো হতো পিতৃকেন্দ্রিক। পিতা হতেন অগাধ শ্রদ্ধা, ভাবগাম্ভীর্য, সম্মান এবং ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই সন্তানদের মাঝে সৃষ্ট বিরোধের মীমাংসা করতেন। গোত্রের মাঝে তিনি হতেন পরিবারের প্রতিনিধি। আর গোত্রপ্রধানের যোগ্যতা ছিল রাষ্ট্রপতির যোগ্যতার সমান। তার থাকত কর্তৃত্ব, গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এবং যে-কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার। সাধারণত বয়সের ভারত্ব,

সাহসিকতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-গরিমা এবং বিচক্ষণতা দেখে গোত্রপ্রধান নির্বাচন করা হতো। বিবাদ মীমাংসা এবং গোত্রের লোকদের মাঝে সৃষ্ট বিরোধ মিটানোর ভার ন্যস্ত থাকত গোত্রপ্রধানের ওপর। আবার অন্য গোত্রের লোকদের সাথে বিরোধ দেখা দিলে দুই গোত্রপ্রধান মিলে সুরাহা করত। কিংবা তৃতীয় কোনো গোত্রপ্রধানের কাছে বিচার উত্থাপন করত। অথবা বিচারের জন্য সালিশ ডাকত।

সালিশি বৈঠক

জাহিলি যুগের অনেক সালিশের কথা জানা যায়। এ ব্যাপারে অনেকের পারদর্শিতা প্রসিদ্ধ। বিশেষত বিচারিক বিধানাবলি এবং ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত বিচক্ষণতার কারণে তাদের অনেকে আজও অমর হয়ে আছেন। এখানে এমন কয়েকজনের আলোচনা আমরা করব।

- **আকসাম ইবনু সাইফি :** জাহিলি যুগে আরবের অন্যতম মাতব্বর। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'অন্তর নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মতো, যার গলায় পানি আটকে গেছে। যে ব্যক্তি শিক্ষাগ্রহণ করে না, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঠাট্টা-মশকরা থেকেই বিদ্বেষের সূচনা হয়। সমতল ভূমিতে চললে আছাড় খেতে হয় না। বিপদমুক্ত স্থানেও সতর্ক থাকা উচিত। নিঃস্ব ব্যক্তির দুর্ভোগের শেষ নেই।' তিনি ইসলামের সময়কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ৯ম হিজরিতে ১০০জন লোক নিয়ে মদীনার উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য তার হয়নি। মদীনায় পৌঁছানোর আগেই তার মৃত্যু হয়। তার সাথি-সঙ্গীদের অনেকে মদীনায় পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করেন। সাথি-সঙ্গীদের তিনি বলতেন, 'মুহাম্মাদ তো সচ্চরিত্রের আদেশ করেন এবং মন্দ চরিত্র থেকে নিষেধ করেন। সুতরাং তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণে তোমরা এগিয়ে যাও। এ ব্যাপারে পিছিয়ে থেকো না।' এভাবেই নবিজির অনুসরণ করতে তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন।[৮]
- **কুস ইবনু সায়িদা আল-আয়াদি :** তিনি ছিলেন আরবের অন্যতম বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং প্রসিদ্ধ বিচারক। জাহিলি যুগের বড় বড় বক্তাদের মাঝে তিনি অন্যতম। ছিলেন নাজরানের বিশপ। তিনি বলতেন, 'প্রমাণ দেখাবে দাবিদার এবং শপথ করবে অস্বীকারকারী।' কথিত আছে, তিনি ছিলেন আরবের মাঝে তলোয়ার বা লাঠির ওপর ভর দিয়ে সর্বপ্রথম বক্তৃতাকারী। أَمَّا بَعْدُ কথাটি সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। রোম সম্রাটের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হলে তাকে যথেষ্ট সম্মান আর সমাদর করা হতো। নবুওয়ত লাভের আগে নবি ﷺ তাকে উকাযে দেখেছেন এবং নবুওয়ত প্রাপ্তির পরে তার প্রশংসাও করেছেন।

[৮] আল-আলাম, ১/৩৪৪

☑ **আমির ইবনুয যরিব আল-আদওয়ানি :** তিনি ছিলেন মুদার গোত্রের অত্যন্ত বিচক্ষণ নেতা, মাতব্বর এবং ঘোড়সওয়ার। জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদানে তিনি ছিলেন পটু। আরবের কেউ তার প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতার ধারেকাছেও ছিল না। জাহিলি যুগে তিনিই সর্বপ্রথম মদ অবৈধ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ হায়াত লাভ করেন।[৭৯]

☑ **উমাইয়া ইবনু আবিস সলত আস-সাকাফি :** তায়িফ নিবাসী আরবের এই মাতব্বর ছিলেন জাহিলি যুগের প্রাজ্ঞ কবি। প্রাচীন কিতাবাদি সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল। জাহিলি যুগেই নিজের জন্য মদের অবৈধতা ঘোষণা দিয়ে পৌত্তলিকতা বর্জন করেছিলেন। ইসলামের যুগও পেয়েছিলেন তিনি। নবি ﷺ-এর কাছে কুরআন শুনে তাঁর সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করা থেকে তিনি বিরত থাকেন। বদর যুদ্ধে নিহত হওয়া মুশরিকদের মাঝে তার দুজন মামাতো ভাই ছিল। এ সংবাদ পেয়ে তিনি আর ইসলাম গ্রহণ করেননি। অবশেষে ৫ম হিজরিতে তায়িফে তার মৃত্যু হয়। তিনিই সর্বপ্রথম بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ (হে আল্লাহ! আপনার নামে) লেখার প্রচলন করেছিলেন। তার কবিতা শুনে নবি ﷺ বলেছেন, 'সে তো প্রায় মুসলিমই হয়ে গিয়েছিল।' অন্য বর্ণনামতে তিনি বলেছিলেন, 'সে অবশ্যই তার কবিতায় মুসলিম হওয়ার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।'[৮০]

☑ **সাহাবি আক্বরা ইবনু হাবিস :** জাহিলি যুগে আরবের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সালিশ ছিলেন। তামিম গোত্রের দারিম বংশের প্রতিনিধিদলের সাথে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। হুনাইনের যুদ্ধ এবং মক্কা ও তায়িফ বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মদীনাতেই অবস্থান করতেন। পরবর্তীকালে আবু বকর رضي الله عنه-এর খিলাফতকালে তিনি দুমাতুল জান্দাল-এ চলে যান। খালিদ ইবনু ওয়ালিদ رضي الله عنه-এর সাথে ইয়ামামার যুদ্ধ-সহ অনেক যুদ্ধে তার অংশগ্রহণ ছিল। ৩১ হিজরিতে খোরাসানের জোযজানে বাহিনী-সহ শাহাদাত বরণ করেন।[৮১]

☑ **হাজিব ইবনু যুরারা :** তিনি ছিলেন জাহিলি যুগের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বিভিন্ন স্থানে তামিম গোত্রের সর্দার ছিলেন। নবি ﷺ-এর জন্মের ১৯/১৭ বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর নবিজি তাকে তামিম গোত্রের যাকাত উসুলের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। এর কিছুদিন পরই তার

---

[৭৯] আল-আলাম : ৪/২০

[৮০] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২২৫৫

[৮১] আল-ইসাবাহ : ১/২৮৬

ইন্তেকাল হয়ে যায়।[৮২]

❁ গণকদের বিচারকার্য

তৎকালীন আরবে গণকদের কাছে রায় চাওয়ার প্রচলন ছিল। সাধারণ লোকদের বিশ্বাস ছিল গণকরা জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে, ভাগ্যগণনা এবং জিনদের সাহায্যে অদৃশ্যের সংবাদ জানতে পারে। গণকরা দাবি করত যে বিভিন্ন লক্ষণ, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তারা এসব বিষয় জেনে থাকে। বনু মাযিনের রবি ইবনু রবীআ ইবনি যিব এ ব্যাপারে খুব খ্যাতি লাভ করেছিল। সে ছিল প্রাচীন আরব গোত্র গাসসানের প্রবীণ গণক। আরবের লোকেরা শুধু যে তার কাছে বিচার নিয়ে যেত, তা-ই নয়। তার ফয়সালাও খুশিমনে মেনে নিত। সে যুগে তার সিদ্ধান্ত ছিল প্রবাদতুল্য। সে থাকত শামের উঁচু ভূমি জাবিয়াতে। নবি ﷺ-এর জন্মের কিছুদিন পরে হিজরতের ৫২ বছর আগে ৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে সে মারা যায়। লোকেরা তার কাছে এসে বলত, বলুন তো আমরা কোন বিষয়ে কথা বলতে এসেছি? তখন সে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিত।

❁ দাবির সপক্ষে দলিল-প্রমাণের পদ্ধতি

জাহিলি যুগে আরবরা দাবি প্রমাণের ক্ষেত্রে সাক্ষী এবং তাদের উপাস্য দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করত। এ ক্ষেত্রে তারা লটারি এবং শপথ গ্রহণের সাহায্য নিত। এটা হতো বারংবার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে।[৮৩] সন্তানের বংশপরিচয় নিয়ে সন্দেহ হলে তারা কিয়াফা তথা নিশানা ধরে ট্রেস করতে পারদর্শী ব্যক্তির সাহায্য নিত। অপরাধীর অবস্থান শনাক্ত করতে তারা পদচিহ্ন ধরে ট্রেস করার পাশাপাশি অন্তর্দৃষ্টি কাজে লাগাত। এ ক্ষেত্রে তারা বাহ্যিক অবস্থা এবং পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করে মনের সুপ্ত প্রবল ধারণার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করত। সেসব গণক ও জ্যোতিষীর প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, যারা অবস্থা জানার জন্য জিন চালান দিত।

❁ মোকদ্দমা এবং বিচারের ক্ষেত্র

সে যুগে উত্তরাধিকার সম্পত্তি, হত্যা, চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি এবং নারীদের ওপর জুলুম নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিবাদ-বিসংবাদ এবং মামলা-মোকদ্দমা সংঘটিত হতো। এ ছাড়া পশুর চারণভূমি, ঘাস খাওয়ানো এবং পানি পান করানো নিয়েও কলহ সৃষ্টি হতো তাদের মাঝে। আবার নেতৃত্ব নিয়েও তারা ঝগড়া করত। ক্ষমতা

---

[৮২] আল-আলাম : ৩/৩৮; আবকারিয়্যাতুল ইসলাম : ৪৩৩

[৮৩] ইমাম বুখারি ইবনু আব্বাস رضي الله عنه সূত্রে জাহিলি যুগে শপথ গ্রহণের পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে সহিহুল বুখারির ৩৬৩২ নং হাদিস দ্রষ্টব্য।

আর কর্তৃত্ব নিয়ে তাদের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যেত। বংশীয় আভিজাত্যের বড়াই নিয়ে তাদের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকত।

❁ মক্কায় ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাংগঠনিক প্রচেষ্টা

কিছু কিছু সমস্যার সমাধানে আরবরা সুশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা করেছিল। ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা, সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা, দুর্বল, অসহায় এবং মজলুম মানুষের পক্ষে লড়াই করার জন্য তারা দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এ লক্ষ্যে কুরাইশরা ফয়সালার জন্য কয়েকজন লোককে নির্বাচন করেছিল। তাদের মধ্যে বনু সাহামের নেতৃস্থানীয় লোকেরা কুরাইশদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ এবং মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করত। আর কুরাইশের সাথে অন্যান্য গোত্রের ঝগড়া-বিবাদ এবং মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য বনু আদির কিছু লোককে ঠিক করা হয়েছিল। এ ধরনের বিচার ও সালিশি দায়িত্ব যাদের দেওয়া হয়েছিল, তারা হলেন হাশিম ইবনু আবদি মানাফ, আবদুল মুত্তালিব, আবু তালিব, আবু বকর সিদ্দিক, উমর ইবনুল খাত্তাব এবং যুল ইসবা আল-উদওয়ানি[৮৪]। এরপর কুরাইশের সবগুলো উপগোত্র হিলফুল ফুজুল নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল মক্কা মুকাররমায় থাকা স্বাধীন-দাস, আপন-পর, মুকিম-মুসাফির—এক কথায় সমস্ত মানুষ থেকে জুলুম আর অত্যাচার প্রতিহত করা। সমস্ত মানুষকে সহায়তা করা, তাদের অধিকার রক্ষা, জুলুম-নির্যাতন প্রতিহত করা এবং সবার প্রতি ইনসাফ করার ব্যাপারে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। রাসূল ﷺ নিজেও তাদের সাথে প্রতিজ্ঞায় অংশ নিয়েছিলেন। সে-সময় তিনি ছিলেন ২৫ বছর বয়সের টগবগে তরুণ। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'আমি তো আবদুল্লাহ ইবনু জাদআনের ঘরে একটি মৈত্রী চুক্তি দেখেছি। ইসলামের যুগেও যদি আমাকে এ ব্যাপারে আহ্বান করা হয়, তাহলে আমি অবশ্যই সাড়া দেবো। এই সংগঠনের মোকাবিলায় লাল উটও আমার কাছে বেশি পছন্দনীয় নয়। তারা এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে, মানুষকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হবে; মজলুমের ওপর জালিমের অত্যাচার মেনে নেওয়া হবে না।'[৮৫]

---

[৮৪] তার নাম প্রকৃত হিরসান ইবনুল হারিস। জাহিলি যুগের প্রাজ্ঞ কবি এবং বাহাদুর। তার কবিতায় প্রজ্ঞা, উপদেশ এবং গৌরবগাঁথা থাকত। হিজরতের ২২ বছর আগে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। — আল-আলাম : ২/১৮৪

[৮৫] সীরাতু ইবনি হিশাম : ১/১৩৩-১৩৪

০২

নববি যুগের বিচারব্যবস্থা

ইসলামে বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে নববি যুগের বিচারব্যবস্থাকে মজবুত ভিত্তি বলে মনে করা হয়। সে যুগই হচ্ছে ঐতিহাসিক এবং বস্তুগত দৃষ্টিকোণের প্রকৃত আঁতুরঘর। তাই এ যুগেই দৃষ্টিকোণ দুটির আলোচনা আমরা একসাথে করব। তবে বিচারব্যবস্থার বস্তুগত দৃষ্টিকোণের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার এবং এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়ার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা থাকবে। বস্তুগত দৃষ্টিকোণের আলোচনা আমরা কেবল ততটুকুই করব, যতটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের সাথে সম্পৃক্ত।

ইসলামের আবির্ভাব

জগতে ইসলামের আবির্ভাবের মাধ্যমে সাধারণভাবে নববি যুগের সূচনা ঘটে। রিসালাতের পরিসমাপ্তির জন্য হেরা গুহাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়। সে-সময় মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। মক্কার অদূরে হেরা গুহাতে তিনি ছিলেন ইবাদতরত। এমন সময় কুরআন কারীমের প্রথম সূরা নিয়ে জিবরীল ﷺ তাঁর কাছে আগমন করলেন। নাযিল হলো,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ﴿۳﴾ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ﴿۴﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ؕ﴿۵﴾

পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তবিন্দু থেকে। পড়ুন, আপনার পালনকর্তা মহা সম্মানিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে

জানত না।[৮৬]

নবি ﷺ-এর কাছে জিবরীল ﷵ ঐশী মিশন পৌঁছে দিলেন। অর্পণ করলেন আসমানি নবুওয়ত ও চিরস্থায়ী রিসালাতের দায়িত্ব, যার সূচনা ছিল তাওহিদ এবং শাহাদাত। এরপর নবি ﷺ-এর কাছে তা প্রচারের নির্দেশ দিয়ে বলা হলো,

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন।[৮৭]

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝

হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন। আপন পালনকর্তার মহত্ত্ব ঘোষণা করুন।[৮৮]

পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়ে অবতীর্ণ হলো,

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝

আপনার নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করুন।[৮৯]

রাসূল ﷺ তখন আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলেন তাঁর স্ত্রী খাদীজা ؓ, বন্ধু আবু বকর ؓ এবং চাচাতো ভাই আলি ইবনু আবি তালিব ؓ। এরপর মক্কাবাসীদের একটি দল ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুশরিকরা তাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগল। নবি ﷺ এবং সাহাবিদের কষ্ট দেওয়া শুরু করল। সম্পদ, সম্মান, নারী এবং ক্ষমতার লোভ দেখাল। কয়েকজন সাহাবিকে হত্যা তো করলই, স্বয়ং নবিজিকেও হত্যার ষড়যন্ত্র করল। সাহাবিরা দুই দফায় হাবাশায় হিজরত করতে বাধ্য হলেন। অবশেষে হজের মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে একদল লোক নবিজির হাতে বাইয়াত হলেন। এভাবেই সংঘটিত হলো আকাবার প্রথম বাইয়াত। তারপর রিসালাত গ্রহণ এবং ইসলাম ও মুসলিমদের সংরক্ষণে অনুষ্ঠিত হলো আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত।

নবুওয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে রাসূল ﷺ হিজরত করলেন ইয়াসরিবে। এরপর তার নামকরণ করলেন মদীনা। নবুওয়ত ও রিসালাতের আলোয় মদীনা ঝলমল করে উঠল। মদীনাবাসীগণ হাসিমুখে নবি ﷺ-কে বরণ করে নিলেন। মুহাজির

---

[৮৬] সূরা আলাক, ৯৬ : ১-৫
[৮৭] সূরা মায়িদা, ৫ : ৬৭
[৮৮] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ১-৩
[৮৯] সূরা শুআরা, ২৬ : ২১৪

এবং আনসারদের মাঝে তিনি স্থাপন করলেন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। রচনা করলেন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সংবিধান। মুসলিমদের সাথে ইহুদি আর মুশরিকদের সম্পর্ক করার পার্থক্য নির্ণয় করে দিলেন। অবিলম্বে স্থাপন করলেন মসজিদের ভিত্তি, যা ছিল নবুওয়তের পাঠশালা। ইসলামি সমাজ গড়ার লক্ষ্যে মসজিদ হলো রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকে ইসলামি ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য বিকশিত হয়; দাওয়াত সুরক্ষা পায়। জাহিলি দাসত্বের ক্ষত ও নির্যাতন থেকে মুক্তির স্মারক হচ্ছে মসজিদ। প্রকৃতপক্ষে হিজরত ছিল তাওহিদবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা। এর মাধ্যমেই হিজরি বর্ষের সূচনা ঘটে। এটা ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ বর্ষের কথা।

হিজরতের পর নবি ﷺ-এর কাছে ওহির অবতরণ ও শরীয়তের আগমন চলতে থাকে। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনার কাজে নিয়োজিত থাকেন তিনি। তাঁর ওপর নাযিলকৃত কুরআন হচ্ছে এক চিরস্থায়ী সংবিধান এবং পবিত্র কিতাব। যা জীবনের পথ দেখায় এবং হিদায়াতের রাস্তা বাতলে দেয়। এর তিলাওয়াত, তাদাব্বুর, অনুধাবন এবং বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিমগণ রাতদিন ইবাদতে নিমগ্ন থাকে।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, নবি ﷺ-কে হিকমত এবং অল্প কথায় অধিক মর্মসমৃদ্ধ কথা বলার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। মদীনায় তিনি একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর আরবের গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে গোটা আরব উপদ্বীপের বাসিন্দাদের সম্মিলন ঘটালেন। ইতিহাসের মাঝে প্রথমবারের মতো সৃষ্টি করলেন একটি উত্তম জাতি এবং সুসংহত রাষ্ট্র। দাওয়াহ ছড়িয়ে সাহাবিদের আসমানি বার্তা গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দিলেন। যাতে তাঁর পরে সাহাবিরা দ্বীন এবং দুনিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। ফলে সাহাবিরা হলেন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। নবি ﷺ এভাবেই সঠিক ভিত্তির গোড়াপত্তন করলেন। ফলে জগৎব্যাপী ইসলাম ছড়িয়ে গেল। জাতি এবং গোত্রের বন্ধন সুদৃঢ় হলো। দ্বীন ছড়িয়ে পড়ল দেশ থেকে মহাদেশে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় হিদায়াত এবং দাওয়াত প্রসারের কাজ ছাড়াও শরীয়তের বিধান প্রচার করতেন। সুশৃঙ্খলভাবে সকলের অধিকার বুঝিয়ে দিতেন। নির্ধারণ করে দিতেন প্রত্যেকের অধিকারের সীমারেখা। বিরোধ ও মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করতেন। বাদী-বিবাদীর মাঝে ফয়সালা করতেন। কায়েম করতেন ইনসাফের ভিত। নবুওয়তের মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জাগতিক ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব প্রদান করতেন। কল্যাণ, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৌভাগ্যের দিকে পরিচালিত করতেন উম্মতকে। কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তির ব্যবস্থা করে গেছেন তিনি।

হিজরতের ১১তম বছরের সফর মাসে মদীনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ অসুস্থ

হয়ে পড়লেন। কিছুদিন জ্বরে ভুগে অবশেষে সাহাবি এবং উম্মতদের চিরবিদায় জানালেন। ১১ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুন ইহজগৎ ত্যাগ করে পরম বন্ধুর সাথে মিলিত হলেন তিনি। তাঁর সমাধি সবুজ গম্বুজের নিচে। পরিধি বাড়ানোর পর বর্তমানে তা মসজিদের ভেতরে চলে এসেছে।

নববি যুগের পরিচয়

মক্কায় কুরআন নাযিল হওয়ার মাধ্যমে ঐতিহাসিক নববি যুগের সূচনা হয় এবং তার সমাপ্তি ঘটে মদীনায় রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের মাধ্যমে ওহির ধারা বন্ধ হওয়ার দ্বারা। এই নববি যুগ তার পূর্ববর্তী স্তরকে ম্লান করে দিয়েছে।

কিন্তু বিচারব্যবস্থার ইতিহাসের আলোকে নববি যুগ কেবল মাদানি জীবনেই সীমাবদ্ধ। হিজরতের মাধ্যমে এর সূচনা হয়েছিল। এই সময়টাতেই তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন. সংবিধান প্রণয়ন করেন, উম্মতের বিষয়াদি সুবিন্যস্ত করেন, সংবিধানের আলোকে বিচারব্যবস্থার প্রচলন ঘটান এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির রূপ দান করেন। এটাই নববি যুগে বিচারব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের উদ্দেশ্য।

নববি যুগে বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব

নববি যুগ ছিল বিচারব্যবস্থার প্রাথমিক যুগ। এ যুগেই বিচারব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই যুগ ইসলামি বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নানান দিক বিবেচনায় ইসলামি বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে এ যুগ অনন্য। যেমন,

- ☑ ১. নববি যুগেই ইসলামি বিচারব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। প্রণীত হয়েছে নীতিমালা এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিচারের নিয়মকানুন। যাতে ইসলামের বিচারব্যবস্থা সুবিন্যস্ত হয় এবং শারঈ বিধিমালা আর বিচারের সাধারণ নিয়মকানুন সুস্পষ্ট হয়ে যায়।
- ☑ ২. নববি যুগের বিচারব্যবস্থা ছিল নিরাপদ, নিপুণ, পরিপূর্ণ এবং হাতেকলমে বাস্তবায়ন। কুরআনের আয়াত এবং রাসূল ﷺ-এর সেসব মৌখিক হাদিসের বাস্তব চিত্র, যা পালনের ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলের পক্ষ থেকে তাত্ত্বিক আদেশ, উদাত্ত আহ্বান এবং উৎসাহের জোগান যেমন রয়েছে, তেমনি অন্যায়, অবিচার, সীমালঙ্ঘন এবং সম্পদ নষ্ট করার ব্যাপারে সতর্কবার্তাও আছে। এসব নিয়ে আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।
- ☑ ৩. নববি যুগে ইসলামি বিচারব্যবস্থা ছিল জাহিলি যুগের প্রচলিত আদর্শ,

মূল্যবোধ, নিয়মনীতি এবং বিধিবিধানের পার্থক্যকারী সীমানা। সে যুগে প্রচলিত আদর্শ, মূল্যবোধ, নীতিমালার মধ্য থেকে ইসলাম কেবল সেসবই গ্রহণ করেছে, যা তার সাথে মানানসই, তার উপযুক্ত এবং কল্যাণকর। যেগুলো অচল, বেকার, অগ্রহণযোগ্য, মিথ্যা, অকল্যাণকর এবং অপকারী, সেগুলো ইসলাম বর্জন করেছে। সেগুলোর সাথে আল্লাহর দ্বীন এবং শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই। শরীয়তের সাধারণ কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্য—কোনোটার সাথেই সেসব সামঞ্জস্য রাখে না।

☑ ৩. নববি যুগের বিচারব্যবস্থা এভাবে বিবৃত হয়েছে যে : রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন একজন নবি, যার কাছে ওহি আসত। সেইসাথে একজন মানুষ বিচারক। দ্বীনি শক্তি আর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সাথে রাষ্ট্রীয় আর দুনিয়াবি ক্ষমতার সমন্বয় তাঁর মাঝে ঘটেছিল। সুতরাং নববি যুগের বিচারব্যবস্থা একদিক থেকে ছিল ঐশী প্রত্যাদেশ আর আল্লাহর শাসনের বাস্তবায়ন। অপরদিক থেকে তা ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার অংশ, যা বাস্তবায়নে কর্তৃত্ব আর রাষ্ট্রশক্তি সহযোগিতা করে থাকে।

☑ ৫. যে বিচারব্যবস্থা আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে পরিচালনা করেছেন, সেটা পবিত্র সুন্নাহর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামি শরীয়তের দ্বিতীয় উৎসরূপে কিয়ামত অবধি তা বহাল থাকবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পরিচালিত বিচারব্যবস্থা নিছক তত্ত্বকথা বা কোনো কাঠখোট্টা চিন্তা নয়। আবার চোখধাঁধানো প্রতীকি চিহ্নও নয়। বরং তা হলো ইসলামি শরীয়তের বাস্তবায়ন। বাস্তব জীবন আর জগতের সাথে যার রয়েছে দৃঢ় সম্পর্ক। মানবপ্রকৃতি ও স্বভাবের সাথে যার রয়েছে গভীর যোগাযোগ। মানবপ্রকৃতিতে ভালো-মন্দ, সততা-অসততা, আদর্শ এবং বাস্তববাদিতার মতো অসংখ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নবি ﷺ কর্তৃক পরিচালিত বিচারব্যবস্থা ছিল মৌলিক ভিত্তির কার্যত নমুনা। মামলা-মোকদ্দমা, দাবিদাওয়া, দলিল-প্রমাণ, বিচারের নীতিমালা এবং ইসলামি বিধিবিধান বাস্তবায়নের বাস্তব উদাহরণ।

☑ ৬. নববি যুগের বিচারব্যবস্থা আঁকড়ে ধরা সকল সময়ের সব জায়গার সমস্ত মুসলিমের জন্য আবশ্যক। প্রতিটি মুসলিম তার অনুসরণ করতে বাধ্য। তার আলোয় আলোকিত হওয়া এবং তার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা সমস্ত মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এই চিন্তা সবাইকেই গ্রহণ করতে হবে। এই আদর্শ অনুসরণ করে এ পথেই সবাইকে চলতে হবে। এ পদ্ধতি ভিন্ন কোনো পদ্ধতি নেই। এ এক অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপনা। অতএব এর প্রয়োগ, কার্যকর আর বাস্তবায়ন আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[১০]

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল।[১১]

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন।[১২]

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

আর যে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে ওইসব লোকের সঙ্গী হবে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন—অর্থাৎ নবিগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদ এবং নেককার ব্যক্তিবর্গ। তারা কতই-না উত্তম সাথি।[১৩]

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।[১৪]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾

আপনি বলে দিন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের

[১০] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১

[১১] সূরা নিসা, ৪ : ৮০

[১২] সূরা নিসা, ৪ : ১৩

[১৩] সূরা নিসা, ৪ : ৬৯

[১৪] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭১

পাপ মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল চিরদয়ালু।'[১৫]

৭. সমস্ত বিশ্বের বিচারব্যবস্থার জন্য নববি যুগের বিচারব্যবস্থা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যা আমাদের নিরপেক্ষতা শিক্ষা দেয়, নিষ্ঠাবান হতে শেখায়, ইনসাফ শিক্ষা দেয় এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরতে শেখায়। সত্য যদি আত্মীয়স্বজন, সন্তান-সন্ততি, এমনকি নিজের বিপক্ষেও হয়, তবুও ইনসাফ করতে হবে। কোনো মুসলিমের বিপক্ষে হলেও অকুণ্ঠ চিত্তে সত্য উচ্চারণ করতে হবে। এই বিচারব্যবস্থায় মুসলিম এবং কাফিরের মাঝে তফাত নেই। ইনসাফপূর্ণ খোদায়ি বিধান প্রতিষ্ঠা, শরীয়তের নীতিমালা সুদৃঢ় করা এবং আল্লাহ-প্রদত্ত চিরস্থায়ী সংবিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নববি যুগের বিচারব্যবস্থা অনন্য।

নববি যুগে বিচারের ব্যবস্থাপনা

নবিজির বিচারকার্য পরিচালনা

রাসূল ﷺ ছিলেন ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম বিচারক। ইসলামি বিচারব্যবস্থার সর্বপ্রথম পরিচালক ছিলেন তিনি। তাঁর বিচারই হচ্ছে আদর্শ বিচারের মডেল আর নমুনা। কারণ, আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত বিচারের বিধান তাঁর কাছেই নাযিল হতো। কুরআনের যেসব আয়াতে তাঁকে বিচারের গুরুভার আর পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেসবের বাস্তবায়ন তিনিই করতেন। তাঁর বিচার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের বিচারক্ষমতা আপনার ওপর ন্যস্ত না করবে; তারপর আপনার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা না রেখে সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেবে।[১৬]

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

অতএব আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুসারে তাদের মাঝে আপনি ফয়সালা করুন। আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির

[১৫] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৩১
[১৬] সূরা নিসা, ৪ : ৬৫

অনুসরণ করবেন না।[১৭]

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا

আমি তো আপনার প্রতি সত্য-সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছে সে অনুসারে লোকদের মাঝে আপনি ফয়সালা করেন। আর আপনি খিয়ানতকারীদের পক্ষে তর্ককারী হবেন না।[১৮]

রাসূল ﷺ ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারার সমাজে বিভিন্ন গোত্র, দল এবং ধর্মাবলম্বীদের মাঝে সৃষ্ট সব সমস্যার সমাধান এবং সমস্ত বিবাদ নিরসনের একমাত্র জায়গা। হিজরতের পরপরই মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে রাসূল ﷺ কৃত চুক্তির আলোচনায় এ সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। সে চুক্তির একটা ধারা ছিল এমন—'এই চুক্তির অধীনে থাকা দল এবং গোত্রের লোকদের মাঝে যেসব কলহ-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক এবং মামলা-মোকদ্দমার কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে, তা নিরসনের জন্য সবাই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দ্বারস্থ হবে।'[১৯]

সুতরাং পূর্বোল্লেখিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ কলহ-বিবাদ নিরসন এবং ফয়সালার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে আদিষ্ট ছিলেন। চুক্তি অনুসারে ঐক্যের তাগিদে এই দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত থাকায় কার্যত তিনিই সেটা পরিচালনা করেছেন। ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা তিনিই করতেন। মানুষের সম্পদ, উত্তরাধিকার সম্পত্তি ও অধিকার প্রদান করতেন। ঋণ ও লেনদেনের বিচার করতেন। দাবিদাওয়া মেটাতেন। মতবিরোধের নিষ্পত্তি, দোষীকে শাস্তি প্রদান এবং ইসলামের দণ্ডবিধি কার্যকর করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান তিনিই করতেন। জায়গা-জমি, পানি-সেচ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি-সহ সকল ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা আমরা আলোচনা করব।

বিচারক নিয়োগ প্রদান

রাসূল ﷺ নিজে মদীনায় যেমন বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, তেমনি কোথাও গেলে বা অবস্থান করলে সেখানেও করতেন। আবার কিছুসংখ্যক সাহাবিকেও তিনি বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের অনেকে ছিলেন বিভিন্ন এলাকায় বিচারক। আবার তাঁর নিযুক্ত প্রশাসকদের কাজও ছিল বিচারকার্য পরিচালনা এবং মোকদ্দমা

[১৭] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৮
[১৮] সূরা নিসা, ৪ : ১০৫
[১৯] সীরাতু ইবনি হিশাম : ১/৫০৪

নিষ্পত্তি করা। সামনে আমরা কিছু উদাহরণ উল্লেখ করব।

(ক) কিছুসংখ্যক সাহাবিকে রাসূল ﷺ কর্তৃক বিচারক নিযুক্তকরণ : তাদের কতক ছিলেন ইসলামি এলাকার দায়িত্বে, অনেকে ছিলেন এলাকার একাংশের দায়িত্বে, আবার কেউ কেউ ছিলেন নির্দিষ্ট শহরের দায়িত্বে। এদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো।

☑ ১. আলি ﷺ-কে বিচারক বানিয়ে ইয়ামানে প্রেরণ করা হয়।[১০০]

☑ ২. মাকিল ইবনু ইয়াসার ﷺ-কে ইয়ামানের বিচারক নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো বিচারকার্য ভালো পারি না।' উত্তরে নবি ﷺ বললেন, 'আল্লাহ বিচারকের সাথে থাকেন, যতক্ষণ না স্বেচ্ছায় সে অন্যায় করে।'[১০১]

☑ ৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ-কে খলিফা উসমান ﷺ বললেন, 'যাও, লোকদের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করো।' আবদুল্লাহ ﷺ আরজ করলেন, 'আমিরুল মুমিনীন! আমাকে কি মাফ করা যায়?' খলিফা বললেন, 'এ পদটি তুমি অপছন্দ করছ, অথচ তোমার বাবা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন!' উত্তরে আবদুল্লাহ ﷺ বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই কথা বলতে আমি শুনেছি— "কোনো ব্যক্তি বিচারক নিযুক্ত হয়ে যদি ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে, তবুও বরাবর আমল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা কঠিন ব্যাপার।" এরপর আমি আর কী আশা করতে পারি!'[১০২]

অন্য বর্ণনামতে আবদুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'আমার বাবা তো জটিল বিষয়ে নবিজির শরণাপন্ন হতেন। আর নবি ﷺ জটিল বিষয়ে জিবরীল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতেন। আমি তো শরণাপন্ন হওয়ার মতো কাউকে পাচ্ছি না, আর আমি আমার বাবার মতো যোগ্যও নই।'[১০৩]

দাউদ ইবনু আমির ﷺ বলেছেন, 'এই উম্মতের বিচারক চারজন। তারা হলেন উমর, আলি, যায়িদ এবং আবু মূসা আশআরি ﷺ।'[১০৪]

(খ) ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া নগর এবং এলাকাতে নবি ﷺ প্রশাসক নিযুক্ত করতেন : বিচারকার্য পরিচালনা, লোকদের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি, শরীয়ত প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীনি বিধান কার্যকর করা ছিল এই প্রশাসকদের দায়িত্ব। এসব

---

[১০০] হাদিসটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৩৫৮২ দ্রষ্টব্য।

[১০১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং : ২০৩০৫; আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস নং : ৬৫০৮

[১০২] সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ১৩২২; ইমাম তিরমিযি বলেন, ইবনু উমর-এর হাদিসটি গারীব। আমার মতে এ হাদিসের সনদ পরস্পর সংযুক্ত নয়।

[১০৩] মুসনাদু আবদ ইবনি হুমাইদ : ১/৪৭

[১০৪] তবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৩৫১

প্রশাসকের অনেকেই ছিলেন বিচারক। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। যেমন তায়িফের প্রশাসক উসমান ইবনু আবিল আস[১০৫], সানআর প্রশাসক মুহাজির ইবনু আবি উমাইয়া[১০৬], খাওলানের প্রশাসক ইয়ালা ইবনু উমাইয়া, হাদরামাউতের প্রশাসক যিয়াদ ইবনু লাবিদ[১০৭] এবং ইয়ামানে প্রেরিত আমর ইবনু হাযম ﷺ। আমর ﷺ-এর নিয়োগের ব্যাপারে নবি ﷺ পত্রও লিখেছিলেন।[১০৮]

(গ) কোনো কোনো সাহাবিকে কিছু অঞ্চলের প্রশাসক ও বিচারক—উভয়টিই বানিয়ে পাঠানো হলেও তারা ইতিহাসে বিচারক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যেমন,

☑ ১. মুআয ইবনু জাবাল ﷺ-কে নবি ﷺ জানাদ[১০৯]-এ পাঠিয়েছিলেন। তার দায়িত্ব ছিল লোকদের কুরআন ও শরীয়তের তালিম প্রদান এবং ইয়ামানের যাকাত উসুলকারীদের থেকে যাকাতের সম্পদ কালেক্ট করা। পাশাপাশি বিচারব্যবস্থার গুরুত্বের কারণে বিশেষভাবে সেটাও তাকে পরিচালনা করতে হতো। তাকে বিদায় দেওয়ার সময় নবি ﷺ এই বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছিলেন। আশ্বস্ত হওয়ার জন্য পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমার কাছে কোনো মোকদ্দমা আনা হলে কিসের ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা করবে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কিতাব মোতাবেক।' নবি ﷺ বললেন, 'যদি আল্লাহর কিতাবে এর কোনো ফয়সালা না পাও?' মুআয ﷺ বললেন, 'তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে।' নবি ﷺ বললেন, 'যদি রাসূলের সুন্নাহতে বা আল্লাহর কিতাবে সেটার ফয়সালা না পাও?' তখন মুআয ﷺ বললেন, 'তাহলে আমি গবেষণা করব; কমতি করব না।' নবি ﷺ তখন মুআযের বুক চাপড়ে বলেছিলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে আল্লাহর রাসূলের মনঃপূত কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন।'[১১০]

☑ ২. ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজিত হয়। সেখান থেকে চলে আসার সময় তিনি আত্তাব ইবনু উসাইদ ﷺ-কে মক্কাবাসীদের প্রশাসক ও বিচারক নিযুক্ত করেন।[১১১]

☑ ৩. আল-আলা ইবনুল হাদরামি ﷺ-কে নবি ﷺ বাহরাইনের প্রশাসক ও বিচারক নিযুক্ত করেন। প্রেরণের সময় নবি ﷺ তাকে একটি দীর্ঘ পত্রও

---

[১০৫] আল-ইসাবাহ : ৪/২২১

[১০৬] সীরাতু ইবনি হিশাম : ২/৬০০

[১০৭] প্রাগুক্ত

[১০৮] আস সীরাতুন নববিয়্যাহ : ২/৫৯৪

[১০৯] ইয়ামানের একটি প্রদেশ। সেখানে ইয়ামানের প্রশাসনিক দপ্তর ছিল। সানআ থেকে জানাদ-এর দূরত্ব ৫৮ ফারসাখ তথা ১৭৫ মাইল। — মারাসিদুল ইত্তিলা : ১/৩৫০

[১১০] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৩৫৯২

[১১১] সুবুলুস সালাম : ৪/১৬১

দিয়েছিলেন। সে পত্রের কিছু অংশ হলো :

> 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটা মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। যিনি উম্মি নবি, যিনি কুরাইশি বংশোদ্ভূত, হাশেমি গোত্রীয়, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং নবি। আল-আলা ইবনুল হাদরামি এবং তার সাথে থাকা মুসলিমদের উদ্দেশ্যে। তোমাদের থেকে আমি এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করছি : হে মুসলিমগণ! তোমরা সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করবে। তোমাদের কাছে আমি আল-আলা ইবনুল হাদরামিকে প্রেরণ করেছি। তার প্রতি আমার নির্দেশ থাকছে সে যেন এক আল্লাহকে ভয় করে, যার কোনো শরিক নেই। সে যেন তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়। তোমাদের মাঝে সে যেন উত্তমভাবে চরিত্র গঠন করে। তোমাদের-সহ যার সাথে দেখা হবে, তার সাথে সে যেন আল্লাহর নাযিলকৃত ইনসাফের পদ্ধতি অনুসারে ফয়সালা করে। সুতরাং সে যখন বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত আচরণ করবে এবং অসহায়ের প্রতি দয়ার্দ্র হবে, তখন তার কথা শোনা এবং মানার জন্য তোমাদের আদেশ করছি। তোমরা তাকে সবরকম সাহায্য-সহযোগিতা করবে।'

এই পত্রটি হিজরতের ৪র্থ বছর যিলকদ মাসের ৩ তারিখ লেখা হয়েছিল। রাসূল ﷺ বসা অবস্থায় সাহাবিদের উপস্থিতিতে মুআবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান ؓ পত্রটি লিখেছিলেন এবং উসমান ইবনু আফফান ؓ তার কপি তৈরি করিয়েছিলেন।[১১২]

☑ ৪. ইয়ামানের জাবেদ, এডেন-সহ আরও কিছু অংশের প্রশাসন ও সেখানকার বিচার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে আবু মূসা আশআরি ؓ-কে নবি ﷺ পাঠিয়েছিলেন।[১১৩] ওয়াকি ؒ সূত্রে বর্ণিত আছে, আবু মূসা ؓ-কে নবি ﷺ ইয়ামানের অর্ধেক দায়িত্ব এবং অবশিষ্ট অর্ধেকের দায়িত্ব মুআয ইবনু জাবাল ؓ-কে দিয়েছিলেন।[১১৪]

(ঘ) কোনো বিশেষ ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সাহাবিকে বিচারের দায়িত্ব প্রদান করা।

☑ ১. উকবা ইবনু আমির ؓ সূত্রে বর্ণিত আছে, একবার দুজন লোক নবি ﷺ-এর কাছে মোকদ্দমা নিয়ে এলে তিনি বললেন, 'যাও, উকবা! ওদের মাঝে ফয়সালা করে দাও।' উকবা ؓ আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার তুলনায় আপনি তো এ কাজের অধিক উপযুক্ত।' নবি ﷺ তখন বললেন, 'তা

---

[১১২] আল-মাত্বালিবুল আলিয়া বিযাওয়াইদিল মাসানীদিস সামানিয়া, হাদিস নং : ২১৭১

[১১৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৩৮১-৩৮২

[১১৪] আত-তাবাকাতুল কুবরা : ১/১০০-১০১

হোক। তুমিই ওদের মাঝে ফয়সালা করে দাও। গবেষণা করে সঠিক বিচার করলে ১০টি সওয়াব পাবে। আবার গবেষণা করার পরও ভুল করলে একটি সওয়াব তুমি পেয়েই যাবে।'[১১৫]

☑ ২. হারিসা ইবনু যাফুর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, দুজন ভাইয়ের যৌথ মালিকানায় একটি ঘর ছিল। ঘরটির মাঝামাঝি তারা একটি বেড়া দিয়ে নিয়েছিল। একসময় তাদের দুজনের মৃত্যু হয়ে যায়। উভয়ের ওয়ারিশই বেড়াটির মালিকানা দাবি করে। একপর্যায়ে বিষয়টি নবি ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করা হলো। তিনি মীমাংসার জন্য হুযাইফা ﷺ-কে পাঠালেন। বেড়ার কাছে থাকা যে দড়ি দিয়ে কুঁড়েঘরটি বাঁধা হয়েছিল, তার মালিকের সপক্ষে বেড়ার মালিকানার ফয়সালা দিলেন। ফিরে এসে নবি ﷺ-কে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, 'সঠিক ফয়সালা করেছ।' অন্য বর্ণনামতে তিনি 'চমৎকার ফয়সালা করেছ' বলেছিলেন।[১১৬]

❁ নিয়োগের পদ্ধতি

নবি ﷺ যাদের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করতেন, তারা উপস্থিত থাকলে তাদেরকে মৌখিকভাবে নিয়োগ দিতেন। বিচারব্যবস্থার নিয়মকানুন এবং বিচারকের বৈশিষ্ট্য জানিয়ে দিয়ে তাদেরকে যাবতীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। মুআয ইবনু জাবাল এবং আলি ইবনু আবি তালিব ﷺ-কে নিয়োগ দেওয়ার সময় তিনি এমন করেছিলেন।

পক্ষান্তরে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে নবি ﷺ তার উদ্দেশ্যে পত্র লিখতেন। যা-তে তার থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ-সহ বিচারব্যবস্থার মূলনীতি সংক্রান্ত নির্দেশনা থাকত। আমর ইবনু হাযম ﷺ-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় এবং আল-আলা ইবনুল হাদরামি ﷺ-কে বাহরাইনের বিচারক নিযুক্তির সময় তিনি এমন পত্র লিখেছিলেন।

❁ বিচারের পরিধি নির্দিষ্টকরণ

পেছনে উল্লেখকৃত উদাহরণগুলো থেকে নববি যুগে নির্দিষ্ট বিচারকের বিষয়টি যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি তাদের বিচারকার্য পরিচালনার নির্দিষ্ট এলাকাও স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন আত্তাব ইবনু উসাইদ ﷺ-কে মক্কার প্রশাসক ও বিচারক নিযুক্ত করার সময় তিনি মক্কা নগরী এবং মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। বাহরাইন ছিল আল-আলা ইবনুল হাদরামি ﷺ-এর নির্দিষ্ট জায়গা।

---

[১১৫] সুনানুদ দারাকুতনি, হাদিস নং : ৪৪৫৯

[১১৬] সুনানুদ দারাকুতনি, হাদিস নং : ৪৫৪৪

ইয়ামানে নিযুক্ত সাহাবিদের প্রত্যেকেরই ইয়ামানের নির্দিষ্ট অংশ বা নগরীর দায়িত্ব ছিল। নবিজির নির্ধারিত বিচারকদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিধিতে দায়িত্ব পালন করতেন।

তদ্রূপ বিচারের ধরন কী হবে এবং প্রকার কেমন হবে, সেটাও নির্দিষ্ট ছিল। বিচারক সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয় দেখবেন, নাকি যে-কোনো বিষয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন, সেটাও নির্ধারণ করে দেওয়া হতো। আলি, আবু মূসা আশআরি এবং মুআয ইবনু জাবাল ﷺ-এর নিয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তারা রক্তপণ, সম্পদ, দণ্ডবিধি, দৈহিক বিধানাবলি এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিস্থিতির বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। যেমন : বিবাহ, তালাক, বংশ প্রমাণিতকরণ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

আবার কোনো কোনো মামলার ক্ষেত্রে বিচারকের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকত। নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিচারকের কার্যকারিতা এবং নিযুক্তির সময় উত্তীর্ণ হয়ে যেত। যেমন আমর ইবনুল আস ﷺ-এর কাছে মামলা দায়ের করা এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উকবা ইবনু আমির আল-জুহানি এবং হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ-এর বিচার করার ঘটনা। তবে বিচারক সাধারণভাবে সব বিষয়ে বিচার পরিচালনা করবেন—এটাই ইসলামি বিচারব্যবস্থার মূল নিয়ম। রাসূল ﷺ এবং বড় বড় বিচারকগণও এমনটাই করেছেন। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, রাসূল ﷺ যেমন রক্তপাতের বিষয়ে ফয়সালা করেছেন, তেমনি দণ্ডবিধিও কার্যকর করেছেন। সম্পদ ও সম্পদ-সংক্রান্ত অধিকারের বিচারের মতো দৈহিক অধিকার এবং বন্দির বিধান সংক্রান্ত বিচারও তিনি পরিচালনা করেছেন।

❁ নববি যুগে বিচারব্যবস্থার উৎস

নববি যুগে বিচারব্যবস্থা এবং অন্যান্য বিধান ছিল ওহির ওপর নির্ভরশীল। যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়া চিরসতেজ কুরআন কারীমের আকৃতিতে প্রকাশ পেত। কখনো-বা প্রকাশ পেত রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে। যিনি কখনোই প্রবৃত্তি-তাড়িত হয়ে কথা বলতেন না। বরং তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত ওহি। কখনো গবেষণার আকৃতিতে স্বয়ং রাসূল ﷺ বা সাহাবিদের থেকে তা বিকশিত হতো। তবে সবগুলোই ছিল ওহির অধীন। শরীয়ত আর দ্বীনের সমর্থিত বিষয়কে ওহিও স্বীকৃতি দিত। পক্ষান্তরে শরীয়ত আর দ্বীনের সাথে বিরোধপূর্ণ বিষয় ওহি যে শুধু খণ্ডন করত তা-ই নয়, সেটা বাতিল আখ্যা দিয়ে সঠিক বিষয় বাতলেও দিত। মোটকথা, নববি যুগে বিচারব্যবস্থার উৎস ছিল তিনটি।

প্রথমত : কুরআন কারীম, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহর

কালাম। কোনো ঘটনা, প্রশ্ন এবং দাবির আগে যেমন তা অবতীর্ণ হতো, তেমনি সেসবের পরেও বিবরণ এবং সঠিক নির্দেশনা নিয়ে অবতীর্ণ হতো। কোনো মোকদ্দমা সামনে এলে নবি ﷺ দুটি কাজের কোনো একটি অবশ্যই করতেন। হয়তো পূর্বে নাযিল হওয়া বিধানের আলোকে ফয়সালা করে দিতেন, নয়তো নাযিল হয়নি—এমন বিধানের ক্ষেত্রে ওহির অপেক্ষায় থাকতেন। অবশেষে ওহি নাযিল হওয়ার পরে বিধানটি সর্বত্র প্রচার করে দিতেন। যেমনটা ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধে সাদ ইবনুর রবি রা. শহীদ হওয়ার পরে। সাদের ভাইয়েরা তার মেয়েদের বঞ্চিত করে সব সম্পত্তি নিয়ে নেন। সাদের স্ত্রী তখন নবি ﷺ-এর কাছে এ বিষয়ে মোকদ্দমা দায়ের করলে তিনি অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। অবশেষে উত্তরাধিকারের বিধান সংবলিত আয়াত নাযিল হওয়ার পরে সে অনুসারে ফয়সালা করলেন।[১১৭]

আরেকবার জনৈক মহিলার স্বামী তার সাথে যিহার করলে নবি ﷺ তাকেও বিধান নাযিল হওয়ার অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। অবশেষে এ সংক্রান্ত বিধান অবতীর্ণ হয়। এমন আরও অনেক ঘটনা আছে।

দ্বিতীয়ত: সুন্নাহ। অর্থাৎ নবি ﷺ যা বলেছেন, করেছেন এবং সমর্থন দিয়েছেন। এর মূল ভিত্তি হলো ওহি। কারণ তিনি প্রবৃত্তি-তাড়িত হয়ে কোনো কথা বলেননি। এ হিসেবে সুন্নাহও মর্মগত দিক থেকে ওহি। জিবরীলের নির্দেশনায় কিংবা সরাসরি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তা আসত। নবি ﷺ তা কার্যকর করতেন এবং সাহাবিগণ তার বুঝ ধারণ করতেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কিতাবে হাদিস ও সুন্নাহ সংকলন করা হয়।

তৃতীয়ত: কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই—এমন বিষয়ে গবেষণা করা। সেটার পদ্ধতি হলো বিধানযুক্ত বিষয়কে বিধানবিহীন সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ের সাথে তুলনা (কিয়াস) করার জন্য বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগানো। এর উদ্দেশ্য হলো সমতা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় প্রতিহত করা।

এই উৎস তিনটি সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত এবং দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত। যেমন পূর্বে মুআয রা.-এর হাদিস আলোচনা করা হয়েছে। ফয়সালা করার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'আমি গবেষণা করব; কোনো রকম কমতি করব না।' তখন বিচারব্যবস্থার এই সঠিক পদ্ধতিটিকে আল্লাহর নবি ﷺ শুধু স্বীকৃতিই দেননি; বরং সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছিলেন।[১১৮] ইসলামি বিচারব্যবস্থার এই পদ্ধতি অন্যান্য সাহাবি এবং মুসলিমদের সবাই বুঝে নিয়েছেন।

উম্মু সালামা রা. বর্ণনা করেছেন, দুজন ব্যক্তি মিরাস এবং পুরাতন জিনিসের ব্যাপারে মামলা নিয়ে হাজির হলে নবি ﷺ তাদের বললেন, 'এ সম্পর্কে আমার

---

[১১৭] আসবাবুন নুযূল লিল ওয়াহিদি : ১২২ দ্রষ্টব্য।

[১১৮] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৩৫৯২

কাছে কোনো হুকুম অবতীর্ণ না হওয়ায় আমি আমার মতানুযায়ী ফয়সালা করে দেবো।'[১১৯]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ؓ বলেছেন, 'কারও কাছে মোকদ্দমা পেশ করা হলে সে যেন আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করে। আল্লাহর কিতাবে নেই এমন বিষয় উপস্থাপিত হলে নবি ﷺ-এর বিচারকার্য অনুপাতে ফয়সালা করবে। যদি এমন মোকদ্দমা সামনে আসে যার বিবরণ আল্লাহর কিতাবেও নেই এবং নবি ﷺ-ও তেমন বিচারকার্য পরিচালনা করেননি, তবে নেককার ব্যক্তিদের কথা অনুসারে ফয়সালা করবে। আর যদি এমন মোকদ্দমা সামনে আসে—যার বিবরণ আল্লাহর কিতাবেও নেই, নবিজির সুন্নাহতেও নেই, এমনকি নেককার ব্যক্তিরাও সে ব্যাপারে কিছু বলেননি, তাহলে নিজের ইজতিহাদ তথা গবেষণা অনুপাতে ফয়সালা করবে। কেউ যদি ভালোমতো গবেষণা করতে না পারে, তাহলে লজ্জা না করে বিষয়টি স্বীকার করে নেবে।'[১২০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ؓ বলেছেন, 'হারাম সুস্পষ্ট এবং হালালও সুস্পষ্ট। উভয়ের মাঝে কিছু সংশয়পূর্ণ বিষয় আছে। সুতরাং সন্দেহপূর্ণ বিষয় ছেড়ে সন্দেহাতীত বিষয় গ্রহণ করো।'[১২১]

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ؓ আলি ؓ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এমন অনেক বিষয় আমাদের সামনে আসে, যে সম্পর্কে কুরআনে কিছু অবতীর্ণ হয়নি, এমনকি সে বিষয়ে আপনার কোনো সুন্নাহও পাওয়া যায় না।" উত্তরে তিনি বললেন, "আলিমদের বা ইবাদতগুজার মুমিনদের একত্র করে তোমাদের উপদেষ্টা বানিয়ে নেবে। তবে একজনের মতের মাধ্যমে অপরের মত খণ্ডন করবে না।"'[১২২]

বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের পর আলি ؓ-এর কাছে এমন এক মোকদ্দমা এল, যার সমাধান তিনি কুরআন-সুন্নাহয় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিচ্ছি। তোমরা সন্তুষ্ট হলে সেটাই হবে চূড়ান্ত ফয়সালা। অন্যথা বিষয়টি আমি মুলতুবি রাখব। তখন তোমরা মোকদ্দমাটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাবে।'

দেখা গেল, আলি ؓ কৃত ফয়সালা তারা মেনে নিতে পারেনি। অবশেষে তারা হজের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে গেল। তখন তিনি মাকামে ইবরাহীমের কাছে অবস্থান করছিলেন। সব শুনে তিনি আলি ؓ কৃত ফয়সালা বহাল রেখে

[১১৯] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৩৫৮৫

[১২০] আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন, হাদিস নং : ৭০৩০

[১২১] সুনানুদ দারিমি, হাদিস নং : ১৬৭

[১২২] ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন (ইলমিয়্যাহ) : ১/৫২

বললেন, 'সে তোমাদের মাঝে যে ফয়সালা করেছে, সেটাই চূড়ান্ত।'[১২৩]

সুতরাং বোঝা গেল, বিচারের ফয়সালা শরীয়ত মোতাবেক ও ওপরের তিনটি উৎস থেকে গ্রহণ করা উচিত।

❁ অভিযোগের তদন্ত এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত বিচার

অভিযোগের তদন্ত বলতে এখানে শাসক, বিচারক ও দায়িত্বশীল কর্তৃক জনসাধারণের অধিকার পুরোপুরি রক্ষা এবং নাগরিকের প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত রাখা উদ্দেশ্য। আর দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত বিচার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৎ কাজের আদেশ পরিত্যাগ করা হলে তা জারি করা এবং ছড়িয়ে পড়া অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করা।

নববি যুগে এই দুই ধরনের বিচারব্যবস্থাই পাওয়া যায়। কিন্তু সে যুগে এসব ছিল সাধারণ বিচারব্যবস্থার অধীনে। এসবের পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা পরবর্তী যুগে প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য আমরা কিছু উদাহরণ দেখতে পারি।

রাশিদ ইবনু আবদিল্লাহ ﵁-কে নবিজি ﷺ যখন বিচারক নিযুক্ত করেন, তখন অভিযোগের তদন্ত করার বিষয়টি সর্বপ্রথম সামনে আসে। নবি ﷺ বলেছিলেন, 'কারও থেকে আমি সম্পদ নিয়ে থাকলে এই রইল আমার সম্পদ। এখান থেকে নিয়ে নাও। আর যদি কারও পিঠে আঘাত করে থাকি, তাহলে আমার পিঠে আঘাত করে তার বদলা নিয়ে নাও।'[১২৪]

বদরের দিন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে নবি ﷺ সাহাবিদের কাতার সোজা করছিলেন। দেখলেন, সাওয়াদ ইবনু গাযিয়্যা ﵁ কাতার থেকে একটু সামনে বেড়ে আছেন। হাতে থাকা তিরের মাথা দিয়ে তার পেটে সামান্য খোঁচা দিলেন তিনি। বললেন, 'সাওয়াদ! কাতার সোজা করো।' সাওয়াদ ﵁ তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আপনি ব্যথা দিয়েছেন। আল্লাহ তো আপনাকে ন্যায় ও ইনসাফ দিয়ে পাঠিয়েছেন। অতএব আমাকে বদলা নিতে দিন।' আল্লাহর নবি ﷺ তখন নিজের পেট থেকে কাপড় সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও, বদলা নাও।' সাওয়াদ তখন নবিজিকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পেটে চুমু দিলেন। নবি ﷺ অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যাপার কী সাওয়াদ?' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আজকের (অর্থাৎ যুদ্ধের) অবস্থা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। তাই আপনাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হলো।'[১২৫]

---

[১২৩] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং : ৫৭৩; যাদুল মাআদ : ৫/১৪; তবাকাতু ইবনি সাদ : ১/৯১

[১২৪] নবিজির ভাষণের এই অংশটি সীরাতবিদগণ উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন হাদিসে এর মর্ম পাওয়া যায়। প্রয়োজনে সহিহ মুসলিম : ১৬/১৫০; মুসনাদু আহমাদ : ২/২৪৩ ও ৬/৪৫; সুনানুদ দারিমি : ২/৩১৪-৩১৫ এবং তবাকাতু ইবনি সাদ : ২/২৫৫ দেখা যেতে পারে।

[১২৫] সীরাতু ইবনি হিশাম : ২/২৭৮-২৭৯

এ ছাড়াও অনেক হাদিস থেকে জানা যায়, নবি ﷺ যাকাত উসূলের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের থেকে হিসাব গ্রহণ করতেন। সহিহুল বুখারিতে এ সংক্রান্ত একাধিক বর্ণনা রয়েছে।[১২৬]

তদ্রূপ নববি যুগে দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত বিচারও সংঘটিত হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নানান বিষয়ে আপামর জনগণের খোঁজখবর রাখতেন। এজন্য তিনি নিজেই বাজার পরিদর্শন করতেন। দ্রব্যমূল্যের প্রতি তাঁর নজর থাকত এবং মানুষকে প্রতারণা করতে তিনি নিষেধ করতেন।

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন, একবার স্তূপীকৃত খাদ্যশস্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নবি ﷺ তাতে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তখন হাতে আর্দ্রতা অনুভব করে তিনি বললেন, 'হে খাদ্যশস্যের মালিক, এটা আবার কী!' সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টির পানি পড়েছিল।' রাসূল ﷺ বললেন, 'ভেজা অংশ খাদ্যশস্যের ওপর দিকে রাখলে না কেন, তাহলে লোকেরা তা দেখতে পেত। যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[১২৭]

মক্কা বিজয়ের পর সাঈদ ইবনু সাঈদ ইবনিল আস رضي الله عنه-কে নবি ﷺ সেখানকার বাজারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। সে দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। পরবর্তীকালে তায়িফ অভিযানের দিন তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১২৮]

অভিযোগের তদন্ত আর দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত বিচার সে-সময় সাধারণ বিচারব্যবস্থার বহির্ভূত বিষয় ছিল না। নববি যুগের বিচারকগণ ব্যক্তিবিশেষের মাঝে যেমন ফয়সালা করতেন, তেমনি ক্ষমতাবানদের সীমালঙ্ঘন করতে বাধা দিতেন। সৎ কাজের আদেশ করা এবং তাদের সামনে সংঘটিত হচ্ছে কিংবা হওয়ার সংবাদ পেয়েছেন এমন অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা ছিল তাদের নিত্যদিনের কাজ।

নববি যুগে বিচার পদ্ধতি

❁ বিচারব্যবস্থার সহজতা

নববি যুগে বিচারের ব্যবস্থাপনা ছিল সহজসাধ্য। বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে জনগণের ওপর শারঈ আইন আর বিধিমালা প্রয়োগে রাসূল ﷺ-এর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল। মামলার ফয়সালা, কলহ নিরসন, বিধিবিধান বর্ণনা এবং বিরোধের নিষ্পত্তি—সবকিছুই রাসূল ﷺ সামলাতেন। সত্য আর ন্যায় স্পষ্টকরণ, সমস্যার ক্ষেত্রে অধিকার প্রদান এবং বিচারের মধ্যে শাস্তি নির্ধারণে

---

[১২৬] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ১৫০০ ও ৬৯৭৯

[১২৭] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১০২

[১২৮] আল-ইসতীআব ফী মারিফাতিল আসহাব : ২/৬২১

আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন একমাত্র উৎস। লোকদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে, তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেলে, তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে, যে-কোনো ঘটনা ঘটলে তারা নির্দ্বিধায় আল্লাহর রাসূলের কাছে ছুটে যেত। স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করত। তখন তিনি অবতীর্ণ হওয়া ওহি অনুসারে বা নিজের গবেষণা অনুসারে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিতেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বিভিন্ন শহরে বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাদেরও দায়িত্ব ছিল একই কাজ করা।

নববি যুগে বিচারব্যবস্থার কোনো বিশেষ পদ্ধতি ছিল না। তা ছিল সব ধরনের জটিলতা, আনুষ্ঠানিকতা এবং বাহ্যিক বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত। বিচারের ধরন ছিল সহজসাধ্য। কারণ সে যুগে মামলা-মোকদ্দমা আর কলহ-বিবাদের আধিক্য ছিল না। মানুষের মাঝে ছিল আধ্যাত্মিক শিক্ষা। ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করত। পক্ষান্তরে এই যুগে বেশির ভাগ মামলা-মোকদ্দমা আর কলহ-বিবাদ জাহিলি যুগের বিভিন্ন প্রাচীন কারণে হয়ে থাকে। যেমন পুরোনো জমি বা নতুন উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ হয়। কিংবা যিহার এবং নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মতো জাহিলি যুগের ঘটনা নতুন করে ঘটে।

অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি

অভিযোগ লিখিত আকারে দায়ের করতে হবে—এমন কোনো শর্ত নববি যুগে ছিল না। বরং মৌখিকভাবেই অভিযোগ গ্রহণ করা হতো। সরাসরি অভিযোগ দায়ের করা হতো, জিজ্ঞাসাবাদ হতো সামনাসামনি এবং আলোচনা থাকত স্পষ্ট। বাদী বা তার প্রতিনিধি যে পদ্ধতি ও শব্দে অভিযোগ দায়ের করতে সক্ষম ছিল, সেভাবেই বিষয়টি উপস্থাপন করত। সাধারণত উভয় পক্ষই রাসূল ﷺ কিংবা প্রশাসক বা দায়িত্বরত বিচারকের কাছে সরাসরি চলে আসত। কখনো বিবাদী অনুপস্থিত থাকলে বিচারক তাকে উপস্থিত করার আদেশ দিতেন এবং বাদীর সাথে উপস্থিত হওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতেন।

মামলা পরিচালনার কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য। যেমন : (ক) মামলার উপস্থাপন ছিল সরাসরি এবং সামনাসামনি; (খ) মামলার বিষয়টি ছিল যাচাইসাপেক্ষ; (গ) উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর তদনুযায়ী ফয়সালা করা হতো; (ঘ) রায় দিতে কোনো ধরনের গড়িমসি বা বিলম্ব করা হতো না এবং মামলা ঝুলিয়ে রাখার চল ছিল না; (ঙ) প্রমাণ এবং দলিল উপস্থাপনের পর দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথেই ফয়সালা শুনিয়ে দেওয়া হতো; (চ) বাদী-বিবাদী স্বেচ্ছায় কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বা সমন জারি করা ছাড়াই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বা তাঁর নিযুক্ত বিচারকের কাছে চলে আসত। আর এটাই ছিল সে যুগের বিচারব্যবস্থা। যা ছিল সালিশি বিচারব্যবস্থার মতো। আর মামলার সিদ্ধান্ত দেওয়া ছিল অনেকটা ফতোয়া

দেওয়ার মতো।

রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত বিচারব্যবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতিমালার বিশদ ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে ইসলামি আইনবিদগণ করেছেন। যেমন,

☑ ক. বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের মাঝে সমতা রক্ষা করা।

☑ খ. উভয় পক্ষ বিচারকের সামনাসামনি বসা।

☑ গ. বাদী আগে কথা বলা শুরু করবে।

☑ ঘ. যে বিচারকের সামনে বাদী-বিবাদী হাজির আছে, তিনিই বৈঠক নিয়ন্ত্রণ করবেন।

☑ ঙ. উভয় পক্ষের প্রত্যেকেই জোরদারভাবে নিজের দাবি উপস্থাপন করবে। যাতে বিপক্ষের কাছে বিচারক তার ব্যাখ্যা চাইতে পারেন।

তদ্রূপ মামলার উপস্থাপন, দলিল শুনানির পদ্ধতি, রাগান্বিত অবস্থায় বিচার না করা এবং পরামর্শ সাপেক্ষে ফয়সালা প্রদান ও রায় জারি করা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা আছে। ইসলামি আইনশাস্ত্রের বিচারব্যবস্থাপনা এবং বিচারের বিধিমালার মাধ্যমে সেগুলো জানা যায়।

❁ নববি যুগে প্রমাণ সাব্যস্ত করার পদ্ধতি

বিচারকের সামনে গ্রহণযোগ্য এবং শরীয়ত অনুমোদিত প্রমাণ পেশ করার উপায় ও পদ্ধতি কী হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন। যার প্রয়োগ হবে তাত্ত্বিক এবং মৌখিক আইনি পদ্ধতির সাথে ব্যবহারিক এবং বাস্তবসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে। বিচারব্যবস্থার বিশেষজ্ঞ আলিমগণ দলিল-প্রমাণ সাব্যস্তকরণের ব্যাপারে স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন। আমাদের মনে হয়, এখানে সেদিকে কেবল সংক্ষিপ্ত কিছু ইঙ্গিত করাটাই যথেষ্ট। আগ্রহী পাঠক যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা জানতে পারবেন। নববি যুগে প্রমাণ সাব্যস্তকরণের আইনি পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

☑ **১. সাক্ষ্য :** দলিল-প্রমাণ এবং মামলার বিষয়বস্তু হিসেবে এই সাক্ষ্য বিভিন্ন স্তরে, নানান ধাপে এবং বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য, দুজন পুরুষের সাক্ষ্য, একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও কসম এবং মহিলাদের বিষয়ে কেবল নারীদের সাক্ষ্য।

☑ **২. কসম :** এটা বিভিন্ন প্রকারের হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিবাদীর কসম, অস্বীকারকারীর কসম, বাদীর কসম, প্রমাণবিহীন হত্যার ঘটনায় নিহতের অভিভাবকদের কসম এবং লিআনের ক্ষেত্রে কসম।

☑ ৩. **লেখা :** নববি যুগে আক্ষরিক শিক্ষার প্রচলন কম থাকায় মামলা লেখার প্রচলন কম ছিল। লেখার চল সাধারণত ছিল না বললেই চলে। তবে অধিকার প্রমাণিতকরণ এবং বিচারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু লেখার ব্যবহার অবশ্য পাওয়া যায়।

☑ ৪. **স্বীকারোক্তি :** স্বীকারোক্তি হচ্ছে সব দলিল-প্রমাণের মূল। এর মাধ্যমে দণ্ড কার্যকর হয়। কিসাস, শাস্তি, বিরোধ, অর্থনৈতিক অধিকার লঙ্ঘন এবং ব্যক্তি পর্যায়ের বিভিন্ন অবস্থার বিচার করা হয়। এটি অপরাধীর নিজের বিরুদ্ধেও একটি দলিল বটে।

☑ ৫. **সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ :** বিতর্ক এবং বিরোধের স্থান সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা। বিচারক বা তার প্রতিনিধি মামলার বিষয়ে সরাসরি অনুসন্ধান ও তত্ত্বতালাশ করবেন।

☑ ৬. **ইঙ্গিতপূর্ণ দলিল :** এ জাতীয় প্রমাণ অনেক। সন্তানের বংশপরিচয় নিয়ে সংশয় হলে বংশ প্রমাণে 'কাফা' এবং 'কিয়াফা' তথা অনুসন্ধান করা, বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের ক্ষেত্রে তার বিবরণ দেখা, ব্যভিচারের কারণে গর্ভধারণ, সংশয়যুক্ত এবং অপবাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ও ইঙ্গিতপূর্ণ দলিল এর অন্তর্ভুক্ত।

☑ ৭. **লটারি :** পূর্বের দলিল-প্রমাণ যদি না পাওয়া যায়, কিংবা সমস্ত প্রমাণ যদি একাকার হয়ে যায়, অথবা উভয় পক্ষের দাবি যদি বরাবর হয় এবং অভ্যন্তরীণ ও গোপন জিনিস ছেড়ে দিয়ে কেবল বাহ্যিক বিষয়ের ওপর প্রমাণ নির্ভরশীল হলে এসব ক্ষেত্রে বাদী-বিবাদী উভয়ের মাঝে লটারি করা হবে।[১২৯]

লটারি-সংক্রান্ত বিচারের একটি ঘটনা : আলি ﷺ যখন ইয়ামানে বিচারব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন, তখনকার কথা। একবার তার কাছে তিনজন লোক এল। তাদের প্রত্যেকেই একটি নবজাতক শিশুর জন্মদাতা হওয়ার দাবি করছিল। আলি ﷺ তখন তাদের প্রত্যেক দুজনকে বললেন, 'তোমরা দুজন তোমাদের তৃতীয়জনের জন্য শিশুটির দাবি ছেড়ে দাও।' কিন্তু তাদের কেউই দাবি ছেড়ে দিতে সম্মত হলো না। অগত্যা আলি ﷺ তাদের মাঝে লটারি দিলেন। লটারিতে যার নাম উঠল, আলি ﷺ শিশুটি তাকে দিয়ে দিলেন। আর বাকি দুজনের জন্য ধার্য করলেন দুই-তৃতীয়াংশ দিয়ত তথা রক্তপণ। আলি ﷺ কৃত এই বিচারের সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি এমনভাবে হেসেছিলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।[১৩০]

---

[১২৯] এ ব্যাপারে সবিস্তারে জানতে আমাদের 'ওয়াসাইলুল ইসবাতি ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ' গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

[১৩০] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/২২২

বিচারের রায়

নববি যুগে বিচারের রায় ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি এবং শারঈ বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিচারকার্য পরিচালনা করা হতো সরাসরি কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে কিংবা নববি সুন্নাহর মাধ্যমে। নয়তো রাসূল ﷺ-এর ইজতিহাদ, সাহাবি এবং নবি ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক ও প্রশাসকদের ইজতিহাদের মাধ্যমে। আর এসব বিচারের বৈধতায় থাকত আল্লাহ তাআলার সমর্থন। ফলে নিশ্চিতভাবে বলা যেত যে, এটাই আল্লাহ তাআলার বিধান।

মামলা-মোকদ্দমার ফয়সালা, বিবাদ-বিরোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত, বিশেষভাবে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কৃত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং জানতে চাওয়া ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর ব্যাখ্যা প্রদান, সমাধান, এবং নির্দেশনা একদিক থেকে বিচার এবং অপরদিক থেকে ফতোয়া। আবার অন্যদিক থেকে সাহাবায়ে কেরাম-সহ সমস্ত মুসলিমের জন্য তা আল্লাহর পক্ষ হতে ঐশী বিধান। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেছেন, 'রাসূল ﷺ কৃত সমস্ত বিশেষ বিচারই সর্বজনীন বিধান।'[১৩১]

নববি যুগে বিধিবিধান প্রথমে পর্যবেক্ষণ করা হতো। তারপর সেটা উচ্চ আদালতে পেশ করা হতো। আর পর্যবেক্ষণ ও দিক-নির্দেশনা প্রথম সংঘটিত হতো আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ওহির মাধ্যমে। তারপর রাসূল ﷺ পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করতেন। যেমন হুযাইফা ؓ-এর হাদিস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বেড়ার বিষয়ে তিনি ফয়সালা করেছিলেন যে, 'বেড়ার সাথে লাগানো দড়িটি যার, বেড়াটিও তারই হবে।' এরপর রাসূল ﷺ-এর কাছে ফয়সালাটি পেশ করা হলে তিনি সেটার অনুমোদন দিলেন। বললেন, 'সঠিক ফয়সালা করেছ।' অথবা বললেন, 'তুমি চমৎকার ফয়সালা করেছ।'[১৩২]

তেমনিভাবে ইয়ামানে চার ব্যক্তি নিহত হওয়ার ব্যাপারে আলি ؓ একটি ফয়সালা দিয়েছিলেন। একে অন্যকে ধরে ফেলার কারণে 'যুবয়াতুল আসাদ' নামক একটি কূপে পড়ে তাদের মৃত্যু ঘটেছিল। পরবর্তীকালে আলি ؓ কৃত ফয়সালাটি রাসূল ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আলি যে ফয়সালা করেছে, সেটাই ঠিক আছে।'

আরেক বর্ণনায় আছে, কূপের পাড়ে যারা ভিড় করেছিল, আলি ؓ তাদের ওপর দিয়াত ধার্য করেছিলেন। রাসূল ﷺ-ও সেটার অনুমোদন দিয়েছিলেন।[১৩৩]

সুতরাং এটা বুঝে আসে, আলি ؓ-এর ফয়সালা শরীয়ত-বিরোধী হলে নবি ﷺ অবশ্যই সেটা বাতিল করে এ ব্যাপারে বিধান বাতলে দিতেন; যেমনটা জনৈক

---

[১৩১] যাদুল মাআদ : ৫/৫

[১৩২] সুনানুদ দারাকুতনি, হাদিস নং : ৪৫৪৪

[১৩৩] যাদুল মাআদ : ৫/১৩; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ২/২০; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং : ৫৭৩

কর্মচারীর ঘটনায় করেছিলেন। ঘটনাটির বিবরণ আমরা সামনে উল্লেখ করব।

আলি ﷺ-এর নিজস্ব ইজতিহাদ নবি ﷺ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার আরেকটি ঘটনা আছে। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন দাসী ব্যভিচার করেছিল। নবিজি তখন বাঁদিকে বেত্রাঘাত করার জন্য আলি ﷺ-কে আদেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে দাসীটি তখন সদ্য গর্ভবতী। আলি ﷺ তখন ভয় পেলেন—এমতাবস্থায় বেত্রাঘাত করলে দাসীটি হয়তো মারা যাবে। এই ভেবে তিনি আর বেত্রাঘাত করলেন না। তারপর নবি ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, 'তুমি ভালো করেছ।' অন্য বর্ণনামতে তিনি বলেছিলেন, 'বেশ, সে সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও।'[১৩৪]

বিচার বাস্তবায়ন

নববি যুগের বিচারব্যবস্থা ছিল ফতোয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মামলার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই আল্লাহ তাআলার ফয়সালা মেনে নিত। উভয় পক্ষেরই বক্তব্য হতো—'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।'

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার হুকুম বাস্তবায়নে আগ্রহী থাকত। সে হুকুম তাদের নিজেদের বিপক্ষে গেলেও তারা পিছপা হতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং বা তাঁর নিয়োগকৃত বিচারক-প্রশাসকরা যে ফয়সালা বা আদেশ দিতেন, সেটা তারা আঁকড়ে ধরত।

অপরাধ-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বিচারক নিজেই তার ফয়সালা বাস্তবায়ন করতেন। অথবা ফয়সালা বাস্তবায়নের আদেশ দিয়ে তিনি নিজে সেটার তত্ত্বাবধান করতেন। সুতরাং বিচারক একইসাথে ফয়সালাকারী এবং ফয়সালা বাস্তবায়নকারী—উভয়ের দায়িত্বই পালন করতেন।

ফয়সালা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ছিল তাৎক্ষণিক। বিচার বা ফয়সালা ঝুলিয়ে রাখা হতো না। ফয়সালা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের টালবাহানা, সময়ক্ষেপণ বা কোনো শর্তারোপ করা হতো না। বিচারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হকদারের কাছে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। যেমন, স্বীকারোক্তি প্রদানের পরই মায়িয ﷺ-কে রজম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদ্রূপ কর্মচারীর ঘটনায় উনাইস ﷺ-কে অভিযুক্ত নারী থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়ার আদেশ করেছিলেন। মহিলাটি নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করলে তাকে রজম করা হয়। আবার কাব ইবনু মালিক ﷺ-কে তার পাওনার অর্ধেক ছেড়ে দেওয়ার ফয়সালা করে ইবনু আবি হাদরাদ ﷺ-কে তৎক্ষণাৎ ঋণ পরিশোধের আদেশ দিয়েছিলেন।[১৩৫] হাদিসের

[১৩৪] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭০৫
[১৩৫] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৩৫৯৫

কিতাবে এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা রয়েছে।

আজকের যুগে আমরা যে অর্থে জেলখানা বা কারাগার বুঝে থাকি, নববি যুগে সেই অর্থে কোনো জেলখানা বা কারাগার ছিল না। অপবাদ আরোপের অভিযোগে কাউকে বন্দি করা হলে তাকে এক দিন এক রাত আটকে রাখা হতো। তাও আবার হতো কাজকর্ম হতে তাকে বাধা দিয়ে নজরবন্দি করে রাখার মাধ্যমে। হয়তো তার নিজের ঘরেই তাকে গৃহবন্দি করা হতো। কিংবা মসজিদে আটকে রাখা হতো। অথবা কাউকে নিয়োজিত করা হতো, যে সর্বক্ষণ অপরাধীকে নজরদারি করত। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো ঋণের অভিযোগে কাউকে বন্দি করেননি।[১৩৬]

❁ বিচারের স্থান এবং সময়

নববি যুগে বিচারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো জায়গা ছিল না। রাসূল ﷺ-কে সর্বপ্রথম যেখানে পাওয়া যেত, লোকেরা সাধারণত সেখানেই মোকদ্দমা নিয়ে আসত এবং তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। বিশেষত মসজিদে নববিতেই অধিকাংশ বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হতো। সেটা ছিল বিচারের অন্যতম জায়গা। আবার মসজিদের বাইরেও তিনি বিচার করতেন। যেমন, বনু কুরাইযার বিচার হয়েছিল মসজিদের বাইরে। আলি এবং ফাতিমা ؓ-এর মধ্যকার মতানৈক্যের মীমাংসা তাদের ঘরেই করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়োগকৃত বিচারক এবং প্রশাসকরা তাদের উপস্থিতির জায়গাতে বা কাজের জায়গাতেই বিচার করতেন। বিরোধ ও মামলার মূল জায়গাতেও বিচার এবং ফয়সালা করা হতো। যেমন, বেড়ার ব্যাপারে হুযাইফা ؓ মোকদ্দমার জায়গায় গিয়ে বিচার করেছিলেন। আবার জনৈক সাহাবিকে রাসূল ﷺ একজন মহিলার কাছে গিয়ে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করতে বলেছিলেন।

এ থেকে বোঝা যায়, বিচারক চাইলে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিবাদের মূল জায়গায় যেতে পারবেন। তাহলে মামলাটি সূক্ষ্মভাবে যাচাই করা যাবে এবং প্রমাণ সাব্যস্তকরণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

নববি যুগে বিচারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান যেমন ছিল না, তেমনি ধরাবাঁধা কোনো সময়ও ছিল না। কেননা আদালতের নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। জুলুম, নির্যাতন, সীমালঙ্ঘন যে-কোনো সময় সংঘটিত হতে পারে। তাই যত দ্রুত সম্ভব নির্যাতন প্রতিহত করতে হবে। গোড়াতেই জুলুম মিটিয়ে দিতে হবে। সীমালঙ্ঘনে তৎক্ষণাৎ বাধা প্রদান করা আবশ্যক। যেমন আবশ্যক যত দ্রুত সম্ভব হকদারের কাছে তার হক পৌঁছে দেওয়া। এ কারণেই কোনো অধিকার প্রত্যাশী ও বিচারপ্রার্থী তার অধিকার ও বিচারের জন্য যে-কোনো সময় দাবি জানাতে পারত। নবি ﷺ

---

[১৩৬] যাদুল মাআদ : ৫/৫

নিজের ব্যাপারে কোনো সময় নির্ধারণ করেননি। না তাঁর নিয়োগকৃত বিচারকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর না তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রশাসকদের জন্য সময় বেঁধে দিয়েছেন।

তবে হ্যাঁ, কুরআন কারীম পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করার এমন কিছু নিয়মকানুন এবং আদব নির্ধারণ করে দিয়েছে, যেগুলো বিচারকার্যের সাথে সমন্বয় করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ
الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ
حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۛ۫ ثَلٰثُ
عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ

> হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ের অনুমতি গ্রহণ করে—ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো এবং ইশার নামাজের পর। এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্যে এবং তাদের জন্যে কোনো দোষ নেই। তোমাদের তো একে অপরের নিকট যাতায়াত করতেই হয়। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১৩৭]

আবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁকে কষ্ট না-দেওয়ার ব্যাপারে কুরআন কারীমে সমস্ত মুসলিমের জন্য আবশ্যক কিছু নিয়মনীতি বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো এমন সময়, যখন তিনি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে ব্যস্ত থাকতেন। বিশেষত যখন তিনি স্ত্রীদের ঘরে অবস্থান করতেন, তখন ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ যেন বিচার-সংক্রান্ত বা অন্য কোনো কাজে তাঁকে ডাকাডাকি না করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ وَلَوْ
اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

> যারা ঘরের পেছন হতে আপনাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। আপনি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্যধারণ

[১৩৭] সূরা নূর, ২৪ : ৫৮

করত, তবে সেটাই তাদের জন্যে মঙ্গলজনক হতো।[১৩৮]

নবিজির বিচার-ফয়সালা

মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূল ﷺ ছিলেন মুসলিম-অমুসলিম সকলের কেন্দ্রবিন্দু। বড়-ছোট যে-কোনো বিষয়ে সবাই তাঁরই শরণাপন্ন হতেন। প্রশ্ন করা, মাসআলা জানতে চাওয়া, বিচার সালিশ-সহ জীবনঘনিষ্ঠ যে-কোনো বিষয়ে তাঁরই দ্বারস্থ হতেন সবাই। তিনি ছিলেন মদীনার সর্বপ্রধান এবং একমাত্র বিচারক। এ কারণে তাঁর থেকে অনেক বিধান প্রকাশিত হতো। বহু ফতোয়া এবং সঠিক ফয়সালার একমাত্র উৎস ছিলেন তিনি। এগুলো এক দিক থেকে যেমন কুরআনের ব্যাখ্যা, অপর দিক থেকে তা আসমানি শরীয়তের প্রচারণা। সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর ফতোয়া এবং মোকদ্দমার ক্ষেত্রে তাঁর ফয়সালা সকল যুগের সমস্ত মুসলিমের জন্য প্রজোয্য।

এজন্যই ইবনুল কাইয়িম রহ. তার অমর গ্রন্থ *যাদুল মাআদ*-এর একটি পূর্ণ অংশজুড়ে কেবল এ আলোচনাই করেছেন। তিনি সে গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন: 'মামলা-মোকদ্দমা, বিবাহ-শাদি এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নবি ﷺ-এর নির্দেশনা।' এরপর তিনি পরিষ্কার করে লিখেছেন, 'সর্বজনীন আইন এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। অবশ্য রাসূল ﷺ-এর বিশেষ ফয়সালাগুলো সর্বজনীন আইনই বটে। মূলত মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে নবি ﷺ-এর খণ্ডিত নির্দেশনাগুলো এখানে আলোচনা করা হবে। আর তিনি কিভাবে মানুষের মাঝে সুবিচার করতেন সেটার আলোচনা আমরা তাঁর সামগ্রিক বিধানাবলিতে করব।'[১৩৯]

শাইখ জহিরুদ্দিন আলি ইবনু আবদিল আজিজ ইবনি আবদির রাজ্জাক আল-মারগিনানি (৫০৬ হি.) রাসূল ﷺ-এর কৃত ফয়সালাগুলো সংকলন করেছেন। গ্রন্থটির বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থও রয়েছে।[১৪০]

হাদিসের কিতাবাদিতে নবি ﷺ কৃত ফয়সালাগুলো নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা আছে। এখানে আমরা কোনো রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কেবল কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব। কারণ পূর্বে যেমন কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি পরেও বিভিন্ন অধ্যায়ে নানান দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ক. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ফয়সালা

উম্মু সালামা রা. বলেছেন, একবার দুজন লোক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির মোকদ্দমা নিয়ে নবি ﷺ-এর কাছে এল। সম্পত্তিটি ছিল নিশ্চিহ্নপ্রায়।

---

[১৩৮] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৪-৫

[১৩৯] যাদুল মাআদ : ৫/৫

[১৪০] কাশফুয যুনূন : ১/১৩০

আবার তাদের দুজনের কারও কাছেই নিজেদের সপক্ষে কোনো প্রমাণও ছিল না। তখন নবি ﷺ বললেন,

> ‘আমি একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে তোমরা মোকদ্দমা নিয়ে আসো। হয়তো তোমাদের কেউ অপরজন থেকে প্রমাণ পেশের ব্যাপারে বেশি বাকপটু। তখন আমি যেমন শুনি তার ভিত্তিতেই ফয়সালা করে থাকি। কাজেই আমি যদি কারও জন্য তার ভাইয়ের হক সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দিই, তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা তার জন্য আমি যে অংশ নির্ধারণ করেছি তা তো কেবল এক টুকরা আগুন।’[১৪১]

নবি ﷺ-এর কথা শুনে লোক দুজন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘আমার ভাইয়ের জন্য আমার দাবি ছেড়ে দিচ্ছি।’ তখন নবিজি বললেন, ‘ঠিক আছে। যাও, ওই সম্পত্তি তোমরা নিজেরা ভাগাভাগি করে নাও।’ বর্ণনাকারী বলেছেন, তখন তারা দুজন আপসে ভাগ করে নিয়ে অপর ভাই যে অংশ ভোগ করছেন তা বৈধ করে দিলেন।

খ. ঋণের ক্ষেত্রে ফয়সালা

কাব ইবনু মালিক رضي الله عنه বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তিনি মসজিদের মধ্যে ইবনু আবি হাদরাদকে নিজের পাওনা পরিশোধের তাগাদা দিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে অবস্থান করছিলেন। একপর্যায়ে তাদের কথার আওয়াজ উঁচু হয়ে যাওয়ায় তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কানে পৌঁছে যায়। তখন তাদের সামনেই হুজরার পর্দা উঠিয়ে কাব ইবনু মালিককে তিনি ডাকলেন, ‘হে কাব!’ উত্তরে কাব رضي الله عنه বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির আছি।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন হাত দিয়ে ইশারা করে বলেন, ‘তোমার পাওনার অর্ধেক মাফ করে দাও।’ কাব رضي الله عنه সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি অর্ধেক মাফ করে দিলাম।’ এরপর ইবনু আবি হাদরাদ رضي الله عنه-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘যাও, অবশিষ্ট পাওনা শোধ করে দাও।’[১৪২]

ঋণ গ্রহণের পর দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ঋণী ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে নবি ﷺ বলতেন, ‘তোমরা যতটা পারো পরিশোধ করো। এর বেশি পরিশোধ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক নয়।’

দেউলিয়াকে তিনি আটকে রাখতেন না। বরং সচ্ছল হয়েও ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করে এমন ব্যক্তিকে তিনি ঋণ পরিশোধের আগ পর্যন্ত আটকে রাখতেন

---

[১৪১] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৬৭৪৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭১৩

[১৪২] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৩৫৯৫

এবং (প্রয়োজনে) প্রহার করতেন।[১৪৩]

❁ গ. ভূমি-সংক্রান্ত ফয়সালা

ওয়াইল ﷺ বলেন, হাদরামাউতের জনৈক ব্যক্তি কিনদার এক লোককে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়। হাদরামাউতবাসী লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি আমার পৈতৃক ভূমি জবরদখল করেছে।' তখন কিনদি লোকটি বলে উঠল, 'না, সেটা তো আমারই সম্পত্তি এবং আমারই দখলে আছে। আমি তাতে চাষাবাদ করে থাকি। এতে কারও কোনো অধিকার নেই।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন হাদরামাউতের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি কোনো সাক্ষী আছে?' সে না-বাচক উত্তর দিলে রাসূল ﷺ বললেন, 'তাহলে বিবাদী এ বিষয়ে কসম করবে।' হাদরামাউতের বাসিন্দা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! সে তো অসৎ লোক, কসম করার বিষয়ে তার কিছুর পরোয়া নেই। কোনো ব্যাপারে সে বাছবিচার করে না।' রাসূল ﷺ বললেন, 'এ ছাড়া তার থেকে তোমার গ্রহণের ভিন্ন কোনো উপায় নেই।'

এরপর কিনদি লোকটি কসম করতে উদ্যোগী হয়। সে ফিরে যাওয়ার পর রাসূল ﷺ বললেন,

> 'জেনে রেখো, ওই লোকটি যদি অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস করার জন্য কসম করে থাকে, তবে সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।'[১৪৪]

❁ ঘ. ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ফয়সালা

আবু হুরায়রা এবং যায়িদ ইবনু খালিদ জুহানি ﷺ বলেন, একজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমার ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করে দেবেন।' বেদুইনটির প্রতিপক্ষ ছিল তার চেয়েও অধিক বুদ্ধিমান। সে বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করুন, তবে (এর আগে) আমাকে (কথা বলার) অনুমতি প্রদান করুন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'বলো।'

লোকটি বলল, 'আমার এক ছেলে ওই ব্যক্তির বাড়িতে কর্মচারী ছিল। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। তখন আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আমার ছেলের ওপর রজম (পাথর নিক্ষেপ)-এর বিধান আরোপিত হবে। তখন

[১৪৩] আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ৬৪

[১৪৪] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১০৯

এর পরিবর্তে আমি একশটি ছাগল এবং একটি বাঁদি দিয়েছি। এরপর আমি এ ব্যাপারে আলিমদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, আমার ছেলেকে একশটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং এক বছরের জন্য তাকে নির্বাসন দেওয়া হবে। আর মহিলাটির শাস্তি হবে রজম।'

রাসূল ﷺ তখন বললেন, 'যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করে দিচ্ছি। বাঁদি এবং ছাগল ফেরত দেওয়া হবে। তোমার ছেলের ওপর একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছর নির্বাসনের হুকুম কার্যকর হবে।' (তারপর নবি ﷺ একজন সাহাবিকে লক্ষ্য করে বললেন,) 'হে উনাইস! (বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য) আগামীকাল সকালে তুমি ওই মহিলাটির কাছে যাবে। সে যদি তা স্বীকার করে নেয়, তবে তাকে রজম করবে।'

সাহাবিটি পরদিন সকালে মহিলাটির কাছে গেলেন। ব্যভিচারের বিষয়টি সে স্বীকার করল। রাসূল ﷺ তখন মহিলার প্রতি শরীয়তের হুকুম কার্যকরের নির্দেশ দিলেন। তাকে রজম করা হলো।[১৪৫]

বুরাইদা رضي الله عنه বলেন, একজন গামিদি মহিলা এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করে ফেলেছি। আপনি আমাকে পবিত্র করে দিন।' তখন নবি ﷺ তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

পরদিন ওই মহিলা আবার এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন? আপনি কি আমাকেও মায়িযের মতো ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন? আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তো গর্ভবতী হয়ে পড়েছি।' তখন নবি ﷺ বললেন, 'তবে (আপাতত) চলে যাও এবং সন্তান প্রসব হওয়া অবধি অপেক্ষা করো।'

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সন্তান প্রসব করার পর মহিলাটি সন্তানকে এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে নবি ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বললেন, 'এই সন্তান আমি প্রসব করেছি।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যাও, তাকে (সন্তানকে) দুধ পান করাও। দুধপান করানোর সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে এসো।'

এরপর যখন তার দুধপান করানোর সময় শেষ হলো, তখন মহিলাটি শিশু সন্তানকে নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। শিশুটির হাতে ছিল এক টুকরা রুটি। এরপর বললেন, 'হে আল্লাহর নবি! আমি তাকে দুধপান করানো শেষ করেছি। সে এখন খাদ্য খায়।'

নবি ﷺ তখন শিশুটিকে একজন মুসলিমের দায়িত্বে প্রদান করলেন। এরপর

[১৪৫] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৬৬৩৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৬৯৭

মহিলার ব্যাপারে (রজমের) আদেশ দিলেন। মহিলাটির বুক পর্যন্ত গর্ত খনন করানোর পর লোকদের নির্দেশ দিলে তারা রজম শুরু করল। ... নবি ﷺ বললেন, 'যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, জেনে রেখো! সে তো এমন তাওবা করেছে, যদি কোনো চাঁদাবাজ এমন তাওবা করত তবে তারও ক্ষমা হয়ে যেত।'

এরপর নবি ﷺ-এর নির্দেশে মহিলাটির জানাযার নামাজ পড়া হলো। নবি ﷺ-ও তার জানাযা পড়লেন। এরপর তাকে দাফন করা হলো।[১৪৬]

ঙ. স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষেত্রে ফয়সালা

আয়িশা رضي الله عنها সূত্রে বর্ণিত, হিন্দা رضي الله عنها নবি ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফইয়ান তো একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খরচ তিনি দেন না; তবে তার অজান্তে আমি (চাইলে) নিতে পারি।' তখন নবি ﷺ বললেন, 'তোমার এবং তোমার সন্তানের প্রয়োজন অনুসারে ন্যায়সংগত পরিমাণ তুমি নিতে পারবে।'[১৪৭]

ইবনুল কাইয়িম رحمه الله তার শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাহর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। 'নবি ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের কেউই স্ত্রীর মাহর-সংক্রান্ত অপরাধে স্বামীকে বন্দি করেননি। ... যখন থেকে স্ত্রীর বিলম্বিত পরিশোধের দাবিতে স্বামীকে আটকে রাখার প্রচলন শুরু হয়েছে, তখন থেকেই সব ধরনের ক্ষতি, বিশৃঙ্খলা-সহ নানান ঝামেলা দেখা দিচ্ছে।'[১৪৮]

চ. হত্যার ক্ষেত্রে ফয়সালা

আনাস رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত আছে, জনৈক ইহুদি একটি বাঁদির মাথা দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলে দিয়েছিল। তখন বাঁদিকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তোমার এ দশা কে করেছে? অমুক ব্যক্তি, অমুক ব্যক্তি?' অবশেষে ইহুদির নাম বলা হলে বাঁদিটি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ-সূচক ইশারা করল। ইহুদিকে তখন লোক পাঠিয়ে ধরে আনা হলো। সে কৃত অপরাধ স্বীকার করলে নবি ﷺ-এর নির্দেশে তার মাথা দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলে দেওয়া হলো।[১৪৯]

ছ. পানি সেচ দেওয়ার ক্ষেত্রে ফয়সালা

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ

---

[১৪৬] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৬৯৫

[১৪৭] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৫৩৬৪

[১৪৮] আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ৬৫

[১৪৯] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ২৪১৩; সুনানুদ দারিমি, হাদিস নং : ২৩৯৪

ﷺ-এর সামনে যুবাইর ؓ-এর সাথে মদীনার হাররা অঞ্চলের নালা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলো। এই নালার পানি দিয়ে তারা খেজুর বাগানে সেচ দিত। আনসারি বলল, 'পানি ছেড়ে দাও, তা প্রবাহিত হতে থাকুক।' যুবাইর ؓ তা মানলেন না। শেষে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিষয়টি পেশ করলে তিনি যুবাইরকে বললেন, 'হে যুবাইর! তুমি পানি ব্যবহার করে তোমার পড়শির জন্য ছেড়ে দিয়ো।' আনসারি লোকটি রেগে গিয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! যুবাইর আপনার ফুফাতো ভাই বলেই কি (এই ফয়সালা)!' এ কথা শুনে নবি ﷺ-এর চেহারার রং বদলে গেল। তিনি বললেন, 'যুবাইর! তুমি সেচ দাও। পানি আইল পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তা আটকে রাখবে।'[১৫০]

যুবাইর ؓ বলেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় এ ঘটনা সম্পর্কেই নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

> না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের বিচারক্ষমতা আপনার ওপর ন্যস্ত না করবে; তারপর আপনার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা না রেখে সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেবে।[১৫১]

নববি যুগের বিচারক

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন ইসলামের প্রথম বিচারক। বিচারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহি গ্রহণ করতেন। আল্লাহর বিধান বিবৃত করা, মানুষকে কল্যাণ আর হিদায়াতের দিকে আহ্বান এবং সত্য দ্বীনের দাওয়াত প্রদান ছিল তাঁর জিম্মাদারি। এ ছাড়াও শরীয়ত বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধান, আল্লাহর বিধানাবলি প্রয়োগ এবং আল্লাহর দ্বীন ও নির্দেশনা পালনের দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। সেইসাথে কিছুসংখ্যক সাহাবিকে তিনি প্রশাসক আর বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। যাদের মধ্যকার বিশেষ কয়েকজনের দায়িত্ব ছিল কলহ-বিবাদ নিরসন এবং মোকদ্দমার ফয়সালা করা। নববি যুগে এই মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন এমন কয়েকজন সাহাবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আমরা এখানে উল্লেখ করব।

---

[১৫০] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৩৫৭; সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৪৫৮৫
[১৫১] সূরা নিসা, ৪ : ৬৫

ﷺ আলি ইবনু আবি তালিব

তার উপনাম ছিল আবুল হাসান। তিনি একাধারে নবি ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং নবি দুহিতা ফাতিমা ﷺ-এর স্বামী। হিজরতের ২৩ বছর আগে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। নবিগৃহে তিনি লালিত পালিত হন। ছোটবেলায়ই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কনিষ্ঠদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। যেমন সাহসী বাহাদুর ছিলেন, তেমনি ছিলেন বাগ্মী বক্তা। তিনি ছিলেন একসাথে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির অন্যতম, উমর ﷺ-এর ওসিয়তকৃত ছয়জন উপদেষ্টার একজন এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের মধ্যে চতুর্থ। ১৭ রমজান ৪০ হিজরিতে তিনি বিশ্বাসঘাতকের হাতে গুপ্তহত্যার শিকার হন।

কুরআন, ফারায়েজ, শরীয়তের বিধানাবলি, ভাষা এবং কবিতায় তিনি পণ্ডিত ছিলেন। সাহাবাদের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনায় তার দক্ষতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। নবি ﷺ তাকে ইয়ামানের বিচারক হিসেবে ইয়ামানে প্রেরণ করার সময়কার কাহিনি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সাহাবিরাও তার বিচারকার্যের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।[১৫২]

আলি ﷺ কৃত ফয়সালাগুলো আলিমগণ সংকলন করেছেন। আমরা সেখান থেকে নববি যুগে কৃত কেবল একটি ফয়সালার কথা উল্লেখ করেই তার প্রসঙ্গের আপাত ইতি টানব। ঘটনাটি ছিল চারজন লোকের সিংহ শিকারের গর্তে পতিত হওয়া সম্পর্কে। ইয়ামানের লোকেরা সিংহ শিকারের জন্য ফাঁদ পেতেছিল। এই ফাঁদ তারা এভাবে তৈরি করত যে, গভীর গর্ত করে ঘাস আর লতাপাতা দিয়ে তা ঢেকে রাখা হতো। বনের পশু চলতে গিয়ে সেই গর্তে পড়ে যেত। একদিন একটি সিংহ তাদের পেতে রাখা ফাঁদে আটকা পড়ে। লোকেরা উৎসাহী হয়ে গর্তের কিনারে দাঁড়িয়ে সিংহ দেখছিল। ধাক্কাধাক্কিতে হঠাৎ এক ব্যক্তি গর্তে পড়ে গেল। সে পড়ে যাওয়ার সময় আরেক ব্যক্তিকে আঁকড়ে ধরে। ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তিও গর্তে পড়ে গেল। কিন্তু পতিত হওয়ার সময় সে তৃতীয় আরেক ব্যক্তিকে ধরে ফেলে। তৃতীয় ব্যক্তি পড়ে যাওয়ার সময় চতুর্থ আরেক ব্যক্তিকে ধরে ফেলে। এভাবে একে একে চারজন ব্যক্তি গর্তে পড়ে গিয়ে সেখানে থাকা সিংহের হাতে প্রাণ হারায়।

বিষয়টি নিয়ে নিহত হওয়া ব্যক্তির আপনজনেরা তাদের বিচারক আলি ﷺ-এর কাছে মোকদ্দমা দায়ের করল। তিনি ফয়সালা দিলেন, যারা গর্ত খনন করেছে তাদের থেকে রক্তপণ গ্রহণ করা হবে। তবে এর পদ্ধতি হবে স্বাভাবিক থেকে একটু ভিন্ন। প্রথম ব্যক্তির জন্য হবে দিয়তের এক-চতুর্থাংশ। কেননা সে গর্তে পড়ে মারা গেছে বটে, তবে অন্য তিনজনের মৃত্যুর কারণও সে। দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য হবে দিয়তের এক-তৃতীয়াংশ। কারণ তার কারণে দুজন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। তৃতীয়

[১৫২] আল-ইসাবাহ : ৪/২২৩; উসদুল গাবাহ : ৩/৫৮৪; আল-ইসতীআব : ৩/৬৯

ব্যক্তির কারণে একজনের মৃত্যু ঘটায় তার জন্য থাকবে অর্ধেক দিয়ত। আর চতুর্থ ব্যক্তি পূর্ণ দিয়ত পাবে। লোকেরা এই ফয়সালা মেনে নিতে অসম্মতি জানিয়ে পরের বছর নবি ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তারা পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিলো। সব শুনে আলি ؓ-এর ফয়সালা বহাল রেখে তিনি বললেন, 'সে তোমাদের মাঝে যে ফয়সালা করেছে, সেটাই ফয়সালা।'[১৫৩]

আবু মূসা আশআরি

তার প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ ইবনু কায়স। উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সিফফিন যুদ্ধের সময় আলি ؓ এবং মুআবিয়া ؓ-এর মধ্যকার অন্যতম সালিশ ছিলেন তিনি। হিজরতের ২১ বছর আগে ৬০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইয়ামানে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম প্রকাশিত হওয়ার পরপরই তিনি নিজ ভাইদের-সহ একটি দলের সাথে মক্কায় উপস্থিত হন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বদেশে ফিরে যান। নবি ﷺ তাকে ইয়ামানের জাবেদ, এডেন-সহ আরও কিছু অংশের লোকদের কুরআন শিক্ষা দান এবং সেখানকার বিচার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তিনি মদীনায় এসে শাম এবং ইরাক বিজয়াভিযানে অংশ নেন। উমর ؓ তাকে প্রথমে কুফার প্রশাসক এবং পরে বসরার প্রশাসক, শিক্ষক এবং বিচারক নিযুক্ত করেন। বিচারের নির্দেশনা-সংবলিত একটি পত্রও তাকে দিয়েছিলেন, যার বিবরণ আমরা সামনে উল্লেখ করব। হিজরি ২৩ সালে তার হাতে ইস্পাহান এবং আহওয়াজ বিজিত হয়। ৪৪ হিজরি মোতাবেক ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কুফাতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

রাসূল ﷺ প্রথমে আবু মূসা ؓ-কে ইয়ামানের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর মুআয ইবনু জাবাল ؓ-কে পাঠিয়েছেন। মুআয ؓ সেখানে পৌঁছলে আবু মূসা ؓ একটি গদি বিছিয়ে দিয়ে তাকে স্বাগত জানান। ঘটনাক্রমে আবু মূসা ؓ-এর সামনে তখন একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ লোক ছিল। মুআয ؓ জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটি কে?' আবু মূসা ؓ বললেন, 'সে প্রথমে ইহুদি থেকে মুসলিম হয়েছিল। এরপর আবার ইহুদি হয়ে গেছে।' আবু মূসা ؓ তখন মুআয ؓ-কে বসতে বললে তিনি বললেন, 'না, তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগে আমি বসব না। এটাই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ফয়সালা।' কথাটি তিনি তিন বার বললেন। এরপর লোকটির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।[১৫৪]

মুআয ইবনু জাবাল

তার উপনাম ছিল আবু আবদির রহমান। তিনি ছিলেন সাহাবিদের মাঝে

---

[১৫৩] যাদুল মাআদ : ৫/১৪; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ২/২০

[১৫৪] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৬৯২৩

হালাল-হারাম সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী। হিজরতের ২০ বছর আগে ৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। সহনশীলতা, লজ্জা এবং বদান্যতায় তিনি ছিলেন মদীনার যুবকদের সেরা। হিজরতের আগে আকাবার বাইয়াতে এবং পরে নবি ﷺ-এর সাথে সমস্ত যুদ্ধাভিযানে অংশ নিয়েছিলেন।

তাবুক যুদ্ধের পর নবি ﷺ তাকে ইয়ামানে শিক্ষক এবং বিচারক নিযুক্ত করে পাঠান। তার সাথে দেওয়া ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা পত্রে নবি ﷺ লিখেছিলেন, 'আমার পরিবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করলাম।' মুআয ﷺ সেখানে আবু বকর ﷺ-এর খিলাফতকালেও অবস্থান করেছিলেন। অবশেষে উমর ﷺ-এর খিলাফতের সময় তিনি সেখান থেকে ফিরে শামে জিহাদরত মুজাহিদদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। আবু উবায়দা ﷺ আমওয়াসের মহামারি তথা প্লেগে আক্রান্ত হলে মুআয ﷺ-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করলে উমর ﷺ-ও তাকে সে পদে বহাল রাখেন। সে বছরই ১৮ হিজরি মোতাবেক ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে জর্দানের সীমান্ত অঞ্চলে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৫৫]

তাকে ইয়ামানে প্রেরণের সময় নবি ﷺ-এর সাথে তার কথোপকথন সংবলিত হাদিস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন ইয়ামানের একাংশের প্রশাসক এবং বিচারক। সেখানে তিনি কয়েকটি বিচারকার্যও পরিচালনা করেন।

আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ ﷺ বলেছেন, মুআয ইবনু জাবাল ﷺ ইয়ামানে জনৈক মৃত ব্যক্তির এক বোন ও এক মেয়েকে তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি আধাআধি ভাগ করে দিয়েছিলেন। নবি ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই তিনি এ ফয়সালা করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তার সামনে ছিল মেয়ের সাথে বোনকে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার নীতি। আরেকবার 'ইসলাম বৃদ্ধি করে, হ্রাস করে না'—এই যুক্তিতে একজন মুসলিমকে তার ইহুদি ভাইয়ের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। এ ছাড়াও মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উমর ﷺ-এর খিলাফতকাল অবধি তিনি ইয়ামানের বিচারক ছিলেন।[১৫৬]

তিনি প্রতিদিন নিজ বৈঠকে বলতেন, 'আল্লাহ সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। যারা সন্দেহ পোষণ করে, তারা ধ্বংস হয়। আলিমদের বিভ্রান্তির ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কেননা শয়তান কখনো কখনো আলিমদের মুখ দিয়ে বিভ্রান্তিমূলক কথা বের করে থাকে। তাদের থেকে হক কথা শুনতে পেলে তা গ্রহণ কোরো। কেননা, হকের মধ্যে নূর নিহিত থাকে।'[১৫৭]

---

[১৫৫] আল-ইসাবাহ : ৬/১০৬; উসুদুল গাবাহ : ৫/১৯৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১/৪৪৩

[১৫৬] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ২৮৯৩; আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৯৯-১০০

[১৫৭] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/১১২

❁ আলা ইবনুল হাদরামি

তিনি মূলত হাদরামাউতের অধিবাসী ছিলেন। তার বাবা মক্কায় থাকার কারণে সেখানেই তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। তিনি যে-দুআ করতেন, সেটাই কবুল হতো। মাত্র কয়েকটি কথা বলে তিনি সাগরে নেমে পড়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম পারস্যের দ্বীপ জয় করেন এবং যুদ্ধের জন্য সর্বপ্রথম সাগর পাড়ি দেন।

৮ম হিজরিতে নবি ﷺ তাকে বাহরাইনের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। যাকাত সংগ্রহ করার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত থাকায় যাকাতের পদ্ধতি কী হবে, সে সংক্রান্ত একটি পত্রও তাকে দিয়েছিলেন। বাহরাইনের লোকদের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা, সেখানে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা এবং জুলুমের দমন করা ছিল আল-আলা ؓ-এর দায়িত্ব।

বনু আবদুল কায়সের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ফরমানে নবি ﷺ লিখেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের তরফ থেকে আল-আকবার ইবনু আবদিল কায়সের প্রতি।... আলা ইবনুল হাদরামি হচ্ছে বাহরাইনের জলে-স্থলে, নগরে, সৈন্যদের মধ্যে এবং সেখানকার উৎপাদিত ফসলের মাঝে আল্লাহর রাসূলের তরফ থেকে তত্ত্বাবধায়ক। বাহরাইনবাসীর দায়িত্ব হলো সব ধরনের অনিষ্ট হতে তাকে রক্ষা করা এবং জুলুমের মোকাবিলায় তার পাশে দাঁড়ানো। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করা হবে এবং জিহাদের সময় তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ করা হবে। এই নির্দেশের মাঝে কোনো রকম রদবদল করা হবে না।'[১৫৮]

অন্য বর্ণনায় আছে, উট, গরু, বকরি, ফল-ফসল এবং সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাতের হার কী হবে, আল-আলা ؓ-কে নবি ﷺ সেটা লিখে দিয়েছিলেন। আল-আলা ؓ সেটা মানুষকে শুনিয়ে তাদের থেকে যাকাত উসুল করতেন।[১৫৯] এ ছাড়াও তাকে বাহরাইনের বিচারক নিযুক্ত করার সময় যে পত্র দেওয়া হয়েছিল, সেটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক সাহাবি সে পত্রের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলেন।[১৬০]

নবি ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় আল-আলা ؓ বাহরাইনের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর আবু বকর এবং উমর ؓ-ও তাকে সে পদে বহাল রাখেন। পরবর্তীকালে উমর ؓ তাকে বসরায় প্রেরণ করলে তামীম এলাকার কাছাকাছি পৌঁছলে পথিমধ্যেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। কারও কারও মতে, বাহরাইনেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এটা ২১ হিজরি মোতাবেক ৬৪২ খ্রিস্টাব্দের কথা।[১৬১]

---

[১৫৮] তবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২৮৩

[১৫৯] তবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২৬৩

[১৬০] তবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২৭১

[১৬১] আল-ইসাবাহ : ৪/২৫৯; তাহযীবুল আসমা : ১/৩৪১; আল-আলাম : ৫/৪৫

۞ আত্তাব ইবনু উসাইদ

তার উপনাম আবু আবদির রহমান। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশীয়। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বিজয়ের পর নবি ﷺ মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাকে সেখানকার প্রশাসক ও বিচারক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। হিজরতের ১৩ বছর পূর্বে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ-এর পরে আবু বকর রা.-ও তাকে সে পদে বহাল রাখেন। আবু বকর রা. এবং তার ইন্তেকাল একই দিনে হয়েছিল। অন্য বর্ণনামতে, আবু বকর রা.-এর ইন্তেকালের সংবাদ যেদিন মক্কায় এসে পৌঁছে, সেদিনই তার ইন্তেকাল এবং দাফন হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

> আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী ক্ষমতা দান করুন।[১৬২]

এর আলোচনায় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেছেন, 'আত্তাব ইবনু উসাইদকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তখন জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের জয় হয়েছিল।'

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. বলেছেন, আত্তাব ইবনু উসাইদকে মক্কার প্রশাসক নিযুক্ত করার সময় নবি ﷺ তার ভাতা ৪০ উকিয়া[১৬৩] রুপা নির্ধারণ করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তার জন্য প্রতিদিন এক দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন। এটাই ছিল (ইসলামের ইতিহাসে) প্রথম সরকারি কর্মচারীর ভাতা।[১৬৪]

۞ আমর ইবনুল আস

মিশর বিজেতা হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ। ইতিহাসের অন্যতম মহান কুশলী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। হিজরতের ৫০ বছর আগে ৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলি জীবনে তিনি ছিলেন ঘোর ইসলামবিরোধী। ৭ম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের বছর হাবাশায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর মদীনায় এসে ইসলামের ঘোষণা দেন।

নবি ﷺ যাতুস সালাসিল অভিযানে তাকে সেনাপতি নির্ধারণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাকে ওমানের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে আবু বকর রা. তাকে শাম অভিমুখে জিহাদের সেনাপতি বানিয়ে প্রেরণ করেন। অবশেষে উমর রা.-এর খিলাফতকালে শাম বিজিত হয়। এ ছাড়াও তিনি কিনসিরিন জয় করেন এবং হালব, মানবিজ এবং আনতাকিয়ার অধিবাসীদের সাথে সন্ধি করেন।

---

[১৬২] সূরা ইসরা, ১৭ : ৮০

[১৬৩] ১ উকিয়া = ১০.৫ তোলা/১২২.৪৭২ গ্রাম

[১৬৪] আল-ইসাবাহ : ৪/২১১; তাহযীবুল আসমা : ১/৩১৮

উমর ﵁ তাকে ফিলিস্তিনের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে মিশরের দায়িত্ব দিলে তার হাতেই তা বিজিত হয়। উসমান ﵁-এর খিলাফতকালে চার বছর সেখানকার প্রশাসক ছিলেন। সিফফিন যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন অন্যতম সালিশ। ৩৮ হিজরিতে মুআবিয়া ﵁ তাকে পুনরায় মিশরের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। অবশেষে ৪৩ হিজরি মোতাবেক ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইহজগতের সফর সমাপ্ত করেন।

নবি ﷺ যে তাকে মদীনায় একটি মোকদ্দমা নিষ্পত্তির দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সে ঘটনা আমরা পেছনে উল্লেখ করেছি।

❁ হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান

তার বাবার প্রকৃত নাম ছিল হিসল ইবনু জাবির। তাদের আদি নিবাস ছিল ইয়ামানে। হুযাইফা ﵁ তার বাবার উপনামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার বাবা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর হুযাইফা ﵁ খন্দক-সহ পরবর্তী সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুনাফিকদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর গোপন কথা তার জানা ছিল। নিহাওয়ান্দ যুদ্ধে নুমান ইবনুল মুকরিনের শাহাদাতের পর তিনি পতাকা ধারণ করেন। উমর ﵁ তাকে মাদায়েনের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। এ দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ৩৬ হিজরি মোতাবেক ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তার ইন্তেকাল হয়।

ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার আশায় নবি ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে তিনি বেশি বেশি জানতে চাইতেন। মদীনায় সীমানা-সংক্রান্ত একটি কলহ নিরসনের জন্য নবি ﷺ তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঘটনাটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

সর্বশেষে আমরা এমন কিছু বর্ণনা উল্লেখ করছি, যা-তে নববি যুগে কোনো কোনো সাহাবির বিচারকার্য পরিচালনার আভাস পাওয়া যায়। তবে তা সাব্যস্ত করার মতো শক্তিশালী দলিল না পাওয়ায় আমরা কেবল সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকব।

(ক) উমর ইবনুল খাত্তাব: পূর্বে এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵁-এর বর্ণনা আমরা উল্লেখ করেছি। যা থেকে বুঝে আসে যে, উমর ﵁ নবিজির যুগেও বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন। আর আবু বকর ﵁-এর খিলাফতকালে তার বিচারকার্য পরিচালনার বিবরণ আমরা সামনে উল্লেখ করব।

(খ) দিহইয়াতুল কালবি: নবি ﷺ ইয়ামানের সীমান্তে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তাকে প্রেরণ করেছিলেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৬৫] তবে এই বর্ণনার শুদ্ধতা আমরা জানতে পারিনি। দিহইয়াতুল কালবি ছিলেন প্রবীণ সাহাবি। বদর যুদ্ধের পর সব যুদ্ধেই নবি ﷺ-এর সাথে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। রোমসম্রাট

[১৬৫] আল-কাদা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ৬৪

হিরাক্লের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রটি দিহইয়াতুল কালবি ؓ-কে দিয়ে রাসূল ﷺ বুসরার[১৬৬] শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে দিহইয়াতুল কালবি ؓ ছিলেন কিংবদন্তিতুল্য। জিবরীল ؑ-ও অনেক সময় তার আকৃতি ধারণ করে আগমন করতেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। দামিস্কের মিযযা অঞ্চলে বসবাস করতেন। ৪৫ হিজরি মোতাবেক ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৬৭]

(গ) যায়িদ ইবনু সাবিত : তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ওহিলেখক। তার উপনাম ছিল আবু সাঈদ। বিচারকার্য পরিচালনা, ফতোয়া প্রদান, কুরআনের পঠনপদ্ধতি এবং ফারায়েজের ব্যাপারে তিনি ছিলেন মদীনার শীর্ষস্থানীয় আলিম। আবু বকর ؓ-এর যুগে কুরআন সংকলন, আবার উসমান ؓ-এর যুগে তার কপি করেছেন এমন তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মাঝে তিনি ছিলেন অন্যতম। ৫৪ হিজরি মোতাবেক ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

দাউদ ইবনু আমির বলেন, 'এই উম্মতের বিচারক চারজন। তাঁরা হলেন উমর, আলি, যায়িদ এবং আবু মূসা আশআরি ؓ।'[১৬৮]

এ কথা থেকে যায়িদ ؓ-এর নববি যুগে বিচারকার্য পরিচালনা করার কথা বুঝে আসে। তবে তার সপক্ষে কোনো বর্ণনা আমি পাইনি। অবশ্য রাশিদিনের যুগে তিনি-যে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, তার সপক্ষে বর্ণনা আছে। পরবর্তীকালে যথাস্থানে তা উল্লেখ করা হবে।

(ঘ) আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ : তিনি ছিলেন প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তার উপনাম ছিল আবু আবদির রহমান। তিনি ছিলেন মক্কার বাসিন্দা। মক্কায় সর্বপ্রথম উঁচু আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করায় কাফিরদের নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। প্রথমে হাবাশায় পরে মদীনায় হিজরত করেন। নিবাসে-প্রবাসে সর্বত্রই তিনি ছিলেন নবি ﷺ-এর বিশ্বস্ত খাদেম। নবিজির জীবদ্দশায় সবগুলো অভিযানে শরিক ছিলেন, আবার তাঁর ইন্তেকালের পর শামের অভিযান ইয়ারমুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ছিলেন দুনিয়াবিরাগী, ফকিহ এবং প্রবীণ সাহাবিদের অন্যতম। কুরআন, ফিকহ এবং বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। মানুষকে দ্বীন শেখানোর জন্য উমর ؓ তাকে কুফাতে পাঠিয়েছিলেন। তার মাধ্যমেই সেখানে ফিকহের বিস্তার ঘটে। সেখানে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা এবং বাইতুল মালের

---

[১৬৬] বুসরার বর্তমান নাম হুরান। এখানেই কিশোর মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে পাদরি বাহীরার ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

[১৬৭] তাহযীবুল আসমা : ১/১৮৫; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৫৫০

[১৬৮] তাবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৩৫১

তত্ত্বাবধানও করতেন। উসমান ﷺ-এর খিলাফতকালে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। ৩২ হিজরি মোতাবেক ৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৬৯]

কোনো কোনো বইয়ে এসেছে যে, নববি যুগেই তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। অবশ্য সেটা প্রমাণিত নয়। সম্ভবত উমর ﷺ-এর যুগে তিনি মদীনা এবং কুফায় বিচারকার্য পরিচালনা এবং ফতোয়া প্রদান করতেন বলেই তাকে সাহাবি বিচারক বলে গণ্য করা হয়।

ইবনু সীরিন ﷺ সূত্রে বর্ণিত আছে, উমর ﷺ একবার আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'শুনলাম, আপনি নাকি বিচার-আচার করে থাকেন! যদিও আপনার সেরকম কোনো দায়িত্ব নেই।' আবদুল্লাহ ﷺ তখন হাঁ-বাচক উত্তর দিলে উমর ﷺ বললেন, 'বেশ তো; ক্ষমতার স্বাদ যখন উপভোগ করেছেন, এবার তাহলে তার তিক্ততাও ভোগ করুন।'[১৭০]

কাতাদা বলেছেন, 'সাহাবিদের মাঝে বিচারক ছিলেন ছয়জন—উমর, আলি, উবাই ইবনু কাব, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবু মূসা আশআরি এবং যায়িদ ইবনু সাবিত ﷺ।' এ কথাটা মাসরুক ﷺ বলেছেন এভাবে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছয়জন সাহাবি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন...।'[১৭১]

(ঙ) বিভিন্ন প্রশাসক : রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসক নিয়োগের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বিচারকার্য পরিচালনা এবং বিবাদের মীমাংসা করতেন। যদিও তাদের বিচারকার্য সম্পর্কে জানা যায় না।

(চ) রাশিদ ইবনু আবদিল্লাহ আস-সুলামি। কেউ কেউ তার নাম রাশিদ ইবনু হাফস বা রাশিদ ইবনু আবদি রব্বিহিও বলেছেন। তার উপনাম আবু আসিলা। পূর্বে তার নাম ছিল গাবি ইবনু জালিম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটা পালটে রাশিদ ইবনু আবদিল্লাহ রেখেছেন। তিনি ছিলেন সুলাইম গোত্রের সুওয়া নামক মূর্তির রক্ষী। একদিন দুটি শেয়াল মূর্তিটির ওপর প্রস্রাব করছে দেখে তিনি বললেন, এ আবার কেমন প্রতিপালক, যার মাথায় দুই-দুটো শেয়াল প্রস্রাব করছে! শেয়ালের প্রস্রাব মাথায় নিয়ে কেউ কি সম্মানিত হতে পারে?

এরপর মূর্তিটি গুঁড়িয়ে দিয়ে নবি ﷺ-এর কাছে হাজির হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তার সাথে মুসলিম হওয়া এক হাজার লোককে সাথে নিয়ে মক্কা বিজয়ের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কাবাতে থাকা মূর্তিগুলো পতিত হতে দেখে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে বলেছিলেন, 'রাশিদ হলো সুলাইম গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।' তার খাতিরেই তার গোত্রের সাথে

---

[১৬৯] আল-ইসাবাহ : ৪/১২৯; উসদুল গাবাহ : ৩/৩৮৪

[১৭০] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৫ ও ৮৩

[১৭১] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০৪-১০৫

রাসূল ﷺ চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। নবিজি তার জন্য একটি ফরমান লিখে দেন।

রাশিদ ইবনু আবদিল্লাহ رضي الله عنه-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলুম এবং মুসলিমদের মাঝে বিচার করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন বলে সীরাতের কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে।[১৭২]

নববি যুগের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

সমস্ত ইসলামি যুগের মাঝে নববি যুগে বিচারব্যবস্থার কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। এর মধ্যকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

☑ ১) নববি যুগের বিচারব্যবস্থা ইসলামের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সে যুগেই এর সূচনা হয়। বপণ করা হয় ইসলামি বিচারব্যবস্থার বীজ। সেই সময়টাকে বিচারব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর বলা চলে। তখনই এর গোড়াপত্তন হয়। যার ওপর দৃশ্যমান হয়েছে ইসলামি, মানবিক এবং জাগতিক ইতিহাসের সুউচ্চ ভবন। কিয়ামত অবধি যার উন্নয়ন, উত্তরণ ঘটতে থাকবে। কেননা রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা সত্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মাঝে তা প্রয়োগের জন্য তিনি ছিলেন আদিষ্ট। তাই তাঁর বিচারব্যবস্থা ছিল ন্যায়ের সুস্পষ্ট চিত্র এবং সর্বাধিক সুন্দর অবস্থা। কারণ সত্য আর ন্যায়কে স্থান আর কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না।

☑ ২) সে যুগে বিচারব্যবস্থা এবং সত্য আর ন্যায়ের সম্পর্ক ছিল আকাশের সাথে। সরাসরি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে। তাই তো বিধান-সংবলিত ওহি নাযিল হতো। সত্যের নির্দেশনা আসত। নির্ণয় করে দেওয়া হতো সরল এবং সঠিক পথ। ঊর্ধ্বজগৎ থেকে তা বাস্তবায়ন আর প্রয়োগের দেখভাল করা হতো। কোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে সংশোধন করা এবং সঠিক পন্থা বাতলে দিতে নেমে আসত ঐশীবার্তা। ওহির ধারার পরিসমাপ্তি ঘটার পর এমন আর হয় না। নবুওয়ত শেষ হয়ে যাওয়ায় সেসবের পুনরাবৃত্তি হবে—এমন স্বপ্নও কেউ দেখে না। ওহির মাধ্যমে কত যে গবেষণা এবং বিধানের স্বীকৃতি মিলেছিল!

☑ ৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন প্রথম বিচারক। বিচারব্যবস্থার একমাত্র দায়িত্বশীল। নির্বাচিত নবি, মনোনীত রাসূল আর নিষ্পাপ শরীয়তপ্রণেতা হওয়ায় আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেই বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। নবুওয়ত ধারণের লক্ষ্যে আল্লাহ তাঁকে নির্বাচন করেছিলেন। দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁকেই মনোনয়ন দিয়েছিলেন। ওহি এবং পাপমুক্তির মাধ্যমে তাঁকে জুগিয়েছিলেন শক্তি। আরও দিয়েছিলেন অনন্য বুদ্ধিমত্তা ও জীবনীশক্তি, চমৎকার দেহসৌষ্ঠব, চমৎকার

---

[১৭২] আল-ইসাবাহ : ২/১৮৫; উসুদুল গাবাহ : ২/১৮৭; তবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২৭৪ ও ৩০৭

আকৃতি, সুমহান চরিত্র, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং ক্ষুরধার মেধা। ফেরেশতারা তাঁকে পাহারা দিয়ে রাখত এবং তাঁর কদম সোজা করে দিত। তাই তো তাঁর বিচারব্যবস্থা প্রসিদ্ধ। সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ বিচারক তিনি। শীর্ষস্থানীয় বিচারকের আসনটি তাঁরই অধীনে।

☑ ৪) দ্বীনদারি, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, মেধা, অভিজ্ঞতা, শক্তি, উদ্যম এবং বিশ্বস্ততা দেখে নবি ﷺ সাহাবিদের মাঝে বিচার এবং প্রশাসন পরিচালনার উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাই করতেন। সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতার পাথেয় জোগান দিয়ে তাদেরকে দিক-নির্দেশনা আর উপদেশ প্রদান করতেন। আবার এমনও হয়েছে যে, ধার্মিক দুনিয়াবিমুখ হওয়া সত্ত্বেও আবু যার ؓ-এর আবেদন নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি তো দুর্বল।'[১৭৩] আবদুর রহমান ইবনু সামুরা ؓ-কে দায়িত্ব চেয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন।[১৭৪]

☑ ৫) বিচারক এবং প্রশাসকদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষ রাখতেন। তাদের রায় ও হুকুম নবিজির সামনে উত্থাপিত হতো। যেসব বিধান শরীয়ত আর দ্বীনের অনুকূলে থাকত, সেগুলো তিনি সমর্থন করতেন। আর শরীয়ত পরিপন্থি হলে শুধরে দিতেন।

☑ ৬) বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব হলো সার্বজনীন দায়িত্বের অংশবিশেষ। এ কারণেই রাসূল ﷺ আইনগত দায়িত্ব প্রদানের সাথে সাথে কার্যকরকরণ, বিচারিক তত্ত্বাবধান এবং অনুসন্ধানের দায়িত্বও প্রদান করতেন। তাঁর নিযুক্ত বেশির ভাগ বিচারকই সাধারণত বিচারকার্য যেমন পরিচালনা করতেন, তেমনি তা বাস্তবায়নের দায়িত্বও আঞ্জাম দিতেন। বিচারব্যবস্থার সাথে অন্যান্য দায়িত্বের পার্থক্য খুব কমই হতো। শুধুমাত্র কলহ নিরসন আর দাবি-দাওয়া নিষ্পত্তির কাজে নিয়োজিত আলাদা বিচারক বলতে গেলে ছিলই না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কুরআন মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন। রাষ্ট্র পরিচালনা এবং কলহ নিরসন আর মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ছিল তাঁরই দায়িত্ব। পাশাপাশি মানুষের মাঝে শরীয়তের বিধানও তিনি বাস্তবায়ন করতেন। আবার নিয়োগকৃত প্রশাসক এবং বিচারক সাহাবিদের রায় ও হুকুমের প্রতিও তাঁর নজর ছিল। এভাবেই তিনি এক হাতে রাষ্ট্রের সবকিছু সামলাতেন।

বিধান বাস্তবায়ন করা, নামাজ কায়েম, যাকাত ও সদাকা একত্রকরণ, মানুষকে দ্বীনি বিষয় বিশেষত কুরআন তিলাওয়াত এবং শরীয়তের বিধানাবলি শিক্ষা প্রদান ছিল তাঁর নিয়োগকৃত বেশির ভাগ বিচারকদের দায়িত্ব। মুআয ইবনু

---

[১৭৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৭৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৮২৫

[১৭৪] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৬৫২; সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৬৬২২ ও ৭১৪৭

জাবাল, আলি ইবনু আবি তালিব, আবু মূসা আশআরি এবং আল-আলা ইবনুল হাদরামি -কে নিয়োগদানের বিষয়টি লক্ষ করলে এটাই স্পষ্ট হয়।

☑ ৭) নববি যুগের বিচারব্যবস্থা সাধারণত ফতোয়া প্রদান কিংবা সালিশব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্য রাখত। মুসলিমরা সাধারণত বাস্তব বিরোধ অথবা প্রকৃত বিবাদের কথা না-বলে বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কী হবে—আল্লাহর রাসূল বা তাঁর নিয়োগকৃত বিচারকের কাছে সেটা জানতে চাইতেন। সে যুগে মোকদ্দমার সংখ্যা ছিল কম। রাসূল -এর কাছে বিধান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানিয়ে দিতেন। তখন তারা ফিরে গিয়ে সওয়াবের আশায় আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়নে লেগে যেতেন। বিরোধের বর্ণনা দেওয়ার সময় বাদী-বিবাদী উভয়ই স্বেচ্ছায় হাজির থাকতেন। শরীয়তের বিধান শোনার পর সেটা কার্যকর করতে তারা কোনো রকম বিলম্ব করতেন না।

☑ ৮) নববি যুগে বিচারব্যবস্থা ছিল সহজ। এজন্য বড় কোনো আয়োজন ছিল না। আবার মোকদ্দমাও কম আসত। কিন্তু তার উন্নতির জন্য সর্বজনীন নীতিমালা, মৌলিক ভিত্তি, সামগ্রিক মূলনীতি এবং সদুদ্দেশ্য ছিল বিধায় সময় এবং স্থানের চাহিদা অনুপাতে তাতে গবেষণা করার সুযোগ ছিল। ফলশ্রুতিতে নববি যুগের বিচারব্যবস্থা সমস্ত যুগের মুসলিমের জন্যই কুরআন কারীমের পর আইনের দ্বিতীয় উৎস হয়ে ওঠে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ মোকদ্দমা দায়েরের নিয়ম, বিচারের নীতিমালা, শুনানি প্রক্রিয়া, বিচারের রায় এবং কার্যকরের বিধানাবলি বাতলে দিয়েছেন। যাতে সর্ব যুগের সমস্ত স্থানের মানুষ এ ক্ষেত্রে দিশা লাভ করতে পারে।

☑ ৯) বিচারব্যবস্থা পরিচালনা এবং মোকদ্দমা দায়েরের নীতিমালার দিক থেকে নববি যুগের বিচারক পূর্ণ স্বাধীনতা রাখতেন। রায় প্রদান এবং গবেষণার ক্ষেত্রে কোনো রকম চাপ ছিল না। কুরআন-হাদিস মানার পর নিজের চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতাকে উন্মুক্তভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল। বিচারক এবং প্রশাসককে নিয়োগ দানের পর নবি তাকে ন্যায় নিশ্চিত করার জন্য ছেড়ে দিতেন। যেমন হুযাইফা -কে বলেছিলেন, 'যাও, তাদের মাঝে ফয়সালা করো।' আত্তাব ইবনু উসাইদ -কে বলেছিলেন, 'চলো, বাইতুল্লাহর পড়শিদের দায়িত্বে তোমাকে নিযুক্ত করছি।' তাঁর নির্দেশনা ছিল : প্রথমে কিতাবুল্লাহর, তারপর সুন্নাহর শরণাপন্ন হতে হবে। এরপর প্রয়োজন অনুপাতে গবেষণা করা যাবে।

☑ ১০) স্পষ্টবাদিতা ছিল নববি যুগের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। সব ধরনের অবকাশ প্রদান, আনুষ্ঠানিকতা এবং জটিলতা থেকে তা মুক্ত ছিল। দ্রুত মোকদ্দমার

নিষ্পত্তি করে চটজলদি তা বাস্তবায়নও করে ফেলা হতো। ফলে বিচারব্যবস্থার লক্ষ্যের বাস্তবায়ন যেমন ঘটত, তেমনি অধিকার রক্ষা, ইনসাফ কায়েম এবং জুলুম আর সীমালঙ্ঘন নির্মূলের মতো বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্যও পূরণ হতো।

☑ ১১) সে যুগে অভিযোগের তদন্ত এবং নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত ফয়সালা সাধারণ বিচারব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত ছিল। বিচারক সব ধরনের বিচার করার যোগ্যতা রাখতেন। সর্বজনীন আর পরিব্যাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারও বিচারকের ছিল।[১৭৫]

[১৭৫] আল-কাদা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ৯৯

০৬

রাশিদুন যুগে বিচারব্যবস্থা

নববি জামানার পর রাশিদুন যুগ ছিল ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। এ যুগে প্রকাশ্য বিজয়ের ধারা চলমান ছিল। আরব উপদ্বীপের বাইরে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছিল ইসলাম। এ যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইসলামের অধিকাংশ নিয়ম-শৃঙ্খলা। বেড়ে ওঠে ইসলামের ব্যবস্থাপনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পরিধি। আবার এ যুগে ন্যাক্কারজনক কিছু অভ্যন্তরীণ দুর্ঘটনাও ঘটে। যার সূচনা হয়েছিল কিছু গোত্র এবং ব্যক্তিবিশেষের ইসলাম ত্যাগের মাধ্যমে। ফলে মুসলিমদের মাঝে মুনাফিক এবং তাদের সমর্থকরা অনুপ্রবেশ করে। একপর্যায়ে খলিফায়ে রাশিদ উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁-কে শহীদ করে দেওয়া হয়। এরপর অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও বৃদ্ধি পায়। একসময় অবাধ্যদের হাতে মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ করেন উসমান ﵁। এ ঘটনার জের ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-উপদল গড়ে ওঠে। যার সমাপ্তি ঘটে আলি ﵁-এর শাহাদাতের মাধ্যমে। কিন্তু এতকিছুর পরও বিচারব্যবস্থা আগের মতোই সমুজ্জ্বল থাকে। ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাবলি ও ফিতনার প্রভাব তার ওপর পড়েনি। বরং স্বাভাবিকভাবেই তার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আমরা এটা নিয়েই আলোচনা করব।

রাশিদুন যুগের সময়কাল

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহজগৎ ছেড়ে পরম বন্ধুর সাথে মিলিত হলেন। সাহাবিরা সর্বসম্মতিক্রমে বাইয়াত গ্রহণ করলেন আবু বকর ﵁-এর হাতে। এর মাধ্যমেই রাশিদুন যুগের সূচনা হলো। এটা ১১ হিজরি মোতাবেক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের কথা। ৪০ হিজরি মোতাবেক ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে রাশিদুন যুগের সমাপ্তি ঘটে।

নববি জামানার পর রাশিদুন যুগ ছিল সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষের যুগ। এ যুগেই ইসলামের প্রসার, বিধিবিধান প্রয়োগ এবং আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত পালনের বিস্তার

ঘটে। ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ এবং কথা আর কাজের মিল রাখতে সঠিক আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিকশিত হয়।

দ্বীনদারিতা, ইলম এবং চারিত্রিক দিক থেকে চার খলিফার প্রত্যেকেই ছিলেন সমস্ত সাহাবির সেরা। দাওয়াহর দায়িত্ব আঞ্জাম, ইসলাম প্রচার এবং দ্বীনের বিবেচনায় তাঁরা ছিলেন অনন্য। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অনেক হাদিস পাওয়া যায়। তাঁদের যুগের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে সবকিছু এখানে উল্লেখ করার সুযোগ নেই বিধায় আমরা কেবল প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করব। এরপর তাঁদের যুগের বিচারিক দিকটি আলোচনা করব।

❁ ক. আবু বকর

তাঁর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ ইবনু উসমান। তিনি ছিলেন কুরাইশের শাখা তামিম গোত্রের লোক। তাঁর উপনাম আবু বকর এবং উপাধি ছিল সিদ্দিক আর আতিক। ইবনু আবি কুহাফা নামেও তিনি পরিচিত। পুরুষদের মাঝে তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। নবি ﷺ-এর কাছ থেকে যে দশজন সাহাবি একসাথে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম এবং প্রথম ছিলেন তিনি।

হস্তীবাহিনীর ঘটনার আড়াই বছর পর হিজরতের ৫১ বছর আগে ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বিভিন্ন গোত্রের বংশপরিচয় এবং আরবের নানান সংবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ধনী ছিলেন এবং ব্যবসা করতেন। জাহিলি যুগেও কখনো মদপান করেননি। নবি ﷺ নবুওয়ত লাভের আগ থেকেই তাঁর সাথে সুসম্পর্ক ছিল। মাক্কি জীবনে তিনি কখনোই নবিজি থেকে দূরে ছিলেন না। এমনকি হিজরতের সময়ও তাঁর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হননি। তাঁর সাথে সমস্ত যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণও করেছেন। দ্বীনের পথে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেছেন। এমনকি নিজের সর্বস্ব ব্যয় করেছেন আল্লাহর পথে। সাহাবিদের অনেকেই তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি যেমন বিশুদ্ধভাষী বক্তা ছিলেন, তেমনি ছিলেন সাহসী। দয়া, সহনশীলতা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অনন্য আর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

মৃত্যুশয্যায় নবি ﷺ তাঁকে নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর মুসলিমরা তাঁকে খলিফা হিসেবে মেনে নেন। তখন তিনি মুরতাদ এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আরব উপদ্বীপে ইসলাম প্রতিষ্ঠা, শাম আর ইরাক অভিমুখে বাহিনী প্রেরণ, উপযুক্ত সেনাপতি নির্বাচন, উপদেষ্টা পরিষদ বাছাইকরণ এবং কুরআন সংকলন ছিল তাঁর

অমর কীর্তি। জীবন সায়াহ্নে উমর ﵁-কে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করে তাঁকে উপদেশ এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।[১৭৬]

১৩ হিজরি মোতাবেক ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আবু বকর ﵁ মদীনায় ইন্তেকাল করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পাশেই তিনি সমাহিত হন।[১৭৭]

❁ খ. উমর ফারুক

উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ ছিলেন কুরাইশের শাখা গোত্র বনু আদির সদস্য। সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ফকিহ এবং একসাথে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির অন্যতম। তিনিই সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। দিওয়ান তথা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, হিজরি সনের প্রচলন এবং বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার পদ্ধতি তাঁর অমর কীর্তি। তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধির পর শাসনব্যবস্থার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা চালু করেছিলেন। তাঁরই নির্দেশে কুফা এবং বসরা নগরী গড়ে ওঠে। নবি ﷺ-এর যুগে বিচারকার্য পরিচালনা এবং আবু বকর ﵁-এর উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। সে আলোকে নিজ যুগের বিচারব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন।

মক্কায় উমর ﵁-এর জন্ম হয় হিজরতের ৪০ বছর আগে ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। জাহিলি যুগে তিনি কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন। তাদের মাঝে তিনি দূতালির কাজও করতেন। ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। অবশেষে নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছরে আল্লাহ তাঁকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দান করেন। তাঁর মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হয়। তিনি প্রকাশ্যে হিজরত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপনাম রেখেছিলেন আবু হাফস এবং উপাধি দিয়েছিলেন ফারুক। সমস্ত অভিযানেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর জ্ঞান, উপলব্ধি, দুনিয়াবিমুখতার ব্যাপারে সবাই একমত। মুসলিমদের সাথে নম্র আচরণ এবং তাদের প্রতি কল্যাণকামিতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। নিজের কাজ বারবার যাচাই-বাছাই করতেন। সত্যের পক্ষে তাঁর অবস্থান গ্রহণ নিয়ে কারও দ্বিমত নেই। এ ছাড়া আরও অনেক গুণের আধার ছিলেন তিনি।

---

[১৭৬] আবু বকর ﵁ তাঁর ওসিয়তনামাতে লিখিয়েছিলেন, 'এটা আবু কুহাফার পুত্র আবু বকরের ওসিয়তনামা, যখন সে দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতে প্রবেশ করতে চলেছে। বস্তুত এই সময়টা এতটাই কঠিন এক মুহূর্ত, যার কষ্ট ও ভয়াবহতায় কাফিরও মুমিন হতে চায়, পাপাচারী ব্যক্তি নেককার হতে চায় এবং মিথ্যাবাদী সত্য গ্রহণের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আমার পরে উমর ইবনুল খাত্তাবকে তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করছি। তার কথা তোমরা শোনো এবং মেনো। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল, তাঁদের মনোনীত দ্বীন ইসলাম, মুসলিম এবং মানবজাতির ব্যাপারে আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত ছিল, তা উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে ন্যস্ত করতে কমতি করিনি।' – তবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৯৯

[১৭৭] আল-ইসাবাহ : ৪/১০১; উসুদুল গাবাহ : ৩/৩০৯; তবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৬৯

১৩ হিজরি মোতাবেক ৬৩৪ হিজরিতে যেদিন আবু বকর ﵁-এর ইন্তেকাল হয়, সেদিনই তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুসলিমরা সবাই তাঁর হাতে বাইয়াত হন। আবু বকর ﵁-এর উপদেশ এবং পদ্ধতি অনুসারে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তাঁর যুগে আল্লাহ তাআলা অনেক নগরী মুসলিমদের অধীন করে দিয়েছিলেন। ইসলাম বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত প্রশাসক এবং বিচারকদের উদ্দেশ্যে পত্র লেখা, তাদের খোঁজখবর রাখা এবং যাচাই-বাছাই করা ছিল তাঁর অভ্যাস। হিজরি ২৩ সাল মোতাবেক ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর পরবর্তী খলিফা নিযুক্তির জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ডের কাছে তিনি দায়িত্ব অর্পণ করেন। সবুজ গম্বুজের নিচে প্রিয়তম রাসূল ﷺ-এর পাশেই তিনি সমাহিত আছেন। তাঁর মহান কীর্তিগুলো কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবে।

❁ গ. উসমান ইবনু আফফান

উসমান ইবনু আফফান ﵁-এর উপনাম ছিল আবু আমর। উপাধি ছিল যুন্নূরাইন। কুরাইশের শাখা গোত্র বনু উমাইয়ার সদস্য ছিলেন তিনি। পূর্বের খলিফা দুজনের মতো তিনিও ছিলেন একসাথে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ব্যক্তির অন্যতম।

হিজরতের ৪৭ বছর আগে ৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ধনাঢ্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সস্ত্রীক হাবাশায় দু'বার হিজরত করার পর অবশেষে মদীনায় গমন করেন। নবিজির কন্যা রুকাইয়া ﵂-এর ইন্তেকালের পর তাঁর বোন উম্মু কুলসুম ﵂-কে বিবাহ করেন তিনি। এজন্যই যুন্নূরাইন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

তিনি হাত খুলে দান করতেন। তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীকে নিজ খরচে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন উমর ﵁ কর্তৃক ওসিয়তকৃত ৬ সদস্যের উপদেষ্টা বোর্ডের অন্যতম সদস্য। ২৪ হিজরির প্রথম দিকে খলিফা মনোনীত হন। তাঁর যুগে অনেক দেশ বিজিত হয়। সংকলিত কুরআনের কপি থেকে আরও অনেক কপি তৈরি করে বিভিন্ন নগরীতে তা প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুন নববির সম্প্রসারণ সর্বপ্রথম তিনিই করেছিলেন। বিচারব্যবস্থা পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা তাঁর যুগেই চালু হয়। তিনি ছিলেন একজন বিদগ্ধ ফকিহ।

আত্মীয়স্বজনদের নিয়োগ প্রদান করা-সহ তাঁর কিছু কাজের বিপক্ষে লোকেরা সরব হয়ে ওঠে। ফিতনা দানা বাঁধতে শুরু করে। বিদ্রোহীরা মদীনা ঘিরে ফেলে। একসময় ঘরে ঢুকে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় তাঁকে শহীদ করে দেওয়া হয়।

এটা ৩৫ হিজরি মোতাবেক ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের কথা। এর পর থেকে ফিতনা আরও ছড়িয়ে যায়।[১৭৮]

ঘ. আলি ইবনু আবি তালিব

আমিরুল মুমিনীন আলি ইবনু আবি তালিব ছিলেন রাশিদুন যুগের চতুর্থ খলিফা। বীরত্ব এবং বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল বিশ্বজোড়া। নবিজির যুগে নিযুক্ত বিচারকদের আলোচনায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। খারিজিদের পরামর্শ অনুসারে হতভাগা আবদুর রহমান ইবনু মুলজিম এই মহান সাহাবিকে শহীদ করে দেয়। ফলে ৪০ হিজরি মোতাবেক ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিশ বছর ধরে চলা রাশিদুন যুগের সমাপ্তি ঘটে। সর্বজনীনভাবে ইসলামি ইতিহাসের এবং বিশেষভাবে বিচারব্যবস্থার ওপর এই যুগের প্রভাব অনস্বীকার্য।

রাশিদুন যুগের মহত্ত্ব

এতক্ষণ রাশিদুন যুগের বিশেষ মাহাত্ম্য এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের একাংশের প্রতি আমরা ইঙ্গিত করেছি। এবার আমরা এই যুগের বিচার-সংক্রান্ত দিকটি নিয়ে আলোচনা করব।

ইসলামের ইতিহাসে একটা বড় ফাটল প্রকাশিত হওয়ার সময় রাশিদুন যুগের সূচনা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের মাধ্যমে আসমান থেকে ওহির আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ ঘোষণার সময় ফাটলটি প্রকাশিত হয়। লোকদের মাঝে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা। কিন্তু দ্রুতই সব শান্ত হয়ে যায়। খলিফা আবু বকর -এর হাতে সবাই বাইয়াত গ্রহণ করে। নবুওয়ত ও রিসালাতের পরিসমাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। রাসূল ﷺ-এর ছেড়ে যাওয়া দ্বীন আঁকড়ে ধরে সে অনুযায়ী আমল করতে মনোযোগ দেয়।

রাশিদুন যুগের অবস্থান নববি যুগের সবচেয়ে কাছে ছিল। ফলে নবিজির যুগের আলোকচ্ছটায় তা উদ্ভাসিত ছিল। রাশিদুন যুগ হলো সর্বজনীন। পক্ষান্তরে বিচার বিভাগ বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থা ছিল নবি-যুগের বিচারব্যবস্থার সাহায্যে পরিচালিত। এক কথায় তা ছিল নববি যুগে প্রমাণিত বিচারব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রক্ষণাবেক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়ন এবং বক্তব্য ও মর্মের সমন্বয়সাধন।

তবে রাশিদুন যুগে আরব উপদ্বীপের বাইরে ইসলামের প্রসার ঘটে। অনেক বড় বড় দেশ বিজিত হয়। শাম এবং পারস্য রোমানদের পর মুসলিমদের দখলে আসে। ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে যায়। মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে

[১৭৮] আল-ইসাবাহ : ৪/২২৩; উসুদুল গাবাহ : ৩/৫৮৪; আল-ইসতীআব : ৩/৬৯

থাকে। বিজিত দেশগুলোর অবস্থা সামগ্রিকভাবে হিজাজ আর আরব উপদ্বীপের মতো যেমন ছিল না, তেমনি নতুন ইসলাম-গ্রহণকারীরাও ছিল আনসার, মুহাজির এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের থেকে ভিন্ন। তাই ঈমান এবং আমলের স্তরে ব্যবধান হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে রাশিদুন যুগ এসব পরিবর্তন আর নতুন নতুন অবস্থার মুখোমুখি হয়। নিত্যনতুন অবস্থা এবং দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং জান-মালের সুরক্ষার নিমিত্তে নিয়ম-কানুন এবং ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে। যাতে মুসলিমরা ইসলামের সুশীতল ছায়া থেকে সরে না গিয়ে এর ব্যাপক কল্যাণ উপভোগ করে। কার্যত এমনটাই হয়েছিল।

এজন্যই বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাশিদুন যুগের মাহাত্ম্য দুটি মৌলিক বিষয়ে পরিলক্ষিত হয়।

☑ প্রথমত : বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে নববি যুগের অধ্যাদেশ সংরক্ষণ, অনুসরণ, কার্যকর এবং তার বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা।

☑ দ্বিতীয়ত : বিস্তৃত ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করা ও নিত্যনতুন বিষয়াদি সামলাতে বিচার-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা নবায়ন করা।

রাশিদুন যুগের সময়কাল খুব দীর্ঘ ছিল না। আবার প্রত্যেক খলিফার যুগে বিচারব্যবস্থাপনার পরিবর্তনও তেমন একটা হয়নি। তাই রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থার চিত্র আমরা সামগ্রিকভাবে একবারে উল্লেখ করব।

আবু বকর এবং উসমান ﵄-এর সময় বিচার-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, রদবদল এবং নতুন বিষয়াদি নিতান্তই কম এবং সীমিত আকারে ছিল। উমর ﵁-এর সময় এই ব্যবস্থার পরিধি বৃদ্ধি পায়। আলি ﵁-এর সময় বিভিন্ন দিক প্রকাশ পায়। এ বিষয়টি আমরা শীঘ্রই সামনে আলোচনা করব। তবে সেটা হবে নববি যুগ এবং রাশিদুন যুগের স্তর থেকে প্রতিশ্রুত মৌলিক চিত্রের প্রতি ইঙ্গিত মাত্র।

বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

বিচারের উন্নত অবস্থানকে গুরুত্বের সাথে রক্ষা করার ব্যাপারে রাশিদুন যুগ বিশেষভাবে যত্নবান ছিল। এ যুগেই বিচারের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়। কেবল ইসলামি বিচারব্যবস্থার ভূমিকা এবং অবদানেই বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্যে শরীয়তের বাস্তবায়ন ঘটেছিল। মূলত এটা সম্ভব হয়েছিল নববি যুগের ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে। তবে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ এবং নতুন নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থায় যেসব পরিবর্তন এসেছিল, তার কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

❁ খলিফাগণের বিচারিক দায়িত্ব গ্রহণ

বিচারের দায়িত্ব ছিল খলিফাদের জন্য অবশ্যপালনীয় বিধান। কেননা ইসলামি শরীয়তের বাস্তবায়ন এবং বিচার সংশ্লিষ্ট দ্বীন-দুনিয়া-সহ মানব জীবনের প্রতিটি অঙ্গনেই বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ পবিত্র দায়িত্ব আর মহান কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই কেবল তা আদায় করা সম্ভব। খলিফার কর্তব্য ছিল নিজে এ দায়িত্ব পালন করা কিংবা অন্যকে নিজের প্রতিনিধি বানানো।

মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে বিচারকার্য পরিচালনা করাও ছিল খলিফাদের দায়িত্ব। তাই ন্যায়বিচার এবং সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁরা বিচারক নিয়োগ দিতেন। সামনে এর বিবরণ আসছে। আবার ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন সময় বিচার পরিচালনা করাও ছিল খলিফাদের গুরুদায়িত্ব। কিন্তু নানান কারণে কেবল রাজধানীতেই বিভিন্ন স্তরের বিচারকার্য পরিচালনা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল।

আবু বকর ﷺ-এর শাসনামলে মানুষ তাঁর কাছে খুব অল্পই মোকদ্দমা নিয়ে আসত। তাঁর কাছে আসা মোকদ্দমাগুলোর মাঝে ছিল—দাদির উত্তরাধিকার, বাবা কর্তৃক সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন এবং অন্যের হাতে কামড় বসাতে গিয়ে দাঁত ভেঙে গেছে এমন ব্যক্তির মোকদ্দমা।

আবু বকর ﷺ বিভিন্ন শহরে নিযুক্ত বিচারকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন।[১৭৯] আর মদীনার তাবৎ বিচারের দায়িত্ব তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ-কে দিয়েছিলেন। ওয়াকি বলেছেন, 'আবু বকর ﷺ খলিফা হওয়ার পর উমর ﷺ-কে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। আর আবু উবায়দা ﷺ-কে প্রদান করেন কোষাগার দেখাশোনার দায়িত্ব। কিন্তু এক বছরে কেউ উমর ﷺ-এর কাছে বিচার নিয়ে আসেনি।'[১৮০] তখন আবু বকর ﷺ আবার বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেননা বিচারকার্য পরিচালনা মূলত খলিফারই দায়িত্ব। কিন্তু আবু বকর ﷺ রাষ্ট্র পরিচালনা-সহ অন্যান্য বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে পূর্ণ মনোযোগ দিতে চাচ্ছিলেন। যেমন মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা, রোমান আর পারসিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সৈন্য প্রেরণ এবং ইসলামের দাওয়াহ সম্প্রসারণ করা। এ বিষয়টি ওয়াকি আরও সুস্পষ্ট করে বলেছেন, 'আবু বকর ﷺ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর উমর এবং আবু উবায়দা ﷺ-কে বলেছিলেন, "আমার তো সহায়ক প্রয়োজন।" তখন উমর ﷺ বললেন, "বিচারের কাজে আমি আপনার সহযোগিতা করব।" আবু উবায়দা ﷺ বললেন, "অর্থনৈতিক কাজে আমি আপনাকে সহযোগিতা করব।"'[১৮১]

এরপর উমর ﷺ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনিই মদীনার বিচারের

---

[১৭৯] আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ১২৮; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/৮৭

[১৮০] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০৪; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১১

[১৮১] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০৪

দায়িত্ব দেখাশোনা করতেন। এ ছাড়া ছোট ছোট বিষয়াদি-সহ অন্যান্য সবকিছুর দায়িত্ব বিভিন্ন সাহাবির কাছে অর্পণ করেছিলেন। বিচারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তিনিই দেখতেন। রাষ্ট্রীয় বিচারের যাবতীয় দিক যে তিনি নিজেই পরিচালনা করতেন, সেটা আমরা সামনে আলোচনা করব। পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলের বিচারকদের বিচারও তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন।

উসমানও পূর্ববর্তী খলিফা উমরের বিচারপদ্ধতিই বহাল রেখেছিলেন। মদীনার প্রধান বিচারকার্য তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব তিনি বিচারকদের দিয়ে রেখেছিলেন। সমস্ত প্রশাসক, বিচারক এবং সেনাপতির সাথে তাঁর নিয়মিত পত্রালাপের বিষয়টি সামনে উল্লেখ করা হবে। গুরুতর হত্যা মামলা এবং নেশা করার বিচার ছিল মদীনায় উসমান ﷺ পরিচালিত অন্যতম বিচারকার্য। আলি ইবনু আবি তালিব, যায়িদ ইবনু সাবিত এবং ইয়াজিদ ইবনু উখতিন নামির ﷺ বিচারকার্য পরিচালনায় আমিরুল মুমিনীন উসমান ﷺ-কে সার্বিক সহযোগিতা করতেন।[১৮২] খলিফার কাছে কোনো মোকদ্দমা আসলে তিনি ওপর্যুক্ত তিনজনের পাশাপাশি অপরাপর সাহাবিদেরও ডেকে পাঠাতেন।[১৮৩]

বিচারের ক্ষেত্রে আলি ﷺ ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক দক্ষ এবং অভিজ্ঞ। নববি যুগ থেকে রাশিদুন যুগ—সবসময় বিচারের ক্ষেত্রে সবাই তাঁর দ্বারস্থ হতো। তাঁর খিলাফতকালেও তিনিই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। সব ধরনের বিবাদ নিরসন আর তাবৎ মোকদ্দমার ফয়সালা ছিল তাঁর দায়িত্বে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রদেশে এবং শহরে নিযুক্ত বিচারকদেরও পর্যবেক্ষণ করতেন। বিচারের নির্দেশনা সংবলিত প্রসিদ্ধ পত্রাবলির মতো সম্পদ, বংশ, কিসাস এবং দণ্ডবিধির ক্ষেত্রেও তাঁর অনেক ফয়সালা রয়েছে।[১৮৪]

❁ বিচারক নিয়োগ প্রদান

খুলাফায়ে রাশিদুন শুধু যে মদীনা আর ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানীতেই বিচার পরিচালনা করেছেন, তা-ই নয়। বরং মদীনা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতেও তাঁরা বিচারক নিযুক্ত করতেন। আমরা এখন বিচারক নিয়োগের চার ধরনের দৃষ্টান্ত লক্ষ করব।

ক) ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানীতে বিচারক নিয়োগ প্রদান। আবু বকর ﷺ মদীনার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য উমর ﷺ-কে নিয়োগ দিয়েছিলেন। উমর ﷺ খলিফা হওয়ার পর ইয়াজিদ ইবনু উখতিন নামির ﷺ-কে বলেছিলেন, 'ছোটখাটো

[১৮২] আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ২১৯
[১৮৩] তারীখুল কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৪৬
[১৮৪] আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ২৪৫

কিছু বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য কোরো।'[১৮৫] আবার আবুদ দারদা ؓ-কেও মদীনার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। উমর ؓ সফরে গেলে অধিকাংশ সময়ই যায়িদ ইবনু সাবিত ؓ-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যেতেন।[১৮৬]

নাফে ؓ সূত্রে বর্ণিত আছে, 'যায়িদ ইবনু সাবিত ؓ-কে উমর ؓ বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এ কাজের বিনিময়ে তাঁর জন্য ভাতাও নির্ধারিত ছিল।'[১৮৭]

ফিকহবিদ সাহাবিগণ ফতোয়া প্রদান করতেন। বিধিবিধান বর্ণনা, সালিশি, মতবিরোধ নিরসন-সহ নানান কাজে লোকেরা তাঁদের শরণাপন্ন হতো।

শাবি ؒ আবু হুরায়রা ؓ-কে বলতে শুনেছেন, নবি ﷺ বলেছেন, 'বিচারব্যবস্থা আছে আনসারগণের মাঝে।'[১৮৮]

একবার উমর এবং উবাই ؓ-এর মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিলে তাঁরা উভয়ই যায়িদ ইবনু সাবিত ؓ-কে সালিশ মেনে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন।[১৮৯]

প্রথম খলিফাত্রয়ের দীর্ঘ সময়কালে মদীনায় আলি ؓ-এর বিচারের সংখ্যা অনেক এবং সেসব প্রসিদ্ধও বটে। বিচারকদের নিয়োগ দানের বিষয়টি এভাবেই চলে আসছিল। অবশেষে খিলাফতের রাজধানী কুফাতে স্থানান্তরিত হয়। সাহাবিরা তখনো একইভাবে মদীনাতে ফতোয়া, সালিশি এবং বিরোধ নিরসন করতেন। আর কুফাতে বিচারকার্য পরিচালনা ছিল শুরাইহের দায়িত্ব। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ তখন মদীনায় আলি ؓ-এর প্রতিনিধি ছিলেন।[১৯০]

খ) প্রাদেশিক শাসককে একইসাথে প্রশাসন এবং বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা। এটাই ছিল দীর্ঘ রাশিদুন যুগের সামগ্রিক চিত্র। তখন সাধারণত এ পদ্ধতিই চলত। এই প্রশাসকদের কেউ কেউ তো নববি যুগ থেকেই তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীকালে আবু বকর-ও তাদেরকে স্বপদে বহাল রাখেন। উমর, উসমান এবং আলি ؓ-এর যুগেও অনেকে সে পদেই বহাল ছিলেন। যেমন ইয়ামানের জাবেদ এলাকার প্রশাসক আবু মূসা আশআরি, জানাদ অঞ্চলের প্রশাসক মুআয ইবনু জাবাল, মক্কার প্রশাসক আত্তাব ইবনু উসাইদ, বাহরাইনের প্রশাসক আল-আলা ইবনুল হাদরামি এবং সানআর প্রশাসক উসমান ইবনু আবিল

---

[১৮৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০৪-১০৫। উমর ؓ নিজের খিলাফতকালে আলি ؓ-কে কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে বিচার-বিষয়ক সর্বাধিক দক্ষ এবং অভিজ্ঞ। — আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১২ এবং আবকারিয়্যাতুল ইসলাম, পৃ. ৪৩৯ দ্রষ্টব্য।

[১৮৬] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০৮

[১৮৭] প্রাগুক্ত

[১৮৮] মুসনাদে আহমাদ : ৮৭৪৬; সুনানুত তিরমিযি : ৩৯৩৬

[১৮৯] প্রাগুক্ত

[১৯০] রওযাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৮

আস ﷺ। খলিফারা অন্যান্য শহরেও আরও কিছু প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। যারা প্রশাসনের পাশাপাশি বিচারকার্যও পরিচালনা করতেন।[১৯১] খলিফাগণ কর্তৃক নিযুক্ত বিচারকের ক্ষেত্রে এমনটা আমরা লক্ষ করেছি। সাধারণত খলিফাদের প্রত্যেকেই পূর্ব থেকে নিয়োজিত প্রশাসক এবং বিচারকদের বহাল রাখতেন।

গ) কেবল বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ প্রদান: শিক্ষাদান, রাষ্ট্রীয় কোষাগার দেখাশোনা, সদাকা সংগ্রহ ইত্যাদি কাজের মতো কেবল বিচারের জন্যও নিয়োগ দানের প্রচলন ছিল। তবে তারা প্রশাসকদের অধীনস্থ ছিলেন না। এ ধরনের বিচারক কেবল উমর, উসমান এবং আলি ﷺ-দের যুগেই ছিলেন। আবু বকর ﷺ কর্তৃক বিভিন্ন শহরে বিচারক নিযুক্ত করার বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। আমরা পরে এসব বিচারকদের নাম আলোচনা করব।

ঘ) খুলাফায়ে রাশিদুন কখনো কখনো বিভিন্ন শহরে নিযুক্ত প্রশাসকদেরও বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব দিতেন। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় তারা সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নির্বাচন করতে সচেষ্ট হতেন। এই ধারাবাহিকতায় মুআয ইবনু জাবাল এবং আবু উবায়দা ﷺ-কে শামে প্রেরণের সময় উমর ﷺ তাঁদেরকে পত্র মারফত নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'আপনাদের পূর্ববর্তীদের মতো সৎ এবং উপযুক্ত ব্যক্তি দেখে বিচারের কাজে নিয়োগ প্রদান করুন।'[১৯২]

বিচারক নির্বাচনের নির্দেশনা দিয়ে আবু মূসা আশআরি ﷺ-কে উমর ﷺ লিখেছিলেন, 'সচ্ছল এবং অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিকেই কেবল বিচারক নিযুক্ত করবেন। কেননা সচ্ছল ব্যক্তি অপরের সম্পদের প্রতি লোভ করে না। আর অভিজাত বংশীয় ব্যক্তি নিজের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।'[১৯৩]

খলিফা অনেক সময় নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য প্রশাসক বরাবর নির্দেশনা পাঠাতেন। যেমন মিশরের সর্বপ্রথম মুসলিম বিচারক কায়স ইবনু আবিল আস ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়ে গেলে মিশরের তৎকালীন প্রশাসক আমর ইবনুল আস ﷺ আমিরুল মুমিনীন উমর ﷺ-কে পত্র মারফত বিষয়টি অবহিত করলেন। খলিফা উত্তরে আমর ইবনুল আস ﷺ-কে নির্দেশ প্রদান করেন, তিনি যেন কাব ইবনু ইয়াসার ﷺ-কে বিচারক নিয়োগ দেন।[১৯৪]

খলিফারা প্রশাসক ও বিচারকদের সূক্ষ্মভাবে বাছাই করতেন এবং তাদের বিচারের যোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করতেন। তাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ ও দিকনির্দেশনাপূর্ণ চিঠি প্রদান করতেন। এজন্যই শুরাইহের মাঝে অন্তর্দৃষ্টি, বিচারকার্য পরিচালনার

---

[১৯১] আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ১২৩, ১৪৯, ২১৪, ২১৪, ২৩৯

[১৯২] আল-মুগনি: ১০/৩৪

[১৯৩] আখবারুল কুদ্বাহ: ১/৭৬-৭৭

[১৯৪] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩০২-৩০৩; হুসনুল মুহাদ্বারাহ: ২/১৩৫; আখবারুল কুদ্বাহ: ৩/২২০

সূক্ষ্ম দক্ষতা, বিভিন্ন বিষয় অনুধাবনের যোগ্যতা এবং মামলা-মোকদ্দমা বিশ্লেষণ করার মতো তীক্ষ্ণ ধীশক্তি আছে দেখে উমর ﷺ তাকে কুফার বিচারক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন।[১৯৫]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ-এর যোগ্যতা, অনুধাবনের শক্তি, বুজুর্গি, দুনিয়াবিমুখতা এবং তাকওয়ার কথা উসমান ﷺ-এর ভালোমতোই জানা ছিল। তাই আবদুল্লাহ ﷺ-কে তিনি বলেছিলেন, 'যাও, মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করো।' কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ সবিনয়ে অব্যাহতি কামনা করলে খলিফা বললেন, 'বিচারের দায়িত্ব নিতে তোমার বাধা কিসের! তোমার বাবাও তো বিচার করতেন।'[১৯৬]

উমর, উসমান-সহ অন্যান্য অনেক সাহাবি সব ধরনের বিচার, বিভিন্ন ঘটনা-প্রবাহ এবং জটিল সমস্যার সমাধানে আলি ﷺ-এর শরণাপন্ন হতেন। বিচার-সহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সাথে তাঁরা পরামর্শ করতেন।[১৯৭]

খলিফাগণ দুর্বল, পাপাচারী এবং মন্দ লোকদের বিচারক পদে নিয়োগ দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন। উমর ﷺ বলতেন, 'জেনেশুনে কোনো পাপাচারীকে যে ব্যক্তি নিয়োগ দেয়, সে নিজেও তার মতো পাপাচারী।' তিনি আরও বলতেন, 'পাপাচারীকে কেবল আরেকজন পাপাচারীই নিয়োগ দিতে পারে।' আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ বলতেন, 'প্রতারককে কেবল প্রতারকই দায়িত্ব প্রদান করতে পারে।'[১৯৮]

উমর ﷺ তো এ-ও বলতেন, 'কেউ যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কাউকে নেতা কিংবা বিচারক নিযুক্ত করে, তাহলে সেই নিয়োগপ্রাপ্ত নেতা বা বিচারক যে গুনাহ করবে—নিয়োগদাতারও সেই অংশ বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মুসলিমদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে নেতা বা বিচারক নিয়োগ দেবে, সে নিযুক্ত ব্যক্তির সওয়াবের ভাগীদার হবে। তবে নিযুক্ত ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করলে সে ওই গুনাহের ভাগীদার হবে না।'[১৯৯]

আলি ﷺ তাঁর নিযুক্ত প্রশাসক মালিক আশতারকে এক চিঠিতে দীর্ঘ নসিহত করেছিলেন। তাতে লিখেছিলেন,

> 'তোমার কর্মকর্তাদের যাবতীয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব তোমার। তাদের চরিত্র এবং যোগ্যতা ভালোমতো যাচাই করার পর তাদের নিযুক্ত করবে। কোনো ধরনের পক্ষপাত করে বা কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের নিয়োগ

---

[১৯৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/১৮৯, ১৯৮; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ৯৫
[১৯৬] সুনানুত তিরমিযি : ১৩২২
[১৯৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৫, ৮৮, ৯০
[১৯৮] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৬৯
[১৯৯] আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৬

দিয়ো না। অভিজাত বংশীয়, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, লজ্জাশীল, নেককার এবং প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী পরিবারের লোকদের মধ্য থেকে নিয়োগ দিয়ো। কারণ এসব লোক বেশি সদাচারী হয়। তাদের আখলাক প্রশংসনীয়। তারা সাধারণত লোভী হয় না। কাজের পরিণতি সম্পর্কে তারা সচেতন থাকে। এরপর তাদেরকে পরিপূর্ণ বেতন দিয়ো।'[২০০]

❁ স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ

নববি যুগের বিচারব্যবস্থা সাধারণত শাসনব্যবস্থার সাথেই যুক্ত থাকত। আবু বকর ﵁-এর যুগে এবং উমর ﵁-এর প্রাথমিক যুগেও ব্যবস্থাপনা এমনই ছিল। রাসূল ﷺ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব একসাথেই পালন করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশাসকরাও প্রশাসনের দায়িত্ব এবং বিচারের দায়িত্ব একই সঙ্গে পালন করতেন। বিচারব্যবস্থার এই পদ্ধতি আবু বকর ﵁-এর যুগে, তারপর উমর ﵁-এর খিলাফতের প্রথম দিকে এভাবেই চলমান ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশাসন এবং বিচার বিভাগের মাঝে কোনো ব্যবধান দেখা যেত না। কিন্তু রাশিদুন যুগের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, ইসলামি রাষ্ট্রের আধুনিকায়ন, ইসলামি খিলাফত, এবং মুসলিমদের অধীনে আসা বড় বড় প্রদেশের প্রশাসনিক কার্যক্রমে যে ব্যাপক উন্নয়ন আর বিস্তার ঘটেছিল, তার পেছনে একমাত্র অনুঘটক ছিল বিচক্ষণ খলিফা উমর ﵁-এর ব্যাপক চিন্তাধারা আর সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ। তিনিই জনস্বার্থের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সমস্ত বিষয় সুসংহত এবং সংগঠিত করেছিলেন। এমন যুগোপযোগী বানিয়েছিলেন—যার মাধ্যমে শরীয়ত, দ্বীন, ইসলামি দাওয়াহর প্রসার ঘটে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

উমর ﵁ ঠিক করলেন, প্রথমে রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ পৃথক করে দেবেন এবং প্রতিটি কাজে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করবেন। কারণ পররাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয়, ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্গত সব প্রদেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হতো। তাই সমস্ত প্রশাসনিক বিভাগের জন্য তিনি পৃথকীকরণ নির্দেশ জারি করলেন। ফলত প্রশাসনিক সব বিভাগ আলাদা হয়ে গেল। তখন প্রতিটি বিভাগ পরিচালনার জন্য তিনি স্বতন্ত্র লোক নিয়োগ প্রদান করলেন। এভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করল স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ। প্রায় সব শহর এবং অনুগত সব রাষ্ট্রে পৃথক পৃথক বিভাগ তৈরি করা হলো। এ ছাড়াও বিচারক এবং প্রশাসকের কার্যক্রম পৃথকীকরণের নির্দেশ জারি করলেন তিনি। ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানীর মতো বড় বড় শহরেও বিচারক নিযুক্ত করলেন। আবুদ দারদা ﵁-কে নিয়োগ দিলেন মদীনায়, শুরাইহ ইবনুল হারিসকে কুফায়,

[২০০] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৯

আবু মূসা আশআরি ؓ-কে বসরায়, কায়স ইবনু আবিল আস ؓ-কে মিশরে, উবাদা ইবনুস সামিত ؓ-কে ফিলিস্তিন এবং শামের বিচার বিভাগে।[২০১]

উমর ؓ-এর নীতি ছিল—কিছুসংখ্যক সাহাবিকে নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং নির্দিষ্ট শহরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা। তাদের একজনকে বিচারকার্য পরিচালনা এবং বিবাদ নিরসনের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতেন। এ ধারাবাহিকতায় তিনি কুফায় আম্মার ইবনু ইয়াসির, উসমান ইবনু হুনাইফ এবং আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদকে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের কাজও তিনি ভাগ করে দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ؓ-এর দায়িত্ব ছিল বিচারকার্য পরিচালনা এবং তালিম প্রদান করা।

মোটকথা, উমর ؓ-ই সর্বপ্রথম সমস্ত প্রদেশে স্বতন্ত্র বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন। দায়িত্বশীল এবং প্রশাসকদের থেকে তাদের স্বতন্ত্র দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিজের অধীনেই রেখে দেন। তাই দেখা যায়, বিচারকদের সাথে তাঁর পত্র মারফত যোগাযোগ রক্ষা হতো। অন্যদের কাছে তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেন। প্রশাসকদেরও বলতেন, তারাও যেন তাঁর সাথে নিয়মিত পত্র প্রেরণ করে এবং বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে পরামর্শ করে। কোনো প্রশাসক যেন বিচারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ না করে—এমন নির্দেশনাও তিনি দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু খালদুন ؒ লিখেছেন, 'উমর-ই সর্বপ্রথম অপরকে বিচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মদীনায় বিচারের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন বিশিষ্ট সাহাবি আবুদ দারদাকে। কায়স ইবনু আবিল আসকে মিশরের বিচারপতির দায়িত্ব এবং আমর ইবনুল আসকে সেখানকার প্রশাসকের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।'[২০২]

পৃথক বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ অভিনব বিষয় হওয়ায় রাষ্ট্র এবং প্রশাসকদের কাছে এর ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক মতানৈক্য হয়েছিল। কোনো কোনো দেশে বিচারক এবং প্রশাসকদের দায়িত্ব নিয়ে কলহ অবধি গড়ায়। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আমিরুল মুমিনীন উমর ؓ-এর কাছে উত্থাপিত হলে তিনি খুব জোরালোভাবে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণের নির্দেশ প্রদান করেন। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, 'বিচারকরা পরিপূর্ণ স্বাধীন; তারা প্রশাসনের অনুগত নয়।'

বেশ কিছু জায়গায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল শামের প্রশাসক মুআবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান ؓ এবং ফিলিস্তিনের বিচারক উবাদা ইবনুস সামিত ؓ-এর মধ্যকার মতবিরোধের ঘটনা। আওযায়ি ؒ বলেছেন, উবাদা ইবনুস সামিত ؓ ছিলেন ফিলিস্তিনের প্রথম বিচারক। তিনি একটি বিচারের

[২০১] আল-কাযা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৯; আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/১৩৪; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/৮

[২০২] ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২২০

ফয়সালা কার্যকর করলে মুআবিয়া ﵁ সেটার বিরোধিতা করলেন। একপর্যায়ে তাঁর কথা কিছুটা কঠিন হয়ে যায়। তখন উবাদা ﵁ বললেন, 'আপনার সাথে এক জমিনে আমি আর কখনোই বসবাস করব না।' এই বলে তিনি মদীনায় চলে গেলেন। উমর ﵁ তাঁর চলে আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি সব খুলে বললেন। সব শুনে উমর ﵁ বললেন, 'ফিরে যান। যে ভূমিতে আপনি বা আপনার মতো মানুষ নেই, সেই ভূমি আল্লাহ তাআলার পছন্দ নয়।' আর মুআবিয়া ﵁-এর উদ্দেশ্যে তিনি পত্র লিখলেন : 'উবাদার ওপর আপনার কোনো কর্তৃত্ব নেই।'[২০৩]

এই ঘটনা থেকে উমর ﵁ কর্তৃক প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রশাসক মুআবিয়া ﵁ থেকে বিচারক উবাদা ﵁-এর কার্যক্রম পৃথক করে, খলিফার সাথে বিচারকের সরাসরি সম্পর্ক এবং নির্বিঘ্ন যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ফলে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রে অঙ্কুরিত হয়েছে স্বাধীন বিচারব্যবস্থার বীজ।

কিন্তু এ স্বাতন্ত্র্য কোনো দিক থেকেই পরিপূর্ণ ছিল না। তাতে কোনো ধরনের সর্বজনীনতাও ছিল না। কারণ বিচার বিভাগ সাধারণত বিরোধ, অর্থবিধি, শারীরিক মোকদ্দমা এবং বিবেচনামূলক শাস্তির নিষ্পত্তিতেই পরিচালিত হতো। অনেক সময় খলিফা এবং প্রশাসকরা দণ্ডবিধি এবং অপরাধ-সংক্রান্ত বিচার নিয়েই মশগুল থাকতেন। এই বিষয়গুলি স্বাধীন বিচারকদের কাজের অন্তর্ভুক্ত থাকত না। হলেও কেবল আংশিকভাবে কিংবা ধাপে ধাপে হতো। কিংবা একেবারেই মন্থর গতিতে চলত। আবার স্বাধীন বিচারকের নিয়োগ-যে সব দেশে ব্যাপকভাবে চালু ছিল, তা-ও নয়। আসলে উমর ﵁ মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন। কোনো কোনো দেশে কিছু প্রশাসকের ব্যাপারে প্রয়োজন এবং জনস্বার্থ অনুযায়ী তা প্রয়োগ করছিলেন।

বিচার বিভাগের চূড়ান্ত পৃথকীকরণ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি বিষয়টি এভাবেই চলছিল। অবশেষে বনু উমাইয়া এবং আব্বাসি যুগে প্রশাসক, শাসক এবং দায়িত্বশীলদের কর্তৃত্ব থেকে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। এটি নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আসলে রাশিদুন যুগে স্বতন্ত্র বিচার বিভাগের বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। কিছু বিচারক তখন প্রশাসন থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন বটে। কিন্তু বেশির ভাগ প্রশাসকই অনেক শহর এবং অঞ্চলে প্রয়োজন এবং কল্যাণ অনুপাতে নির্ধারিত শারঈ আইনকানুন মেনে বিচারকার্য এবং নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালনা করে আসছিলেন। তাদের সব কার্যক্রমই জনস্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল।[২০৪]

---

[২০৩] সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮; আল-ইসতীআব ফী মারিফাতিল আসহাব : ২/৪১২

[২০৪] আল-কাদা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ১৭১

দুর্নীতির বিচার এবং তদন্ত বিভাগ

প্রশাসক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ জনসাধারণের প্রতি জুলুম বা অবিচার করলে, কিংবা আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে, অথবা জনস্বার্থ বাস্তবায়ন থেকে সরে গেলে তাদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা এবং বিচারের আওতায় আনা ছিল 'কাদাউল মাযালিম' এর লক্ষ্য। আর 'কাদাউল হিসবাহ' এর লক্ষ্য ছিল আল্লাহর শরীয়ত এবং দ্বীন বাস্তবায়নের জন্য সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা। যাতে ইসলামের বিধিবিধান আর নীতিমালা বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা করা যায়। ইতিপূর্বে আমরা ইঙ্গিত করেছি, দুর্নীতির বিচার এবং তদন্ত বিভাগের সূচনা নববি যুগেই ঘটেছিল।

রাশিদুন যুগে দুর্নীতির বিচার এবং তদন্ত বিভাগের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব বা কাঠামো ছিল না। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, এ বিভাগ দুটির কাজ তখন বন্ধ ছিল, কিংবা এর লক্ষ্য নিয়ে কারও মনে কোনো চিন্তা ছিল না। আসলে তা বাস্তবায়নে কারও উদাসীনতা ছিল না। এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে সকলের মনোযোগ ছিল একান্ত কেন্দ্রীভূত। এ কাজকে আরও বেগবান করার চিন্তা সকলেরই ছিল।

পূর্বে যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, নববি যুগেই এর বীজ বপন করা হয়েছে। তারপর এর চারা উদ্গত হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। তা বিস্তার লাভ করেছে রাশিদুন যুগের দীর্ঘ সময়ে। অবশ্য স্বতন্ত্র এ বিভাগ না থাকা সত্ত্বেও এর মূল লক্ষ্য ঠিকই বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক আর সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং মানুষের মাঝে থাকা উন্নত আধ্যাত্মিক দীক্ষা ছিল স্বতন্ত্র বিভাগ না থাকার অন্যতম কারণ। এজন্য দুর্নীতি দমন, তদন্ত-সহ বিভিন্ন অভিযোগের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার যথাযথ কারণ বা উপসর্গ ছিল না। সে যুগের অধিকাংশ মানুষ নিজের দায়িত্ব আর কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকত। তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে তা পালন করত। নিজের অধিকার এবং অধিকারের সীমারেখা তাদের অজানা ছিল না। সে অনুপাতে তারা সীমাবদ্ধ থাকত। সামান্য পরিমাণও সীমালঙ্ঘন তারা করত না।

এটা ছিল তৎকালীন সমাজের সামগ্রিক চিত্র।[২০৫] সামান্য অসংগতি, ব্যত্যয় অথবা কোনো ধরনের পদস্খলন দেখা দিলেই ওত পেতে থাকা খিলাফতের উচ্চ আদালত আর প্রশাসনের মুখোমুখি হওয়া লাগত। যার মাঝে অবাধ্যতা, হঠকারিতা, সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনা থাকত, যে ব্যক্তি অবিচার বা ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে, কিংবা আল্লাহ তাআলার বাতলানো সরল পথ আর সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রবণতা আছে—এমন ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হতো।

[২০৫] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২৩

এ বিষয়টির লক্ষ্য, মাধ্যম এবং উদ্দেশ্য যে খুলাফায়ে রাশিদুনের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল, তা ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা এবং বিচারের কাহিনি থেকে পরিষ্কার হয়।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আবু বকর ﵁-এর সর্বপ্রথম ভাষণ ছিল দুর্নীতির বিচার, অন্যায় প্রতিরোধ, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম সংক্রান্ত। আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনার পর তিনি বলেছিলেন,

> 'হে লোকসকল! আমাকে আপনাদের দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে। যদিও আপনাদের তুলনায় আমি উত্তম নই। আমি ভালো কাজ করলে আপনারা তবেই আমাকে সহযোগিতা করবেন। আর বিপথে চললে আমাকে সংশোধন করে দেবেন। সত্য আমানত, আর মিথ্যা হচ্ছে খিয়ানত। আল্লাহ চাহেন তো আপনাদের দুর্বল ব্যক্তিটি আমার কাছে সবল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না তার ন্যায্য অধিকার তার কাছে ফিরিয়ে দেবো। ইনশাআল্লাহ, আপনাদের শক্তিশালী ব্যক্তিটি আমার কাছে দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না তার থেকে আমি অন্যের ন্যায্য অধিকার আদায় করব। ... আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করব, ততক্ষণ আমার আনুগত্য করবেন। যখন আমাকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নাফরমানি করতে দেখবেন, তখন আমার আনুগত্য করা আপনাদের জন্য আবশ্যক নয়।'[২০৬]

আবু বকর ﵁ বিভিন্ন শহরে নিযুক্ত প্রশাসকদের এবং যুদ্ধে বিজয়ী সেনাপতিদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতেন। আপামর জনগণের সাথে তাদের আচরণ কেমন সে খবর যেমন রাখতেন, তেমনি সাধারণ মুসলিমদের খোঁজখবরও নিতেন। সৎ কাজ প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় থেকে বাধা প্রদান ছিল তাঁর প্রধান কাজ। তাঁর যুগে সবচেয়ে বড় অন্যায় ছিল রিদ্দাহ তথা ধর্মদ্রোহিতা, যা শুরু হয়েছিল রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর। তিনি শক্ত হাতে এর প্রতিরোধ করেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই কাজ বাস্তবায়ন করিয়েছেন।

খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণের পর দুর্নীতি দমন এবং তদন্ত সংক্রান্ত বিচারের ক্ষেত্রে উমর ﵁ তাঁর পূর্বসূরি আবু বকর ﵁-এর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। দায়িত্ব গ্রহণের সময় তাঁর বক্তব্য ছিল আবু বকর ﵁-এর মতোই। তিনি বলেছিলেন,

> 'তোমাদের মাঝে কেউ যত দুর্বলই হোক না কেন, আমি অবশ্যই তার কাছে তার প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেবো। আবার তোমাদের মধ্যকার যে যত বেশি

---

[২০৬] সীরাতু ইবনি হিশাম, ৪/৬৬১; তবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৮২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৬/৩০১; তারীখুল খুলাফা লিস সুয়ূতি, পৃ. ৬৯; শারহু নাহজিল বালাগাহ : ১৭/১৫৯

> শক্তিশালীই হোক না কেন, আমি তার থেকে অপরের ন্যায্য অধিকার আদায় করব।'[২০৭]

উদ্বোধনী ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা এবং দুআ করার পর তিনি বলেছিলেন,

> 'আমার কাছে বা আমার অনুপস্থিতিতে অন্যদের কাছে তোমাদের বিষয় আসবে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, কেউ ভালো আচরণ করলে আমিও তার সাথে ভালো আচরণ করব। আর কেউ অপরাধ করলে আমি অবশ্যই তাকে সাজা দেবো। আমাদের উপস্থিতিতে যা হবে, তার ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করব। আর আমাদের অনুপস্থিতিতে যা হবে, তার দায়িত্ব থাকবে বিশ্বস্ত এবং শক্তিশালী লোকদের কাছে। সুতরাং যারা ভালো কাজ করবে, তাদের সুযোগ-সুবিধা আমরা বাড়িয়ে দেবো। বিপরীতে অপরাধীদের জন্য থাকবে শাস্তির পরোয়ানা।'

বিচার-সংক্রান্ত পরিকল্পনার ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন,

> 'জেনে রেখো, আমার কঠোরতাকে আমি আপাতত নম্রতা বানিয়ে রেখেছি। কিন্তু এ কথা ভুলে যেয়ো না যে, সেই কঠোরতা মুসলিমদের ওপর জুলুম ও নিপীড়নকারীদের ওপর আপতিত হবে। পক্ষান্তরে শান্তিপ্রিয়, অনুগত, দ্বীনদার এবং সদিচ্ছাবান ব্যক্তিদের প্রতি আমি তাদের নিজেদের পরস্পরের অপেক্ষা অধিক কোমল। কারও প্রতি জুলুম-নিপীড়নের সুযোগ আমি দেবো না। জালিমের এক গাল মাটিতে ঠেকিয়ে অপর গাল হাঁটু দিয়ে চেপে ধরব, যতক্ষণ না সে অন্যের অধিকার স্বীকার করে নেয়। এত কঠোরতার পরও সংযমী এবং যোগ্য লোকদের জন্য আমি থাকব কোমলপ্রাণ।
>
> তোমরা জিহাদের মিশনে দূরে গেলে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমিই তোমাদের পরিবারের দেখাশোনা করব। সুতরাং আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। নিজেদের বিপক্ষে গিয়ে হলেও আমাকে সহযোগিতা করবে। আমার বিরুদ্ধে তোমাদের নফসকে কোনো ধরনের সুযোগ দিয়ো না। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য কোরো, যদিও সেটা আমার বিপক্ষে হয়। আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন, সে ব্যাপারে আমার প্রতি কল্যাণকামিতায় কমতি কোরো না।'[২০৮]

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের দিন প্রদত্ত ভাষণে উমর ﷺ বলেছিলেন,

> 'হে লোকসকল! তোমাদের কেউ যতই দুর্বল হোক না কেন, তার পক্ষ হয়ে তার

---

[২০৭] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২৩; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ, ১/১৭০

[২০৮] আখবারু উমার, পৃ. ৬২-৬৪

অধিকার আমি আদায় করবই। আবার তোমাদের কেউ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তার থেকে অপরের ন্যায্য অধিকার আমি ছিনিয়ে নেবোই।'[২০৯]

আবু মূসা আশআরি ﷺ-কে উমর ﷺ দুর্নীতি এবং অন্যায় সংক্রান্ত বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন, 'শাসকের ব্যাপারে মানুষের অনেক ঘৃণা রয়েছে। আপনি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করুন। দিনের কিছু সময় হলেও সাধারণ মানুষের অভিযোগ শোনার জন্য বসবেন।'[২১০]

উমর ﷺ নিজ খিলাফতের সুদীর্ঘ সময়ে দুর্নীতি এবং তদন্ত বিভাগীয় বিচারের মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। তিনিই পরিচালনা করতেন দুর্নীতির বিচার এবং তদন্ত। বাজার তদারকি, দ্রব্যমূল্য যাচাই, প্রতারণার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, মানুষের অধিকার হরণে বাধা প্রদান—সব তিনিই করতেন।

উমর ﷺ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁর নিযুক্ত সমস্ত প্রশাসকের কাজকর্মের পর্যালোচনা করতেন। তাদের কাছে জবাবদিহি চাইতেন। তাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের দুর্নীতি বা অপরাধ সংঘটিত হলে সাজা দিতেন। জুলুমের অভিযোগ পেলে বিচার করতেন। প্রতি বছর হজের মৌসুমে সমস্ত প্রশাসকদের ডেকে পাঠাতেন। তাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ থাকলে শুনতেন। তাদের বদলা নিতেন। এটার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা। বছরের মাঝখানে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ আসলে তাদের ডাকিয়ে এনে মজলুমদের ইনসাফপূর্ণ বিচার করে দিতেন।[২১১] এ ক্ষেত্রে তিনি কোথা কী অবস্থায় আছেন, সেটা মূল বিবেচ্য ছিল না। ইতিহাসের পাতায় আজও অমর হয়ে থাকা একটি ঘটনা আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

মিশরের তৎকালীন প্রশাসক বিখ্যাত সাহাবি আমর ইবনুল আস ﷺ-এর ছেলের সাথে জনৈক কিবতির মনোমালিন্য হয়। একপর্যায়ে আমর ﷺ-এর ছেলে সেই কিবতিকে অন্যায়ভাবে আঘাত করে। কিবতি মদীনায় এসে উমর ﷺ-এর কাছে অভিযোগ জানায়। খলিফা তখন আমর ইবনুল আস ﷺ এবং তাঁর ছেলেকে ডাকিয়ে এনে কিবতিকে বদলা নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। খলিফা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, ছেলের এ জুলুম করার দুঃসাহসের একমাত্র কারণ ছিল বাবার ক্ষমতা। এজন্য আমর ইবনুল আস ﷺ-কে ভর্ৎসনা করে উমর ﷺ যা বলেছিলেন তার উল্লেখ ইতিহাসের পাতায় আজও লিখিত আছে। তিনি বলেছিলেন, 'কখন থেকে তোমরা মানুষদেরকে দাস বানাতে শুরু করলে, অথচ তাদের মায়েরা

---

[২০৯] ইবনু আবিল হাদীদ, শারহু নাহজিল বালাগাহ : ১২/৯

[২১০] শারহু নাহজিল বালাগাহ : ১২/১২

[২১১] আল-কাদা ফিল ইসলাম, পৃ. ১০১; আখবারু উমার, পৃ. ১৪৯

তাদেরকে স্বাধীন হিসেবে জন্ম দিয়েছে?'[২১২]

কর্মচারীরা হজের মৌসুমে মানুষের সামনে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে জনগণের ওপর জুলুম থেকে বিরত থাকত। মানুষের মাঝে ন্যায় আর ইনসাফ কায়েমে ত্রুটি করত না।[২১৩]

উমর ﷺ যে একা একাই এ ধরনের অভিযোগের বিচার করতেন তা নয়; বরং বিখ্যাত তাবিয়ি আবু ইদরিস খাওলানি ﷺ-কেও তিনি এ কাজে নিয়োগ দিয়েছিলেন। দুর্নীতি-সংক্রান্ত বিচারের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত ছিল।[২১৪]

মানুষের মাঝে দুর্নীতি-সংক্রান্ত বিচারের ঘোষণা দিয়ে উমর ﷺ বলেছিলেন,

> 'হে লোকসকল! আল্লাহর কসম, তোমাদের কাছে তো আমার প্রশাসকদেরকে তোমাদের শরীরে আঘাত করে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য পাঠাইনি। বরং এজন্য পাঠিয়েছি, যাতে তারা তোমাদের দ্বীন শেখায় এবং জীবন-যাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। তারা যেন তোমাদের মাঝে যথাযথ বিচার এবং ন্যায়সংগত ফয়সালা করে। যে এর অন্যথা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার কাছে তোমরা নালিশ জানাবে। যে সত্তার হাতে উমরের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি অবশ্যই তার বদলা নেবো। (অর্থাৎ মজলুমের পক্ষ হয়ে জালিমকে শাস্তি দেবো)।'[২১৫]

উমর ﷺ আরও বলতেন, 'আমার কোনো প্রশাসক যদি কারও প্রতি জুলুম করে, এরপর সে অভিযোগের বিচার আমার কাছে আসার পরও আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত না লাগে—তাহলে এর অর্থ হলো আমি নিজেই জুলুম করলাম।'[২১৬]

এরপর উমর ﷺ নিজের খিলাফতের শেষ দিকে দুর্নীতি এবং অভিযোগের বিচারের ক্ষেত্রে কঠিন এক ধাপ অতিক্রম করেছেন। এ কাজে তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার ঘোষণা দেন। কারণ তাঁর ভয় ছিল, মজলুম আর নিপীড়িত মানুষের প্রয়োজন হয়তো তাঁর পর্যন্ত পৌঁছবে না। আপামর সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই তিনি বলেন, 'যদি বেঁচে থাকি তাহলে ইনশাআল্লাহ এক বছর যাবৎ সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের খোঁজখবর নেবো। আমি জানি, মানুষের অনেক প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেগুলো আমার কাছে পৌঁছে না। না প্রশাসকরা আমার কাছে সেসব

[২১২] আখবারু উমার, পৃ. ১৫৬ ও ২২৫

[২১৩] আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১০১

[২১৪] তারীখুল কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ২৫; ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২২২

[২১৫] আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১০১; আখবারু উমার, পৃ. ২৩৮ ও ২৫৮; শারহু নাহজিল বালাগাহ : ১২/২২, ৩৩

[২১৬] শারহু নাহজিল বালাগাহ : ১২/২২

পেশ করে, আর না সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজন নিয়ে আমার কাছে আসতে পারে। অতএব আমি শামে সফর করে সেখানে দুই মাস অবস্থান করব। তারপর বাহরাইনে যাব। সেখানে থাকব দুই মাস। এরপর যাব কুফায়। সেখানেও দুই মাস থাকব। ... আল্লাহর কসম! এটা হবে চমৎকার একটি সময়।'[২১৭]

সরকারি ও প্রশাসনিক উচ্চতর কর্মকর্তাদের তুলনায় আপামর জনসাধারণের সাথে খলিফা উমর ﷺ অধিক ইনসাফের পরিচয় দিতেন। মজলুম ফাজারির ঘটনা এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। ফাজারিকে থাপ্পড় দিয়েছিল জাবালা ইবনুল আইহাম। বেচারা ফাজারি তখন খলিফার কাছে অভিযোগ দায়ের করলে তিনি জাবালা থেকে কিসাস বা বদলা নেওয়ার ফয়সালা দেন।[২১৮]

উমর ﷺ-এর চরিত্র-মাধুরী এমন ছিল যে, কারও সাথে ভুলবশত অসৌজন্যমূলক আচরণ করে ফেললে সাথে সাথে ওই ব্যক্তির কাছে বদলা নেওয়ার আবেদন জানাতেন। নিজের হাতে থাকা চাবুক সে লোকের হাতে দিয়ে বলতেন, 'হে অমুক! আমার কাছ থেকে তুমি বদলা নিয়ে নাও।'[২১৯]

নিজের ছেলের ওপরও দণ্ড প্রয়োগে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। ছেলের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অপরাপর সাধারণ মানুষের মতোই।[২২০]

দুর্নীতির বিচারের ইতিহাসে উমরের চরিত্র আজও আলোকজ্জ্বল। হাসান বসরি ﷺ থেকে আবু ইউসুফ ﷺ বর্ণনা করেছেন, এক লোক উমর ﷺ-কে বলল, 'উমর!

---

[২১৭] তারীখুত তবারি, ৩/২৭১; শারহু নাহজিল বালাগাহ : ১২/৬১

[২১৮] ১৬ হিজরিতে পারস্য বিজয়ের পর ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমান সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী জাবালা ইবনুল আইহাম ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসে। আমিরুল মুমিনীন উমর h তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন। জাবালা মুসলিম হলেও তার স্বভাবে কোনো পরিবর্তন আসেনি। একবার সে হজ করার জন্য মক্কায় গমন করে। সেখানে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার সময় তার ইহরামের কাপড় জনৈক ব্যক্তির পায়ে লেগে খুলে যায়। জাবালা তখন রাগান্বিত হয়ে লোকটিকে এত জোরে থাপ্পড় মারে যে, তার নাকের হাড় ভেঙে যায়। সে তখন খলিফার কাছে নালিশ করলে তিনি জাবালাকে তলব করেন। ঘটনার সত্যতা জানতে চাইলে জাবালা সব স্বীকার করে। খলিফা তখন বলেন, 'তুমি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছ। এখন সম্ভব হলে এই লোককে খুশি করো। নয়তো তাকে বদলা নেওয়ার সুযোগ করে দাও।' জাবালা অহমিকার কারণে নিজেকে সব ধরনের নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে ভেবেছিল। তাই খলিফার কথা শুনে সে অবাক হয়ে বলে, 'আমি একজন নেতৃস্থানীয়। পক্ষান্তরে লোকটি নিতান্তই সাধারণ ব্যক্তি। আমরা পরস্পর সমান হই কিভাবে?' উত্তরে খলিফা বললেন, 'ইসলামের দৃষ্টিতে তোমরা দুজনই সমান।' জাবালা বলল, 'এমন হলে তো আমি পুনরায় খ্রিষ্টান হয়ে যাব।' উমর h বললেন, 'তাহলে মুরতাদের শাস্তি হিসেবে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।'

খলিফা ইনসাফ কায়েম করেই ছাড়বেন বুঝতে পেরে জাবালা পরদিন সকাল পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনার সময় নেয়। সেই সুযোগে রাতেই মদীনা থেকে সদলবলে পালিয়ে কনস্টান্টিনোপলে সম্রাট হিরাকলের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে সে। সেখানে সে পুনরায় খ্রিষ্টান হওয়ার ঘোষণা দিলে হিরাকল তখন জাবালার জন্য একটি জায়গীর নির্ধারণ করে দেয়। বিস্তারিত ঘটনা জানতে, আখবারু উমার, পৃ. ২০৬ দেখা যেতে পারে।

[২১৯] আখবারু উমার, পৃ. ২০২ এবং ৩৫৯

[২২০] আখবারু উমার, পৃ. ৩২০ এবং ৩২২; শারহু নাহজিল বালাগাহ : ১২/১০৪

আল্লাহকে ভয় করুন।' এভাবে উমর ﷺ-কে সে অনেক কটুকাটব্য করল। এ সময় আরেক ব্যক্তি তাকে বলল, 'চুপ করো। আমিরুল মুমিনীনকে তুমি যথেষ্ট কথা শুনিয়েছ।' উমর ﷺ তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন, 'তাকে বলতে দাও। তারা এমন প্রতিবাদ না করলে তাদের মাঝে কোনো ধরনের কল্যাণ থাকবে না। আবার আমাদের মাঝেও কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না, যদি আমরা তার প্রতিবাদ গ্রহণ না করি।'[২২১]

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর জনতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে উমর ﷺ বলেছিলেন, 'আপনাদের কেউ আমার মাঝে কোনো অসংগতি বা ত্রুটি দেখলে তা ঠিক করে দেবেন।'

তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রেও তাঁর নীতি ছিল অভিন্ন। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। মানুষকে ন্যায়, সততা এবং সীরাতে মুসতাকিম দেখিয়ে দিতেন। প্রতারণা আর প্রবঞ্চনা প্রতিহত করতেন। ধোঁকার ব্যাপারে সতর্ক করতেন মানুষকে। আবার রাতের বেলা তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। তাঁর জীবনীতে লিখিত আপামর জনসাধারণের খোঁজখবর রাখার নমুনা ইতিহাসে আজও অনন্য। এসবের বিস্তারিত আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে করা অসম্ভব।[২২২]

শুধু-যে মদীনাতেই দুর্নীতি আর তদন্তের বিচার হতো এমন নয়। বরং মদীনার বাইরে অন্যান্য শহরের প্রশাসকরাও উমর ﷺ-এর অনুকরণে, তাঁর বিচারের সাথে মিল রেখে তারাও দুর্নীতি আর তদন্ত বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। কারণ মানুষ তাদের শাসকদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে। শাসক ইনসাফ করলে প্রশাসক বা অন্য কেউ জনগণের প্রতি জুলুম করার দুঃসাহস করে না। কারণ দায়িত্বশীলের মনে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় থাকে।

সে-সময় খলিফার কাছে তাঁর প্রশাসকরা কেবল নিজেদের কৃতকর্মের জবাবদিহিই করতেন না। বরং তাদের অধীনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি সম্পর্কেও তারা জিজ্ঞাসিত হতেন। উমর ﷺ-এর নিযুক্ত প্রশাসকদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধ, জবাবদিহিতা এবং আল্লাহর পর্যবেক্ষণের অধীনে থাকার অনুভূতির ক্ষেত্রে তারা উমর ﷺ-এর চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিলেন না।

আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়ন, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যা ও জুলুমের উৎখাত-সহ যাবতীয় বিষয়ে তারা ছিলেন এক ও অভিন্ন। এই আচরণই ছিল সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, হিমসের প্রশাসক উমাইর ইবনু সাদ, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, মুআবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান, সাঈদ ইবনু আমির ﷺ-এর জীবনের

[২২১] আল-খারাজ লিআবি ইউসুফ, পৃ. ১৩; আসসিয়াসাতু ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮৫
[২২২] আখবারু উমার, পৃ. ৩৫২, ৩৫৬; শারহু নাহজিল বালাগাহ : ১২/১৪, ৬৩

প্রতিটি আচরণে এবং উচ্চারণে।[২২৩]

এর চেয়েও কঠোর নিয়ম ছিল এটা যে, কোনো ব্যাপারে প্রশাসকদের কাছ থেকে জবাবদিহিতা গ্রহণের সময় স্বয়ং খলিফার পক্ষ থেকে কোনো জুলুম হয়ে যায় কি না, সেটা নিরীক্ষণের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা ﷺ-কে। তিনি ছিলেন খলিফা ও তাঁর নিযুক্ত প্রশাসক এবং প্রশাসক ও জনগণের মধ্যকার কাজের তদন্তকারী। তার প্রতি উমর ﷺ-এর আস্থা থাকায় সব ধরনের বিচারের তদন্তে তাকেই পাঠাতেন। সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ﷺ-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্তও তিনিই করেছিলেন। তার তদন্তে সে অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হয়। একইভাবে আবু মূসা আশআরি, আমর ইবনুল আস, ইয়াজ ইবনু গানাম এবং আবদুল্লাহ ইবনু কুরত ﷺ-সহ আরও অনেকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করার দায়িত্ব তার ওপরই অর্পিত হয়েছিল।[২২৪]

আবু মূসা আশআরি ﷺ-এর উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রে উমর ﷺ লিখেছিলেন, 'দিনের কিছু সময় হলেও দণ্ডবিধি কায়েম করুন। অন্যায়কারীদের তটস্থ রাখুন। সরাসরি একজন একজন লোক করে বিচার করবেন।'[২২৫]

পরবর্তীকালে উসমান-ও উমরের নীতিই অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রণীত নীতিমালাই রক্ষা করে চলেছেন। বিভিন্ন স্থানে থাকা বাহিনীর সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রে তিনি লিখেছেন,

> 'উমর যে-সকল নীতি তোমাদের জন্য প্রণয়ন করে গেছেন, সেগুলো আমাদের অজানা নয়। বরং আমাদের সকলের সামনেই তিনি সেসব প্রণয়ন করেছিলেন। সুতরাং আমার কাছে যেন তোমাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের রদবদলের সংবাদ না আসে। এমনটা করলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অবস্থা পালটে দেবেন। তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন।'[২২৬]

উসমান ﷺ তাঁর সমস্ত প্রশাসকদের এ নীতি জানিয়ে ফরমান জারি করেছিলেন,

> 'আল্লাহ তাআলা শাসকদের দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জনগণের কাছে তাদেরকে কেবল ট্যাক্স উসুলকারী হিসেবে প্রেরণ করেননি। ... মনে রাখবেন, মুসলিমদের যাবতীয় বিষয়ে মনোযোগী থাকাই সর্বাধিক ইনসাফপূর্ণ আচরণ। তাদের ন্যায়সংগত অধিকার যেমন প্রদান করবেন, তেমনি রাষ্ট্রের অধিকার তাদের থেকে আদায় করে নেবেন। অমুসলিম নাগরিকদের বিষয়ে সচেতন থাকবেন। তাদের ন্যায্য অধিকার যেমন বুঝিয়ে দেবেন, তেমনি

[২২৩] আখবারু উমার, পৃ. ১৭৩, ২৪১, ২৭১; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩১
[২২৪] আখবারু উমার, পৃ. ১৫০; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২৯, ৩১
[২২৫] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২২
[২২৬] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৪; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/২৬

> অন্যায় হলে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া চলবে না।'[২২৭]

রাজস্ব কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে উসমান ﵁ লিখেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সৃষ্টিজগৎকে ন্যায়সংগতভাবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কেবল ন্যায়সংগত বিষয়ই তিনি গ্রহণ করবেন। অতএব, সত্যকে ধারণ করুন এবং ন্যায়সংগতভাবে অপরের হক প্রদান করুন। আর আমানতের ব্যাপারে খুব সাবধান থাকবেন। এমন যেন না হয় যে, আপনারাই আমানতের প্রথম খিয়ানতকারী হয়ে গেলেন। তাহলে তো পরবর্তীরা আপনাদের অর্জনে অংশীদার হবে। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকবেন। বিশ্বস্ততা বজায় রাখবেন। ইয়াতিম এবং চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি জুলুম করতে যাবেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাদের ওপর জুলুমকারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন।'[২২৮]

প্রতিটি শহরে উসমান ﵁-এর এ ফরমান জারি করা ছিল, 'কর্মকর্তা এবং তাদের বিপক্ষে অভিযোগকারীরা যেন হজের মৌসুমে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। সে-সময় তিনি তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন।' তাদেরকে জবাবদিহির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলতেন, 'তোমরা একে অন্যকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। ঈমানদার ব্যক্তি যেন নিজেকে অপদস্থ না করে। দুর্বল যতক্ষণ মজলুম থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ চাহেন তো আমি দুর্বলের পক্ষেই থাকব।'[২২৯]

উসমান ﵁ তাঁর শাসনামলের শেষ দিকে কিছু অভিযোগ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এসব অভিযোগের অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত এবং অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তা ছাড়া কর্মকর্তাদের ব্যাপারে আপামর সাধারণ জনগণ সেসব বিষয় মেনেও নিয়েছিল।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আলি ﵁ বিচার, প্রশাসন, দুর্নীতির বিচার এবং তদন্তের বিচারের ক্ষেত্রে পূর্বের খলিফাগণের নীতি অনুসরণ করেছেন। প্রশাসক এবং বিচারকদের নিয়োগ দেওয়ার সময় তাদের জন্য তিনি নীতিমালা নির্ধারণ করে দিতেন। তাঁর নিযুক্ত এক কর্মকর্তার প্রতি তাঁর নির্দেশনা ছিল এমন :

> 'তাদের কাছে গেলে তাদেরকে শীতবস্ত্র বা গ্রীষ্মকালে পরার মতো কাপড় কিনে দিয়ো না। তাদের খাওয়ার জন্য খাদ্য সামগ্রী কিংবা কাজের জন্য বাহনও কিনে দেওয়ার দরকার নেই। এক দিরহামের কারণেও তাদের কাউকে চাবুক মেরো না। আমরা তো কেবল ক্ষমার নীতি গ্রহণের ব্যাপারেই আদিষ্ট।'[২৩০]

---

[২২৭] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৪; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/২৬

[২২৮] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৪; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১০৪

[২২৯] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৫

[২৩০] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৯

আলি ﷺ প্রথমেই উসমান ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসকদের অপসারণ করেছিলেন। শহরের লোকদের বাইয়াত তাঁর কাছে পৌঁছার অপেক্ষা করেননি। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে এসব প্রশাসক মুসলিমদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার যোগ্য ছিল না। তাই সরকারি কর্মকর্তা, প্রশাসক এবং বিচারকদের (নতুনভাবে) নিয়োগ দিয়ে সবাইকে তিনি দিকনির্দেশনা আর উপদেশ দিয়েছিলেন। আশতার ﷺ-কে মিশরের প্রশাসক নিযুক্ত করার সময়ও তিনি এমন দিকনির্দেশনাপূর্ণ পত্র দিয়েছিলেন। যা-তে তিনি লিখেছিলেন,

> 'জনগণের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য নাগরিকদের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে। সে এমন হবে, যে কিনা মামলা-মোকদ্দমা এলে মেজাজের ভারসাম্যতা হারায় না এবং বাদী-বিবাদী তাকে উত্তেজিত করতে পারবে না। নিজের ভুল বুঝতে পারলে গোঁ ধরে থাকে না, আবার সত্য চিনতে পেরেও তা গ্রহণে গড়িমসি করে না। না সে লোভী হবে, আর না ভাসাভাসা জ্ঞান দিয়ে বিচার করবে। সন্দেহজনক বিষয়ে সে থমকে যাবে, যুক্তি-প্রমাণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে এবং ফরিয়াদির দীর্ঘ কৈফিয়ত শোনার জন্য সে থাকবে মানসিকভাবে প্রস্তুত। সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ এবং বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মিথ্যা থেকে সত্য উদ্ঘাটনের কাজে তাকে অবশ্যই ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। রায় প্রকাশের সময় সে হবে নির্ভীক। তোষামোদে গলে যায়, আবার প্ররোচনায় পথ হারিয়ে ফেলে—এমন লোক বিচারক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।'[২০১]

পত্রে তিনি আরও লিখেছিলেন,

> 'ইনসাফ প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব আল্লাহ তোমার ওপর দিয়েছেন, তার জন্য কষ্ট স্বীকার করবে। মানুষের প্রতি নিজের থেকেও বেশি সুবিচার করবে। তোমার আত্মীয়স্বজন এবং নাগরিকদের মধ্যে যাকে তোমার বেশি পছন্দ, তাদের ক্ষেত্রেও ইনসাফের পরিচয় দিয়ো। এমনটা না করলে তুমি জুলুম করবে।'[২০২]

সাহাবিদের মধ্যে আলি ﷺ ছিলেন বিচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী। বিচারকার্য পরিচালনায় তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল সুদীর্ঘ। পাশাপাশি তাঁর ছিল বুজুর্গি, আল্লাহভীতি, দুনিয়া-বিমুখতা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দুর্বার আগ্রহ। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি নিজেই দুর্নীতির বিচার এবং তদন্ত বিভাগ পরিচালনা করতেন। এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ধরনের অনেক বিচারের বর্ণনা তাঁর বিচারের ইতিহাস এবং তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়। প্রশাসক এবং বিচারকদের নিয়োগ দিয়ে তিনি নিজেই তাদের তদারকি

---

[২০১] আল-কাদা ফিল ইসলাম, পৃ. ১০৫; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/৫১

[২০২] নিযামুল হুকম, পৃ. ৫৫৯

করতেন। তাদের কাজের খোঁজখবর রাখতেন।

আলি ﵁ তাঁর পূর্ববর্তী খলিফাদের পুরোটা সময় এবং তাঁর নিজের শাসনামলেও সাধারণভাবে বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন।[২০৩] বিশেষভাবে তাঁর খিলাফতকালে দুর্নীতি এবং তদন্তের বিচারব্যবস্থা তিনি নিজেই পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন শহর থেকে প্রশাসকদের বিপক্ষে তাঁর কাছে অভিযোগ আসত। এমনকি অমুসলিমদের পক্ষ থেকেও এ জাতীয় অভিযোগ উত্থাপিত হতো। একবার জনৈক প্রশাসকের বরাবর তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। যা-তে তিনি লিখেছিলেন,

> 'মূলকথা এই যে, তোমার দেশের সম্পদশালী লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে কঠোরতা আর নিষ্ঠুরতার অভিযোগ করেছে। তুমি নাকি তাদের অবজ্ঞা করো এবং তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করে থাকো। বিষয়টি যাচাই-বাছাই করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে—তাদেরকে খুব কাছে টানা কিংবা দূরে সরিয়ে দেওয়াও ঠিক হবে না। অতএব তুমি রুক্ষ ব্যবহার কোরো না। বরং তাদের সাথে ঈষৎ কঠোরতা মিশ্রিত কোমল আচরণ করো। তোমার অবস্থান যেন কঠোরতা এবং নম্রতার মাঝামাঝি থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় ঘনিষ্ঠতা এবং দূরত্বের মাঝে সমন্বয় করে চলতে তুমি সচেষ্ট থেকো।'[২০৪]

কাব ইবনু মালিক ﵁ ছিলেন আলি ﵁-এর পক্ষ থেকে নিয়োজিত প্রশাসকদের পর্যবেক্ষক। আলি ﵁ এ ব্যাপারে তাকে লিখেছিলেন, 'আপনার কাজের দায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে কুরাতুস সাওয়াদ এলাকায় নিযুক্ত আমার প্রশাসকদের ব্যাপারে লোকদের থেকে খোঁজখবর নিন। দজলা এবং আযিবের মাঝামাঝি তাদের আচরণ লক্ষ রাখবেন।'[২০৫]

জুলুমের উৎখাত, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের অধিকার রক্ষা করার ব্যাপারে আলি ﵁ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতেন। তিনি বলতেন, 'সত্যকে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তো এই উম্মতকে চাবুক এবং তরবারির মাধ্যমে সভ্যতার শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব শাসকের কাছে কেউ কোনো ধরনের প্রশ্রয় পাবে না।'[২০৬]

সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ হতে নিষেধ এবং পরিমাপ আর ওজনের ব্যাপারে অপব্যবহারের ক্ষেত্রে আলি ﵁ বলেন, 'বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার বিরোধিতা বা গতিরোধ করার মতো কেউ নেই। এর জন্য কেউ তিরস্কার করে না বা বিরত রাখে না। ... আল্লাহর অভিশাপ সেসব লোকদের প্রতি, যারা (অপরকে)

---

[২০৩] আখবারুল কুদ্বাহ লিওয়াকি : ২/১৯৬
[২০৪] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৬১
[২০৫] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৬২
[২০৬] প্রাগুক্ত

সৎ কাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজেরাই সৎ কাজ বর্জন করে। আবার মানুষকে অন্যায়ের ব্যাপারে নিষেধ করে অথচ নিজেরাই তাতে লিপ্ত হয়।'[২৩৭]

জুলুমের ভয়াবহতা এবং তা থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে তিনি বলতেন, 'আল্লাহর কসম, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাথে আল্লাহর কোনো বান্দার প্রতি জুলুমকারী আর দুনিয়ার সামান্য খড়কুটো ছিনতাইকারী হিসেবে সাক্ষাৎ করার চেয়ে, সিংহের পিঠের ওপর রাত কাটানো বা সিংহকে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়। অতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হতে চলেছে এবং দীর্ঘকাল মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকতে হবে, এমন মানুষের জন্য আমি কি কারও ওপর জুলুম করতে পারি?'[২৩৮]

❁ বিচারকদের বেতন-ভাতা

বিচারক হচ্ছেন নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। প্রশাসকের মতো তিনিও নিজেকে মুসলিমদের জনস্বার্থে নিয়োজিত রাখেন। তাই তার বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা মুসলিমদের একান্ত কর্তব্য। মক্কার প্রশাসক আত্তাব ইবনু উসাইদ ﵁ সহ বিভিন্ন শহরে নিযুক্ত কিছু প্রশাসকদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

আবু বকর ﵁ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর মুসলিমরা তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। যাতে তিনি ব্যক্তিগত আয়-রোজগারের পেরেশানি থেকে মুক্ত হয়ে মুসলিমদের রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে নির্বিঘ্নে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। খলিফা এবং তাঁর পরিবারের প্রয়োজন মিটে যায় এ পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছিল।[২৩৯] উমর ﵁ এবং তাঁর পরবর্তীদের সময়ে ভাতা নির্ধারণের বিষয়টি এভাবেই চলত।[২৪০]

রাশিদুন যুগে অধিকাংশ প্রশাসক, সরকারি কর্মকর্তা এবং বিচারকদের ভাতার বিষয়টি এভাবেই চলে আসছিল। কিন্তু নববি যুগে এবং আবু বকর ﵁-এর যুগে বিচারের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি নিয়োগ দেওয়া এবং তার জন্য ভাতা নির্ধারণের বিষয়টি পাওয়া যায় না। নববি যুগের পর বেতনের সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থাপনা না থাকলেও খলিফার জন্য ভাতা নির্ধারিত ছিল। সেইসাথে আগে থেকেই প্রশাসন এবং বিচারের দায়িত্ব পরিচালনা করে আসা প্রশাসকরাও কিছু সুবিধা পেতেন।

এরপর উমর ﵁-এর শাসনামলে তিনি বিচারের জন্য বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেন। তাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেন। এ আইন

---

[২৩৭] নাহজুল বালাগাহ : ৮/২৪৪

[২৩৮] নাহজুল বালাগাহ : ১১/২৪৫

[২৩৯] আখবারু উমার, পৃ. ৩৪৮; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ১/১৯১

[২৪০] আখবারু উমার, পৃ. ৩৫০

প্রবর্তন করেন যে, বিচারকরা সরাসরি বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অথবা বাইতুল মালের যে-কোনো বিভাগ থেকে, কিংবা দেশের বা অন্য শহরের খিলাফতের যে-কোনো অফিস থেকে বেতন তুলতে পারবেন। মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করতে তারা নিজেদের অন্য কোনো ব্যস্ততা থেকে মুক্ত রেখেছেন বলেই এই সুবিধা তারা পেতেন। কারণ বিচারকরা জীবিকার জন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হলে সাধারণ জনগণের অধিকার খর্ব হবে।

ওপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, উমর-ই সর্বপ্রথম বিচারকদের জন্য সরকারিভাবে ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই বাইতুল মাল পরিপূর্ণ প্রশাসনিকভাবে গঠিত হয়। প্রশাসনিক অন্যান্য বিভাগের মতো বাইতুল মালের কার্যক্রম এবং নীতিমালাও তিনি নির্ধারণ করেছিলেন। প্রশাসকদের কার্যক্রম থেকে বিচারকদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ পৃথক বানিয়ে দিয়েছেন। বিচারকদের বেতন নির্ধারণের ধারাবাহিকতায় সুলাইমান ইবনু রবীআ আল-বাহিলির জন্য বরাদ্দ করেছিলেন মাসিক পাঁচশ দিরহাম এবং শুরাইহের জন্য একশ দিরহাম।[২৪১]

পূর্বে নাফে ﵁ সূত্রে ওয়াকি ﵀-এর বর্ণনা আমরা উল্লেখ করেছি, যায়িদ ইবনু সাবিত ﵁-কে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর উমর ﵁ তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন।[২৪২] এ ছাড়াও আম্মার ইবনু ইয়াসির, উসমান ইবনু হুনাইফ এবং আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵃-কে কুফায় পাঠিয়ে তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ কুফাবাসীদের শিক্ষকতার পাশাপাশি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। সেখানকার রাষ্ট্রীয় কোষাগার দেখাশোনার দায়িত্বও তার ছিল। তার বেতন ছিল মাসে একশ দিরহাম এবং দিনে একটি বকরির এক-চতুর্থাংশ।[২৪৩]

বিচারকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে উমর ﵁ সবসময় সচেষ্ট থাকতেন। কেননা তাদের বেতন বৃদ্ধিতে জনস্বার্থ জড়িত থাকে। মুআয ইবনু জাবাল এবং আবু উবায়দা ﵄-কে শামে পাঠানোর সময় খলিফা তাদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, 'আপনাদের পক্ষ থেকে কিছু যোগ্য লোক দেখে বিচারকের দায়িত্বে নিয়োগ দিন। তাদের বেতন বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলার দেওয়া সম্পদ থেকে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিন।'[২৪৪]

উসমান ﵁-এর শাসনামলে বিচারকদের ভাতার বিষয়টি উমর ﵁-এর যুগের মতোই অব্যাহত ছিল। বরং উসমান ﵁-এর সময়ে বিচারক, প্রশাসক-সহ তাবৎ

[২৪১] আল-কাদা ফিল ইসলাম, পৃ. ২৯; আখবারু উমার, পৃ. ১৪৬; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৮; তারীখুল কাদা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৬২

[২৪২] আখবারুল কাদা লিওয়াকি : ১/১০৮; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৭

[২৪৩] আখবারু উমার, পৃ. ১৪৫; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৬-৪৭

[২৪৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১/৩২৬; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২১১; আল-মুগনি : ১০/৩৪

মানুষের বেতন-ভাতা আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২৪৫] হাসান বসরি ﵀ বলেছেন, 'উমর এবং উসমান ﵄ উভয়ই ইমাম, মুয়াযযিন, শিক্ষক এবং বিচারকদের বেতন-ভাতা দিতেন।'[২৪৬]

আলি ﵁-এর যুগেও বিষয়টি এভাবেই চলছিল। বিচারকদের ভাতা বৃদ্ধির জন্য উমর ﵁-এর নীতি আলি ﵁-এর জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিল। বিচারকের ব্যাপারে মিশরের প্রশাসক আশতার ﵀-কে আলি ﵁ বলেছিলেন, 'বিচারকের জন্য এ পরিমাণ খরচ করবে, যার মাধ্যমে তার সংকট দূর হয়ে যাবে। প্রয়োজনে মানুষের কাছে তার হাত বাড়ানোর দরকার পড়বে না।'

বিচারক শুরাইহ ﵀-এর নির্ধারিত মাসিক ভাতা যেখানে ছিল পাঁচশ দিরহাম, সেখানে খলিফাতুল মুসলিমীন আলি ﵁ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অল্পেতুষ্ট দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি। সামান্যতেই পরিতৃপ্ত হতেন তিনি। বাইতুল মাল থেকে পাওয়া দৈনিক এক পাত্র পরিমাণ ছারিদই তাঁর যথেষ্ট হয়ে যেত।[২৪৭]

এভাবেই বাইতুল মাল থেকে প্রশাসক, সরকারি কর্মকর্তা এবং বিচারকদের প্রয়োজন অনুপাতে দেশভিত্তিক বেতন-ভাতা প্রদান করা হতো। বিচারকদের ভাতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল একেবারে সুস্পষ্ট। এমনকি বিচারকগণ তাদের বেতন অগ্রীম পেতেন।[২৪৮]

۞ বিচারের কার্যালয় এবং বন্দিশালা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, নববি যুগে বিচারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো জায়গা ছিল না। কারণ, ইনসাফ কোনো স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। সত্য প্রকাশিত হবেই, তা যেখানেই হোক না। আবু বকর এবং উমর ﵄-এর যুগ এভাবেই চলছিল। বিচারক মামলার বিষয় পর্যবেক্ষণ করে সাধারণত মসজিদে বা ঘরে, কিংবা অন্য কোনো স্থানে ফয়সালা করে দিতেন। কখনো কখনো তো রাস্তাতেও মীমাংসা করে দেওয়া হতো। এভাবে বিচারের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা না হওয়ার কিছু কারণ তো আমরা আগে উল্লেখ করেছি। সেগুলো ছাড়াও আরও কিছু কারণ ছিল এমন :

প্রথমত, মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাধিক্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, মসজিদের কর্মপরিধি ছিল ব্যাপক। তৃতীয়ত, মামলা হতো দীর্ঘসূত্রিতামুক্ত এবং বিচারের কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। ফলে বিচারব্যবস্থা হতো ফতোয়া বা সালিশির মতো।

---

[২৪৫] উসমান ﵁ নিজে ছিলেন হাতখোলা ব্যক্তি। সাধারণ মানুষ এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরও তিনি হাত খুলে দান করতে উৎসাহিত করতেন। আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৫ দ্রষ্টব্য।

[২৪৬] আখবারু উমার, পৃ. ১৪৫; শারহু নাহজিল বালাগাহ : ১৭/৫৯

[২৪৭] আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ২৯; আখবারুল কুদ্বাহ : ২/২২৮; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৫৩

[২৪৮] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৭; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ৩০

উসমান ؓ তাঁর শাসনামলে বিচারের জায়গা নির্দিষ্ট করার জন্য একটি কার্যালয় তৈরি করেন। উদ্দেশ্য ছিল : বিচারের সময় যে শোরগোল হয় তা থেকে মসজিদকে মুক্ত রাখা। মসজিদ যাতে অনর্থক কাজকর্ম থেকে পবিত্র থাকে। তাহলে বিচারে মানুষের অংশগ্রহণের জায়গা প্রশস্ত থাকবে। সে হিসেবে উসমান-ই সর্বপ্রথম মদীনাতে স্বতন্ত্র বিচারালয় নির্মাণ করেন। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য শহর আর অঞ্চলে এ ব্যবস্থাপনার বিস্তার ঘটে।[২৪৯]

কিন্তু এর মানে এটা নয় যে, বিচারকগণ মসজিদে বা ঘরে সাধারণ আর ছোটখাটো বিচারকার্য পরিচালনা থেকে বিরত থাকতেন। বরং বিচারের প্রধান প্রধান এবং সরকারি বৈঠকগুলো বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত হতো। আর অন্যান্য সাধারণ বিচার মসজিদে বা ঘরেই হতো। এ কারণেই শোরগোল আর হইচই হয় বিধায় কোনো কোনো ফিকহবিদ মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা মাকরুহ বলেছেন। তা ছাড়া বিচারালয়ে বিচারকের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা করাও সহজ হয়।

নববি যুগে অভিযুক্ত ব্যক্তি আর অপরাধীকে বন্দি করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো বন্দিশালা ছিল না। সে-সময় কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দি করতে হলে তাকে মসজিদে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হতো। কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ ও চোখে-চোখে রাখার জন্য কোনো একজন মুসলিমকে দায়িত্ব দেওয়া হতো। নয়তো তাকে কোনো মুসলিমের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সেখানে সে মেহমান হিসেবে থাকত। মেজবানের দায়িত্ব থাকত তাকে পাহারা দিয়ে রাখা এবং বিচারের সময় তাকে উপস্থিত করা। উমর ؓ-এর শাসনামলের প্রায় অর্ধেক সময় পর্যন্ত বন্দি করার বিষয়টি এভাবেই চলে আসছিল। অবশেষে উমর ؓ জেলখানা নীতির প্রচলন করেন। বিচারক, শাসক এবং সরকারি কর্মকর্তাগণ যাকে বন্দি করা দরকার বলে মনে করতেন, তাকে সেখানে আটক রাখতেন। পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবেচনায় পরবর্তীকালে এভাবেই সকল বিভিন্ন শহরে জেলখানা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রসার লাভ করে।

নাফে ؓ ছিলেন উমর ؓ কর্তৃক নিযুক্ত মক্কার প্রশাসক। তিনি উমর ؓ-এর আদেশে মক্কায় সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া ؓ থেকে জেলখানা বানানোর জন্য একটি বাড়ি কিনেছিলেন। শর্ত ছিল, উমর ؓ অনুমোদন না দিলে সেটা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অবশেষে খলিফার অনুমোদনে সেটা জেলখানা হিসেবে ব্যবহার শুরু করা হয়।[২৫০]

আলি ؓ ঋণের কারণে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে বন্দি করতেন না। তিনি বলতেন, 'এটা জুলুম।' তিনি আরও বলতেন, 'একজন মানুষের অপারগতা জানার

---

[২৪৯] আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ২৬; তুরাসুল খুলাফাইর রাশিদিন, পৃ. ১৬৪

[২৫০] বায়হাকি : ৬/৩৪; আল-মাদখালুল ফিকহিল আম : ১/৪৯৮

পর তাকে কারাগারে বন্দি রাখা ঠিক নয়।'[২২১]

রাশিদুন যুগে বিচার বিভাগের গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা

প্রশাসনের পাশাপাশি বিচার বিভাগের গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা ছিল রাশিদুন যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিচার বিভাগ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট তাবৎ বিষয় যাতে সুপরিকল্পিত হয়, তার পরিচালনা যেন নিপুণ হাতে হয় এবং তার সঠিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশিদুন বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছিলেন। কারণ এমনটা করলেই কেবল রাষ্ট্র পরিচালনা এবং বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত মূলনীতি এবং আইনকানুন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে।

রাশিদুন যুগে বিচার বিভাগের গঠনমূলক ও তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যম ছিল চিঠিপত্র এবং সেসব নির্দেশনা, যেগুলো বিভিন্ন বিচারক ও প্রদেশের গভর্নরদের উদ্দেশ্যে খলিফাগণ প্রেরণ করেছিলেন। আর কার্যত ব্যবস্থাপনা ছিল বিরোধের নিষ্পত্তি, বিবাদ নিরসন, বিভিন্ন বিচার ও মোকদ্দমা পর্যবেক্ষণ, বিচারের সমস্ত বিধিবিধান বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় করা।

উমর ﷺ-এর যুগে গঠনমূলক এই ব্যবস্থাপনা তাত্ত্বিকভাবে এবং কার্যত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাঁর যুগের পরেও সেই ব্যবস্থাপনা দীর্ঘ সময় অবধি কার্যকর ছিল। তবে এর আগে তথা আবু বকর ﷺ-এর যুগে এই ব্যবস্থাপনার প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ। এখানে আমরা বিচার-সংক্রান্ত এই গঠনমূলক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করব।

❁ বিচার-সংক্রান্ত বিভিন্ন চিঠিপত্র

বিচার-সংক্রান্ত গঠনমূলক এবং তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় খলিফাগণ লিখিত দাপ্তরিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং বিচার পরিচালনা ও শ্রেষ্ঠ বিচারব্যবস্থার দিকনির্দেশনা সংবলিত সেসব কালজয়ী চিঠিপত্রে, যা তাঁরা সমস্ত প্রদেশের গভর্নরদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। যাতে তারা পরিপূর্ণ ইনসাফ বাস্তবায়ন করেন। মানুষের অধিকার রক্ষা এবং জুলুম-নির্যাতনের প্রতিরোধ-সহ অন্যায়ের সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া তাদের জন্য সহজ হয়।

■ আবু বকর সিদ্দিকের ফরমান

বিচারব্যবস্থা পরিচালনায় আবু বকর সিদ্দিক ﷺ-এর বিশেষ কোনো চিঠিপত্র ছিল না। তবে তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন আদেশ, নির্দেশনা, তাঁর বিভিন্ন ভাষণ ও বক্তব্যে এ ব্যাপারে কিছু দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

---

[২২১] আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ৬২

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সময় তিনি সর্বপ্রথম যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন, তার প্রতি আমরা শুধু ইঙ্গিত প্রদান করব। অবশ্য আমরা ইতিপূর্বেও তা উল্লেখ করেছি। সে ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আমি একজন অনুসারী মাত্র; নতুন কোনো কিছুর উদ্ভাবক নই।'[২২]

উমর ﷺ-কে খিলাফতের দায়িত্বভার প্রদানকালেও তিনি অনুরূপ একটা ভাষণ প্রদান করেছিলেন। যা-তে ইনসাফের প্রতি তাঁর আগ্রহ, এর গুরুত্ব এবং ইনসাফ কায়েমের ব্যাপারে তাঁর প্রত্যাশার বর্ণনা পাওয়া যায়। সে-সময় উমর ﷺ-এর ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, 'তার ব্যাপারে তো আমার এটাই ধারণা যে, সে ইনসাফ করবে। তার ব্যাপারে এটাই আমার জ্ঞান। পক্ষান্তরে রদবদল ঘটালে বলব, প্রতিটি মানুষ নিজের কর্মফল নিজেই ভোগ করবে। তবে আমি মঙ্গল চেয়েছিলাম। আর আমার তো গায়িব জানা নেই। জালিমরা অচিরেই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে জানতে পারবে।'[২৩]

উমর ﷺ-এর কঠোরতার কথা সবাই জানতেন। এ ব্যাপারে আবু বকর ﷺ-কে কিছু সাহাবি ভয় দেখালে তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা কি আমাকে আল্লাহর ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছেন? যে ব্যক্তি আপনাদের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অন্যায় করবে, সে তো ব্যর্থ হবে। তাকে নিয়োগের ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে আল্লাহকে আমি বলব, "হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদেরকে আপনার পছন্দকৃত উত্তম ব্যক্তির জিম্মায় রেখে এসেছি।"'[২৪]

▪ উমর ফারুকের চিঠিপত্র

উমর ﷺ তাঁর নিযুক্ত প্রশাসক এবং বিচারকদের কাছে বিচার বিভাগের ব্যবস্থাপনা নিয়ে অনেক চিঠিপত্র লিখেছিলেন। যা-তে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথ এবং লক্ষ্যে পৌঁছার সঠিকতম নির্দেশনা দেওয়া থাকত। উমর ﷺ কৃত রাষ্ট্রের সর্বজনীন এবং বিচার বিভাগের বিশেষ ব্যবস্থাপনা ছিল প্রসিদ্ধ।

উমর ﷺ-এর চিঠিগুলো হতো বিভিন্ন ধরনের পরিচালনার ব্যবস্থাপনা, বিচারের কর্মপন্থা এবং শারঈ বিধিবিধানের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং সঠিক কর্মপন্থার বিবরণ বেশি থাকত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্রাবলি ছিল কুরআন-সুন্নাহর সারনির্যাস এবং চয়িতাংশ। ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিজয়ের ধারা এবং মানুষের দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার বিষয়টিও তাতে উল্লেখ করা থেকে বাদ পড়ত না। আমরা এখানে তাঁর কিছু পত্রের বিবরণ উল্লেখ করব। সেগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনায় পরিপূর্ণ।

---

[২২] তবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৮৩

[২৩] তবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৯৯

[২৪] তবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৯৯-২০০

■ আবু মূসা আশআরির উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র

বিচার বিষয়ক জরুরি এই পত্রটি বিচার-সংক্রান্ত মৌলিক নীতিমালা সংবলিত। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ﷺ তো এই পত্রটিকে كِتَابُ السِّيَاسَةِ তথা 'বিচার-সংক্রান্ত নীতিমালা' বলে নামকরণ করেছেন। সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা ﷺ বলেছেন, আবু মূসা আশআরি ﷺ-এর উদ্দেশ্যে উমর ﷺ-এর পত্রটি ছিল নিম্নরূপ।

> "পরম করুণাময় ও চিরদয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা মুমিনদের আমির উমরের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ ইবনু কায়সের প্রতি। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।
>
> পরসমাচার এই যে, বিচারকার্য তো আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব এবং অনুস্মরণীয় সুন্নাহ। আপনার কাছে কোনো বিচার এলে তা ভালোভাবে বুঝে নেবেন। কারণ যে সত্য বাস্তবায়িত হয় না, তা বলে কোনো লাভ নেই। আপনার এজলাসে এবং রায়ের ক্ষেত্রে সব মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখবেন। যাতে সবল আপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে না ওঠে এবং দুর্বল আগ্রহ হারিয়ে না ফেলে। প্রমাণ পেশের দায়িত্ব বাদীর এবং অস্বীকারকারীর কর্তব্য হলো শপথ করা। মুসলিমদের মাঝে আপসে সমঝোতা করা বৈধ। কিন্তু তা যেন বৈধ বিষয়কে অবৈধ এবং অবৈধ বিষয়কে বৈধ বানিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে না হয়। কেউ যদি এমন অধিকার বা প্রমাণের দাবি করে যা উপস্থিত নেই, তাহলে সেটা উপস্থিত করার মতো সময় তাকে প্রদান করুন। প্রমাণ উপস্থিত করতে পারলে তাকে অধিকার দিয়ে দেবেন। আর যদি না পারে, তবে রায় তার বিপক্ষে যাবে। কারণ সেটাই চূড়ান্ত ওজর এবং অসারতার প্রমাণ।
>
> সুপথপ্রাপ্ত হয়ে আগের দিনের যেসব (জাহিলি) ফয়সালা থেকে আপনি মনে মনে ফিরে এসেছেন, তা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো রকম সংকোচ বোধ করবেন না। কারণ সত্য হচ্ছে চিরন্তন বিষয়। কোনো কিছুই তার মাঝে পরিবর্তন আনতে পারে না। বাতিলের ব্যাপারে টালবাহানা অপেক্ষা হকের পথে প্রত্যাবর্তন শ্রেয়।
>
> স্বাভাবিকভাবে মুসলিমরা একে অপরের ব্যাপারে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। তবে যাদের ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া প্রমাণিত হয়েছে, যাদের ওপর শরীয়তের দণ্ডবিধি আরোপিত হয়েছে এবং দায়িত্বের ক্ষেত্রে বা আত্মীয়তার ব্যাপারে যারা অভিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাদের কথা ভিন্ন। কারণ আল্লাহ তাআলা বান্দার গোপন বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রমাণ এবং শপথ ব্যতীত তাদের শাস্তির বিষয়টি তিনি প্রকাশ করেন না।
>
> কোনো মোকদ্দমার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হলে যদি কুরআন এবং সুন্নাহতে তার সমাধান পাওয়া না যায়, তবে বিষয়টি নিয়ে পুনরায় চিন্তা করবেন। এরপর বিষয়টিকে তার অনুরূপ আগেকার মোকদ্দমাগুলোর সাথে তুলনা করবেন।

> তারপর দেখবেন, কোন দিকটি আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক পছন্দনীয় এবং সৃষ্টির সাথে বেশি মিল রাখে।
>
> সাবধান! বিচারের সময় রাগান্বিত থাকবেন না। বিরক্তির ভাব কিংবা অস্থিরতা নিয়ে বিচার করবেন না। মানুষের কষ্টের কারণ হওয়া থেকে বিরত থাকুন। মোকদ্দমা বা মোকদ্দমা দায়েরকারীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবেন না। কেননা ন্যায়সংগত বিচার করার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভ হয়। এমন বিচারকের নাম মানুষ উত্তমভাবে স্মরণ করে। নিজের মধ্যে নেই এমন গুণ প্রদর্শনকারীকে আল্লাহ তাআলা ত্রুটিযুক্ত বানিয়ে দেবেন। কারণ তিনি কেবল নির্ভেজাল বিষয়ই পছন্দ করেন।
>
> আল্লাহ তাআলার কাছে থাকা রিযিক এবং তাঁর রহমতের ভাণ্ডার সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন হওয়া উচিত? ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।”[২৫৫]

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেছেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ এই পত্রটির ব্যাপারে কোনো আলিম দ্বিমত পোষণ করেননি। এর ভিত্তিতেই তাঁরা বিচার এবং সাক্ষ্য সংক্রান্ত মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। বিচারকার্য পরিচালনাকারী এবং ফতোয়া প্রদানকারীর এই পত্রটি নিয়ে গবেষণা করা এবং তা গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত।’[২৫৬]

এই পত্রটি উপদেশমালা, প্রজ্ঞা এবং দিকনির্দেশনায় পরিপূর্ণ। বিচারকার্যের ব্যবস্থাপনা এবং দাবি প্রমাণিত করার পদ্ধতি তা থেকে শেখা যায়। দাবি পেশ করার সময় বিচারক কোন ধারা অনুসরণ করবেন, দাবি এবং বিরোধ কিভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন, বাদী-বিবাদীর কথা বিচারক কিভাবে শুনবেন, প্রমাণিতকরণের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করবেন যেভাবে, বিচারের রায় প্রকাশ এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি এবং বিচারকের কাজের নীতিমালা হলো এই পত্র। প্রকারান্তরে এই পত্রটি হচ্ছে একটি অভ্যন্তরীণ খসড়া এবং বিচারের সংবিধান। ফিকহবিদগণ ফরমানটির প্রত্যেকটি ধারা-উপধারার প্রতি নির্ভরশীল।

কোনো কোনো সন্দিহান আলিম অবশ্য রিওয়ায়াত এবং সনদ বিবেচনার বিচারে পত্রটি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ইবনু হাযাম যাহিরি ﵀ কিয়াসের বিপক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। গোল্ডযিহার এবং মার্গোলিউর মতো কিছু প্রাচ্যবিদ তো এর সমালোচনা করার

[২৫৫] পত্রটি ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, তবারানি, বায়হাকি, দারাকুতনি-সহ অনেক ফকিহ, ঐতিহাসিক, সীরাতবিদ এবং সাহিত্যিক বর্ণনা করেছেন। দেখুন, ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৯১; সুনানুদ দারাকুতনি : ৪/২০৬; আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ লিল মাওয়ারদি, পৃ. ৭১; আল-মাবসুত লিস সারাখসি : ৬০/১৬; ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২২১।

[২৫৬] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৯২। এ কথা লেখার পরে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম পাঁচশতেরও অধিক পৃষ্ঠা জুড়ে এর ব্যাখ্যা করেছেন।

সুযোগ ছাড়েননি। তবে আলিমগণ এসব দাবি খণ্ডনপূর্বক তার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করেছেন। কিন্তু এখানে সেসব আলোচনা করার সুযোগ নেই।[২৫৭]

▪ কাযি শুরাইহ বরাবর খলিফা উমরের ফরমান

শুরাইহ ؒ-এর কাছে উমর ؓ বিচার বিষয়ক অনেকগুলো ফরমান পাঠিয়েছিলেন। সেগুলোর বেশির ভাগ ছিল শারঈ বিধানের বিবরণ সংবলিত। আর কিছু ফরমানে ছিল বিচারকের বিধানের উৎসের বিবরণ। এখানে আমরা কেবল প্রথম প্রকার তথা শারঈ বিধানের বিবরণ সংবলিত ফরমানগুলো উল্লেখ করব। বিচারকের বিধানের উৎসের বিবরণ সংবলিত ফরমান আমরা রাশিদুন যুগে বিচারিক বিধানের উৎস-সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করব।

বলে রাখা ভালো, শুরাইহ বরাবর উমর ؓ-এর প্রেরিত ফরমানাদি এবং তাঁর সূত্রে কৃত বর্ণনাগুলো নিয়ে ওয়াকি ؒ একটি পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ সংকলন করেছেন। সেখান থেকেই আমরা কিঞ্চিৎ উল্লেখ করছি :

- ☑ 'কোনো ব্যক্তি যদি সামান্য সময়ের জন্যও সন্তানকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেলে, তাহলে সে আর তা নাকচ করার কোনো সুযোগ পাবে না।'
- ☑ 'তুমি কোনো মহিলাকে তার সম্পদের অনুমোদন কিছুতেই দেবে না, যে যাবৎ না স্বামীর কাছে তার বছর পূর্ণ হয় কিংবা সন্তান জন্ম দেয়।'
- ☑ শুরাইহ বরাবর উমর ؓ লিখেছিলেন, 'ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার প্রদানের ফয়সালা করো।' অন্য বর্ণনানুসারে শুরাইহ নিজেই বলেছেন, 'উমর ؓ আমাকে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার প্রদানের ফয়সালা করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।'
- ☑ আবদুল্লাহ ইবনু শুবরুমাহ ؒ বলেন, হামদানের ওয়াদিআ গোত্রে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। বিচারক শুরাইহ ইবনুল হারিস তখন খলিফা উমর ؓ-এর কাছে সমাধান চেয়ে পত্র লিখলে জবাবে তিনি লিখলেন, 'ওয়াদিআর ৫০ জন লোককে ভালোমতো জিজ্ঞাসাবাদ করো। তারা নিজেরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল না এবং হত্যাকারী সম্পর্কেও তারা কিছু জানে না—এই মর্মে তাদেরকে কসম করতে বলো।' শুরাইহ তখন নির্দেশমতো কাজ করে উমর ؓ-কে জানালেন। তখন খলিফা লিখে পাঠালেন, 'এই কসমের মাধ্যমে তারা হত্যার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে বটে। কিন্তু রক্তপণ দেওয়া থেকে তারা রেহাই পাবে না। সুতরাং তাদের ওপর তুমি রক্তপণ ধার্য করে দাও।'[২৫৮]

---

[২৫৭] আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ২৮
[২৫৮] আখবারুল কুদ্বাহ লিওয়াকি : ২/১৯১

☑ শুরাইহ সূত্রে শারঈ এবং ফিকহি বিধান সংবলিত আরও অনেক ফরমানের বর্ণনা পাওয়া যায়। তার কাছে উমর ﷺ বেশি বেশি ফরমান প্রেরণ করতেন। কারণ সাহাবি না হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ বিধান তার জানা ছিল না। এজন্যই উমর ﷺ তাকে বিচারক নিযুক্ত করার পর পত্র মারফত বিধান জানাতেন। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব। উমর ﷺ তাকে বলে রেখেছিলেন, 'তোমার কাছে যদি এমন মোকদ্দমা আসে যার বিবরণ আল্লাহর কিতাবে নেই, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহতেও এর কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছ না, এমনকি এ বিষয়ে কেউ কিছু বলেওনি, তাহলে তুমি দুটি কাজের কোনো একটি করতে পারো—চাইলে আগ বেড়ে নিজের গবেষণাপ্রসূত রায় প্রদান করবে, অথবা বিষয়টি এড়িয়ে যাবে। আমার মনে হয় এড়িয়ে যাওয়াই তোমার জন্য ভালো হবে।' অন্য বর্ণনামতে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি চাইলে আমার সাথে পরামর্শ করতে পারো। আমার মনে হয়, আমার সাথে পরামর্শ করাটাই তোমার জন্য নিরাপদ হবে।'[২২৯]

☑ শুরাইহ সূত্রে বর্ণিত আছে, উমর ﷺ তাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, '(মূর্খদের সাথে) কোনো রকম শলা-পরামর্শ করবে না বা তর্কবিতর্কে জড়াবে না। কারও কোনো রকম অনিষ্ট করবে না। বিচারের এজলাসে বেচাকেনা করা থেকে বিরত থাকবে। রাগান্বিত অবস্থায় দুজন ব্যক্তির মাঝে ফয়সালা করতে যেয়ো না।'[২৩০]

▪ মুআবিয়ার উদ্দেশ্যে পত্র

শামের প্রশাসক মুআবিয়া ﷺ-এর উদ্দেশ্যে উমর ﷺ কিছু পত্র লিখেছিলেন। যা-তে দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা, সুবিচার করার উপদেশ এবং বিচারের কিছু ধারার নির্দেশনা দেওয়া ছিল।

শাবি ﷺ সূত্রে বর্ণিত আছে, শামের প্রশাসক মুআবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ-এর উদ্দেশ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর লিখিত পত্রটি ছিল এমন,

> 'মূলকথা হলো, আপনার উদ্দেশ্যে লিখিত আমার বিচার-সংক্রান্ত এই পত্রে আপনার বা আমার নিজের কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে আমি কোনো ধরনের অবহেলা করিনি। সুতরাং নিজের দ্বীন নিরাপদ রাখার স্বার্থে আপনি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করুন, যা আপনার সৌভাগ্য বয়ে আনবে। বাদী-বিবাদী উপস্থিত হলে দেখবেন, তাদের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ এবং অকাট্য শপথ আছে কি না। দুর্বল ব্যক্তিকে আপনার কাছে টেনে নেবেন, যাতে তার মনে সাহসের সঞ্চার

[২২৯] আখবারুল কুজাত লিওয়াকি : ২/১৮৯; তারীখুল কাযা ফিল ইসলাম, পৃ. ১২০
[২৩০] আল-বায়ান ওয়াত তাবঈন : ২/১৫০

> হয় এবং মুখ খুলে কথা বলতে পারে। বহিরাগত লোকের বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। কারণ তাকে দীর্ঘসময় আটকে রাখার অর্থ তার অধিকার লঙ্ঘন করা। তার পরিবারের খোঁজখবর রাখুন। বিচারব্যবস্থাকে তোয়াক্কা করে না—এমন ব্যক্তির অধিকারই কেবল বাতিল করা যায়। ফয়সালা আপনার কাছে সুস্পষ্ট হওয়ার আগে দুই পক্ষকে আপসে মীমাংসা করে নেওয়ার সুযোগ প্রদান করবেন।'[২৬১]

■ আবু উবায়দার কাছে পত্র

আবু উবায়দা ﵁-এর উদ্দেশ্যে উমর ﵁-এর লিখিত বিচার-সংক্রান্ত পত্রটি ছিল নিম্নরূপ।

> 'মূলকথা হলো, আপনার উদ্দেশ্যে লিখিত আমার বিচার-সংক্রান্ত এই পত্রে আপনার বা আমার নিজের কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে আমি কোনো ধরনের অবহেলা করিনি। সুতরাং নিজের দ্বীন নিরাপদ রাখার স্বার্থে আপনি এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করুন, যা আপনার সৌভাগ্য বয়ে আনবে। বাদী-বিবাদী উপস্থিত হলে আপনার কর্তব্য হলো—তাদের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ এবং অকাট্য শপথ আছে কি না তা যাচাই করা। তারপর দুর্বল ব্যক্তিকে আপনার কাছে ঘেঁষার সুযোগ দেবেন, যাতে সে মুখ খুলে কথা বলতে পারে এবং তার মনে সাহস সঞ্চার হয়। বহিরাগত লোকের বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। কারণ তাকে দীর্ঘসময় আটকে রাখার অর্থ তার অধিকার লঙ্ঘন করা। তার পরিবারের প্রতি মনোযোগী থাকবেন। বস্তুত সদয় আচরণ না করা হলেই অধিকার লঙ্ঘন করা হয়। সবসময় তাদের সদয় দৃষ্টি রাখবেন। ফয়সালা আপনার কাছে সুস্পষ্ট হওয়ার আগেই দুই পক্ষকে আপসে সমঝোতা করে নেওয়ার সুযোগ দেবেন। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'[২৬২]

■ প্রাদেশিক শাসক এবং বিচারকদের কাছে উসমানের পত্র

সরকারি কর্মকর্তাদের বরাবর উসমান ﵁ অনেক চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। সেগুলোতে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ, দায়িত্ব পালন এবং জনগণের মাঝে ন্যায়বিচারের কথা থাকত। যেমন,

> 'মূলকথা হলো, আল্লাহ তাআলা ন্যায়সংগতভাবে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ন্যায়ানুগ পন্থাই তিনি গ্রহণ করবেন। সুতরাং ন্যায়নিষ্ঠতা বজায় রাখুন। মানুষকে তাদের

---

[২৬১] আখবারুল কুদ্বাহ লিওয়াকি : ১/৭৪

[২৬২] আখবারু উমার, পৃ. ২৪৫। এই চিঠি এবং আগের চিঠিটি এক রকম হওয়ার কারণ সম্ভবত এমনটা হতে পারে যে, উমর ﵁ একই চিঠি দুজন প্রশাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ন্যায্য অধিকার প্রদান করুন। খুব সতর্ক থাকুন আমানতের ব্যাপারে। আমানত যথাযথভাবে পৌঁছে দিন। এমন যেন না হয় যে, আপনারাই আমানতের প্রথম খিয়ানতকারী হয়ে গেলেন। তাহলে তো পরবর্তীরা আপনাদের অর্জনে অংশীদার হবে। ওয়াদা পূর্ণ করবেন। বিশ্বস্ততা বজায় রাখবেন। ইয়াতিম এবং চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের সাথে অন্যায় করতে যাবেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাদের সাথে অন্যায়কারীদের বিপক্ষে অবস্থান নেবেন।'[২৬৩]

■ খলিফা আলির পত্র

চমৎকার বাচনভঙ্গি এবং ভাষার বিশুদ্ধতায় আলি ﷺ-এর খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। বিচারকার্য পরিচালনায় তিনি শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি প্রাদেশিক শাসক এবং বিচারকদের উদ্দেশ্যে কিছু পত্র প্রেরণ করেন। সঠিক নির্দেশনা, ইনসাফের সাথে সুবিচারের পদ্ধতি, বিচারক বাছাইয়ের পন্থা এবং আপামর জনগণের দেখভাল করার কথা সেসব পত্রে উল্লেখ থাকত। মিশরের প্রশাসক আশতার নাখায়িকে প্রদত্ত একটি দীর্ঘ প্রশাসনিক চিঠি ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছে। আমরা এখানে সেই চিঠিটির কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি :

'জনগণের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য নাগরিকদের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে। সে এমন হবে, যে কিনা মামলা-মোকদ্দমা এলে মেজাজের ভারসাম্যতা হারায় না এবং বাদী-বিবাদী তাকে উত্তেজিত করতে পারবে না। নিজের ভুল বুঝতে পারলে গোঁ ধরে থাকে না, আবার সত্য চিনতে পেরেও তা গ্রহণে গড়িমসি করে না। না সে লোভী হবে, আর না ভাসাভাসা জ্ঞান দিয়ে বিচার করবে। সন্দেহজনক বিষয়ে সে থমকে যাবে, যুক্তি-প্রমাণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে এবং ফরিয়াদির দীর্ঘ কৈফিয়ত শোনার জন্য সে থাকবে মানসিকভাবে প্রস্তুত। সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ এবং বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মিথ্যা থেকে সত্য উদ্ঘাটনের কাজে তাকে অবশ্যই ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। রায় প্রকাশের সময় সে হবে নির্ভীক। তোষামোদে গলে যায় আবার প্ররোচনায় পথ হারিয়ে ফেলে—এমন লোক বিচারক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। অবশ্য এই ধরনের লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম।

এরপর সে তার রায় ভালো করে যাচাই করে দেখবে। তাকে এ পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে দিয়ো যাতে তার অসৎ হওয়ার কোনো অজুহাত না থাকে, সেইসাথে মানুষের কাছে তাকে চাইতে না হয়। তাকে এমন পদে বসাবে, যাতে তোমার বিশিষ্টজনদের কেউ তার ওপর ছড়ি ঘোরাতে না পারে। ফলে সে তোমার কাছের লোকদের হম্বিতম্বি থেকে নিরাপদ থাকবে। এ ব্যাপারে তুমি

[২৬৩] আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১০৪

> বিশেষ নজর দিয়ো। কারণ ইতিপূর্বে দেশটা মন্দ লোকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, যারা নিজেদের খেয়ালখুশি অনুসারে দেশ চালাত এবং এর মাধ্যমে দুনিয়া কামাই করত।'[২৬৪]

প্রাদেশিক শাসক, বিচারক এবং কর্মচারীদের কাছে আলি ﷺ অনেক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেগুলোতে ছিল সীরাতে মুসতাকিমের ওপর অবিচল থাকা এবং শরীয়ত বাস্তবায়ন করার জন্য উৎসাহ প্রদান। জুলুম, সীমালঙ্ঘন এবং বাড়াবাড়ির ব্যাপারে তিনি সতর্ক করতেন। শরীফ রেজা সংকলিত 'নাহজুল বালাগা' গ্রন্থে এমন অনেক পত্র আছে। তবে তাতে এমন অনেক কথাও আছে—যা আলি ﷺ-এর বক্তব্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেটা তাঁর বক্তব্য নয়। সঠিক এবং ভুলের পার্থক্য তাতে করা হয়নি।

❁ বিচারের উৎস

নববি যুগে যেসব উৎসের ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং তাঁর নিয়োগকৃত বিচারকরা নির্ভর করতেন, রাশিদুন যুগের বিচারকরাও সেসব উৎসের প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। অর্থাৎ কিতাব, সুন্নাহ এবং গবেষণা ছিল নববি যুগের বিচারের উৎস। তবে রাশিদুন যুগে দুটি বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল।

☑ প্রথমত : ব্যক্তিগত গবেষণা এবং সে অনুপাতে কাজের বিকাশ ঘটেছিল। সৃষ্টি হয়েছিল গবেষণার ভূমিকা, মাধ্যম এবং লক্ষ্য। ফলশ্রুতিতে পরামর্শ, উপদেষ্টা পরিষদ, বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্য, অভিমত এবং সাদৃশ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়।

☑ দ্বিতীয়ত : নববি যুগে ছিল না এমন কিছু নতুন উৎস প্রকাশিত হয়। সেটা হলো এক খলিফার যুগ থেকে অন্য খলিফার যুগের মধ্যকার সৎ পূর্বসূরি তথা সাহাবি এবং তাবিয়ি থেকে প্রকাশিত বিচারের ফয়সালা।

তাহলে রাশিদুন যুগে বিচারের ছয়টি উৎস পাওয়া গেল : কুরআন, সুন্নাহ, ইজতিহাদ, ইজমা, কিয়াস (সাদৃশ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত) এবং পূর্ববর্তী বিচারকের ফয়সালা। তবে সবগুলোই মাসআলা, ফয়সালা এবং বিধানাবলি সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ আর পরামর্শের অধীনে ছিল। এই উৎসগুলোর সমর্থনে অনেক সুস্পষ্ট বক্তব্য আর বর্ণনা পাওয়া যায়। আমরা এখানে সেগুলোর একাংশ উল্লেখ করব :

(১) মাইমুন ইবনু মিহরান ﷺ বলেন, আবু বকর ﷺ-এর কাছে কোনো মোকদ্দমা এলে তিনি প্রথমে কিতাবুল্লাহতে (এর হুকুম) খোঁজ করতেন। বিষয়টি সেখানে পেয়ে গেলে তিনি সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিতেন। পক্ষান্তরে তা যদি কিতাবুল্লাহতে না থাকত, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ

[২৬৪] নাহজুল বালাগাহ বিশারহি ইবনিল হাদীদ : ১৭/৫৮

তাঁর জানা থাকলে তদনুযায়ী এর ফয়সালা করে দিতেন। এ ব্যাপারে সফল না হলে সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করার জন্য তিনি বেরিয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, 'আমার কাছে এমন এমন মোকদ্দমা এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে কিভাবে ফয়সালা করেছেন, তা আপনারা জানেন কি?' তখন সাহাবিরা দলে দলে তাঁর কাছে একত্র হতেন। তাঁদের প্রত্যেকেই উল্লেখিত বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর ফয়সালা বর্ণনা করতেন। তখন আবু বকর ؓ বলতেন, 'আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদের মাঝে এমন লোকের ব্যবস্থা করেছেন, যারা নবি ﷺ-এর বক্তব্য সংরক্ষণ করে রাখে।'

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহতে এ বিষয়ে কোনো ফয়সালা পেতে ব্যর্থ হলে তিনি সাহাবিদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ আর নেতৃস্থানীয়দের একত্রিত করে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁরা সবাই একটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছলে তার ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন।[২৬৫]

অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, উমর ؓ যদি কুরআন-সুন্নাহর মাঝে কোনো সমাধান না পেতেন, তাহলে জানতে চাইতেন, 'এ ব্যাপারে কি আবু বকরের কোনো সিদ্ধান্ত আছে?' আবু বকর ؓ-এর কোনো সিদ্ধান্ত পেয়ে গেলে উমর ؓ সেটার অনুসরণ করতেন। আর না পেলে আলিমদের একত্র করে পরামর্শ করতেন। এরপর তাদের সম্মিলিত মতানুসারে ফয়সালা দিতেন।[২৬৬]

তাহলে ফয়সালার উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ, উপদেষ্টা পরিষদ, ঐকমত্য, পূর্ববর্তী ফয়সালা, গবেষণা এবং অভিমত।

(২) শাবি ؓ সূত্রে বর্ণিত আছে, শুরাইহের কাছে উমর ؓ লিখেছিলেন, 'তোমার কাছে যদি এমন মোকদ্দমা আসে যার বিবরণ আল্লাহর কিতাবে নেই, আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও তেমন কোনো ফয়সালা করেননি, এমনকি ন্যায়পরায়ণ বিচারকরাও এমন কোনো ফয়সালা করেননি, তাহলে তুমি দুটি কাজের কোনো একটি করতে পারো। ইচ্ছে হলে আগ বেড়ে নিজের গবেষণাপ্রসূত রায় প্রদান করবে। অথবা তুমি চাইলে আমার সাথে পরামর্শ করতে পারো। আমার মনে হয়, আমার সাথে পরামর্শ করাটাই তোমার জন্য নিরাপদ হবে।'[২৬৭]

অন্য বর্ণনামতে উমর ؓ বলেছিলেন, 'তোমার কাছে যদি এমন মোকদ্দমা আসে যার বিবরণ আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যাচ্ছে না, আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও তেমন কোনো ফয়সালা করেননি, তাহলে আলিমগণের ঐকমত্য অনুসারে ফয়সালা করবে। আর যদি এমন হয় যে তার বিবরণ আল্লাহর কিতাবে নেই, আল্লাহর রাসূল

---

[২৬৫] সুনানুদ দারিমি : ১৬৩; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৬৫; তারীখুল কাদা, পৃ. ২০
[২৬৬] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৬৬
[২৬৭] আখবারুল কুদাত লি ওয়াকি : ২/১৮৯

ﷺ-ও তেমন কোনো ফয়সালা করেননি, এমনকি এ বিষয়ে কেউই কিছু বলেননি, তাহলে দুটি কাজের কোনো একটি করার অধিকার তোমার আছে। ইচ্ছে হলে আগ বেড়ে নিজের গবেষণাপ্রসূত রায় প্রদান করবে। নয়তো বিষয়টি এড়িয়ে যাবে। আমার মনে হয় এড়িয়ে যাওয়াই তোমার জন্য ভালো হবে।'[২৬৮]

এক বর্ণনাতে আছে, শুরাইহ বলেন, উমর ﵁ আমাকে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কিতাবের যতটা তোমার কাছে স্পষ্ট, তদনুযায়ী ফয়সালা করবে। গোটা কিতাবুল্লাহ যদি তোমার জানা না থাকে, তাহলে আল্লাহর রাসূলের যতটা তোমার কাছে স্পষ্ট, সে অনুযায়ী ফয়সালা করবে। আল্লাহর রাসূলের সমস্ত ফয়সালা তোমার জানা না থাকলে হিদায়াতপ্রাপ্ত নেতাদের রায়ের যতটা তোমার কাছে স্পষ্ট, সে অনুযায়ী ফয়সালা কোরো। হিদায়াতপ্রাপ্ত নেতাদের সব রায় তোমার যদি জানা না থাকে, তাহলে নিজের গবেষণা অনুযায়ী অভিমত প্রকাশ করবে এবং আলিম ও নেককার লোকদের সাথে পরামর্শ করবে।'[২৬৯]

অন্য বর্ণনামতে উমর ﵁ বলেছিলেন, 'আল্লাহর কিতাব তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলে এ ব্যাপারে আর কাউকে প্রশ্ন কোরো না। স্পষ্ট না হলে হাদিস খোঁজ করবে। হাদিস না পেলে তখন নিজের গবেষণাপ্রসূত রায় দেবে।'[২৭০]

(৩) ইবনু সীরিন ﵀ বলেন, 'অজানা বিষয়ে আবু বকর ﵁ অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠাবান কেউ নেই। আবার আবু বকর ﵁-এর পর উমর ﵁-এর চেয়ে অধিক নিষ্ঠার পরিচয়ও কেউ দিতে পারবে না। আবু বকর ﵁-এর কাছে যখন কোনো মোকদ্দমা আসত, কিন্তু কুরআনে সেটার কোনো মূলনীতি এবং হাদিসে সে সম্পর্কিত কোনো নির্দেশনা তাঁর নজরে আসত না, তখন তিনি নিজের গবেষণাপ্রসূত অভিমত প্রকাশ করতেন। আর বলতেন, "এটা আমার অভিমত। সঠিক হলে তা আল্লাহর তরফ হতে। আর ভুল হলে আমার পক্ষ থেকে। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"'[২৭১]

(৪) ইবনু শিহাব যুহরি ﵀ সূত্রে বর্ণিত আছে, উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে লোকসকল! আল্লাহর রাসূল ﷺ যেসব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেসবই নির্ভুল। কেননা আল্লাহ তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতেন। পক্ষান্তরে আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ধারণা আর কৃত্রিমতার পর্যায়ভুক্ত।'[২৭২]

উমর ﵁ সূত্রে সুফইয়ান সাওরি ﵀ বলেছেন, 'এটা উমরের অভিমত। সঠিক

---

[২৬৮] আখবারুল কুদাহ লিওয়াকি : ২/১৯০

[২৬৯] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/২২৪; আল-কাদা ফিল ইসলাম, পৃ. ২১

[২৭০] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৯১

[২৭১] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৫৭ এবং ৮৮

[২৭২] সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৮৬; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৫৭

হলে তা আল্লাহর তরফ থেকে। আর যদি ভুল হয় তবে উমরের পক্ষ থেকে।'[২৭৩]

(৫) ইবনুল কাইয়িম বলেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর উমর বলেছিলেন, 'আবু বকরের মত খণ্ডন করার ব্যাপারে তো আল্লাহর সামনে আমি লজ্জিত অনুভব করব।'[২৭৪] শুরাইহের কাছে প্রেরিত তাঁর আরেকটি পত্রে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলার কিতাব অনুসারে ফয়সালা করবে। তাতে না থাকলে রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ অনুসারে করবে। তাতে না থাকলে সৎ ব্যক্তিদের ফয়সালা অনুপাতে ফয়সালা কোরো।'[২৭৫]

(৬) উসমান -এর যুগে ফয়সালার উৎস এবং বিচারের উৎস ছিল প্রথম খলিফা দুজনের যুগের মতোই। উসমান নিজেও যে তাঁদের পূর্ণ অনুসরণ করতেন, সেটা তাঁর খিলাফতের বাইয়াতের সময়কার ঘটনা থেকেই ফুটে ওঠে।

আবু ওয়াইল বলেন, আবদুর রহমান ইবনু আউফ -কে আমি বলেছিলাম, 'আপনি আলির পরিবর্তে উসমানকে খলিফা নিযুক্ত করলেন কেন?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো চেষ্টার কমতি করিনি। প্রথমে তো আলির কাছেই গিয়েছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম, "আপনি কি কুরআন, সুন্নাহ এবং আবু বকর আর উমরের জীবনচরিত অনুসারে চলার জন্য আমার বাইয়াত গ্রহণ করবেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করব।" তারপর উসমানের কাছে একই কথা বললে তিনি সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন।'[২৭৬]

(৭) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব আলি -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এমন অনেক বিষয় আমাদের সামনে আসে, যে সম্পর্কে কুরআনে কিছু অবতীর্ণ হয়নি, এমনকি সে বিষয়ে আপনার কোনো সুন্নাহও পাওয়া যায় না।" উত্তরে তিনি বললেন, "আলিমদের বা ইবাদতগুজার মুমিনদের একত্র করে তোমাদের উপদেষ্টা বানিয়ে নেবে। তাতে একজনের মতের মাধ্যমে অপরের মত খণ্ডন করবে না।"'[২৭৭]

(৮) সাহাবিদের অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেছেন, 'কেউ যদি আদর্শ গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তার উচিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের আদর্শ গ্রহণ করা। কারণ তাঁরা এই উম্মতের মাঝে সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী। তাঁদের ইলম সবচেয়ে গভীর। তাঁদের মাঝে লৌকিকতা কম। তাঁরা সঠিক পথের দিশাপ্রাপ্ত এবং সর্বোত্তম মানুষ। নবিজির সংস্পর্শ এবং দ্বীন

---

[২৭৩] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৫৮
[২৭৪] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/২২৪
[২৭৫] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ২/১৮৬, ২৩৬
[২৭৬] তারীখুল খুলাফা লিস সুয়ূতি, পৃ. ১৫৪
[২৭৭] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৬৮

কায়েমের জন্য আল্লাহ তাঁদের নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করো এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। কেননা তাঁরাই সঠিক পথে অবিচল আছে।'[২৭৮]

সারকথা, নববি যুগের বিচারের উৎসই কিছুটা বিশদ আকারে রাশিদুন যুগে বিচারের উৎস ছিল। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ এবং গবেষণা। তবে এই গবেষণার মাঝে কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন ঘটায় নববি যুগের তুলনায় তাতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। গবেষণার পদ্ধতিও তখন কিছুটা ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন,

▪ (ক) ইজমা তথা বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্য

কুরআন-সুন্নাহর মাঝে ফয়সালার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া না গেলে বিচারক তখন আলিমদের শরণাপন্ন হতেন। সাহাবি আর ফিকহবিদদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করে তাঁদের পরামর্শ চাইতেন। পর্যালোচনা-গবেষণা করে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন, সেটাই হলো ইজমা তথা ঐকমত্য। অর্থাৎ কোনো শারঈ বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মাদির গবেষকদের একমত পোষণ করা। এটা হচ্ছে শরীয়তের তৃতীয় উৎস। যা রাশিদুন যুগে প্রথম প্রকাশ পায়। এ ব্যাপারে অনেক সুস্পষ্ট হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ফিকহ ও ফিকহের মূলনীতির গ্রন্থ এবং শরীয়তের ইতিহাসে এ সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনা পাওয়া যায়।

তবে ফয়সালা এবং মাসআলার ক্ষেত্রে ইজমা বা ঐকমত্য খুব কমই সংঘটিত হয়েছে। কারণ খিলাফতের রাজধানী মদীনা মুনাওয়ারাতে অনেক সাহাবি, আলিম এবং ফিকহবিদগণ বসবাস করতেন। তাই সেখানে যেমন ঐকমত্য হওয়া সম্ভব ছিল, অন্যান্য শহরে তেমনটা ছিল না।

মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই না থাকলে তার মা ত্যাজ্য সম্পত্তির ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) পাবেন। পক্ষান্তরে কয়েকজন ভাই থাকলে মায়ের অংশ কমে ১/৬ (এক-ষষ্ঠাংশ) হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ একবার খলিফা উসমান ﷺ-কে বলেছিলেন, 'আরবিতে أَخٌ (ভাই) শব্দটির দ্বিবচন বোঝাতে أَخَوَانِ ব্যবহৃত হয়। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত আয়াতটিতে বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তির কয়েকজন ভাই থাকলে তার মা ১/৬ পাবেন।[২৭৯] এখানে إِخْوَةٌ (কয়েকজন ভাই) তথা বহুবচনের শব্দ এসেছে। কিন্তু দুজন ভাই থাকলেও মৃত ব্যক্তির মায়ের হিস্যা ১/৩ থেকে ১/৬ হয়ে যায় কেন?'[২৮০] উত্তরে উসমান ﷺ বলেছিলেন, 'প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে

[২৭৮] আল-জামিউ লিআহকামিল কুরআন : ১/৬০

[২৭৯] সূরা নিসা (৪) এর ১১ নং আয়াতের কথা বলা হয়েছে। — অনুবাদক

[২৮০] বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় বচন দুই প্রকার হলেও আরবি ভাষায় বচন তিন প্রকার। এ কারণেই ইবনু আব্বাস ﷺ প্রশ্নটি করেছিলেন। — অনুবাদক

আমার পূর্ববর্তীদের যুগ থেকে যে রীতি চলে আসছে, তা থেকে তো আমি সরতে পারি না।'[২৮১]

অর্থাৎ ইবনু আব্বাস ﷺ প্রশ্ন করার আগেই এ বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে। সুতরাং তার প্রশ্নের কারণে এখানে মাসআলার রদবদল হবে না।

পরামর্শ, গবেষণা এবং ঐকমত্য হচ্ছে ইজমার প্রধান তিন উপকরণ। এই উপকরণ তিনটির কোনো একটি না পাওয়া গেলে বিচারক পরবর্তী উৎসের দিকে মনোনিবেশ করবেন।

▪ (খ) পূর্ববর্তী ফয়সালা

অর্থাৎ বিগত খলিফা, নেককার ব্যক্তি এবং প্রবীণ সাহাবিদের ফয়সালা আছে কি না, তা যাচাই করা। যেমন আবু বকর ﷺ-এর রায় এবং বিচারক ও প্রাদেশিক শাসকদের প্রতি তাঁর নির্দেশনা সম্পর্কে উমর ﷺ-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তদ্রূপ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-ও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'আলি ﷺ-এর কোনো ফয়সালা বা ফতোয়ার কথা যদি আমরা জানতে পারি, তাহলে সেটা টপকে অন্য কারও ফয়সালা বা ফতোয়ার দিকে আমরা যাব না।'[২৮২]

এ বিষয়টি ইবনুল কাইয়িমও সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। *'সাহাবিদের অভিমত আমাদের নিজেদের অভিমত অপেক্ষা শ্রেয়'*—এই শিরোনামের অধীনে তিনি লিখেছেন, 'যারা এই স্তরভুক্ত, তাঁদের অভিমত তো আমাদের জন্য আমাদের নিজেদের অভিমত অপেক্ষা উত্তম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেনই-বা তাঁদের অভিমত উত্তম হবে না? সেসব তো এমন অন্তর থেকে এসেছে—যা নূর, ঈমান, ইলম ও হিকমত দিয়ে পরিপূর্ণ। সেসব অন্তরের ধারকগণ তো স্বয়ং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল থেকে ইলম ও ফাহম তথা জ্ঞান ও বুঝ লাভ করেছেন। তাঁদের মাঝে ছিল উম্মতের প্রতি কল্যাণকামিতা। তাঁদের অন্তর এবং রাসূলের অন্তর ছিল সরাসরি। রাসূল ﷺ এবং তাঁদের মাঝে কোনো গ্যাপ ছিল না। নবুওয়তের দীপাধার থেকে সতেজ ঈমান এবং টাটকা ইলম তাঁরা ধারণ করতেন। যার মাঝে কোনো ধরনের সংশয় বা আপত্তি ছিল না। বৈপরীত্যের মাধ্যমে যা কলুষিত হয়নি। সুতরাং যে কিয়াস তাঁদের অভিমতের পরিবর্তে অন্যদের অভিমতে সমৃদ্ধ, সেটা সুশৃঙ্খল কিয়াস নয়।'[২৮৩]

▪ (গ) কিয়াস

পূর্ববর্তী ফয়সালাও তেমন পাওয়া যেত না। বিচারক যদি কুরআন-সুন্নাহর

---

[২৮১] আল-মুহাল্লা : ৯/২৫৮

[২৮২] আখবারুল কুদাত ওয়াকি : ১/৯১

[২৮৩] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৮৭

সুস্পষ্ট বক্তব্য অথবা ইজমা কিংবা পূর্ববর্তী ফয়সালা না পেতেন, তখন তিনি মুআয رضي الله عنه-এর মতো ইজতিহাদ বা গবেষণার ওপর নির্ভর করতেন। গবেষণার প্রথম স্তর ছিল সুস্পষ্ট বক্তব্যবিহীন মাসআলাকে সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে এমন মাসআলার সাথে তুলনা বা কিয়াস করা। এটা শরীয়ত, ইসলামি ফিকহ এবং বিধানাবলির চতুর্থ উৎস। আবু মূসা আশআরি رضي الله عنه-কে এটার নির্দেশনা দিয়ে উমর رضي الله عنه বলেছিলেন, 'এরপর বিষয়গুলো পরস্পর তুলনা (কিয়াস) করবেন। অনুরূপ বিষয়গুলো তখন ভুলে যাবেন না যেন। তারপর যে বিষয়টি আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় এবং ন্যায়ের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ বলে মনে করবেন, সেটির ওপরই নির্ভর করবেন।'[২৮৪]

ইবনুল কাইয়িম رحمه الله *'আকস্মিক ঘটনার ক্ষেত্রে সাহাবিদের ইজতিহাদ এবং তাঁদের কিয়াস অবলম্বন'*—এই শিরোনামের অধীনে বিষয়টির বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণ আকস্মিক ঘটনার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতেন। কিছু বিধানকে কিছু বিধানের সাথে কিয়াস করা এবং কোনো বিধানকে তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিধানের সাথে মিলানো ছিল তাঁদের রীতি। আলি رضي الله عنه বলেছেন, দাবির সপক্ষে প্রমাণ পেশ এবং কল্যাণের দিকটি লক্ষ করে ব্যক্তির সপক্ষে ফয়সালা দেওয়া হবে। এমনটা না থাকলে মোকদ্দমাটি উপেক্ষা করা হবে। সত্য জানা যাবে জ্ঞানীদের কাছে তুলনার মাধ্যমে।'[২৮৫]

▪ (চ) রায় বা অভিমত

মোকদ্দমার বিষয়টির যদি সুস্পষ্ট বক্তব্যের সাথে তুলনাযোগ্য কোনো মূলনীতি না থাকে, তাহলে বিচারক গবেষণা করে এমন একটি অভিমত প্রদান করতেন—যা ন্যায়, ইনসাফ এবং নির্ভুলের কাছাকাছি হয়। এ ক্ষেত্রে শারঈ নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের উদ্দেশ্যের অনুকূলে তার অবস্থান থাকত। বিচারক শুরাইহ-সহ অন্যদের কাছে উমর رضي الله عنه-এর প্রেরিত পত্রাদিতে এ বিষয়টি তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন।[২৮৬]

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা উল্লেখ করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه-এর কাছে কোনো বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি কিতাবুল্লাহর মাঝে উত্তর খোঁজ করতেন। সেখানে পেয়ে গেলে জবাব দিয়ে দিতেন। অন্যথা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর মাঝে দেখতেন। সেখানে পেয়ে গেলে জবাব দিয়ে দিতেন। সেখানেও না পেলে দেখতেন, আবু বকর এবং উমর رضي الله عنهما এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন কি না। তাঁদের

---

[২৮৪] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৯২

[২৮৫] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/২২২

[২৮৬] অভিমত অনুসারে ফয়সালা এবং গবেষণা করা বলে প্রশংসিত অভিমত উদ্দেশ্য। যে নিন্দনীয় অভিমত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেটা এখানে উদ্দেশ্য নয়। এই দুই ধরনের অভিমতের পার্থক্য নিরূপণে আলিমগণ অনেক ধরনের মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। প্রয়োজনে ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৭০ দেখুন।

কোনো বক্তব্য না পেলে অবশেষে নিজের গবেষণাপ্রসূত রায় প্রদান করতেন।[২৮৬]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, 'কারও কাছে মোকদ্দমা পেশ করা হলে সে যেন আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করে। আল্লাহর কিতাবে নেই—এমন বিষয় উপস্থাপিত হলে নবি ﷺ-এর বিচারকার্য অনুপাতে ফয়সালা করবে। এমন মোকদ্দমা যদি সামনে আসে—যার বিবরণ আল্লাহর কিতাবেও নেই, আবার নবিজিও তেমন বিচারকার্য পরিচালনা করেননি, তবে নেককার ব্যক্তিদের কথা অনুসারে ফয়সালা করবে। আর যদি এমন মোকদ্দমা সামনে আসে—যার বিবরণ আল্লাহর কিতাবেও নেই, নবিজিও তেমন কোনো বিচারকার্য পরিচালনা করেননি, এমনকি নেককার ব্যক্তিরাও সে ব্যাপারে কিছু বলেননি, তাহলে নিজের ইজতিহাদ অনুপাতে ফয়সালা করবে। কেউ যদি ভালোমতো গবেষণা করতে না পারে, তাহলে লজ্জা কাটিয়ে বিষয়টি স্বীকার করে নেবে।'[২৮৮]

এখানে শেষ বাক্যটি অন্য বর্ণনায় এসেছে এভাবে, 'কেউ যদি ভালোমতো গবেষণা করতে না পারে, তাহলে লজ্জা না করে উঠে যাবে।'[২৮৯]

একবার এক মহিলার স্বামী তাকে সঙ্গদানের আগেই মৃত্যুবরণ করে। তখন মহিলাটি স্বামীর উত্তরাধিকার এবং মাহর পাবে কি না, এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়। প্রথমে তিনি এ মাসআলার সমাধান দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপর লোকদের পীড়াপীড়িতে এক মাস সময় চেয়ে নেন। দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর অবশেষে তিনি বলেন, 'এ ক্ষেত্রে আমি নিজের গবেষণা অনুসারে মতামত দিচ্ছি। সঠিক হলে সেটা আল্লাহর তরফ থেকে, আর ভুল হলে সেটি আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে দায়মুক্ত। মহিলাটি মাহরে মিসিল পাবে। কোনো ধরনের অবমূল্যায়ন বা কমতি করা হবে না। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতেও তার অংশ থাকবে। সেইসাথে ইদ্দত পালন করাও তার জন্য আবশ্যক হবে।'

আবদুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনে আশজা গোত্রীয় কিছু লোক দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের গোত্রের বারওয়া বিনতু ওয়াশিক নামের এক মহিলার ক্ষেত্রেও নবি ﷺ এমনটাই রায় দিয়েছিলেন।'

এ কথা শুনে ইবনু মাসউদ ﷺ-এর আনন্দের সীমা ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর সেদিনটিই ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি আনন্দের দিন।[২৯০]

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, নিজ গবেষণাপ্রসূত অভিমত প্রকাশ করার সময়

---

[২৮৭] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৬৭

[২৮৮] আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন : ৭০৩৩

[২৮৯] আখবারুল কুযাত লি ওয়াকি : ১/৭৬; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৬৭

[২৯০] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৬৭ ও ৮৭

আবু বকর ﷺ বলতেন, 'এটা আমার অভিমত। সঠিক হলে তা আল্লাহর তরফ হতে। আর ভুল হলে আমার পক্ষ থেকে। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'[২১]

পরামর্শ এবং উপদেষ্টা পরিষদ ছিল বিচারকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। পূর্বে এ সংক্রান্ত বর্ণনা, পত্র এবং ফরমান আমরা উল্লেখ করেছি। দ্বীনের সুগভীর পাণ্ডিত্য থাকার পরও উমর ﷺ নিজে পরামর্শের ব্যাপারে যত্নবান থাকার পাশাপাশি অন্যদেরও এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিতেন। প্রবীণ সাহাবি এবং ফিকহবিদদের সাথে পরামর্শ না করে তিনি সাধারণত ফয়সালা করতেন না।

শাবি ﷺ বলেছেন, উমর ﷺ-এর কাছে মোকদ্দমা আসত। অনেক সময় রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি এক মাস পর্যন্ত চিন্তাভাবনার সময় নিতেন এবং সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন। 'ধীরস্থিরতা আল্লাহর তরফ থেকে এবং তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে'—এই হাদিসের ওপর তাঁর আমল ছিল। আবু বকর এবং উমর ﷺ উভয়েই উসমান ইবনু আফফান ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করতেন। বড় বড় আর গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ তাঁর পরামর্শ মোতাবেক করেছেন।[২২]

একই অভ্যাস উসমান ﷺ-এরও ছিল। আবদুল্লাহ বা আবদুর রহমান ইবনু সাঈদ ﷺ বলেছেন, উসমান ﷺ একদিন মসজিদে ছিলেন। এমন সময় দুজন লোক তাঁর কাছে মোকদ্দমা নিয়ে এল। খলিফা তখন একজন লোককে বললেন, 'যাও, আলিকে ডেকে আনো।' আরেকজনকে বললেন, 'তালহা, যুবাইর এবং আবদুর রহমানকে ডেকে আনো।' সবাই এসে বসলে খলিফা তখন বাদী-বিবাদীর কথা শুনলেন। তারপর ডাকিয়ে আনা সাহাবিদের বললেন, 'আমাকে পরামর্শ দিন।' তাঁদের বক্তব্য খলিফার মতের অনুকূলে হলে তিনি তৎক্ষণাৎ ফয়সালা করে দিতেন। অন্যথা চিন্তাভাবনা করার জন্য কিছুটা সময় নিতেন। আগত সাহাবিরাও বিষয়টি খলিফার কাছে ন্যস্ত করে চলে যেতেন।[২৩]

উবাই, যায়িদ, ইবনু উমর, ইবনু আব্বাস এবং আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রেও এমনটা বর্ণিত আছে।[২৪]

রাশিদুন যুগে বিচারের পরিধি

রাশিদুন যুগে বিচারকের জন্য সময়সীমা নির্ধারণের কোনো ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে দিনের একাংশের জন্য একজন এবং অপরাংশের জন্য

[২১] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৮৮; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ৯৪
[২২] আল-মাবসুত লিসসারাখসি : ১৬/৮৪; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১০২, ১০৩ এবং ১০৫
[২৩] আখবারুল কুদ্বাহ লিওয়াকি : ১/১১০; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৪৬
[২৪] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৬৭-৬৮

আরেকজন বিচারক—এভাবে নিযুক্ত করা হতো না। আবার এমনও হতো না যে, সপ্তাহের কয়েকদিন একজন আর অবশিষ্ট দিনগুলো আরেকজন বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বরং সময়ের বিচারে বিচারকের দায়িত্ব পালনের সময় ছিল সর্বজনীন এবং পরিব্যাপ্ত।

তবে নববি যুগের মতো রাশিদুন যুগেও বিচারের স্থানগত পরিসীমা নির্দিষ্ট ছিল। বিচারক নিযুক্ত করার সময় খলিফা বা প্রশাসক তাকে নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা নগর, অথবা পূর্ণ অঞ্চলের দায়িত্ব প্রদান করতেন। মদীনা মুনাওয়ারায়, মক্কায়, কুফাতে, বসরায়, শামে, ফিলিস্তিনে, মিশরে, ইয়ামানে, ইয়ামানের এক অঞ্চলে, হাদরামাউতে এবং বাহরাইনে বিচারক নিযুক্তির আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। আবার উমর এবং উসমান رضي الله عنهما-এর যুগে মদীনাতে একাধিক বিচারক নিযুক্ত ছিল। খলিফা ছাড়া তারাও বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। সে হিসেবে আলি এবং যায়িদ رضي الله عنهما ছিলেন মদীনার বিচারক।

আবুস সাইব ইয়াজিদ ইবনু উখতিন নামির এবং আবুদ দারদা رضي الله عنهما-কে খলিফা উমর رضي الله عنه মদীনাতে বিচারকার্য পরিচালনায় নিয়োগ দিয়েছিলেন। যায়িদ এবং আলি رضي الله عنهما তো আগে থেকেই সেখানকার বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[২৯৫]

বিচারকার্যের ধরন হিসেবে তাদের কাজ বিভক্ত ছিল। আবু মূসা আশআরি এবং মুআয ইবনু জাবাল رضي الله عنهما একই সময়ে ইয়ামানের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ নির্ধারিত অংশের দায়িত্ব পালন করতেন। আবু মূসা আশআরি رضي الله عنه তো উমর رضي الله عنه-এর খিলাফতকাল অবধি ইয়ামানের অর্ধেকে বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন।

রাশিদুন যুগে বিচারকের ধরন বা প্রকার নির্দিষ্ট করার বিষয়টি ছিল সুস্পষ্ট। খলিফার স্থলবর্তী বা প্রতিনিধি রূপে বিচারককে বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। তবে খলিফা চাইলে স্থলবর্তী এবং প্রতিনিধিকে কোনো ধরনের শর্তারোপ করতে ও তার পরিধি নির্দিষ্ট করে দিতে পারতেন। বিচারের প্রকার নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হতো। যেমন,

☑ (১) উমর رضي الله عنه এবং উসমান رضي الله عنه-এর যুগে আবুদ দারদা رضي الله عنه-কে সামরিক বাহিনীর বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল। সৈন্যদের অবস্থান করা বা যাওয়ার সময় তাদের মাঝে সংঘটিত বিরোধের বিষয়টি তিনি দেখতেন।[২৯৬]

আবু যুরআহ رحمه الله উল্লেখ করেছেন, আবুদ দারদা رضي الله عنه-কে উমর رضي الله عنه দামিস্কের বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন।[২৯৭]

---

[২৯৫] ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২২০; আখবারুল কুদ্বাহ লিওয়াকি : ১/১০৫

[২৯৬] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৫৮; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১১৯

[২৯৭] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৪১৩

☑ (২) হদ, কিসাস এবং অপরাধ সংক্রান্ত বড় বড় আর গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমাগুলো সাধারণত খলিফার পক্ষ থেকে রাজধানীতে নিরসন করা হতো। এ ব্যাপারে উসমান ﷺ সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। আবু বকর ﷺ তো তাঁর খিলাফতকালে বিষয়টি উমর ﷺ-এর দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর উমর ﷺ এবং আলি ﷺ মাঝে মাঝে হদ এবং অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়টি দেখতেন। আবার ঝামেলার সম্ভাবনা থাকলে কোনো কোনো প্রশাসকও তার নিরসন করে দিতেন। কেননা বড়সড় অপরাধের বিচার করতে গেলে বিচারকের প্রভাব এবং ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। স্বভাবতই প্রশাসন এ ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে থাকে। অবশ্য খলিফা বা প্রশাসক বিষয়টি অনেক সময় বিচারকের দায়িত্বেই ছেড়ে দিতেন।

☑ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলিফা এবং প্রশাসকরা সাধারণত অভিযোগের তদন্ত এবং দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত বিচারকার্য নিজেরাই পরিচালনা করতেন। কিংবা এ কাজের জন্য বিশেষ বিচারক নিয়োগ দিতেন।

☑ (৩) অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয়ের জন্য বিচারক নিযুক্ত করা। যেমন উমর ﷺ খলিফা হওয়ার পরে ইয়াজিদ ইবনু উখতিন নামির (ইয়াজিদ ইবনু সাঈদ) ﷺ-কে বলেছিলেন, 'ছোটখাটো কিছু বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য কোরো।'[২৯৮] অন্য বর্ণনামতে উমর ﷺ বলেছিলেন, 'ছোটখাটো বিষয়ের দায়িত্ব তোমার।' তখন থেকে ইয়াজিদ ﷺ দিরহাম এবং অন্যান্য বিষয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[২৯৯]

☑ (৪) দরকারি আর প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিচারক নিয়োগ দেওয়া। উমর ﷺ সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির প্রচলন করেন। কুফায় নিযুক্ত প্রশাসককে সমাজে ঘটে যাওয়া বড় বড় অপরাধের বিচার করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি। উসমান ﷺ খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর আবু মূসা আশআরি ﷺ-কে বসরার বিচারক ও এই পদে বহাল রাখেন।[৩০০]

যুহরি এবং ইবনুল মুসাইয়িব সূত্রে বর্ণিত আছে, উমর ﷺ তাঁর খিলাফতকালে আলি ﷺ-কে গুরুত্বপূর্ণ বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। কারণ আলি ﷺ ছিলেন বিচারকার্য পরিচালনায় সাহাবিদের মাঝে সর্বাধিক পারদর্শী।[৩০১]

তবে এই ধরন বা প্রকার নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল ব্যতিক্রমী বিষয়। এমন পরিস্থিতি খুব কমই হতো। আবার সেটাও হতো নিতান্তই সীমিত পরিসরে। রাশিদুন যুগের স্বাভাবিক নীতি অনুসারে বিচারক সব ধরনের বিচারে পারদর্শী

---

[২৯৮] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০৫; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১২।

[২৯৯] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০৬

[৩০০] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৫৮; আখবারুল কুদ্বাহ : ১/২৭৪

[৩০১] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২৫৬

থাকতেন। অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শারীরিক, অপরাধ সংক্রান্ত, কিসাস এবং হদ সংক্রান্ত বিচার করতেন। খলিফাগণ বিচারক নিয়োগ দানের সময় কোন ধরনের বিচার করতে হবে সেটা নির্দিষ্ট করে দিতেন না। জটিল, কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্ট নয় ও গবেষণা নির্ভর—এমন বিষয়েই কেবল খলিফার শরণাপন্ন হতে বলতেন। শরণাপন্ন হওয়ার ব্যাপারটিও থাকত একান্তই ঐচ্ছিক। নির্দেশনা হিসেবে আন্তরিকতার কারণেই খলিফা মূলত পরামর্শটি দিতেন। যা পালন করা আবশ্যক ছিল না। আমরা আগে শুরাইহের উদ্দেশ্যে উমর ﷺ-এর পত্রটি উল্লেখ করেছি। তাতে এ কথা ছিল, 'ইচ্ছে হলে আগ বেড়ে নিজের গবেষণাপ্রসূত রায় প্রদান করবে। অথবা তুমি চাইলে আমার সাথে পরামর্শ করতে পারো। আমার মনে হয়, আমার সাথে পরামর্শ করাটাই তোমার জন্য নিরাপদ হবে।'[৩০২]

বিভিন্ন শহর আর অঞ্চলের বিচারকরা অনেক সময় সরাসরি শারঈ বিধান জানতে বা এ ব্যাপারে ইঙ্গিত পেতে খলিফার শরণাপন্ন হয়ে নানান বিষয়ে পরামর্শ করতেন। আবার কখনো ফয়সালার সংবাদ খলিফা জানতে পারলে তিনিও সেটার অনুমোদন দিতেন। প্রধান মোকদ্দমার ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হতো না। এমন অনেক উদাহরণের মাত্র কয়েকটি আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

ওয়াকি ﷺ বর্ণনা করেছেন, একবার আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-এর কাছে কুরাইশের এক ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অভিযোগে ধরে আনা হয়। আবদুল্লাহ ﷺ তখন তার ব্যাপারে চল্লিশটি বেত্রাঘাতের ফয়সালা দিয়ে জনসম্মুখেই তা কার্যকর করেন। একদল লোক তখন খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর কাছে এ মর্মে অভিযোগ দায়ের করল, 'ইবনু মাসউদ আমাদের একজনকে লাঞ্ছিত করেছে।' খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি নাকি কুরাইশের এক লোককে বেত্রাঘাত করেছেন?' উত্তরে আবদুল্লাহ ﷺ বললেন, 'জি, এমনটাই করেছি।' খলিফা আবার জানতে চাইলেন, 'বিধান কি এটাই?' আবদুল্লাহ বললেন, 'জি, এটাই বিধান।' খলিফা তখন বললেন, 'আপনি তো চমৎকার ফয়সালা করেছেন।'

এ অবস্থা দেখে অভিযোগ দায়েরকারী লোকেরা বলে উঠল, 'আমরা যার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলাম, তার কাছেই দেখি বিধান জানতে চাওয়া হচ্ছে।'[৩০৩]

একবার জনৈক ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে উমর ﷺ-কে বলল, 'আলি ﷺ এবং যায়িদ ﷺ বিষয়ে এমন ফয়সালা করেছেন।' খলিফা বললেন, 'তাদের স্থলে আমি হলে এমনটা না করে অমনটা করতাম।' লোকটি তখন আবদার করল, 'আপনি তো খলিফা। এখন অমনভাবে ফয়সালা করে দিন না!' উমর ﷺ বললেন, 'কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে ফয়সালা করলে আমি অবশ্য তাদের মতোই ফয়সালা করতাম।

[৩০২] আখবারুল কুদ্বাহ লিওয়াকি : ২/১৮৯; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৯০

[৩০৩] আখবারুল কুদ্বাহ লিওয়াকি : ২/১৮৮; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৪৫

তোমাকে যে ফয়সালার কথা বললাম সেটা তো আমার নিজের রায় অনুসারে বলেছি।' এরপর তিনি আগের ফয়সালাই বহাল রাখলেন।[৩০৪]

আবু মূসা আশআরি ﷺ বলেছেন, আমি ইয়ামানের বিচারক থাকাকালীন একজন সন্দেহভাজন গর্ভবতী মহিলাকে আমার কাছে আনা হয়। আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, 'আপনি এমন মহিলাকে প্রশ্ন করেছেন, যে কিনা কোনো স্বামীসঙ্গ ছাড়াই গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। শুনে রাখুন, ইসলাম গ্রহণের পর আমি না কারও সাথে বন্ধুত্ব করেছি আর না ছেলেবন্ধু গ্রহণ করেছি। আসলে বিষয়টি হচ্ছে, একবার আমি ঘরের উঠানে ঘুমিয়ে ছিলাম। আল্লাহর কসম করে বলছি, এমন সময় কেউ এসে আমাকে তুলে আমার পেটে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো কিছু একটা ছুড়ে মারল। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আমি আবছামতো কাউকে দেখেছি। তবে সে মানুষ নাকি অন্য কিছু সেটা বুঝতে পারিনি।'

আবু মূসা ﷺ বলেন, বিষয়টি উমর ﷺ-এর কাছে লিখে জানালে তিনি জবাবে লিখলেন, 'মহিলাটিকে তার গোত্রের কয়েকজন-সহ নিয়ে আমার কাছে এসো।' আমরা সময়মতো তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি কৃত্রিম রাগের স্বরে বললেন, 'মহিলাটির ব্যাপারে আপনি কোনো কথা এড়িয়ে যাননি তো!' আমি বললাম, 'জি না, মহিলাটি এবং তার গোত্রের কয়েকজন লোক তো আমার সাথেই আছে।' তখন তিনি মহিলাটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে আগের মতোই উত্তর দিলো। তার গোত্রের লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারাও মহিলাটি সম্পর্কে ভালো কথা বলল। উমর ﷺ তখন মহিলাটির ওপর কোনো ধরনের হদ কায়েম করলেন না। ওপরন্তু মহিলার সাথে থাকা লোকদের বলে দিলেন, তার সাথে যেন ভালো আচরণ করা হয়।[৩০৫]

আবদুল্লাহ ইবনু শুবরুমাহ বলেন, হামদানের ওয়াদিআ গোত্রে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। বিচারক শুরাইহ ইবনুল হারিস তখন খলিফা উমর ﷺ-এর কাছে সমাধান চেয়ে পত্র লিখলে জবাবে তিনি লিখলেন, 'ওয়াদিআর ৫০ জন লোককে ভালোমতো জিজ্ঞাসাবাদ করো। তারা নিজেরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল না এবং হত্যাকারী সম্পর্কেও তারা কিছু জানে না—এই মর্মে তাদেরকে কসম করতে বলো।' শুরাইহ তখন নির্দেশমতো কাজ করে উমর ﷺ-কে জানালেন। তখন খলিফা লিখে পাঠালেন, 'এই কসমের মাধ্যমে তারা হত্যার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে বটে। কিন্তু রক্তপণ দেওয়া থেকে তারা রেহাই পাবে না। সুতরাং তাদের ওপর তুমি রক্তপণ ধার্য করে দাও।'[৩০৬]

---

[৩০৪] উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ, পৃ. ২৬৩; আল-মাদখাল লিলফিকহিল ইসলাম, পৃ. ৮৭-৮৮; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৬৮; আল-মাদখালুল ফিকহিল আম : ২/৬২২

[৩০৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০১; তারীখুল কাদ্বা, ১২২ ও ১৪৩

[৩০৬] আখবারুল কুদ্বাহ লিওয়াকি : ২/১৯১

তবে অপরাধ এবং হদ সংক্রান্ত মোকদ্দমার স্বল্পতা, এ ব্যাপারে সতর্কতা আর পরামর্শ, এতদসংক্রান্ত খলিফাদের পত্র প্রেরণ এবং সে তুলনায় অর্থনৈতিক আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিরোধের আধিক্য দেখে ধারণা হয় যে, অধিকাংশ বিচারকের পরিধি ছিল শহরকেন্দ্রিক মোকদ্দমার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে ইবনু খালদুন-সহ অনেকেই এ কথা খণ্ডন করেছেন যে, রাশিদুন যুগের বিচারকদের কোনো রকম পরিধি নির্দিষ্ট ছিল না। ইবনু খালদুন বলেন, 'খলিফাদের যুগে বিচারকের দায়িত্ব থাকত কেবল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা। এরপর খলিফা এবং বাদশাহগণ বড় বড় রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে বিচারকরাও বাধ্য হয়ে অন্যান্য কাজে হাত লাগান।'[৩০৭] তবে এ কথা ঢালাওভাবে বলা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিচারকের বেলায় এ কথা প্রযোজ্য হয়। কিন্তু এটা তাদের সর্বজনীন নয়। বিশেষভাবে কোনো কোনো প্রদেশে নির্দিষ্ট কিছু বিচারকের সাথে এমনটা ঘটত।

বিচারের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি

রাশিদুন যুগে বিচারব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এবং বাস্তবধর্মী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেই আমরা এই আলোচনার ইতি টানব। এই অনুচ্ছেদটি আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত।

রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থা ছিল সহজ-সরল। জটিলতা-সহ সব ধরনের কৃত্রিম কর্মপদ্ধতি থেকে মুক্ত। সে-সময় মৌখিকভাবেই অভিযোগ দায়ের করা হতো। বাদী-বিবাদী উভয়েই একসাথে বিচারকের কাছে উপস্থিত হতো। কিংবা বিচারক নিজ উদ্যোগে বিবাদীকে ডেকে পাঠাতেন। সরাসরিই উভয়ের কথা শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। উভয় পক্ষেরই আত্মপক্ষ সমর্থন এবং উত্তর দেওয়ার সুযোগ থাকত। বিচারক প্রমাণ পেশ করতে বলতেন। তবে সেরেস্তাদার বা কেরানি ব্যবহার করতেন না। বিচারালয়ের মুনশিও কমই কাজে লাগত।

বিচারকের সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেলে কোনো রকম দীর্ঘসূত্রিতা ছাড়াই অবিলম্বে রায় দিয়ে ফেলতেন। তবে বিধানের ক্ষেত্রে সন্দেহ দেখা দিলে অথবা প্রমাণ না থাকলে রায় প্রদানে বিলম্ব হতো। আবু মূসা ﷺ-এর উদ্দেশ্যে উমর ﷺ-এর লিখিত পত্রের আলোচনায় আমরা যেমনটা দেখেছি। বিচারের রায় লিখে রাখার প্রচলনও ছিল না। কিছু রায় খলিফার অবগতি বা পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে এবং রাজধানীতে পাঠানো হতো। অথবা উদ্দেশ্য থাকত শরীয়তের বিধান বর্ণনা করা বা সংশয়পূর্ণ হলে পরামর্শ চাওয়া। নয়তো বিধান কুরআন-সুন্নাহর মাঝে

---

[৩০৭] ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২২১। শাইখ মুহাম্মাদ আল-খাযিরি 'মুহাদারাত ফী তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/৮৮'-এ ইবনু খালদুনের কথা সমর্থন করেছেন।

সুস্পষ্টভাবে থাকলে বিচারক তৎক্ষণাৎ রায় দিয়ে দিতেন। পূর্বোল্লেখিত বিধানের উৎসাদি এবং পত্রাবলির আলোচনা থেকে আমাদের এমনটাই বুঝে আসে।

সন্ধি বিষয়ক কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য এবং উমর ﷺ-এর পত্রের কারণে বিচারক সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন উভয় পক্ষ যেন আপসে সমঝোতা করে ফেলে। তা ছাড়াও ফয়সালা আর বিধানের মাধ্যমে উভয় পক্ষের দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিচারের ফয়সালা করার পর বিচারক তা যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করতেন। সাধারণত বিচারক নিজেই তার রায়ের বাস্তবায়ন করতেন। কিংবা তার তত্ত্বাবধানে রায় বাস্তবায়িত হতো।

ন্যায় এবং ইনসাফপূর্ণ বা এর কাছাকাছি হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে খলিফা বা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা বিচারক নিজেই প্রদত্ত রায়ের পর্যালোচনা করতেন। যেমনটা উমর ﷺ এক পত্রে লিখেছিলেন, 'সুপথপ্রাপ্ত হয়ে আগের দিনের যে রায় থেকে আপনি মনে মনে ফিরে এসেছেন, তা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো রকম সংকোচ বোধ করবেন না। ... বাতিল নিয়ে টালবাহানা করার চেয়ে হকের পথে প্রত্যাবর্তন করা শ্রেয়।'

সুস্পষ্ট বক্তব্য বা ইজমার পরিপন্থি না হলে রায় প্রত্যাহার করা হতো না। এজন্যই উমর ﷺ বলেছিলেন, 'আগে আমরা যা বলেছি সেটা ছিল আমাদের অতীত ফয়সালা। আর বর্তমানে আমরা যা করব সেটাই হবে এখনকার ফয়সালা।'

রাশিদুন যুগে ওকালতি পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল। আলি ﷺ বিরোধের ক্ষেত্রে তাঁর ভাই আকিলকে উকিল নিয়োগ করতেন। আকিলের বয়স বেড়ে গেলে আলি ﷺ তখন নিজের ভাতিজা আবদুল্লাহ ইবনু জাফরকে বিচারের সময় উকিল নিয়োগ করতেন। তিনি বলতেন, 'আমার উকিলের পক্ষে ফয়সালাই আমার পক্ষের ফয়সালা। আর উকিলের বিপক্ষে যে ফয়সালা হবে, সেটা আমারই বিপক্ষের ফয়সালা।'[৩০৮]

রাশিদুন যুগের বিচারক ও মোকদ্দমা

এখানে আমরা রাশিদুন যুগের বিচারকগণের নাম এবং সে যুগে ঘটে যাওয়া মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কিছু ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করব। অবশ্য ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি, বিশাল ভূখণ্ডে ইসলামের প্রসার এবং বিভিন্ন জাতির ইসলামের বা ইসলামি রাষ্ট্রের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের তুলনায় এসব ঘটনার সংখ্যা নিতান্তই কম।

রাশিদুন যুগে বিচারক কয়েক ধরনের ছিল। এক ধরনের বিচারকদের স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়োগ দিয়েছিলেন। রাশিদুন যুগেও তাঁরা সে দায়িত্ব পালনরত

[৩০৮] শারহু নাহজিল বালাগাহ : ১২/১৫৫; উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ, পৃ. ৭০

ছিলেন। আরেক ধরনের বিচারক রাশিদুন যুগেই প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ ধরনের বিচারকগণ হয়তো সাহাবি নয়তো তাবিয়ি বা মুখাযরামি[৩০৯] ছিলেন। আবার দেখা যায়, সাহাবি বিচারকদের কেউ কেউ নববি যুগ এবং রাশিদুন যুগ—উভয় জামানাতেই দায়িত্ব পালন করেছেন। পক্ষান্তরে অনেকে কেবল রাশিদুন যুগেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ কারণেই যেসব সাহাবি বিচারকদের কথা তাবিয়িরা বলতেন, তাঁরা ছিলেন উভয় যুগেই দায়িত্ব পালনকারী। যেমন শাবি বলেছেন, '(সাহাবিদের মাঝে) বিচারক ছিলেন চারজন—উমর, আলি, ইবনু মাসউদ এবং আবু মূসা ﷺ।'[৩১০]

কাতাদা বলেছেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবিদের মাঝে ছয়জন বিচারক ছিলেন—উমর, আলি, উবাই ইবনু কাব, ইবনু মাসউদ, আবু মূসা এবং যায়িদ ইবনু সাবিত ﷺ।'[৩১১]

মাসরুক বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছয়জন বিচারকার্য পরিচালনা করতেন—উমর, আলি, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, উবাই ইবনু কাব, যায়িদ ইবনু সাবিত এবং আবু মূসা আশআরি ﷺ।'[৩১২]

এসব বক্তব্যের মাধ্যমে কেবল যে তাঁরাই বিচারক ছিলেন—এমনটা বোঝানো হয়নি। বরং সামগ্রিকভাবে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

তদ্রূপ রাশিদুন যুগের বিচারকরা দুই ধরনের ছিলেন। এক ধরনের বিচারকগণের দায়িত্ব ছিল কেবলই বিচারকার্য পরিচালনা করা। আরেক ধরনের বিচারকগণ প্রশাসন এবং বিচার-সালিশ—উভয়টির দায়িত্বই পালন করতেন।

রাশিদুন খলিফাগণ কর্তৃক দুর্নীতি দমন এবং তদন্ত সংক্রান্ত বিচারের দায়িত্ব পালন করার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বিচারকার্য পরিচালনাই ছিল তাঁদের প্রধান দায়িত্ব। হয়তো পূর্ব থেকেই বিচারের দায়িত্বরত ছিলেন। নয়তো খিলাফতের দায়িত্ব পালনের সাথে বিচারের দায়িত্বও পালন করতেন।

❁ আবু বকরের জামানার বিচারকগণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক এবং বিচারকদের অনেককেই আবু বকর ﷺ স্বপদে বহাল রেখেছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ স্থানে প্রশাসন এবং বিচারকার্য পরিচালনায় দায়িত্বরত ছিলেন। আর মদীনা মুনাওয়ারার বিচারকার্য পরিচালনা যে

[৩০৯] জাহিলি যুগ এবং নববি যুগ—দুটোই পেয়েছেন কিন্তু সাহাবি হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি, পরবর্তী সময়ে ইসলাম কবুল করেছেন, এমন লোকদের মুখাযরামি বলা হয়।

[৩১০] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০৪

[৩১১] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০৫

[৩১২] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০৫ পার্শ্বটীকা

উমর ﵁-এর দায়িত্ব ছিল, সেটা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অবশ্য আবু বকর ﵁ নিজেও তাঁর কাছে আসা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করতেন।[৩১৩] আমরা এখানে আবু বকর ﵁ কর্তৃক নিযুক্ত কয়েকজন বিচারকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করছি।

- ☑ **উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ :** আবু বকর ﵁-এর সময় তিনি মদীনায় বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এক বছরে কেউ তাঁর কাছে অভিযোগ দায়ের করেনি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, দুই বছরে তাঁর কাছে দুজন লোকও অভিযোগ নিয়ে আসেনি।[৩১৪]

- ☑ **আত্তাব ইবনু উসাইদ ﵁ :** মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সেখানকার প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। আবু বকর ﵁-ও তাঁকে সে পদেই বহাল রাখেন এবং সেখানকার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বও প্রদান করেন।

- ☑ **উসমান ইবনু আবিল আস ﵁ :** রাসূল ﷺ-এর সময় থেকেই তিনি তায়িফের প্রশাসক ছিলেন। আবু বকর ﵁ তাঁকে সে পদের পাশাপাশি সেখানকার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বও দিয়েছিলেন।

- ☑ **আবু মূসা আশআরি ﵁ :** নববি যুগ থেকেই তিনি ইয়ামানের জাবেদ এবং রাম্মা অঞ্চলের প্রশাসক এবং বিচারক ছিলেন। আবু বকর ﵁ তাঁকে সে পদেই বহাল রাখেন।

- ☑ **মুআয ইবনু জাবাল ﵁ :** নববি যুগ থেকেই তিনি ইয়ামানের জানাদ অঞ্চলের প্রশাসক এবং বিচারক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আবু বকর ﵁ তাঁকে অপসারণ করেননি।

- ☑ **মুহাজির ইবনু আবি উমাইয়া ﵁ :** রিদ্দার যুদ্ধের সময় তাঁর নেতৃত্বে ইয়ামানের সানআ নগরী বিজিত হয়। এরপর আবু বকর ﵁ তাঁকেই সেখানকার প্রশাসক এবং বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

- ☑ **আল-আলা ইবনুল হাদরামি ﵁ :** রাসূল ﷺ তাঁকে বাহরাইনের প্রশাসক এবং বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। আবু বকর ﵁-ও তাঁকে বহাল রাখেন।

- ☑ **যিয়াদ ইবনু লাবিদ ﵁ :** রাসূল ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত হাদরামাউতের প্রশাসক এবং বিচারক ছিলেন। ইয়ামানে সংঘটিত রিদ্দার যুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার পর আবু বকর সিদ্দিক ﵁-এর যুগে সেখানকার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

- ☑ **ইয়ালা ইবনু উমাইয়া ﵁ :** ইয়ামানের খাওলান অঞ্চলের প্রশাসক এবং বিচারক

---

[৩১৩] তারীখুল কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ৯৯; আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ১২৩; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৭৪; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ১/১৯৫

[৩১৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১০৪

ছিলেন।[৩১৫]

☑ **জারির ইবনু আবদিল্লাহ আল-বাজালি ﷺ :** নাজরানের প্রশাসক এবং বিচারক ছিলেন। আবু বকর ﷺ তাঁকে নাজরানের প্রশাসক নিযুক্ত করেন।[৩১৬]

❁ আবু বকরের জামানার মোকদ্দমা

আবু বকর ﷺ-এর যুগে বেশ কিছু মোকদ্দমার ফয়সালা হয়েছিল। এগুলোর কয়েকটি মদীনায়, কিংবা মক্কাতে, অথবা ভিন্ন কোনো শহরে তাঁর কাছে এলে তিনি সেসবের ফয়সালা করে দিয়েছিলেন। আর কিছু মোকদ্দমা তাঁর যুগের প্রশাসক এবং বিচারকের পক্ষ থেকে এসেছিল। এখানে আমরা সেসবের কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

▪ ক. কিসাসের মোকদ্দমা

মাজিদা নামক জনৈক ব্যক্তি বলেন, মক্কায় এক ব্যক্তির সাথে আমার ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে সে কামড়ে আমার কানের কিছু অংশ ছিঁড়ে নেয়। কিংবা আমি কামড়ে তার কানের কিছু অংশ ছিঁড়ে ফেলি। পরবর্তীকালে আবু বকর ﷺ হজে এলে আমরা বিষয়টি তাঁর কাছে উত্থাপন করি। তিনি বললেন, 'তাদের দুজনকে উমরের কাছে নিয়ে চলো। বিষয়টি কিসাস পরিমাণ হলে আহত ব্যক্তিকে কিসাস নিয়ে দেওয়া হবে।'

এরপর উমর আমাদের অবস্থা দেখে জানালেন যে, বিষয়টি কিসাসের পরিমাণে পৌঁছেছে। সুতরাং একজন হাজাম ডাকতে হবে। হাজামের কথা শুনে খলিফা বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে আমি শুনেছি, "আমার খালাকে আমি একজন ভৃত্য দিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ এর মাধ্যমে তাকে বরকত দান করবেন বলে আমি আশাবাদী। তবে আমার খালাকে আমি নিষেধ করেছি, তাকে যেন তিনি হাজাম বা ধোপা কিংবা স্বর্ণকার না বানান।"'[৩১৭]

▪ খ. সন্তান কর্তৃক বাবার ব্যয়ভার নির্বাহ

কায়স ইবনু হাযিম বলেছেন, আবু বকর ﷺ-এর কাছে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আমার বাবা তো আমার সব সম্পদ নিয়ে আমাকে অসহায় করে দিতে চাইছেন।' আবু বকর ﷺ তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বললেন, 'তোমার চলার জন্য যথেষ্ট হয়—কেবল এ পরিমাণ সম্পদই তুমি নিতে পারবে।' লোকটি বলল, 'হে রাসূলের খলিফা! রাসূলুল্লাহ ﷺ

---

[৩১৫] তবাকাতু ইবনি সাদ : ২/২৬৯

[৩১৬] তবাকাতু ইবনি সাদ : ১/৬৫, ২৬৬, ২৪৭, ২৪৮; আল-ইসাবাহ : ২/২৪২

[৩১৭] মুসনাদু আহমাদ : ১০২; আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ১২৮; আখবারুল কুদ্বাহ : ২/১০২

কি বলেননি, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার?' আবু বকর ﵁ তখন বললেন, 'আল্লাহ যা-তে সন্তুষ্ট, তুমিও তা-তে সন্তুষ্ট হয়ে যাও।'[৩১৮]

অন্য বর্ণনামতে আবু বকর ﵁ বলেছিলেন, 'এ কথার দ্বারা রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যয়ভার নির্বাহ করা।'[৩১৯]

■ গ. দাবি নাকচ

আবদুল্লাহ ইবনু আবি মুলাইকা ﵀ তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। দ্বিতীয় লোকটি তখন নিজের হাত বের করার জন্য সজোরে টান দিলে কামড়দাতার সামনের দাঁত পড়ে যায়। ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে আবু বকর ﵁-এর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করা হলে তিনি সেটা নাকচ করে দেন।[৩২০]

■ ঘ. বেত্রাঘাতের বিধান

সফিয়্যা বিনতু আবি উবায়দ ﵂ সূত্রে বর্ণিত, আবু বকর ﵁-এর কাছে এক লোককে আনা হলো। যে একটি কুমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। লোকটি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে। সে অবিবাহিত থাকায় আবু বকর ﵁ তাকে বেত্রাঘাতের আদেশ করেন। এরপর তাকে ফাদাক নামক স্থানে নির্বাসিত করা হয়।[৩২১]

❁ উমরের জামানার বিচারকগণ

উমর ﵁-এর খিলাফতকালে অনেক দেশ বিজিত হয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেসব স্থানে তিনি অনেক প্রশাসক এবং বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন। কিছু কিছু জায়গায় বিচারব্যবস্থাকে প্রশাসন থেকে যেমন পৃথক করে দিয়েছিলেন, তেমনি মদীনাতেও একাধিক বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন। আবার তিনি নিজেও বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল সুদীর্ঘ এগারো বছরব্যাপী। এ সময়টাতে তিনি একাধিক বার বিচারক রদবদলও করেছেন। কুফা এবং বসরার ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়েছিল। এজন্যই তাঁর খিলাফতকালে অনেক প্রশাসক এবং বিচারকের কথা জানা যায়। যাদের নথিতে বহু মামলার বিবরণ এবং জীবনচরিতে অনেক বিচারকার্য পরিচালনার উল্লেখ আছে। সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনের পরিচয় আমরা এখানে উল্লেখ করব।

---

[৩১৮] আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি : ৭/৪৮১

[৩১৯] অর্থাৎ সন্তান তার পিতার ব্যয়ভার নির্বাহ করবে। তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৯৬

[৩২০] সহিহুল বুখারি : ২২৬৬; তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৯৪

[৩২১] মুওয়াত্তা মালিক, পৃ. ৫১৬, ব্যভিচার স্বীকারকারী সংক্রান্ত অধ্যায়; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ৯৪

☑ **আলি ইবনু আবি তালিব** ؓ : উমর ؓ-এর খিলাফতকালে তাঁর বিচারকার্য কিংবদন্তিতুল্য ছিল। সে যুগে লোককথা ছিল, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে হলে আবুল হাসান হওয়া দরকার।[৩২২]

☑ **যায়িদ ইবনু সাবিত** ؓ : উমর ؓ তাঁকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সেজন্য ভাতাও নির্ধারণ করেছিলেন। একবার উমর এবং উবাই ؓ-এর মাঝে মতানৈক্য হলে তাঁরা উভয়েই যায়িদ ؓ-কে সালিশ বলে মেনে নেন।[৩২৩]

☑ **ইয়াজিদ ইবনু সাঈদ** ؓ : তিনি ইয়াজিদ ইবনু উখতিন নামির নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর আলোচনা আমরা পূর্বে একাধিক বার করেছি।

মদীনায় উমর ؓ-এর পাশাপাশি ওপর্যুক্ত তিনজনও বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। অনেক সময় ফয়সালা প্রদানের ক্ষেত্রে উমর ؓ তাঁদের সহায়তা নিতেন।

☑ **আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ** ؓ : উমর ؓ তাঁকে কুফার বাইতুল মাল এবং বিচার বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। শাবি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ সর্বপ্রথম কুফার বিচারকার্য পরিচালনা করেন।[৩২৪]

☑ **সুলাইমান ইবনু রবীআ** ؓ : উমর ؓ তাঁকে কাদিসিয়্যাহ এবং কুফার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনি সর্বপ্রথম কুফায় বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। চল্লিশ দিন সেখানে অবস্থান করলেও কেউ তাঁর কাছে বিচার নিয়ে আসেনি।[৩২৫]

☑ **শুরাইহ ইবনুল হারিস :** তার শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর প্রসিদ্ধ অবস্থান দেখে উমর ؓ তাকে কুফায় নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি ষাট বছরেরও বেশি সময় কাযির দায়িত্বরত ছিলেন। ইবনুয যুবাইরের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময় তিনি বিচারকার্য বন্ধ রাখেননি। হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ যখন ইরাকের প্রশাসক, সে-সময় তিনি দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেন। এর কিছুকাল পর ৮০ হিজরিতে ১০০/১২০ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়।[৩২৬]

☑ **আবু মারইয়াম ইয়াস ইবনু সুবাইহ হানাফি :** উমর ؓ তাকে কিছু সময়ের জন্য বসরার বিচার বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বসরার প্রথম

---

[৩২২] তারীখুল কাদা, পৃ. ১১৮

[৩২৩] আখবারুল কুদাহ : ১/১০৭; রাওদাতুল কুদাহ, ৪/১৪৮১; তারীখুল কাদা, পৃ. ১৯৮

[৩২৪] আখবারুল কুদাহ : ২/১৮৫ ও ১৮৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১/৪৬১; তবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৩৪২

[৩২৫] ওয়াকি তাঁর নাম কখনো সালমান, আবার কখনো সুলাইমান বলেছেন। আখবারুল কুদাহ : ২/১৮৪ ও ১৮৭; তারীখুল কাদা, পৃ. ১০৯। ইবনু সাদ তাঁকে সালমান নামে অভিহিত করেছেন। (তবাকাত : ৬/৩৪ ও ১৩২)

[৩২৬] আখবারুল কুদাহ : ২/১৮৯; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/৮; ওফায়াতুল আইয়ান : ২/১৬৭

বিচারক। মানুষ তার দুর্বলতার কথা বললে খলিফা তাকে অপসারণ করেন। ইবনু সীরিন বলেছেন, ইয়াস ছিলেন বসরার প্রথম বিচারক। হিজরি ১৪ সালে বসরার প্রশাসক ছিলেন উতবা ইবনু গাযওয়ান। আবু মারইয়ামকে তিনি বিচার বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এরপর উতবার মৃত্যু হয়। মুগীরা ইবনু শুবা বসরার প্রশাসক হওয়ার পরও আবু মারইয়ামকে স্বপদে বহাল রাখেন। তারপর এ ব্যাপারে উমরের সাথে পত্র বিনিময় করেন।[৩২৭]

☑ **কাব ইবনু সুর :** ইয়াস ইবনু দুবাইহকে অপসারণ করার পর উমর ؓ বসরায় কাব ইবনু সুরকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। উমর ؓ-এর শাহাদাত পর্যন্ত কাব সেখানে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীকালে উসমান ؓ কর্তৃক নিযুক্ত বসরার প্রশাসক আবদুল্লাহ ইবনু আমিরও কাবকে সেই পদে বহাল রাখেন। অবশেষে জঙ্গে জামালে তিনি শহীদ হয়ে যান। সেদিন তার অবস্থান ছিল যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধির সপক্ষে। বিচারকার্য পরিচালনায় তার অপূর্ব যোগ্যতা দেখে উমর ؓ তাকে বসরার কাযি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এমনকি তার কাছে প্রেরিত পত্রে তার কাজের ভূয়সী প্রশংসাও করেন।

☑ **কায়স ইবনু আবিল আস ؓ :** উমর ؓ তাঁকে মিশরের বিচারক পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মিশরের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মুসলিম বিচারক। ২৩ হিজরিতে উমর ؓ তাঁকে বিচারক পদে নিয়োগ দানের জন্য আমর ইবনুল আস ؓ বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। প্রায় তিন বছর দায়িত্ব পালনের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাঁর ছেলে উসমান ؓ বিচারক নিযুক্ত হন।

☑ **উবাদা ইবনুস সামিত ؓ :** উমর ؓ তাঁকে শামের বিচারক এবং শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনের প্রথম বিচারক।[৩২৮]

এই বিচারকরা উমর ؓ-এর খিলাফতকালে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনার পাশাপাশি কখনো কখনো প্রশাসনের দায়িত্বও পালন করতেন। তাঁরা ছাড়া আরও কিছু প্রশাসককে উমর ؓ বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যাদের অন্যতম ছিলেন :

☑ মক্কার প্রশাসক নাফে ইবনু আবদিল হারিস ؓ।

☑ সানআর প্রশাসক ইয়ালা ইবনু উমাইয়া ؓ। উমর ؓ-এর কাছে তিনি ইয়ামানের বিচারকার্য-সংক্রান্ত পত্র লিখেছিলেন।[৩২৯]

☑ তায়িফের প্রশাসক সুফইয়ান ইবনু আবদিল্লাহ ؓ।

---

[৩২৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/২৬৯; তারীখুল কুদ্বাহ, পৃ. ১০৯ এবং ১১৭

[৩২৮] তারীখু কুদ্বাতিল উনদুলুস, পৃ. ২২; সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮; আল-ইসতীআব : ২/৪১২

[৩২৯] তবাকাতু ইবনি সাদ : ২/৩৬৯

☑ কুফার প্রশাসক মুগীরা ইবনু শুবা ﷺ।

☑ শামের প্রশাসক মুআবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ।

☑ বাহরাইন এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রশাসক উসমান ইবনু আবিল আস ﷺ।

☑ হিমসের প্রশাসক উমাইর ইবনু সাদ ﷺ।

এরা ছাড়া আরও কিছু সাহাবি ছিলেন, উমর ﷺ-এর যুগে যাদের দায়িত্ব ছিল বিচারকার্য পরিচালনায় সহায়তা কিংবা বিচারকার্য পরিচালনার তত্ত্বাবধান করা। তাঁদের অন্যতম ছিলেন,

☑ আবু উবায়দা আমির ইবনুল জাররাহ ﷺ।

☑ মুআয ইবনু জাবাল ﷺ।

এই দুই সাহাবিকে উমর ﷺ বিচারকার্য পরিচালনা এবং বিচারক নিযুক্ত করার ক্ষমতা দিয়ে শামে পাঠিয়েছিলেন।[৩৩০]

☑ আবুদ দারদা ﷺ। তাঁর আসল নাম ছিল উওয়াইমির ইবনু মালিক। মদীনায় তিনি সামরিক বাহিনীর বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। উমর ﷺ-এর নির্দেশে মুআবিয়া ﷺ তাঁকে দামিস্কের বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেখানকার প্রথম বিচারক।[৩৩১]

☑ আবদুল্লাহ ইবনু উতবা ইবনি মাসউদ ﷺ নববি যুগে ছোট ছিলেন। যুহরির সূত্রে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, ইবনু উতবাকে উমর ﷺ বাজারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন।[৩৩২]

☑ আবু ইদরিস আল-খাওলানি ﷺ-কে উমর ﷺ দুর্নীতি সংক্রান্ত বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[৩৩৩]

❁ উমরের যুগের মোকদ্দমা

উমর ﷺ-এর খিলাফতকাল দীর্ঘ হওয়ায় সে-সময় ইসলাম দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিচারকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদের কাছে আসা মোকদ্দমার সংখ্যাও ছিল অনেক। এ কারণেই ইতিহাসের পাতায় উমর ﷺ-এর যুগে বিচারের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। সাহাবিদের মাঝে আলি ইবনু আবি তালিব[৩৩৪] আর আবদুল্লাহ

[৩৩০] তারীখুল কাদ্বা : পৃ. ২০১

[৩৩১] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৯৯; কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৪১৩

[৩৩২] আল-ইসাবাহ : ৪/১০০

[৩৩৩] ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২২২; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ২৫

[৩৩৪] আল-হাক্কুল মুবিন ফী কাদ্বায়ি আমিরিল মুমিনীন, পৃ. ২১ দ্রষ্টব্য

ইবনু মাসউদ[৩৩৫] ﷺ এবং তাবিয়িদের মাঝে শুরাইহ[৩৩৬] আর কাব ইবনু সুর[৩৩৭]-সহ অনেকের বিচার ছিল এই উমর ﷺ-এর যুগে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা এখানে আমরা উল্লেখ করব।

▪ ক. নিষিদ্ধ বিবাহ

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব এবং সুলাইমান ইবনু ইয়াসার সূত্রে বর্ণিত, তুলাইহা ছিলেন রুশাইদ সাকাফির স্ত্রী। ঘটনাক্রমে রুশাইদ তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন। তারপর তুলাইহা ইদ্দতের মাঝেই নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলেন। এ খবর খলিফা উমর ﷺ-এর কাছে গেলে তিনি তুলাইহা এবং তার স্বামীকে কয়েকটি বেত্রাঘাত করলেন এবং দুজনকে পৃথক করে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, 'যে মহিলা তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করেছে, বিবাহকারীর সাথে তার সহবাস না হয়ে থাকলে দুজনকে পৃথক করে দেওয়া হবে। এরপর মহিলাটি প্রথম স্বামীর অসম্পূর্ণ ইদ্দত পূর্ণ করবে। দ্বিতীয় স্বামী তারপর মহিলাটিকে স্বাভাবিক নিয়মে বিবাহের প্রস্তাব দিবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে মহিলার সহবাস হয়ে থাকলেও দুজনকে পৃথক করে দেওয়া হবে। এরপর মহিলাটি তার প্রথম স্বামীর অবশিষ্ট ইদ্দত পূর্ণ করবে। তবে এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামী আর কখনোই মহিলাটিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না।'[৩৩৮]

▪ খ. হত্যায় জড়িতদের কিসাস

কায়স ইবনু সালাবা গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনু উমাইরাহ বলেন, সানআর এক লোক প্রতি বছর প্রতিযোগিতা করত। একবার সে প্রতিযোগিতা থেকে ফিরে দেখে, তার বাঁদি সাতজন লোকের সাথে মদপান করছে। মাতালগুলো লোকটিকে হত্যা করে ফেলল। একপর্যায়ে বিষয়টি খলিফার কাছে উত্থাপিত হলো। তখন তিনি লিখে পাঠালেন, 'সাতজনের প্রত্যেকেরই, এমনকি বাঁদিটির ওপরও কিসাস কায়েম করো। সানআর সমস্ত লোকও যদি এই ব্যক্তিকে হত্যার কাজে জড়িত থাকত, তাহলে সবার ব্যাপারেই আমি কিসাসের ফয়সালা দিতাম।'[৩৩৯]

▪ গ. ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের দায়

উমর ﷺ একবার জনৈক ব্যক্তি থেকে দেখেশুনে একটি ঘোড়া কিনলেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিছু দূর যাওয়ার

---

[৩৩৫] আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

[৩৩৬] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/২২৭; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৩০ এবং তরফাতুন ফিল কাদ্বা দ্রষ্টব্য।

[৩৩৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/২৭৫; আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ১৬৮ দ্রষ্টব্য।

[৩৩৮] মুওয়াত্তা, পৃ. ৩৩১; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৭৮

[৩৩৯] সুনানুদ দারাকুতনি : ৩/২০২; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/২৫৪; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৭৮

পর ঘোড়াটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। উমর ﷺ তখন দেরি না করে সরাসরি বিক্রেতার কাছে ফিরে এসে তাকে বললেন, 'তোমার ঘোড়া তুমি ফিরিয়ে নাও; এটা তো ত্রুটিযুক্ত।'

বিক্রেতা বলল, 'আমিরুল মুমিনীন! আমি ঘোড়াটি ফেরত নেবো না। কারণ আপনি তো সেটা সুস্থ-সবল অবস্থাতেই আমার থেকে কিনে নিয়েছিলেন।'

এভাবে দুজনের মাঝে মতানৈক্য হলে খলিফা বললেন, 'বেশ, তাহলে তোমার এবং আমার মাঝে সমাধানের জন্য একজন সালিশ নির্ধারণ করো।' বিক্রেতা বলল, 'ঠিক আছে, শুরাইহ আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন।'

এরপর তারা উভয়েই বিচারক শুরাইহের কাছে গিয়ে তাকে পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিলেন। ঘোড়ার মালিকের অভিযোগ শুনে শুরাইহ খলিফাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি ঘোড়াটি সুস্থ-সবল অবস্থায় কিনেছিলেন?' উমর ﷺ তখন হাঁ-বাচক জবাব দিলে বিচারক বললেন, 'আমিরুল মুমিনীন! ঘোড়াটি ফেরত দিতে হলে যে অবস্থায় নিয়েছিলেন সে অবস্থাতেই দিতে হবে।'

খলিফা তখন শুরাইহের অপূর্ব ফয়সালায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এরপর তাকে সরকারি বিচারক নিযুক্ত করে কুফায় প্রেরণ করেন।[৩৪০]

۞ উসমানের জামানার বিচারকগণ

উমর ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক এবং বিচারকদের অনেকেই উসমান ﷺ-এর খিলাফতকালে দায়িত্ব অব্যাহত রাখেন। এর বাইরে আরও অনেককেই উসমান ﷺ নতুনভাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এখানে আমরা তাঁদের একাংশের বিবরণ প্রদান করব।

- ☑ আবুদ দারদা উওয়াইমির ইবনু মালিক ﷺ। উসমান ﷺ-এর খিলাফতকালে তিনি ছিলেন দামিস্কের বিচারক। উসমান ﷺ-এর খিলাফতকাল সমাপ্তির দুই বছর আগে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়।[৩৪১]
- ☑ নাফে ইবনু আবদিল হারিস ﷺ। উমর ﷺ-এর যুগে তিনি মক্কার প্রশাসক এবং বিচারক ছিলেন। উসমান ﷺ-ও তাঁকে স্বপদে বহাল রেখেছিলেন।
- ☑ সুফইয়ান ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ। উমর ﷺ-এর যুগে তায়িফের প্রশাসন এবং বিচারের দায়িত্বে থাকা এই সাহাবিকে উসমান ﷺ-ও বহাল রাখেন।
- ☑ আবু মূসা আশআরি ﷺ। নববি যুগে এবং আবু বকর ﷺ-এর খিলাফতকালে তিনি ছিলেন ইয়ামানের প্রশাসক। পরবর্তীকালে উমর ﷺ তাঁকে বসরার

---

[৩৪০] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/১৯৮; আল-কাদ্বাউ ফিল ইসলাম, পৃ. ৯৫; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৯১
[৩৪১] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২; আল-ইসাবাহ : ৫/৪৬; তাহযীবুল আসমা : ২/২২৮

প্রশাসক নিযুক্ত করেন। প্রথমে বসরা এবং কুফা—উভয় স্থানেরই প্রশাসক ছিলেন। পরবর্তীকালে কেবল বসরার দায়িত্ব পালন করেন। উসমান ﷺ তাঁকে প্রথমে বসরার দায়িত্বে বহাল রাখলেও পরে কুফার প্রশাসক পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন।[৩৪২]

☑ আবদুল্লাহ ইবনু আমির ﷺ। আবু মূসা আশআরি ﷺ-এর পর তিনি বসরার প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

☑ দামিস্কের প্রশাসক মুআবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ।

☑ মিশরের প্রশাসক আমর ইবনুল আস ﷺ।

☑ মিশরের প্রশাসক আবদুল্লাহ ইবনু সাদ ﷺ। উসমান ﷺ-এর যুগে তিনি আফ্রিকা জয় করেন। পরবর্তীকালে আসকালান-এ বসবাস করতে থাকেন। ৩৬ হিজরিতে সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়।[৩৪৩]

☑ উসমান ইবনু কায়স ﷺ ছিলেন মিশরের বিচারক। আমিরুল মুমিনীন উসমান ইবনু আফফান ﷺ-এর শাহাদাতের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর মুআবিয়া ﷺ-এর খিলাফতের আগ পর্যন্ত মিশরে স্বতন্ত্র কোনো বিচারক ছিলেন না।[৩৪৪]

☑ কাদিসিয়্যাহর বিজয়ী সেনাপতি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ﷺ। কুফাতে উমর ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক। উসমান ﷺ তাঁকে প্রথমে বহাল রাখলেও পরবর্তীকালে অপসারণ করেন। তখন তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। হিজরি ৫৫ সালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৩৪৫] সাদ ﷺ-কে অপসারণের পর ওয়ালিদ ইবনু উকবা ﷺ-কে সে পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁকেও অপসারণ করে সেখানে সাঈদ ইবনুল আস ﷺ-কে নিয়োগ দেন।[৩৪৬]

আমিরুল মুমিনীন উসমান ﷺ-এর অভ্যাস ছিল বিচারের ব্যাপারে আলি ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করা। এ ছাড়া তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনু আউফও ছিলেন তাঁর জুরিবোর্ডের সদস্য। মোকদ্দমা, দাবি-দাওয়া এবং বিধানের ব্যাপারে তাঁদের মতামত নিতেন। আবার আলি ﷺ নিজেও বিচার করতেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ কুফায় বিচারকার্য পরিচালনা করে আসছিলেন। যায়িদ ইবনু সাবিত ﷺ অনেক সময় মদীনায় বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। আর উবাদা ইবনুস সামিত ﷺ-এর দায়িত্ব

[৩৪২] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/২৭৪
[৩৪৩] আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ২১৮; আল-উলাতু ওয়াল-কুদ্বাহ, পৃ. ১১
[৩৪৪] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ২০২-২০৩
[৩৪৫] আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ২১৪
[৩৪৬] আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ২১৫-২১৬

ছিল ফিলিস্তিন এবং শামে বিচারকার্য পরিচালনা করা।

খলিফার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵁ যে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন—সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।[৩৪৭]

❁ উসমানের যুগের মোকদ্দমা

বিচারের ক্ষেত্রে উসমান ﵁-এর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, ফয়সালার ক্ষেত্রে তিনি কেমন দূরদর্শী ছিলেন, আর কতটা সূক্ষ্মভাবে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতেন—তা বোঝানোর জন্য সংক্ষিপ্ত দুটো উদাহরণ এখানে পেশ করছি।

▪ ক. হত্যার বিচার

খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পরপরই হত্যা-সংক্রান্ত বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব চলে আসে উসমান ﵁-এর সামনে। নিহত খলিফা উমর ﵁-এর হত্যা এবং তার বদলা সংক্রান্ত হওয়ায় বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নাজুক। আবু লুলু খাঁজবিশিষ্ট দোধারী বড় ছোরা দিয়ে উমর ﵁-কে তিনটি আঘাত করেছিল। ফলে তিনি শহীদ হয়ে যান। বিষয়টি কেবল আবু লুলুর মাঝে সীমাবদ্ধ না থাকায় সেটা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে।

আবদুর রহমান ইবনু আবি বকর ﵁ বলেন, 'উমর ﵁ যেদিন ভোরে আক্রান্ত হন, তার আগের দিন সন্ধ্যায় আবু লুলুর পাশ দিয়ে আমি অতিক্রম করি। সে তখন জুফাইনা এবং হুরমুজানের সাথে গোপনে আলাপ করছিল। আমি তাদের কাছাকাছি হতেই তারা পালাতে শুরু করে। একপর্যায়ে তাদের থেকে খাঁজবিশিষ্ট একটি দোধারী ছোরা মাটিতে পড়ে যায়।'

লোকেরা তখন দেখলেন, আবু লুলুর ব্যবহৃত ছোরাটি আবদুর রহমান ﵁ কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণের সাথে মিলে যায়। এতে উবাইদুল্লাহ ইবনু উমর ﵁ বুঝে ফেলেন, তাঁর বাবার ওপর হামলার পেছনে আবু লুলু ছাড়াও জুফাইনা ও হুরমুজানের হাত রয়েছে। ফলে তখনই তরবারি হাতে বের হয়ে হুরমুজান, জুফাইনা ও আবু লুলুর মেয়েকে হত্যা করেন। তাঁর অবস্থা এমন হয়েছিল, যেন পারলে মদীনায় থাকা সমস্ত যুদ্ধবন্দিকেই তিনি হত্যা করে ফেলেন।

মুসলিমরা উবাইদুল্লাহ ﵁-এর কাজ মেনে নিতে পারছিলেন না। কারণ তাঁকে তো কিসাস গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ওপরন্তু এ কাজে কারা জড়িত—এ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণও তাঁর কাছে ছিল না। তাই মুসলিমরা ক্ষুব্ধ হয়ে উবাইদুল্লাহকে বিশিষ্ট সাহাবি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ﵁-এর ঘরে বন্দি করে রাখেন। উসমান ﵁ খলিফা হওয়ার পরপরই বিষয়টি তাঁর সামনে উত্থাপন করা

[৩৪৭] সুনানুত তিরমিযি : ১৩২২

হয়।

উসমান ﷺ বিষয়টি নিয়ে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করলে তাঁরা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করলেন। অবশেষে খলিফা নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বললেন, বিবরণের ভিন্নতা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে দিয়ত কার্যকরের ফয়সালা হবে। রাষ্ট্র তথা তিনি নিজে নিহত তিনজনের অভিভাবক হিসেবে কিসাসের দাবি মওকুফ করে দিয়েছিলেন। অন্য বর্ণনামতে, আবু লুলুর মেয়ে এবং জুফাইনার কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। পক্ষান্তরে হুরমুজানের ছেলে কুমাজান থাকায় খলিফা তার পক্ষে কিসাসের হুকুম দিয়েছিলেন। পরে কুমাজান কিসাসের দাবি ছেড়ে রক্তপণ গ্রহণে সম্মত হয়ে যায়।[৩৪৮]

■ খ. মদপানের বিচার এবং ভাইয়ের ওপর হদ কায়েম

উসমান ﷺ তাঁর ২৫ বছর বয়সি সৎভাই ওয়ালিদ ইবনু উকবা ﷺ-কে কুফার প্রশাসক পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি পাঁচ বছর সেখানকার দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন খলিফার অত্যন্ত স্নেহভাজন। কুফার দায়িত্বে থাকাকালীন অনেক বিজয়ের ব্যাপারেও তাঁর অবদান ছিল।

একবার কুফার সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিছু যুবক সিঁধ কেটে একটি ঘরে ঢুকে। ঘরের মালিককে হত্যা করে। লোকেরা ঘেরাও করে যুবকদের ধরে ফেলে। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় প্রশাসক ওয়ালিদের কাছে। অপরাধ প্রমাণিত হলে ওয়ালিদ তাদের বিষয়টি জানিয়ে খলিফার কাছে পত্র প্রেরণ করেন। এরপর খলিফার নির্দেশে কিসাসস্বরূপ তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

এইসব যুবকের পক্ষের লোকেরা তখন বদলা নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা বলে, ওয়ালিদ মদপান করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, ওয়ালিদ সত্যই মদপান করেছিলেন। তিনি ফজরের নামাজ চার রাকাত পড়িয়েছিলেন। আবার কারও মতে, তিনি সিজদায় গিয়ে বলছিলেন, 'তুমি নিজে পান করো। আমাকেও পান করাও।' যা-ই হোক, খলিফার কাছে অভিযোগ পৌঁছলে তিনি ওয়ালিদ ﷺ-কে কুফা হতে ডেকে পাঠালেন। তাঁর বিপক্ষে একাধিক সাক্ষীও পাওয়া গেল। কিন্তু ওয়ালিদ ﷺ কসম করে বিষয়টি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম করে বলছি, মূলত বদলা নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ওরা এমন সাক্ষ্য দিচ্ছে।'

উত্তরে খলিফা বললেন, 'কিছু করার নেই। আমরা তো কেবল অভিযোগ অনুসারে বিচার করি। কেউ মজলুম হলে আল্লাহ তার তরফ থেকে বদলা নেবেন। আর জালিমকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন।' এই বলে তিনি সাঈদ ইবনুল আস ﷺ-কে নির্দেশ দিলে তিনি মদপানের হদ (তথা দণ্ড) বাস্তবায়ন করেন। সৎভাই এবং

---

[৩৪৮] আল-হাক্কুল মুবিন ফী কাদ্বায়ি আমিরিল মুমিনীন, পৃ. ৩৯

প্রশাসক হওয়া সত্ত্বেও খলিফা দণ্ড বাস্তবায়নে কোনো ধরনের কসুর করেননি। অবস্থা অনুসারে সংগত কাজটিই তিনি করেছিলেন।[৩৪৯] মূলত তাঁর রায় ছিল বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে। অন্তরের অবস্থা তো আল্লাহই ভালো জানেন।[৩৫০]

আলির জামানার বিচারকগণ

আগের খলিফাগণ কর্তৃক নিযুক্ত যেসব বিচারক যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, আলি ؓ তাঁদের স্বপদে বহাল রাখার পাশাপাশি নতুন বিচারক এবং প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছিলেন।[৩৫১] এদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন,

- ☑ **শুরাইহ ইবনুল হারিস ؓ :** ইনি আগে থেকেই কুফায় বিচারকার্য পরিচালনা করে আসছিলেন। আলি ؓ তাকে স্বপদে বহাল রাখেন এবং তার মাসিক ভাতা ৫০০ দিরহাম নির্ধারণ করেন।
- ☑ **আবু মূসা আশআরি ؓ :** উসমান ؓ কর্তৃক নিযুক্ত কুফার প্রশাসক আবু মূসা আশআরি ؓ-কে আলি ؓ-ও বহাল রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁকে অপসারণ করেন।
- ☑ **মালিক ইবনুল হারিস আল-আশতার নাখায়ি ؓ :** তিনি ছিলেন তৎকালীন অভিজাত শ্রেণির সদস্য এবং অন্যতম বাহাদুর যোদ্ধা। ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সিফফিনের যুদ্ধে তিনি আলি ؓ-এর সাথে ছিলেন। তার বাহাদুরির কারণে জয়ের পাল্লা তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পর আলি ؓ তাকে মিশরের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তার সাথে দেওয়া ঐতিহাসিক পত্রটির কিছু অংশ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মিশর পৌঁছার আগে পথেই তার মৃত্যু হয়।[৩৫২]
- ☑ **কুসাম ইবনুল আব্বাস ؓ :** মদীনা মুনাওয়ারার প্রশাসক। ৩৭ হিজরিতে তিনি মক্কা এবং তায়িফের প্রশাসক ছিলেন।
- ☑ **আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ :** তিনি ছিলেন আলি ؓ-এর পক্ষ থেকে বসরার প্রশাসক। এক বর্ণনামতে, আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালি তখন বসরার বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[৩৫৩] অন্য বর্ণনামতে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ বসরার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আবদুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ আল-

---

[৩৪৯] সাক্ষী-প্রমাণের মাধ্যমে শরীয়তের বিচারকার্য পরিচালিত হয়। ওয়ালিদ ইবনু উকবা ؓ-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পাওয়া যাওয়ায় তার ওপর হদ কায়েম করা হয়েছিল। — অনুবাদক

[৩৫০] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৮৪; আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ২৬৩; ইতমামুল ওয়াফা, পৃ. ১৪৩

[৩৫১] রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৮৪; আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ২৩৯

[৩৫২] তবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/২১৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৩৪; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ২৩

[৩৫৩] তারীখুত তবারি : ৩/৫৪৬ ও ৪/৬৯

হুদ্দানিকে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল-মুলাহহাব ইবনু সুফরার সৎভাই। আলি رضي الله عنه এবং মুআবিয়া رضي الله عنه-এর জামানার একটা সময় অবধি তিনি দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে যিয়াদ তাকে অপসারণ করে।[৩৫৪] আবু উবায়দা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه (বসরায়) ফতোয়া প্রদান এবং বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি বসরার বাইরে গেলে আবুল আসওয়াদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। তখন তিনিই ফতোয়া প্রদান করতেন। সে-সময় বিচারককে মুফতি নামে অভিহিত করা হতো। হিজরি ৪০ সালে আলি رضي الله عنه নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলছিল। আবুল আসওয়াদ সূত্রে অনেক চমৎকার বিচারকার্যের বিবরণ পাওয়া যায়। আলি رضي الله عنه মদীনা থেকে বসরায় চলে যাওয়ার সময় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه-কে সেখানকার প্রশাসক নিযুক্ত করে যান।[৩৫৫]

☑ **উবাইদুল্লাহ ইবনু মাসউদ :** ইয়ামানের প্রশাসক এবং বিচারক।

☑ জাদা ইবনু হুবায়রা, এরপর খালিদ ইবনু কুররা ছিলেন খোরাসানের প্রশাসক।

আলির মোকদ্দমার উদাহরণ

সাহাবিদের মাঝে আলি رضي الله عنه ছিলেন বিচারকার্যে সর্বাধিক পারদর্শী। নববি যুগে এই দায়িত্বরত থাকার পাশাপাশি আবু বকর, উমর এবং উসমান رضي الله عنهم—এই তিন খলিফার সময়কালে এই কাজের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। নিজের খিলাফতকালেও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এবং ফয়সালা প্রদানের কাজ করে গেছেন। বিচার-সংক্রান্ত বেশ কিছু মূল্যবান পত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক নির্দেশনা তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর পরিচালিত বিচারকার্যের সংখ্যা অনেক। যার প্রতিটিই অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা, গবেষণালব্ধ অভিমত এবং বিচারিক নীতিমালায় সমৃদ্ধ। আমরা সেসবের একাংশ, বিশেষভাবে সংক্ষিপ্ত কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করব। সেগুলোর অভিনবত্ব, স্বয়ং আলি رضي الله عنه-এর নিরীক্ষণ ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতা দেখে আমরা যেমন মুগ্ধ হব, তেমনি অসংখ্য উপকারিতা আর বিধান আমাদের জানা হয়ে যাবে।

▪ ক. রজম-সংক্রান্ত মোকদ্দমা

শাবি বলেন, শুরাহাহ নামক এক মহিলার স্বামী শামের বাইরে ছিল। এমতাবস্থায় মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তার অভিভাবক তখন আলি رضي الله عنه-এর কাছে এসে বলে, শুরাহাহ তো ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিয়েছে। আলি رضي الله عنه তখন বৃহস্পতিবারে

---

[৩৫৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/২৮৮-২৮৯

[৩৫৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/২৮৮

মহিলাটিকে বেত্রাঘাত করালেন এবং শুক্রবারে রজমের শাস্তি দিলেন। মহিলাটিকে নাভি অবধি গর্তে পুঁতে নেওয়া হয়েছিল, যা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। তারপর আমিরুল মুমিনীন বলেন, 'রাসূল ﷺ রজমের নীতি প্রবর্তন করেছেন। এ ধরনের মোকদ্দমার ব্যাপারে কেউ যদি সাক্ষ্য দেয়, তাহলে সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে তাকেই প্রথমে অভিযুক্ত করা হবে। এরপর তার দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। তবে এ ক্ষেত্রে আমি ফয়সালা করেছি মহিলাটির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে। তাই আমিই সর্বপ্রথম তাকে রজম করব।' বর্ণনাকারী বলেন, এই বলে তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। এরপর লোকেরা পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আমিও তাদের মাঝে ছিলাম। অন্য বর্ণনামতে আলি ؓ বলেছিলেন, 'কুরআনের বিধান অনুযায়ী মহিলাটিকে বেত্রাঘাতের এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী তাকে রজমের শাস্তি দিয়েছি।'[৩৫৬]

বিচারের এই ফয়সালাটি ছিল একান্তই আলি ؓ-এর গবেষণামূলক। এর অনুসরণ করা যাবে কি না, তা নিয়ে ফকিহগণ মতবিরোধ করেছেন। তবে অধিকাংশ ফকিহ-ই এক ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত এবং রজম—উভয়টি না করার কথা বলেছেন।[৩৫৭]

■ খ. হত্যা-সংক্রান্ত মোকদ্দমা

একবার এক লোককে ধ্বংসস্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। লোকটির হাতে ছিল একটি রক্তমাখা ছুরি। তার সামনে পড়ে ছিল নৃশংসভাবে হত্যা করা একটি মৃতদেহ। দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিই তাকে হত্যা করেছে।

টহলরত পুলিশেরা দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে আমিরুল মুমিনীন আলি ؓ-এর কাছে নিয়ে এল। সব শুনে খলিফা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করতেই সে হত্যার কথা স্বীকার করল। অগত্যা তিনি লোকটিকে কিসাসস্বরূপ হত্যার নির্দেশ দিলেন।

লোকটিকে হত্যার জন্য উন্মুক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল এক লোক। 'না, না, একে হত্যা করবেন না। নিহত লোকটিকে আমিই খুন করেছি।'—বলতে লাগল লোকটি। খলিফার সামনে এসে লোকটি বলল, 'আমিরুল মুমিনীন! আসলে নিহত লোকটিকে আমিই খুন করেছি।'

কিসাসের আদেশ মুলতুবি করলেন খলিফা। এরপর প্রথম লোকটিকে বললেন, 'ব্যাপার কী বলো তো? হত্যা না করেও দায় নিলে কেন?'

লোকটি বলল, 'এ ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না। নিহত লোকটির

[৩৫৬] নায়লুল আওতার : ৭/৯১ এবং ১১৪

[৩৫৭] নায়লুল আওতার : ৭/৯৬ এবং ৯৭; আল-মুগনি : ৯/৩৭

সামনে রক্তাক্ত ছুরি হাতে আমিই যে দাঁড়ানো ছিলাম। ধ্বংসস্তূপের কাছে আর কেউ তো ছিল না। এমতাবস্থায় অস্বীকার করলেও আমার কথা কেউ বিশ্বাস করত না। তাই টহল পুলিশ আমাকে দায়ী করলে আমি সব মেনে নিয়েছি। ভেবেছি, আর কেউ না জানলেও আল্লাহ তো জানেন সত্যটা কি।'

আমিরুল মুমিনীন বললেন, 'তুমি কাজটা ভালো করোনি। এবার আসল ঘটনাটা খুলে বলো তাহলে।'

লোকটি বলল, 'আমি একজন কসাই। ভোররাতে দোকানে গিয়ে গরু জবাই করে চামড়া ছাড়াচ্ছিলাম। এমন সময় আমার প্রস্রাবের ভীষণ চাপ আসে। তাই হালকা হওয়ার জন্য কাছের ধ্বংসস্তূপটিতে যাই। কাজ সেরে সেখান থেকে দোকানে ফেরার জন্য বের হয়েই আমি লাশটি দেখতে পাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করা যায় সেটাই ভাবছিলাম। এমন সময় টহল পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে আসে। সবাই আমার দোষ দিতে থাকে। এরপরের ঘটনা তো আপনি ভালো করেই জানেন।'

এরপর আলি ﷺ দ্বিতীয় লোকটিকে জবানবন্দি দিতে বলেন। সে বলল, 'শয়তানের প্ররোচনায় মৃত লোকটির সম্পদের লোভে পড়ে আমি লোকটিকে হত্যা করে ফেলি। টহল পুলিশের আওয়াজ শুনে লাশটি আমি সেখানেই ফেলে রেখে সটকে পড়ার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় কসাইটিকে ধ্বংসস্তূপের কাছে দেখতে পেয়ে আমি সেখানেই লুকিয়ে পড়লাম। আমার সামনেই টহল পুলিশ বেচারা কসাইটিকে আপনার সামনে ধরে নিয়ে আসে। তারপর আপনিও কিসাসের ফয়সালা দিয়ে দিলেন। ফয়সালা বাস্তবায়নের সময় আমার মনে হলো, আমি তো এমনিতেই একজনের খুনি। আমার চোখের সামনেই নিরপরাধ একজন মানুষের জীবন এখন চলে যাচ্ছে। কিন্তু যেদিন আল্লাহ তাআলার সামনে আমাকে হাজির করা হবে, সেদিন আমি কী জবাব দেবো—এই ভেবে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না।'

আলি ﷺ তখন হাসান ﷺ-এর মতামত জানতে চাইলেন। হাসান ﷺ বললেন, 'আমিরুল মুমিনীন! খুনি লোকটি একজনকে হত্যা করলেও আরেকজন নিরপরাধের প্রাণ সে বাঁচিয়েছে। আর কুরআনে এসেছে,

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

> 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছে, সে যেন গোটা মানবজাতির প্রাণ রক্ষা করেছে।'[৩৫৮]

মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা রক্তপণ নিতে সম্মতি প্রকাশ করলে খলিফা তখন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তা পরিশোধ করে দিলেন। এর মাধ্যমে অপরাধীকেও মাফ

---

[৩৫৮] সূরা মায়িদা, ৫ : ৩২

করে দেওয়া হলো।[৩৫৯]

■ গ. উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত মোকদ্দমা

একবার বিচারক শুরাইহের কাছে দুজন লোক একজন মহিলার উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে উপস্থিত হলো। লোক দুজনের একজন ছিল মহিলার স্বামী, আর অপরজন ছিল তার সৎভাই। উভয়েই আরেক সম্পর্কের দিক থেকে ছিল মহিলাটির চাচাতো ভাই। শুরাইহ তখন ফয়সালা দিলেন, মহিলার স্বামী অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। আর তার সৎভাই পাবে অবশিষ্ট সম্পদ।

লোক দুটি তখন আলি ﷺ-কে বিষয়টি জানালে তিনি শুরাইহকে ডেকে পাঠালেন। শুরাইহ উপস্থিত হলে খলিফা বললেন, 'এমন ফয়সালা কি তুমি কুরআনের ভিত্তিতে করেছ, না সুন্নাহর ভিত্তিতে?' শুরাইহ বললেন, 'কুরআনের ভিত্তিতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

> আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আত্মীয়রা পরস্পর অধিক ঘনিষ্ঠ।[৩৬০]

তাই, ফয়সালাটি কি এমন হবে না?'

আলি ﷺ তখন ফয়সালা দিলেন এভাবে : মহিলার স্বামী পাবে অর্ধেক সম্পত্তি। তার ভাই পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। আর অবশিষ্ট সম্পত্তি উভয়ের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হবে।[৩৬১]

কুরআন এবং হাদিসে যাবিল ফুরূয এবং আসাবার[৩৬২] অংশের ব্যাপারে যে বর্ণনা এসেছে—তার বিরোধী হওয়ায় আলি ﷺ আগের ফয়সালাটি রদ করে দিয়েছিলেন। কুরআনের ভাষ্যমতে, মৃত-মহিলার স্বামী পাবে সম্পত্তির অর্ধেক এবং ভাই পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। আর হাদিস অনুসারে চাচাতো ভাই আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে।

■ ঘ. জটিল মোকদ্দমা

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত, একবার আমিরুল মুমিনীন উমর

---

[৩৫৯] আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ৫৬; আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ২৫১

[৩৬০] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬

[৩৬১] আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ২৫৬

[৩৬২] কুরআনে মৃত ব্যক্তির যেসব আত্মীয়ের প্রাপ্য নির্ধারিত হিস্যা বলে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে 'যাবিল ফুরূয' বলা হয়। এদের সংখ্যা ১২জন। যাবিল ফুরূযেরা নির্দিষ্ট অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট অংশ যারা পায়, তাদেরকে 'আসাবা' বলা হয়। কোনো মৃত ব্যক্তির 'যাবিল ফুরূয' না থাকলে সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তি আসাবাদের মাঝে বন্টিত হয়।

ﷺ-এর কাছে এমন এক জটিল মোকদ্দমা আসলো, যার কারণে তিনি হয়রান হয়ে গেলেন। কিন্তু ফয়সালা দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হলো না। অবশেষে সাহাবিদের ডেকে বিষয়টি উল্লেখ করে পরামর্শ চাইলেন। সাহাবিরাও এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে খলিফার কাছেই দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তখন উমর ﷺ বললেন, 'একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চিনি। আমার মনে হয় তার পক্ষেই কেবল এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা সম্ভব।'

সাহাবিরা বুঝে গেলেন, খলিফা কার কথা বলছেন। আমিরুল মুমিনীন বললেন, 'চলো, আমরা আলির কাছে যাই।' সাহাবিরা বললেন, 'আপনি কষ্ট করে কেন যাবেন? বরং তিনিই এখানে আসবেন।' খলিফা বললেন, 'এ কেমন কথা! তিনি বনু হাশিমের লোক। নবি-পরিবারের সদস্য। তাঁর রেখে যাওয়া ইলমের ধারক। তিনি কেন আসবেন? তার কাছেই বরং আমাদের যাওয়া উচিত।'

সবাই মিলে আলি ﷺ-এর কাছে পৌঁছে দেখলেন, তিনি একটি বাগানের মাঝে বসে বারংবার নিচের আয়াতটি পড়ছেন আর কাঁদছেন।

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

মানুষ কি মনে করে তাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে?[৩৬৩]

উমর ﷺ তখন সাথে থাকা শুরাইহকে বললেন, 'বিষয়টি আমাদের যেভাবে শুনিয়েছ সেভাবেই আলিকে শোনাও।' তখন শুরাইহ বললেন, 'আমি বিচারের মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় এই লোকটি এসে আমার কাছে বলল, একজন লোক নাকি তাকে দুজন গর্ভবতী মহিলার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিল। মহিলা দুজনের একজন স্বাধীন, আর অপরজন দাসী। এরপর একরাতে দুজন মহিলাই সন্তান প্রসব করে। একজনের গর্ভ থেকে জন্ম নেয় ছেলে, আরেকজনের মেয়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে দুজন মহিলাই পুত্র-সন্তান জন্ম দেওয়ার দাবি করে।'

শুরাইহ এ পর্যন্ত বলার পর আলি ﷺ বললেন, 'তখন তুমি কী ফয়সালা করলে?' শুরাইহ বললেন, 'আমি ফয়সালা করতে পারিনি বলেই তো এখানে তাদের নিয়ে এসেছি।' আলি ﷺ তখন একটি খড় তুলে নিয়ে বললেন, 'বিষয়টি তো এর থেকেও সরল।'

এই বলে তিনি দুটি পেয়ালা আনালেন। মহিলা দুজনের হাতে পেয়ালা দুটি দিয়ে বললেন, 'তোমরা দুজনেই আড়ালে গিয়ে যার যার পেয়ালায় নিজের বুকের দুধ নিয়ে এসো।'

মহিলা দুজন তা-ই করল। পেয়ালা দুটো বিচারক আলি ﷺ-এর সামনে রাখা। ভালো করে লক্ষ করে দেখলেন তিনি। যে পেয়ালায় দুধ কম—তার মালিককে

[৩৬৩] সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩৬

ডেকে কন্যা-সন্তানটি দিলেন। আর যে পেয়ালায় দুধ বেশি—তার মালিককে বললেন, 'পুত্র-সন্তানটি তোমার।'

বিচারের রায় শুনে খলিফা-সহ সবাই অবাক। কেউ কিছুই বুঝতে পারছেন না। শেষে বিচারক আলি ﷺ নিজেই শুরাইহকে বললেন, 'মেয়ে-সন্তানের চেয়ে পুত্র-সন্তানের জন্য (মায়ের বুকে) যে বেশি দুধ আসে, তা বুঝি তুমি জানো না? উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে একজন ছেলে তো দুজন মেয়ের সমান হিস্যা পায়। বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে মেয়ের বুদ্ধি ছেলের বুদ্ধির অর্ধেক। সাক্ষ্যের ক্ষেত্রেও দুজন মহিলার সাক্ষ্য তো একজন পুরুষের সমান। মেয়েদের রক্তপণ ছেলেদের রক্তপণের অর্ধেক হয়ে থাকে। সুতরাং বোঝা গেল, মহিলা সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের অর্ধেক হিস্যার অধিকারী।'

আলি ﷺ-এর এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যারপরনাই মুগ্ধ হলেন খলিফা উমর ﷺ। তিনি বলে উঠলেন, 'হাসানের বাবা! আল্লাহ যেন আমাকে এমন পরিস্থিতিতে না ফেলেন, যা আমি সামাল দিতে পারব না। আর আপনি নেই—এমন দেশে আল্লাহ যেন আমাকে না রাখেন।'[৩৬৪]

▪ ঙ. দুধ সম্পর্কিত বোনের মাহর

এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করে তার মাহর নগদ পরিশোধ করল। সহবাস করার আগে সে লক্ষ করল, নববধূ আসলে তারই দুধবোন। বিষয়টি আলি ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তাদের দুজনকে তিনি পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর মহিলাটিকে তার মাহর হিসেবে পাওয়া সম্পদ ফিরিয়ে দিতে বললেন।[৩৬৫]

আলি ﷺ-এর বিচার-সংক্রান্ত উদাহরণের এখানেই ইতি টানছি। খোঁজ করলে ইতিহাসের পাতায় আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। তদ্রূপ তাঁর নিযুক্ত বিচারকদের পরিচালিত বিচারকার্যের উদাহরণও ইতিহাসে অনেক আছে। সেখান থেকে কেবল একটি নমুনা উল্লেখ করেই আমরা এই আলোচনা সমাপ্ত করব।

শাবি বলেন, আলি ﷺ একবার তাঁর বর্মটি হারিয়ে ফেললেন। কিছুদিন পর সেটি এক খ্রিষ্টানের কাছে দেখলেন। আলি ﷺ তখন নিজের বর্মটি চাইলে সে বলল, 'এটি আমার বর্ম এবং আমার দখলেই তা রয়েছে।' অগত্যা বিষয়টি মীমাংসার জন্য তারা দুজন বিচারক শুরাইহের কাছে গেলেন।

সেখানে পৌঁছে আলি ﷺ বিচারককে বললেন, 'এই বর্মটি আমার। আমি সেটা বিক্রিও করিনি, আর কাউকে হাদিয়াও দিইনি।' এবার খ্রিষ্টানটি বলল, 'আমিরুল

---

[৩৬৪] তারীখুল কাদা, পৃ. ১৯৫

[৩৬৫] তারীখুল কাদা, পৃ. ১৯৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৮/২

মুমিনীনকে আমি মিথ্যাবাদী বলব না, তবে বর্মটি আমারই।' বিচারক শুরাইহ তখন আলি ﷺ-এর কাছে প্রমাণ চাইলে তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, 'শুরাইহ ঠিক কাজই করেছেন। আমার কাছে তো কোনো প্রমাণ নেই।'

অবশেষে শুরাইহ খ্রিষ্টানের পক্ষে রায় দিলে বর্মটি নিয়ে সে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু কয়েক পা হেঁটেই আবার ফিরে এসে বলল, 'শুনে রাখুন! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এটাই নবিগণের বিধান এবং শিক্ষা। আমিরুল মুমিনীন আমাকে বিচারকের কাছে নিয়ে গেছেন, আর বিচারক তার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর কসম করে বলছি, হে আমিরুল মুমিনীন! এটা আপনারই বর্ম। আপনি যখন সিফফিনে যাচ্ছিলেন, তখন আপনার বাহিনীর পেছনেই আমি ছিলাম। আপনার মেটে রঙের উটের ওপর থেকে বর্মটি পড়ে গেলে আমি তা তুলে নিই।'

আলি ﷺ বললেন, 'বেশ, তুমি যখন মুসলিম হয়ে গেছ, তাহলে এটি এখন থেকে তোমার।' তারপর নওমুসলিমটিকে একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে তাকে বিদায় জানালেন।[৩৬৬]

রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

আমরা বিভিন্ন কারণে রাশিদুন যুগে বিচার বিভাগের ইতিহাসের ওপর একটু বিস্তারিত আলোচনা করেছি। নববি যুগের চেয়ে এই যুগটি ত্রিশ বছরেরও অধিক দীর্ঘ। রাশিদুন যুগে ইসলামি রাষ্ট্রের আয়তন এবং জনসংখ্যা নববি যুগে ইসলামি রাষ্ট্রের আয়তন এবং জনসংখ্যা অপেক্ষা দশগুণেরও বেশি ছিল। প্রশাসনিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগের গুরুত্ব অনেক বেশি। পরবর্তী যুগে রাশিদুন যুগের যে প্রভাব রয়েছে, সেদিক থেকেও এ যুগ বিরাট গুরুত্ব বহন করে।

নববি যুগের বিচারব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামি বিচারব্যবস্থার শিকড়। সে হিসেবে রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থাও নববি যুগের বিচারব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থা একদিকে পূর্ণাঙ্গ কাঠামো এবং একটি ব্যাপক প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। অপরদিকে ইসলামি বিচারব্যবস্থার জন্য তা এক উজ্জ্বল মাইলফলক। যাকে পরবর্তী ইসলামি যুগের বিচারব্যবস্থার জন্য একটি রোল মডেল তথা আদর্শ আর নমুনা হিসেবে গণ্য করা হয়।

আমরা এখানে রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি সংক্ষেপে কেবল ইঙ্গিত প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকছি।

☑ ১. মূলত রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থা ছিল নববি যুগের বিচারব্যবস্থার একটি

[৩৬৬] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৮/৪

সুদীর্ঘ চিত্র। কারণ রাশিদুন যুগ আঁকড়ে ধরেছিল নববি যুগকে। নববি যুগকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল। রাশিদুন যুগে দ্বীনি শিক্ষা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। নববি যুগের ঈমান-আকীদার সাথে এ যুগের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। বিশ্বাস আর চেতনার সাথে ছিল গভীর বন্ধন। এ যুগের লোকেরা ধর্মীয় অনুশাসন এবং ইনসাফের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাদের মামলা-মোকদ্দমা চলত একেবারেই সাদাসিধাভাবে। বিচার প্রক্রিয়া হতো একদমই সংক্ষিপ্ত। রাষ্ট্রের ব্যাপক সম্প্রসারণ, জনসংখ্যার আধিক্য, উত্তম পন্থায় বিচারক নিয়োগ এবং বিচারের পরিপূর্ণ শর্তাবলি থাকার পরও মামলা-মোকদ্দমা এবং ঝগড়া-বিবাদ ছিল নিতান্তই কম।

☑ ২. রাশিদুন যুগ ছিল ইসলামি বিচারব্যবস্থার একটি সঠিক, প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এ কারণেই গবেষকদের গবেষণার উৎস ছিল এই রাশিদুন যুগ। সমস্ত ফকিহের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এ যুগের ওপর। রাশিদুন যুগের বিচারের বিধিবিধান ও প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থা ছিল শারঈ বিধানাবলি, বিচারের কৌশল, গবেষণা, বিভিন্ন যুগে ইসলামি আইন শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান উৎস। এমনকি সাহিত্যগত দিক থেকেও এই যুগ সমস্ত আলিম এবং সর্বশ্রেণির কাছে সমাদৃত। অবশ্য শাখাগত এবং বিস্তারিত কোনো কোনো বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য থাকলেও মৌলিক বিষয়ে কারোরই দ্বিমত নেই। এ কারণেই সাহাবিদের কথা দলিল হবে কি হবে না, তা নিয়ে ফিকহবিদদের মাঝে মতভিন্নতা দেখা যায়। ইসলামি ফিকহের মূলনীতি, হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা এবং ইসলামি আইনের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

☑ ৩. খুলাফায়ে রাশিদুন এবং বিভিন্ন শহরের প্রশাসকগণ ঝগড়া-বিবাদের বিচার পরিচালনা করেছেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিচারকার্যও পরিচালনা করতেন। তাঁরা পরিপূর্ণ গুরুত্ব দিতেন দুর্নীতি দমন এবং তদন্তের প্রতি।

☑ ৪. খুলাফায়ে রাশিদুন রাষ্ট্রের অন্য কোনো দায়িত্বের জন্য নয়, বরং বিচারের জন্য সর্বপ্রথম এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অধিকাংশ ইসলামি শহরে বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম বিচার বিভাগকে অন্যান্য বিভাগ থেকে পৃথক করেছিলেন। তাঁরা এ নীতিও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, বড় বড় শহরে নিয়োগকৃত বিচারকদের ওপর প্রশাসকদের কোনো কর্তৃত্ব চলবে না। আর যে সমস্ত অঞ্চলে প্রশাসকদেরকে বিচারের ক্ষমতা-সহ নিয়োগ দিয়েছেন, সেখানে তারা উভয় দায়িত্বই পালন করবেন।

☑ ৫. রাশিদুন যুগের বিচারকগণ ছিলেন মুজতাহিদ তথা গবেষক। তাঁরা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কাজ করতেন। উত্থাপিত ঘটনার সমাধান কুরআন

ও সুন্নাহর মাঝে খুঁজে না পেলে পূর্বসূরিদের বিচারের আলোকে এবং সমকালীন আলিমদের পরামর্শ অনুসারে নিজেরা ইজতিহাদ করে ফয়সালা করতেন।

☑ ৬. নববি যুগের বিচার পদ্ধতি অনুকরণ করে রাশিদুন যুগে অনেক নতুন নতুন ধারা-উপধারা উদ্ঘাটিত হয়। পরবর্তীকালে সেগুলোই হয়ে গেছে বিচারিক বিধিবিধানের মৌলিক উৎস। সেসব হচ্ছে: আল-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস তথা সাদৃশ্যলব্ধ সিদ্ধান্ত, পূর্ববর্তী বিচারাচার এবং শূরা পরিষদের অভিমত।

☑ ৭. রাশিদুন যুগে নিখুঁত বিচার বিভাগ ও সুগঠিত প্রশাসন ছিল। বিচারের যাবতীয় বিষয় পরিচালনা এবং বিচারের সাংবিধানিক নীতিমালার বর্ণনা দিয়ে উমর ﷺ এবং আলি ﷺ বিচারক ও প্রশাসকদের বরাবর চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। ইতিহাসের পাতায় সেগুলো অমর হয়ে আছে। এসব চিঠি প্রেরণের পাশাপাশি খলিফাগণ বিচারকদের নজরদারিতে রাখতেন। তাদের সাথে মতবিনিময় করতেন। তাদের খবরাখবর এবং বিচারাচার সম্পর্কে জানতে চাইতেন জনসাধারণের কাছে। বিভিন্ন জটিল, নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ মামলা-মোকদ্দমা পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখার নির্দেশ দিতেন। এটা ছিল আমিরুল মুমিনীন উমর ﷺ-এর খিলাফতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উসমান ﷺ-এর সময় তা কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে যায়। আর আলি ﷺ-এর খিলাফতকালে অস্থিতিশীল পরিবেশ, নানা ধরনের ফিতনা, ব্যাপক গৃহযুদ্ধ, একাধিক সরকারি আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও শাম এবং প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের ফলে এই বৈশিষ্ট্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

☑ ৮. সমস্ত ঘটনাপ্রবাহে বিচারকের ক্ষমতা ছিল। বিচারকের ক্ষমতা থাকত সর্বব্যাপী এবং বিস্তৃত। বিচারক পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এ যুগে বিচারকদের ধরন বা প্রকার নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি চালু হয়েছিল। কিছু বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল ছোটখাটো মামলা-মোকদ্দমা দেখার জন্য। আবার গুরুতর বিচার পরিচালনার জন্য কিছু বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খলিফাগণ বিভিন্ন অপরাধ এবং দণ্ডবিধি সংক্রান্ত বিচার পরিচালনা করতেন। কোনো কোনো প্রশাসকও এই দায়িত্ব পালন করতেন। তদ্রূপ মদীনা মুনাওয়ারা, কুফা, বসরা এবং ইয়ামানের মতো বৃহৎ অঞ্চলগুলোতে একই সময়ে একাধিক বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ঠিক তেমনি প্রথমবারের মতো আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল সামরিক বাহিনীর বিচারককে।

☑ ৯. নববি যুগের বিচারিক ফয়সালা ভালোভাবে লক্ষ করা হতে থাকে। ব্যক্তিগত মতামত এবং গবেষণা তখন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হতো। কুরআন-

সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত হলেই সেটা অনুমোদিত হতো। কারণ এক গবেষণা অন্য গবেষণার মাধ্যমে বাতিল হয় না। বরং একমাত্র কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হলেই সেটা বাতিল হয়ে যায়।

☑ ১০. আরও কিছু বিষয় রাশিদুন যুগে ছিল, যা একেবারেই নতুন। নববি যুগে তার কোনো নজির ছিল না। যেমন : বিচারকদের সরকারি বেতন-ভাতা প্রদান, নিয়মিত রেশন দেওয়া, এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে কিছুটা বাড়তি সুবিধা দেওয়া, স্বতন্ত্র বিচারালয় প্রতিষ্ঠা এবং জেলখানার ব্যবস্থা ইত্যাদি। তদ্রূপ বড় বড় সাহাবিদের বিচারের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকার বিষয়টিও এ যুগে প্রথমবারের মতো প্রকাশ পেয়েছিল। যেমন আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵄-কে খলিফা উসমান ﵁ বিচারকার্যের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি সম্মত হননি। কাব ইবনু ইয়াসার ﵁-কে উমর ﵁ মিশরের বিচার বিভাগের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। কারও কারও মতে, তিনি অল্প কিছুদিন বিচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বটে। এরপর স্বেচ্ছায় অব্যাহতি দিয়ে দেন।[৩৬৭]

☑ ১১. রাশিদুন যুগে বিচার কম হওয়ায় বিচারকার্যের প্রক্রিয়া ছিল নিতান্তই সহজ-সরল। প্রথমে মামলার শুনানি হতো। তারপর পেশ করা হতো দলিল, প্রমাণ এবং যুক্তি। সবশেষে ফয়সালা শোনানো হতো। ফয়সালা প্রদানের পরপরই তা বাস্তবায়িত হয়ে যেত। বিচারকার্যের অন্যতম নীতি ছিল—দুর্বলের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা। দুর্বলের সমর্থন এবং মজলুমের সাহায্য ছিল বিচারের মুখ্য বিষয়। বাদী-বিবাদী উভয়ের প্রতিই ইনসাফ করা হতো। ন্যায় ও আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের টালবাহানা ছিল না। যদিও সেটা স্বয়ং খলিফা, মুসলিম শাসক বা গভর্নরের বিরুদ্ধে যায় না কেন। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় উভয় পক্ষ ফয়সালা বাস্তবায়নে বিলম্ব বা গড়িমসি করলে সাধারণত বিচারকই তা বাস্তবায়ন করে দিতেন। ফয়সালা দেওয়ার পর তা বাস্তবায়নে অযথা বিলম্ব করা হতো না।

রাশিদুন যুগে আরও কিছু নতুন প্রশাসনিক বিষয় চালু করা হয়েছিল। যেমন উমর ﵁-এর যুগে বিচারকের জন্য মির-মুনশি নিয়োগ দেওয়া হয়। পুলিশ ফোর্স এবং বিচারক ও প্রশাসকের জন্য সহযোগী নিয়োগ দেওয়ার প্রচলন শুরু হয় উসমান ﵁-এর যুগে। তদন্তের অগ্রগতি এবং প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে সাক্ষীদের পৃথক পৃথকভাবে যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করা ছিল আলি ﵁-এর যুগে প্রবাদতুল্য বৈশিষ্ট্য।

---

[৩৬৭] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৭০; আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৭ ও ৩/২২১; আল-উলাতু ওয়াল-কুদ্বাহ, পৃ. ৩০২; হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১৩৫

০৪

উমাইয়া যুগের বিচারব্যবস্থা

মুআবিয়া ﷺ-এর খিলাফতের মাধ্যমে উমাইয়া যুগের সূচনা হয়। আলি ﷺ-এর শাহাদাতের পর ৪০ হিজরিতে শামে মানুষ তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে। এরপর ৪১ হিজরিতে হাসান ইবনু আলি ﷺ খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিলে সমস্ত মানুষ মুআবিয়া ﷺ-এর খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়ে যায়। মুসলিমদের মাঝে আবার একতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে ইতিহাসে এ বছরকে 'ঐক্যের বছর' বলে উল্লেখ করা হয়। আব্বাসীয় বংশের আবির্ভাব পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফত অব্যাহত থাকে। ১৩২ হিজরিতে উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফা মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ নিহত হন।

উমাইয়া বংশের খলিফাগণ

আমরা এখানে উমাইয়া খলিফাগণের সময়সীমা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

☑ ১. **মুআবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান** ﷺ: তাঁর উপনাম ছিল আবু আবদির রহমান। তাঁর খিলাফতকাল ছিল ৪০ হিজরি থেকে ৬০ হিজরি অবধি। একটা সময় তিনি একইসাথে খিলাফত এবং বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। পরবর্তী সময়ে বিচারকার্য পরিচালনা ছেড়ে দেন।

☑ ২. **ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া:** সময়সীমা ৬১ হিজরি থেকে ৬৪ হিজরি পর্যন্ত।

☑ ৩. **মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদ ইবনি আবি সুফইয়ান:** উপনাম আবু আবদির রহমান কিংবা আবু লাইলা ছিল। পিতা ইয়াজিদের মৃত্যুর পর থেকে তার খিলাফতের সময়সীমা ছিল মাত্র তিন মাস। কেউ কেউ অবশ্য ৪০ দিনের কথা বলেছেন।

☑ ৪. **মারওয়ান ইবনুল হাকাম:** ৬৪ হিজরি থেকে ৬৫ হিজরি অবধি।

☑ **৫. আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান :** ৬৫ হিজরি থেকে ৮৬ হিজরি মোতাবেক ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ অবধি। তার খিলাফতকালেই মূসা ইবনু নুসাইরের হাতে উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা বিজিত হয়।

☑ **৬. ওয়ালিদ ইবনু আবদিল মালিক :** ৮৬ হিজরি থেকে ৯৬ হিজরি পর্যন্ত।

☑ **৭. সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিক :** ৯৬ হিজরি থেকে ৯৯ হিজরি।

☑ **৮. উমর ইবনু আবদিল আজিজ ইবনি মারওয়ান ইবনিল হাকাম :** ৯৯ হিজরি মোতাবেক ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০১ হিজরি মোতাবেক ৭২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। উমাইয়া যুগের খলিফাদের মাঝে তিনি ছিলেন সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। এ কারণে তাঁকে পঞ্চম খুলাফায়ে রাশিদ বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

☑ **৯. ইয়াজিদ ইবনু আবদিল মালিক :** ১০১ হিজরি থেকে ১০৫ হিজরি অবধি।

☑ **১০. হিশাম ইবনু আবদিল মালিক :** ১০৫ হিজরি থেকে ১২৫ হিজরি পর্যন্ত।

☑ **১১. ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনি আবদিল মালিক :** ১২৫-১২৬ হিজরি।

☑ **১২. ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইবনি আবদিল মালিক :** ১২৬ হিজরি। তিনি কেবল পাঁচ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

☑ **১৩. ইবরাহীম ইবনুল ওয়ালিদ ইবনি আবদিল মালিক :** তার খিলাফতের সময়সীমা ছিল মাত্র ৬০ দিন।

☑ **১৪. মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি মারওয়ান ইবনিল হাকাম :** ১২৭ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি অবধি তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া যুগের সর্বশেষ খলিফা। এ সময় আব্বাসীয় বংশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলে উমাইয়া যুগের সমাপ্তি ঘটে।[৩৬৮]

উমাইয়া যুগের বৈশিষ্ট্য

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, উমাইয়া যুগ ছিল রাশিদুন যুগের চেয়ে তিনগুণ বেশি দীর্ঘ। উমাইয়া খলিফাদের সংখ্যাও খুলাফায়ে রাশিদুন থেকে তিনগুণেরও বেশি ছিল।

উমাইয়া যুগে খিলাফত, প্রশাসন ও বিচার সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনা ঘটেছিল। যার সূচনা হয়েছিল হুসাইন ﷺ-এর হাতে ইরাকবাসীদের বাইয়াত গ্রহণের

---

[৩৬৮] তারীখুত তবারি : ৪/১২৩; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/৯৯; রাওদ্বাতুল কুদ্বাত : ৪/১৪৮৬ দ্রষ্টব্য।

মাধ্যমে। আর শেষ হয়েছিল কারবালার ময়দানে তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে। একই সময়ে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ হিজাজের ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু তখনো তাঁর খিলাফতের বাইয়াত নেওয়া হয়নি। লোকদের সাথে নিয়ে তিনি ৬০ এবং ৬১ হিজরিতে হজ পালন করেন। ৬৪ হিজরির রজব মাসে ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার ইন্তেকালের পর তাঁর কাছে খিলাফতের বাইয়াত নেওয়া হয়। হিজাজ-সহ অন্যান্য অঞ্চলগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয় আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ-এর কর্তৃত্ব। ৭৩ হিজরি পর্যন্ত তাঁর শাসনামল ছিল। মারওয়ান ইবনুল হাকামের যুগে দাহহাক ইবনু কায়স বিদ্রোহ করে। মুখতার আস-সাকাফি খলিফা আবদুল মালিকের শাসনামলে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ-কে খিলাফতের মসনদ থেকে অপসারণ করে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যার কাছে বাইয়াত নেয়। এদিকে আবু উমাইয়া আমর ইবনু সাঈদ আল-আস বিদ্রোহ করে। তার দাবি ছিল যে, খলিফা মারওয়ান খিলাফতের দায়িত্ব তার কাছে অর্পণ করে গেছেন। আবার আবদুর রহমান ইবনুল আশআসও বিদ্রোহ করে। ইয়াজিদ ইবনু আবদিল মালিকের যুগে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইয়াজিদ ইবনুল মুলাহহাব। আবার হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের যুগে আবুল হুসাইন যায়িদ ইবনু আলি কুফায় বিদ্রোহ করে। এদিকে খোরাসানে কিছু আব্বাসীয় আহ্বায়কের উত্থান ঘটে এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে।

উমাইয়া যুগের বিচারব্যবস্থার ওপর এসব আন্দোলন আর বিদ্রোহের কোনো প্রভাব পড়েনি। তবে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ-এর খিলাফতের ওপর প্রভাব পড়েছিল। তিনি যেমন হিজাজে বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর ভাই মুসআবও অল্প সময়ের জন্য ইরাকে বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন। আর উমাইয়া রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা সুদীর্ঘ সময় ধরে চালু ছিল।

উমাইয়া যুগের কর্তৃত্ব আর খিলাফত মুআবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ, মারওয়ান এবং তাদের দুজনের বংশধরদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের কারও খিলাফত ছিল চল্লিশ দিন। কারও দুই মাস, কারও পাঁচ মাস, কারও এক বছর, আবার কারও দুই বছর, আবার কারও খিলাফত ছিল তিন বছর। তবে তাদের মধ্যে চারজন খলিফার সময়কাল দীর্ঘ হয়েছিল। মুআবিয়া ﷺ-এর শাসনকাল ছিল এক মাস কম ২০ বছর। আবদুল মালিকের ২১ বছর, ওয়ালিদ ইবনু আবদিল মালিকের শাসনকাল ছিল ১০ বছর কয়েক মাস এবং হিশামের শাসনামল ছিল ২০ বছরেরও বেশি।

এসময় ইসলামি সাম্রাজ্য ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। পূর্বে সিন্ধু এবং ভারত থেকে নিয়ে পশ্চিমে আন্দালুস এবং দক্ষিণ ফ্রান্স অবধি। উত্তরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য থেকে আর্মেনিয়া এবং ট্রান্সঅক্সিয়ানা রাজ্যসীমা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

উমাইয়া যুগে ইসলামি সভ্যতা ব্যাপকভাবে উৎকর্ষ লাভ করে। এ যুগের

প্রশাসন ছিল খুবই শক্তিশালী এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ইনসাফ আর ন্যায়কে পরিপূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়। উমর ইবনু আবদিল আজিজ ﵀-এর যুগে তো ইনসাফ তথা সুবিচার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল।

কাদরিয়্যা, জাহমিয়্যা, মুরজিআ এবং মুতাজিলার মতো ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ এ যুগেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিশাল দলবল নিয়ে উত্থান হয় খারিজি এবং শিয়া সম্প্রদায়ের।

রাশিদুন যুগের সাথে উমাইয়া যুগের সম্পর্ক

উমাইয়া যুগ ছিল বিভিন্ন দিক থেকে রাশিদুন যুগের সম্পূরক। কারণ সে যুগেও অনেক সাহাবি জীবিত ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইলম ও ফিকহ, বিচারকার্য-সহ অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহাবিদের সাথে অংশগ্রহণ করেন প্রথম সারির এবং দ্বিতীয় স্তরের তাবিয়িগণ।

রাশিদুন যুগের অনেক বিচারক উমাইয়া যুগেও দায়িত্বরত ছিলেন। শুরাইহ ইবনুল হারিস ﵀-এর মতো তাদের কারও কারও দায়িত্বের সময়সীমা ছিল অনেক দীর্ঘ।

উমাইয়া যুগে ছিল ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব। ইসলামি আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। সর্বত্র ছিল ঈমানের সুস্পষ্ট ছাপ এবং দ্বীনের আঁচল আঁকড়ে ধরা আর শরীয়তের বিধিবিধান মেনে চলার বাধ্যবাধকতা।

উমাইয়া যুগে বড় বড় মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটেছিল। যারা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম এবং ফিকহি মাযহাবের মধ্যকার সেতু বন্ধন। আব্বাসীয় যুগে যেসব মাযহাবের প্রকাশ ঘটেছিল, উমাইয়া যুগের উলামায়ে কেরাম আর মুজতাহিদগণ ছিলেন সেগুলোর ইমামদের উসতায। উমাইয়া যুগের আদালত আর বিচারব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে এ সকল ফিকহি মাযহাবের প্রভাব ব্যাপক এবং অবদান অনস্বীকার্য। এ যুগে ইজতিহাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। শুরু হয় ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ করার এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন আর জোড়ালো প্রয়াস। খুলে যায় অন্যান্য সভ্যতার দুয়ার। আশেপাশে থাকা বিভিন্ন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি অনূদিত হতে থাকে।

উমাইয়া যুগের দীর্ঘ সময়ে ইসলামি রাষ্ট্র আর খিলাফতের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে ইসলামি বিচারব্যবস্থারও বিস্তার ঘটে। বেড়ে যায় বিচারকদের সংখ্যা। মুজতাহিদ আর ফিকহি মাযহাবের ইমামগণ যেসব বিচারের ওপর নির্ভর করেছিলেন, সেসবও বৃদ্ধি পায়। এই ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে উমাইয়া যুগের প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থা, এ যুগের নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াদি এবং সংক্ষিপ্ত আকারে এ যুগের সাধারণ বিচারব্যবস্থা নিয়ে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন।

উমাইয়া যুগে বিচারব্যবস্থার কাঠামো

উমাইয়া যুগে প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থা কুরআন-সুন্নাহর আলোকেই পরিচালিত হয়েছিল। পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল রাশিদুন যুগের বিচারনীতি এবং সম্প্রসারণনীতি। উমর ﷺ-এর প্রশাসনিক নীতি এবং বিচারকদের সাথে তাঁর পত্র মারফত যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উমাইয়া যুগের বিচারব্যবস্থা এ পদ্ধতিতে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত ছিল।

রাশিদুন যুগের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উমাইয়া যুগেও সমুন্নত ছিল। পাশাপাশি প্রশাসনিক নতুন নতুন কিছু বিষয় এ যুগে প্রকাশিত হয়। সেগুলো সামনে আলোচনা করব। নতুনভাবে প্রকাশিত হওয়া এসব বিষয় নববি যুগ এবং রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থা-সংক্রান্ত ইতিহাসের গুরুত্ব আরও শক্তিশালী করে।

❁ বিচারব্যবস্থা পৃথকীকরণ

খুলাফায়ে রাশিদুন নিজেরা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। মামলা-মোকদ্দমার ফয়সালা, দাবি-দাওয়ার নিষ্পত্তি আর ঝগড়া-বিবাদের নিরসন তাঁরা নিজেরা করতেন। তাঁদের থেকে এ ধরনের অনেক বিচারকার্য প্রকাশ পেয়েছে। আর প্রশাসকরাও খলিফাদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অনেক দায়িত্ব পালন করতেন। কারণ তারা ছিলেন খলিফারই প্রতিনিধি। তবে যাদেরকে সীমিত পর্যায়ের দায়িত্ব দেওয়া হতো এবং বিচারকার্য পরিচালনা করা থেকে যাদের নিষেধ করা হতো, তাদের কথা ছিল ভিন্ন। বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তাদের সাথে স্বতন্ত্র বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো। শামে ২০ বছর যাবৎ প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করা মুআবিয়া ﷺ ছিলেন এসব প্রশাসকদের অন্যতম। প্রশাসনের পাশাপাশি একইসাথে তিনি বিচারের দায়িত্বও পালন করেছেন।[৩৬৯] আবার উমর ইবনু আবদিল আজিজ ﷺ মদীনায় থাকাকালীন বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এরপর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর মুআবিয়া ﷺ বিচারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী দামিস্কে স্বতন্ত্র বিচারক নিয়োগ দিয়ে তাদের কাছে বিচারিক ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। বিচারের ক্ষেত্রে তাদেরকে দেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। বিভিন্ন শহরে নিয়োগকৃত তাঁর প্রশাসকরাও এ পদ্ধতিতেই চলতেন। বিচারের কাজে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা থেকে তারা বিরত থাকতেন। উমাইয়া খিলাফতকালের সুদীর্ঘ সময়ে খলিফাগণ এই নীতি অনুসারেই চলতেন। কেবল তিনটি বিষয়ে উমাইয়া খলিফাগণ কর্তৃত্ব রাখতেন।

☑ প্রথমত : রাজধানী দামিস্কে সরাসরি বিচারক নিয়োগ প্রদান।

---

[৩৬৯] রাওজাতুল কুজ্জাহ : ৪/১৪৯৭

☑ দ্বিতীয়ত: বিচারকদের যাবতীয় কার্যক্রম এবং রায় লক্ষ করা। বিচারক নিয়োগ প্রদান, বরখাস্ত করা, তাদের ভাতা দেওয়া, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, বিচারকদের থেকে প্রকাশিত নির্দেশনাবলির তদারকি করা-সহ তাবৎ বিষয় নজরদারিতে রাখা। যেমন: এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যে, বিচারকদের রায় ন্যায়সংগত হচ্ছে কি না, আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা দিচ্ছে কি না, বিচার-সংক্রান্ত নীতি সঠিকভাবে পালন করছে কি না ইত্যাদি।

☑ তৃতীয়ত: দুর্নীতি এবং জনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিচার পরিচালনা করা। উমাইয়া খলিফাগণ দুর্নীতির বিচারের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন। অবশেষে দুর্নীতির বিচারব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছিল এবং এর জন্য তৈরি হয়েছিল স্বতন্ত্র একটি ব্যবস্থাপনা। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব।

এ কারণেই উমাইয়া যুগের বিচার বিভাগ ছিল গতানুগতিক অন্য সব সরকারি বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি খলিফার ক্ষমতাও সেখানে চলত না। প্রশাসকদের ক্ষমতা ছিল কেবল বিচারক নিয়োগ প্রদান এবং বরখাস্ত করা। মোটকথা, বিচারকের কার্যক্রম, রায়, গবেষণা এবং বিচারের ক্ষেত্রে কারোরই হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকত না। খলিফা এবং প্রশাসকদের কাজ কেবল এতটুকুই ছিল যে, বিচারকদের প্রদত্ত ফয়সালা তারা বাস্তবায়ন করতেন।

শাইখ আবুল হাসান নুবাহি ﷺ লিখেছেন, 'অবশেষে খিলাফতের দায়িত্ব মুআবিয়া ﷺ-এর কাছে এলে তিনি বিচারকদের তদারকি করার ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালে একটা সময় অবধি এ নীতিই বহাল ছিল।'[৩৭০]

❁ বিচারক নিয়োগ

উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কুফার বিচারক শুরাইহের মতো আগের কোনো কোনো বিচারককে খলিফা এবং প্রশাসক স্বপদে বহাল রেখেছিলেন। তারপর খলিফা ইসলামি খিলাফতের রাজধানী দামিস্কে বিচারক মনোনয়ন এবং নিয়োগ প্রদান শুরু করেন। দামিস্কের বিচারককে 'قَاضِي الْخَلِيفَةِ' তথা খলিফার বিচারক নামে অভিহিত করা হতো। যাদের বিশালসংখ্যক একটা অংশ ছিলেন সুগভীর ইলম, পরহেজগারি, আল্লাহভীতি এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ।[৩৭১]

[৩৭০] তারীখু কুদ্বাতিল উনদুলুস, পৃ. ২৪

[৩৭১] রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ গ্রন্থের দামিস্কে খলিফাদের বিচারক সংক্রান্ত আলোচনাটি দেখুন। অন্যান্য বিচারকদের তুলনায় খলিফার বিচারকদের বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না। বিচারক নিযুক্তির ব্যাপারে তার কাছে কোনো ধরনের মতামতও জানতে চাওয়া হতো না। পক্ষান্তরে আব্বাসীয় যুগের অবস্থা ছিল ভিন্ন। (তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৫; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৫৯; তারীখুল উম্মামিল ইসলামিয়্যাহ: ২/২১৮; আবকারিয়্যাতুল ইসলাম, পৃ. ৪৪০)

এ বিষয়টি আমরা সামনে লক্ষ করব।

বিচারক নির্বাচন এবং বিচার ও বিচারক সংক্রান্ত বিষয়ে খলিফা যথেষ্ট মনোযোগ এবং পরিপূর্ণ গুরুত্বারোপ করতেন। বিচারকদের গুণাবলি চিহ্নিত করার ব্যাপারে উমর ইবনু আবদিল আজিজের বক্তব্যও এমনই ছিল। তিনি বলেছেন, 'একজন উপযুক্ত বিচারকের পাঁচটি গুণের অধিকারী হতেই হবে : ১. চারিত্রিক পবিত্রতা, ২. সহনশীলতা, ৩. পূর্ববর্তী বিচারকদের কাজের ব্যাপারে জ্ঞান থাকা, ৪. অভিজ্ঞদের সাথে বিচার-সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করা এবং ৫. আল্লাহর খাতিরে কারও নিন্দার পরোয়া না করা।'

বিচারক এবং অন্যান্য দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে সে নিজেকে এমন শাস্তি দেবে যা মানুষকে দেওয়া শাস্তির অধিক ভয়াবহ হবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তা প্রদান করবেন।'[৩৭২]

কিন্তু উমাইয়া যুগে যে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল তা হলো, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কোনো হস্তক্ষেপ না থাকা। দামিস্কে থেকে খলিফা বিভিন্ন শহরের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসকদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন। উমাইয়া যুগের অধিকাংশ সময়ে গভর্নররাই প্রাদেশিক বিচারকদের নিয়োগ দিতেন। আবার কখনো খলিফারাও গভর্নরদের কাছে নির্বাচিত নাম প্রস্তাব করতেন।[৩৭৩]

বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে খলিফা এবং প্রশাসকরা ছিলেন যথেষ্ট সতর্ক। শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের খোঁজ করে বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদানের জন্য তারা বড় বড় ফকিহ, আলিম এবং অভিজ্ঞ লোকদের শরণাপন্ন হতেন।

খলিফা উমর ইবনু আবদিল আজিজ ﵀ বলেন, 'একজন বিচারকের মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকলে সে পূর্ণাঙ্গ বিচারক বলে বিবেচিত হবে : ১. পূর্ববর্তীদের বিচার সম্পর্কে জানা থাকা, ২. নির্লোভ হওয়া, ৩. বাদী-বিবাদীর প্রতি সহনশীল হওয়া, ৪. মুসলিম নেতার অনুসরণ করা এবং ৫. আলিমদের সাথে মিলে কাজ করা।'[৩৭৪]

ইবনু হুবায়রা ছিলেন ইরাকের প্রশাসক। তার থেকে ইবনু শুবরুমাহর সূত্রে ওয়াকি বলেছেন, 'বুদ্ধিমান এবং আল্লাহভীরু আলিমই বিচারকার্য পরিচালনার উপযুক্ত ব্যক্তি।'[৩৭৫]

---

[৩৭২] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/২০; আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৭৭

[৩৭৩] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৪১ ও ১৮১; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ২৯; আল-কাদ্বাউল ইদারি, পৃ. ৪৬

[৩৭৪] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৬

[৩৭৫] ইতিহাসে দুজন ইবনু হুবায়রার কথা জানা যায়। একজন হলেন উমর ইবনু হুবায়রা আল-ফাযারি। মৃত্যু ১১০ হিজরি। খলিফা ইয়াজিদ ইবনু আবদিল মালিক তাকে ইরাক এবং খোরাসানের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কুফায় থাকতেন। (আল-আলাম : ৫/২৩১) আরেকজন ছিলেন উমর ইবনু হুবায়রার ছেলে ইয়াজিদ। মৃত্যু ১৩২ হিজরি। খলিফা মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ ১২৮ হিজরিতে তাকে প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তাকে দুই ইরাকের

বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে খলিফা এবং প্রশাসকরা অন্যদের সহযোগিতা নিতেন। সেটা হতো বয়োবৃদ্ধ কিংবা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে চাচ্ছেন এমন বিচারকের মনোনয়ন প্রদানের মাধ্যমে। অথবা এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য যিনি প্রার্থী হতে চান তার ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চিত হয়ে যাচাই-বাছাই করে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার মাধ্যমে।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। বিচারক নুমাইর ইবনু আউস শারীরিকভাবে দুর্বল এবং দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে যাওয়ায় বিচারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলে খলিফা হিশাম ইবনু আবদিল মালিক তার জায়গায় আরেকজনকে মনোনীত করে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। নুমাইর তখন দামিস্কের অধিবাসী ফকিহ ইয়াজিদ ইবনু আবি মালিক হামাদানির কথা উল্লেখ করলে খলিফা তাকে নিয়োগ প্রদান করেন। ইয়াজিদ প্রচুর হাদিস বর্ণনার পাশাপাশি অনেক বিচারকার্যও পরিচালনা করেছেন।[৩৭৬]

প্রখ্যাত রাবি কিনদি ﷺ বলেন, আবদুর রহমান ইবনু হুজাইরাহ ছিলেন সবার সেরা ফকিহ। তাই আবদুল আজিজ তাকে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ দিয়েছিলেন। ওয়াকি ﷺ বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-এর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'তোমাদের মাঝে ইবনু হুজাইরাহ আছে, আর তুমি কিনা আমার কাছে জানতে চাইছ!'[৩৭৭]

কোনো বিচারক অসুস্থতা বা অপারগতা কিংবা অপসারণের কারণে বিচারের পদ ছেড়ে দেওয়ার সময় হলে খলিফা তার মতামত নিতেন, তার পরে কাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া যায়। বিচারক তখন উপযুক্ত আর যোগ্য কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন। ওয়াকির সূত্রে এ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, আবুদ দারদা ﷺ ছিলেন দামিস্কের বিচারক। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন মুআবিয়া ﷺ তাঁকে দেখতে এসে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার পর এ দায়িত্বের জন্য আপনি কাকে উপযুক্ত মনে করেন?' আবুদ দারদা ﷺ তখন ফাদ্বালাহ ইবনু উবাইদ ﷺ-এর নাম প্রস্তাব করেন।[৩৭৮]

প্রশাসক বলা হতো। (আল-আলাম : ৯/২৪০)

[৩৭৬] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২০৬

[৩৭৭] আল-উলাতু ওয়াল-কুদ্বাহ, পৃ. ৩১৪; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৫

[৩৭৮] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৯৯; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ১৩৫। তারপর ফাদ্বালাহ ﷺ বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুআবিয়া ﷺ-এর খিলাফতকালেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। মুআবিয়া ﷺ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করে খাটলির একাংশ বহন করেছিলেন। ফাদ্বালাহ ﷺ বাইয়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের সবার শেষে মৃত্যুবরণ করেন। মুআবিয়া ﷺ শামের বাইরে গেলে তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যেতেন। (আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২০১-২০২)

ওয়াকি এ-ও বর্ণনা করেছেন, 'তাওবা ইবনু নামির[৩৭৯] বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বরত ছিলেন। একসময় তিনি অব্যাহতি চাইলে তাকে বলা হয়, "আপনার পরে আমরা বিচারক বানাতে পারি এমন কারও ব্যাপারে আপনি আমাদের পরামর্শ দিন।" তখন তিনি বললেন, "আমার মির-মুনশি জুবাইর ইবনু নুআইম।"[৩৮০]

এরপর জুবাইর বিচারের দায়িত্ব পালন করেন। জুবাইরও কিছুকাল দায়িত্ব পালন করে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি দেন। কেননা একজন সাধারণ লোককে গালি দেওয়ার অপরাধে একজন সৈনিককে তিনি বন্দি করেছিলেন। কিন্তু প্রশাসক সৈনিকটিকে মুক্ত করে দেন। এ কারণে জুবাইর বিচারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ঘরে চলে যান। প্রশাসক আবু আউন তাকে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন করলে জুবাইর স্পষ্ট বলে দিলেন, "সৈনিকটিকে জেলে না ঢোকালে আমি ফিরে যাব না।" কিন্তু প্রশাসক এটা করল না। সে তখন বিচারক জুবাইরকে বলল, "তাহলে আপনার পর আমরা কাকে দায়িত্ব দিতে পারি সে ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ দিন।" জুবাইর তখন তার মির-মুনশি গাউস ইবনু সুলাইমানের কথা বললেন। তারপর গাউস বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।'[৩৮১]

খলিফাদের নীতি ছিল, বিচারকদের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করার আগে তাদের যোগ্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং তাদের বিষয়াদি নিয়ে নিজেরা পরামর্শ করে নেওয়া।[৩৮২] শুরাইহ এবং কাব ইবনু ইয়াসারকে নিয়োগ দেওয়ার সময় উমর ﵁-ও এমনটা করেছিলেন। বনু উমাইয়াও এই নীতি অনুসরণ করে।

ওয়াকি বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনু আবদিল আজিজ বসরার প্রশাসক আদি ইবনু আরতাতের কাছে একজন লোক পাঠিয়েছিলেন। যার দায়িত্ব ছিল প্রথমে ইয়াস ইবনু মুআবিয়া এবং কাসিম ইবনু রবীআ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হওয়া। এরপর তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান, তাকে বসরার বিচারকার্য পরিচালনায় নিয়োগ দেওয়া। সেমতে তাদের দুজনকে একত্রিত করা হলে ইয়াস তাকে বলেন, 'আমাদের সম্পর্কে শহরের সেরা দুই ফকিহ হাসান ও ইবনু সীরিন ﵏-কে জিজ্ঞাসা করুন। তারা আপনাকে যাকে নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ দিবে,

---

[৩৭৯] তাওবা ইবনু নামির ১১৫ হিজরিতে মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২০ হিজরি সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালনরত ছিলেন। খলিফা হিশামের সময় তিনিই সর্বপ্রথম ওয়াকফ সম্পত্তি গ্রহণ করেন। (আল-উলাতু ওয়াল-কুদ্বাহ, পৃ. ৩৪২, ৩৪৬ এবং ৩৪৭)

[৩৮০] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৩১। কিনদি তার নাম খাইর ইবনু নুআইম আল-হাদরামি বলেছেন। ১২০ হিজরিতে তিনি মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুয়ুতি তার নাম কখনো খাইর ইবনু নুআইম, আবার কখনো জাবর ইবনু নুআইম বলেছেন। ১৩৭ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়। (হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ১/২৯৯, ৫৫১)

[৩৮১] আখবারুল কুদ্বাতি ওয়াল উলাহ : ২/২৩২; আল-উলাতু ওয়াল-কুদ্বাহ, পৃ. ২৫৬

[৩৮২] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/২৩২, ৩/১৩০

তাকেই আপনি নিয়োগ দিন।' হাসান এবং ইবনু সীরিন ﷺ-এর সাথে কাসিম ইবনু রবীআর ওঠাবসা ছিল। পক্ষান্তরে ইয়াস তা করতেন না। তাই কাসিম বুঝে ফেললেন, প্রশাসক তাঁদের দুজনকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা তো তার ব্যাপারেই পরামর্শ দেবেন। তাই তিনি প্রশাসককে বললেন, 'জনাব! আমাদের সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। আমার কথা শুনুন। এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আসলে আপনি যা চাচ্ছেন আমি তার উপযুক্ত নই। ইয়াসই এ ব্যাপারে অধিক অভিজ্ঞ। এ ব্যাপারে সে অধিক পারদর্শী। আপনি নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকলে ইয়াসকে বাদ দিয়ে আমাকে নিয়োগ দেওয়া আপনার জন্য উচিত হবে না। পক্ষান্তরে দায়িত্বের ব্যাপারে আপনি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে কোনো মিথ্যাবাদীকে নিয়োগ দেয়াও আপনার জন্য সমীচীন নয়।' তখন প্রশাসক একটু থমকে গিয়ে সন্দেহে পড়ে গেলেন। তিনি ইয়াসকে নিয়োগ দেওয়ার মনস্থ করতেই ইয়াস বলে উঠলেন, 'আপনি এমন একজন লোককে আনতে চলেছেন, যাকে আপনি জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করছে। নিজের মুক্তির জন্য সে এমন কসম করেছে, যা থেকে সে তাওবা করে রবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। এর মাধ্যমে আপনার ইচ্ছার ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে চায়।' তখন প্রশাসক বললেন, 'এ দায়িত্বের এমন নাজুকতা যদি আপনি বুঝে থাকেন, তাহলে আপনিই এর উপযুক্ত। কারণ আপনি কাসিমের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান।' এরপর প্রশাসক তাকেই বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেন।[৩৮৩]

বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসক আবু আউন অনেক আলিমের সাথেও পরামর্শ করেছিলেন। আবদুর রহমান ইবনু হুজাইরাহকে আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ান বিচারকার্য পরিচালনায় নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইবনু হুজাইরাহ ছিলেন একজন বিজ্ঞ ফকিহ।[৩৮৪]

۞ বরখাস্তকরণ এবং স্বেচ্ছায় পদত্যাগ

উমাইয়া যুগে বিচারকদের ব্যাপক রদবদল দেখা গিয়েছিল। বিচারকদের বরখাস্ত করা অথবা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ ছিল এর অন্যতম কারণ। এ ছাড়াও আরও অনেক কারণ ছিল।

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, প্রাদেশিক শাসকরা বিভিন্ন শহর এবং উপশহরে বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব পালন করতেন। এটাই ছিল বিচারকদের বরখাস্ত করা বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার অন্যতম প্রধান কারণ। সে-সময় প্রাদেশিক শাসকরাও

---

[৩৮৩] আল-উলাতু ওয়াল-কুদ্বাহ : ১/৩১৩; ওয়াফায়াতুল আইয়ান : ১/৩২৫; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ১৩৩

[৩৮৪] আল-উলাতু ওয়াল-কুদ্বাহ : ১/৩১৪

ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতো। কারণ তখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং প্রশাসনিকভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন হতো। বিভিন্ন দল এবং উপদলে বিপ্লবের উত্থান ঘটত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল সাধারণ ঘটনা। এ কারণেই প্রশাসকদের রদবদল করা হতো। বিশেষত নতুন কোনো প্রশাসক আসলেই আগের বিচারককে বরখাস্ত করে নতুন বিচারক নিয়োগের প্রচলন ছিল। কখনো-সখনো আগের বিচারককে বহাল রাখা হতো।

কিনদি বলেন, মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাওসারা ইবনু সুহাইল আল-বাহিলি মিশরে এল। তারা সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হত্যা করল। একপর্যায়ে বরখাস্ত করল বিচারক খাইর ইবনু নুআইমকে। ... হাসসান ইবনু আতাহিয়া তখন হাওসারাকে বললেন, 'আপনি তো হাদরামাউতের জন্য এই নেতা (অর্থাৎ খাইর ইবনু নুআইম) ছাড়া আর কাউকেই অবশিষ্ট রাখেননি। এখন তাকে শেষ করে দেওয়া মানে এই অঞ্চলকেই (উমাইয়াদের থেকে) বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।' হাওসারা অবশেষে খাইর ইবনু নুআইমকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় আবদুর রহমান ইবনু সালিমকে নিয়োগ দিলেন।[৩৮৫]

সায়েব ইবনু হিশামের ইতিহাসে হাফিজ ইবনু হাজার ﷺ লিখেন, 'মাসলামা ইবনু মাখলাদ তাকে মরক্কোর বিচারের দায়িত্বের পাশাপাশি মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বও প্রদান করেন। আর এটা ছিল সুলাইম ইবনু আনরের পর মুআবিয়া ﷺ-এর যুগের ঘটনা। আর সুলাইমই ছিল সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যাকে মুআবিয়া এবং মাসলামা দুজনই নিয়োগ দিয়েছিলেন।' ইবনু হাজার আরও লিখেন, 'তারপর মাসলামার কাছে এ খবর পৌঁছল যে, সুলাইম বলেন, "আমিরের দরজায় যাওয়া বিচারকের উচিত নয়। বরং বিচারকের দরজায় আমিরের যাওয়া উচিত।" মাসলামা তখন সুলাইমকে বরখাস্ত করে দেয়।'[৩৮৬]

ওয়াকি বলেন, ১২৫ হিজরিতে হিশাম ইবনু আবদিল মালিক ইন্তেকাল করলে ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ ক্ষমতায় আসেন। তখন তিনি হিশাম ইবনুল ওয়ালিদকে শহরে প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করে সে জায়গায় ইউসুফ ইবনু খালিদকে নিয়োগ দেন। ইউসুফকে অবশ্য আগেই বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। পরে তাকে বরখাস্ত করেন। এভাবেই শহরে কোনো নতুন প্রশাসক নিয়োগ হলে তিনি নতুন বিচারক নিয়োগ দিতেন এবং সাবেক বিচারককে বরখাস্ত করতেন।[৩৮৭]

অনেক সময় বিচারকদের সাথে সম্পৃক্ত কিছু কারণেও বরখাস্ত করা হতো।

---

[৩৮৫] আল-উলাতু ওয়াল-কুদ্বাহ : ১/৩৫২

[৩৮৬] রাফউল ইসর আন কুদ্বাতি মিশর : ২/২৪৪; আল-উলাতু ওয়াল-কুদ্বাহ : ১/৩১২

[৩৮৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৮৭। প্রশাসক রদবদল এবং শহরের বিচারক বরখাস্ত করার উদাহরণ দেখতে আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১১৪-১২০ দেখুন।

যেমন উমর ইবনু আবদিল আজিজ এক বিচারককে এজন্য বরখাস্ত করেছিলেন যে, মামলার মীমাংসার ক্ষেত্রে বাদী-বিবাদীর তুলনায় সে বেশি কথা বলত। কোনো ত্রুটি, সুন্নাহ এবং ইজমার বিরোধিতা, শরীয়তের বিধি-নিষেধ বা বিচারের নিয়ম অমান্য করা, আমানতদারিতার ব্যাপারে অভিযোগ, কিংবা অধিকাংশ জনগণের অভিযোগের কারণেও অনেক সময় বিচারককে বরখাস্ত করা হতো।[৩৮৮]

আবার বিচারকরাও অনেক সময় বিভিন্ন কারণে দায়িত্ব থেকে সরে যেতেন। যেমন বিচারপতি শুরাইহ বার্ধক্যজনিত কারণে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের কাছে অব্যাহতি চেয়েছিলেন।[৩৮৯] উমাইয়া যুগে খাইর ইবনু নুআইম দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়েছিলেন। কারণ আমির মিশরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হত্যা করেন। আব্বাসীয় যুগেও তিনি আরও এক বার বিচারের দায়িত্ব থেকে সরে যান। কেননা তিনি অভিযোগের কারণে একজন সৈন্যকে বন্দি করেছিলেন। কিন্তু আমির সেই সৈন্যটিকে ছেড়ে দেয়। খাইর তখন সৈন্যটিকে পুনরায় বন্দি করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। অবশেষে তার কথা মানা হচ্ছে না দেখে তিনি দায়িত্ব থেকে সরে যান।[৩৯০]

বিচারক ইমরান ইবনু আবদিল্লাহরও এমনই একটি ঘটনা আছে। একবার তার কাছে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মালিকের একজন মুনশি নেশা করেছে। তখন তিনি সেই মুনশির বিচার করতে চাইলে প্রশাসক আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মালিক তাকে বাধা দেয়। তখন বিচারক ইমরান বলেন, 'বেশ, আমি বিচারের দায়িত্বও পালন করব না। আবার তাকে শাস্তিও দেবো না।' যে কথা সেই কাজ। তিনি বিচার তো করলেনই না; এমনকি বিচারের দায়িত্ব থেকেও সরে গেলেন।[৩৯১]

❁ মসজিদ এবং অন্যান্য জায়গায় বিচার-সালিশ

অধিকাংশ ইসলামি শহরে বিচারের কার্যক্রম মসজিদেই পরিচালিত হতো। যেসব বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া হতো, মসজিদেই তাদের শপথগ্রহণ হতো।

☑ উমাইয়া যুগে বিচারকগণ অধিকাংশ বিচার জামে মসজিদে কিংবা মসজিদের মূল ফটকে করতেন।

☑ মদীনার বিচারক আবু বকর ইবনু হাযাম মসজিদেই বিচারের কার্যক্রম

[৩৮৮] বিচারক বরখাস্ত করার ঐতিহাসিক উদাহরণ দেখতে নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআতি ওয়াত তারীখ, পৃ. ১৭০ দেখুন।

[৩৮৯] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৪০৮; নিযামুল হুকমি, পৃ. ১৭৯

[৩৯০] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ১৭৮; আল-উলাতু ওয়াল-কুদ্বাহ, পৃ. ৩৫২

[৩৯১] নিযামুল হুকমি, পৃ. ১৭৮

পরিচালনা করতেন। তার কাছেই চাবুক হাতে প্রহরীরা দাঁড়ানো থাকত।

☑ বিচারক ইয়াস বসরার বাজারে বিচার করতেন। আর এ ধরনের বিচার জামে মসজিদের বিচারের মতোই হতো।[৩৯২]

☑ বসরার অপর বিচারক আবু বুরদাহ তার বাসভবনে বিচার করতেন। শাবি বিচার করতেন কুফার জামে মসজিদে। সেখানেই শাস্তি বাস্তবায়ন করতেন।[৩৯৩]

☑ আবদুল্লাহ ইবনু নাওফ আত-তাইমি বিচার করতেন কুফার কেন্দ্রীয় মসজিদে।[৩৯৪] ইবনু আবি লাইলা মসজিদেই দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতেন।[৩৯৫]

বিচারকের পদ থেকে দূরে থাকা

উমাইয়া যুগে আলিম এবং ফকিহদের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব থেকে বিরত থাকার বিষয়টি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এর পেছনে অনেক কারণ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ দুয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো :

☑ **১. রাজনৈতিক দিক :** সে-সময় কিছু আলিম উমাইয়া-বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। উমাইয়া যুগেই এ সকল আন্দোলনের উত্থান ঘটে। এ আন্দোলনের অনেক আহ্বায়ক তৈরি হয়। অনেক আলিম প্রত্যক্ষভাবে এসব আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও এসবের প্রতি তারা একধরনের টান অনুভব করতেন। এগুলোর প্রতি তারা সংবেদনশীল ছিলেন। এ কারণেই তারা বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। যাতে তাদেরকে উমাইয়া প্রশাসনের লোক মনে করা না হয়। কেউ যাতে তাদেরকে প্রশাসনের সমর্থক না ভাবে। কিছু আলিম তো এমনও ছিলেন, সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সাথে যাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না, কিন্তু উমাইয়াদের কিছু রাজনৈতিক পলিসি নিয়ে তারা ছিলেন বেশ ক্ষুব্ধ। উমাইয়াদের কিছু রাজনৈতিক পলিসি ছিল রাশিদুন যুগের রাজনীতি থেকে আলাদা। যেমন, পরবর্তী শাসক নিযুক্ত করে যাওয়া। উমাইয়ারা ইসলামি রাজনীতির তুলনায় পার্থিব রাজনীতির দিকে একটু বেশিই ঝুঁকে পড়েছিল। নেককার পূর্বসূরিদের আদর্শের সাথে তাদের খুব বেশি মিল ছিল না। তাই আলিম সমাজ এবং উমাইয়া শাসকদের মাঝে একটি ফাটল তৈরি হয়েছিল। এসব কারণে তারা বিচারকের পদ গ্রহণ থেকে

---

[৩৯২] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/১৬৯; আল-কাদ্বাউল ইদারি, পৃ. ৪৬; আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৪৫ ও ৩৩৯

[৩৯৩] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৩২৮, ৪১২ এবং ৪১৪

[৩৯৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৪

[৩৯৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৩৫

বিরত থাকেন।[৩১৬]

☑ **২. আধ্যাত্মিক দিক :** এটাও ছিল আলিমদের বিরত থাকার অন্যতম কারণ। বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব কতটা নাজুক, আলিমরা সেটা বুঝতে পারতেন। এ ব্যাপারটিকে তারা ভীষণ ভয় করতেন। তারা মনে করতেন, এ এমন এক পরীক্ষা, যার পরিণাম তাদের অজানা। তাদের ভয় থাকত, পাছে জাহান্নামি বিচারকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান কি না! না-জানি জালিম আর অন্যায় বিচারক হতে হয়। কিংবা তারা মনে করতেন, সুচারুরূপে বিচারের দায়িত্ব পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ এ পথে রয়েছে প্ররোচনাদায়ক নানান জিনিস, কুপ্রবৃত্তির চাহিদা, ঘুস-সহ বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপের হাতছানি। এখানে শাসক এবং প্রশাসকের মুখোমুখি হতে হবে। সামাজিক সমালোচনার সামনে তারা টিকে থাকতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে মানুষ কেবল সে-সকল ন্যায়পরায়ণ বিচারকদেরই বরদাস্ত করে, যারা সকল শ্রেণির এবং সমস্ত স্তরের মানুষের মাঝে অকপটে শরীয়তের বাস্তবায়ন ঘটায় এবং বিচারের বিধান প্রয়োগ করে।

উমাইয়া যুগে আলিমগণের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব থেকে বিরত থাকার অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বর্ণিত আছে। সেখান থেকে মাত্র কয়েকটা আমরা এখানে উল্লেখ করব।

☑ **১. আবদুল্লাহ ইবনু উতবা ইবনি মাসউদ আল-হুযালি :** মুসআব ইবনুয যুবাইরের সময় তিনি ছিলেন কুফাবাসীদের বিচারক। আস্থাভাজন বিচারক হিসেবে সবাই তাকে চিনত। উমাইয়া যুগে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তাকে ডাকা হলে তিনি বিরত থাকলেন। তখন একজন লোক গোপনে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'তোমার কাছে আমার একটি প্রয়োজন আছে।' লোকটি জানতে চাইল, 'কী প্রয়োজন?' তিনি বললেন, 'তুমি এই অঙ্গারের মধ্যে একটি আঙুল রাখো তো দেখি।' লোকটি অবাক হয়ে বলল, 'সুবহানাল্লাহ, এ কী বলছেন আপনি!' তিনি বললেন, 'দুনিয়াতে একটি আঙুল বাঁচাতে তুমি কতটা সতর্ক। অথচ (দায়িত্ব নিলে) জাহান্নামে আমার গোটা শরীরই যে জ্বলবে!'[৩১৭]

☑ **২. মুসাইয়াব ইবনু রাফেকে উমর ইবনু হুবাইরা :** তাকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ডাকলে তিনি বললেন, 'বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করলে যদি তোমাদের মসজিদের এই চৌহদ্দি স্বর্ণে পরিণত হয়ে যায়, তবুও সেটা আমার

---

[৩১৬] আলিম এবং ফকিহদের বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি বিষয়ে আত-তুরাস পত্রিকার ৩য় বর্ষের ১১তম সংখ্যার ১৪০তম পৃষ্ঠায় আমাদের আলোচনা পড়ুন।

[৩১৭] তবাকাতু ইবনি সাদ : ৬/১২০; আখবারুল কুযাহ : ২/৪০২, ৪০৬

কাছে পছন্দনীয় হবে না।'[৩৯৮]

☑ ৩. **হাফ ইবনুল হারিস আল-ইয়ামানি :** সিমনানি বর্ণনা করেন, হাফ ইবনুল হারিসকে খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান বিচারের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানান এবং বিরত থাকেন। তখন খলিফা তাকে আর জোরাজুরি করেননি।[৩৯৯]

☑ ৪. **মাকহুল :** তিনি ছিলেন তৎকালীন (১১৩ হিজরি) শামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ। বিচারকের পদ প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, 'বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ অপেক্ষা আমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।' তিনি আরও বলেন, 'আমাকে যদি বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ এবং আমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে যে-কোনো একটা বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে আমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়াটাই আমি পছন্দ করব।'[৪০০]

☑ ৫. **হাইওয়া ইবনু শুরাইহ :** ইয়াজিদ ইবনু হাতিম তাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিতে চেয়েছিল। তখন হাইওয়া সাফ জানিয়ে দেন—'আমি এটা পারব না। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন।' তখন ইয়াজিদ ইবনু হাতিম তাকে ছেড়ে দিয়ে আবু খুযাইমা ইবরাহীম ইবনু ইয়াজিদকে বিচারের দায়িত্ব দিলো। এই ঘটনার পর হাইওয়া সবসময় বলতেন, 'আবু খুযাইমা আমার চেয়ে উত্তম। তাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।' আবু খুযাইমার বিচারের দায়িত্ব গ্রহণের কারণ সম্পর্কে ওয়াকি বলেছেন, 'সালিহ ইবনু আলি নামক এক ব্যক্তিকে বিচারের দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে আবু আউন পরামর্শ করলে তাকে তিনজন ব্যক্তির ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হলো। সেই তিনজন হলেন যথাক্রমে হাইওয়া ইবনু শুরাইহ, আবু খুযাইমা এবং আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস আল-গাসসানি। আবু খুযাইমাকে ইস্কান্দারিয়ায় ডেকে আনা হলো। বাকি দুজনকে ডাকা হলে তারাও এলেন। প্রথমে হাইওয়াকে দায়িত্ব দিতে চাওয়া হলে তিনি গ্রহণে অসম্মতি জানালেন। এরপর তাকে ভয় দেখানোর জন্য তরবারি এবং চামড়ার মাদুর আনা হয়। এটা দেখে হাইওয়া সাথে থাকা একটি চাবি বের করে বললেন, 'এটা আমার ঘরের চাবি। আমি তো আমার শেষ ঠিকানা জান্নাতের প্রতি আগ্রহী।' হাইওয়ার এমন দৃঢ়চেতা মনোভাব দেখে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তখন হাইওয়া তাদের বলে দিলেন, 'তার অপর সঙ্গী দুজনের কাছে যেন তার অস্বীকৃতির বিষয়টি প্রকাশ না করা হয়। তাহলে আমি যা করেছি তারাও সেটাই করবে।' এভাবেই হাইওয়া বিচারকার্য

---

[৩৯৮] আখবারুল কুদাহ : ১/২৪

[৩৯৯] রাওদাতুল কুদাহ : ৪/১৫০০

[৪০০] আখবারুল কুদাহ : ১/২৪; আল-আলাম : ৮/২১২

পরিচালনার দায়িত্ব থেকে বেঁচে গেলেন।[৪০১] সুয়ূতি ﷺ বলেন, তারপর আবু খুযাইমাকে ডেকে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হলে তিনিও অসম্মতি প্রকাশ করেন। তখন তার সামনেও তরবারি এবং চামড়ার মাদুর আনা হলে তার অন্তর দুর্বল হয়ে যায়। এটা বরদাস্ত করতে না পেরে তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেন। ফলত তাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো। তারপর তিনি কর্মক্ষেত্রে চমৎকার দক্ষতার পরিচয় দিতে লাগলেন।[৪০২]

☑ **৬. আবু হানিফা** ﷺ : মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের প্রশাসক ছিল ইয়াজিদ ইবনু হুবায়রা। সে ইমাম আবু হানিফা ﷺ-কে ডেকে বিচারের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। যার কারণে তাঁকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এর কারণ সম্ভবত এটাও ছিল যে, যায়িদ ইবনু আলি ১২২ হিজরিতে কুফায় বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনার আগে আবু হানিফা ﷺ-এর পক্ষ থেকে যায়িদ ইবনু আলির ব্যাপারে প্রশংসামূলক কিছু বক্তব্য পাওয়া গিয়েছিল। তাই ইবনু হুবায়রার ইচ্ছা ছিল, ইমাম আবু হানিফাকে উমাইয়াদের পক্ষ থেকে বিচারের দায়িত্ব দিয়ে পরীক্ষা করা। এরপরও তাঁর অসম্মতি দেখে তাঁকে শাস্তিও দিয়েছিল। এ ধরনের ঘটনা আবু হানিফা ﷺ-এর সাথে বেশ কয়েকবার ঘটেছে। ১২৭ হিজরিতে আবদুল্লাহ ইবনু জাফরের নাতি আবদুল্লাহ ইবনু মুআবিয়া যখন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ইবনু হুবায়রা তখন আবু হানিফা ﷺ-কে পুনরায় পরীক্ষা করে। একপর্যায়ে তাঁকে প্রহারও করা হয়। কারণ ইমাম আবু হানিফা যে বনু উমাইয়ার আদর্শ থেকে সরে গেছেন, সেটা ইবনু হুবায়রা ধরতে পেরেছিল। মূলত এটাই ছিল তাঁকে প্রহার করার কারণ। বিচারের দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে প্রহার করা হয়েছিল—বিষয়টি এমন নয়। আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ যখন আব্বাসীয় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন ইমাম আবু হানিফার সাথে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সে-সময় কুফা ছিল এই আন্দোলনের বড় কেন্দ্র। সেখানেই আবুল আব্বাসের বাইয়াত সম্পন্ন হয়।[৪০৩]

☑ **৭. আবদুর রহমান ইবনু আমর আল-আওযায়ি** ﷺ : তিনি ছিলেন শামের প্রখ্যাত ফকিহ। ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদ এক মজলিসে বসে তাঁকে বিচারের

---

[৪০১] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৩২-২৩৩

[৪০২] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ৩/১৩৯; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৭৪। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, ইয়াস প্রথমে দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানালেও পরে গ্রহণ করেছিলেন।

[৪০৩] তারীখু কুদ্বাতিল উনদুলুস, পৃ. ১১; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৭২; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৯৭

দায়িত্ব অর্পণ করে। তখন তিনি অব্যাহতি চাইলে তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে দেওয়া হয়।[৪০৪]

প্রশাসকরা মুসলিম উম্মতের স্বার্থেই বড় বড় আলিমদের দায়িত্ব প্রদানে আগ্রহী ছিল। ন্যায়, ইনসাফ এবং সততা রক্ষার্থে প্রশাসকরা উম্মতের সূর্যসন্তান তথা ফকিহ এবং আলিমদের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করত।

❁ বিচারকদের বেতন-ভাতা

উমাইয়া যুগে বিচারকদের ব্যাপকভাবে মাসিক বেতন-ভাতা দেওয়ার প্রচলন ছিল। মূলত এটা দেওয়া হতো তাদের পারিশ্রমিক হিসেবে। বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে তারা অনেক সুবিধা লাভ করতেন। তবে দেশ, শহর এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির বিচারে বেতনের পরিমাণ নির্ধারিত হতো।

মালিক ইবনু আনাস ﵀ সূত্রে ওয়াকি ﵀ বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনু আবদিল আজিজ মদীনায় আসার পর এক ব্যক্তিকে লোকদের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তার জন্য মাসিক ভাতা দুই দিনার নির্ধারণ করেন।[৪০৫]

বসরার বিচারক ইয়াস ইবনু মুআবিয়ার বেতন ছিল ১০০ দিরহাম।[৪০৬] আবু খুযাইমা যখন বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন প্রতি মাসে তার নির্ধারিত ভাতা ছিল দশ দিনার। তিনি জুমুআর দিনের জন্য কোনো ভাতা গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন, 'আমি তো মুসলিমদের একজন শ্রমিক মাত্র। তাদের কোনো কাজ না করলে তো তাদের থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারি না।' ওয়াকি বলেন, মিশরের একজন আমাকে বলল যে, সে মিশরের নথিতে এক টুকরা কাগজে লেখা পেয়েছে, 'বিচারক আবু খুযাইমা যে দিনগুলোতে বিচারের জন্য বসেননি, সেসব দিনের পাঁচ দিরহাম তিনি বাইতুল মালে ফিরিয়ে দিয়েছেন।'[৪০৭]

ইউসুফ ইবনু উমর ১২১ হিজরি থেকে ১২৬ হিজরি অবধি ইরাকের গভর্নর ছিলেন। আবদুর রহমান ইবনু আবি লাইলার ছেলে মুহাম্মাদকে তিনি বললেন, 'কুফাবাসীদের মাঝে তোমাকেই আমি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছি। তোমার জন্য মাসে ১০০ দিরহাম ভাতা চালু করেছি। সুতরাং তুমি সকাল-সন্ধ্যা জনগণের অভিযোগ শোনার জন্য বসবে। কেননা তুমি মুসলিমদের একজন খাদিম মাত্র।' ওয়াকি বলেছেন, 'ইবনু আবি লাইলাকে ইউসুফ ইবনু উমর কুফায় সর্বপ্রথম বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং মাসে তার জন্য ১৫০ দিরহাম ভাতা

---

[৪০৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২০৭
[৪০৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৩৪
[৪০৬] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৩৪২
[৪০৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৩৩

নির্ধারণ করেছিলেন।'[৪০৮]

বিচারক শুরাইহ সূত্রে শাবি বর্ণনা করেছেন, শুরাইহ বিচারকার্যের পরিচালনার জন্য মাসে ৫০০ দিরহাম নিতেন। তিনি বলতেন, 'আমি জনগণকে পরিপূর্ণ সময় দিই এবং পরিপূর্ণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করি।' তিনি আরও বলতেন, 'জনগণের বিচারের জন্যই আমি বসি। আমি নিজেকে এ কাজেই নিয়োজিত রাখি। আর আমাকে ভাতা দেওয়া হবে না, এটা কেমন কথা!'

৭২ হিজরিতে খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান নাখিলা এলাকায় এসে শুরাইহ সম্পর্কে মানুষের কাছে খোঁজখবর নিলেন। তিনি জানতে পারলেন, ইবনুয যুবাইরের বিদ্রোহের সময় শুরাইহ বিচারের দায়িত্ব থেকে সরে গেছেন। তখন খলিফা শুরাইহকে ডেকে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দান করুন। আপনি বিচারের দায়িত্ব পালন করে যান। আমি আপনার জন্য ১০ হাজার দিরহাম এবং ৩০০ জারিব দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।' শুরাইহ এটা গ্রহণ করেন এবং ৭৮ হিজরি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।[৪০৯]

কিছু বিচারক ছিলেন, যারা বিচারকার্য পরিচালনার জন্য কোনো বেতন নিতেন না। আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য এর প্রতিদান তারা আল্লাহর কাছে আশা করতেন। তাদের একজন হলেন বিচারক ও মুফতি মাসরুক ইবনুল আজদা ﷺ। মৃত্যু ৬৩ হিজরিতে। মাসরুক বিচারের ক্ষেত্রে শুরাইহের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। আর শুরাইহ ছিলেন বিচারের ক্ষেত্রে মাসরুকের চেয়ে বেশি দূরদর্শী। মাসরুকের স্ত্রী বলেছেন, 'মাসরুক বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে কোনো ভাতা নিতেন না।' কাসিম বলেন, 'মাসরুক বিচারের জন্য কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না।' মাসরুক নিজেও বলতেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে এক বছর পাহারা দেওয়ার চেয়ে একদিন ইনসাফের সাথে বিচার করা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।'[৪১০]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-এর নাতি কাসিম ইবনু আবদির রহমান-ও বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না। তিনি বলতেন, 'চারটি কাজে কোনো ধরনের পারিশ্রমিক নেওয়া যায় না। সেগুলো হচ্ছে: বিচারকার্য পরিচালনা, আযান, হিসাব-নিকাশ এবং কুরআন। আর হিসাব-নিকাশই হচ্ছে বণ্টন।'[৪১১]

---

[৪০৮] আখবারুল কুযাহ : ৩/১২৯; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২১১

[৪০৯] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, শুরাইহের জন্য উমর ﷺ মাসে ১০০ দিরহাম ধার্য করেছিলেন। ইবনু আবি লাইলা বলেছেন, আলি ﷺ কুফার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য শুরাইহকে ৫০০ দিরহাম ভাতা প্রদান করতেন। (আখবারুল কুযাহ : ২/২২৭, ৩৯৭)

[৪১০] আখবারুল কুযাহ : ২/৩৯৮; আল-আলাম : ৮/১০৮; তবাকাতু ইবনি সাদ : ৬/৮২

[৪১১] আখবারুল কুযাহ : ৩/৬-৭

দামিস্কের বিচারক ছিলেন যুরআহ ইবনু আইয়ুব। তিনিও বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না। তিনি সিগনেচার করার সময় লিখতেন, لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَابٌ অর্থাৎ প্রত্যেক কাজের একটি প্রতিদান আছে। তিনি বিচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন খলিফা ওয়ালিদের যুগে। তাকে ২০০ দিনার ভাতা গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও তিনি গ্রহণ করেননি।

খলিফা ওয়ালিদ পীড়াপীড়ি করে তাকে আবাদি জমি দেন। তারপর কসম করে বলেন, এটা তার পৈতৃক সম্পদ থেকে দেওয়া হয়েছে। তখন যুরআহ বললেন, 'আপনার থেকে আমি এটা গ্রহণ করলাম। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, এই জমির তিন ভাগের এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আরেক ভাগ আমার কওমের ইয়াতিম ও অসহায়দের জন্য বরাদ্দ করলাম। আর এক ভাগ ওই নেককার ব্যক্তিদের জন্য, যারা এসব ইয়াতিম ও অসহায়দের দেখাশোনা করে এবং তাদের হক আদায় করে। তারপর আমি এটা পছন্দ করি, আমাকে এ পর্যন্ত আপনি যত বেতন দিয়েছেন, সেগুলি নিয়ে নেবেন। সেগুলো আমার ঘরের তাকে রাখা আছে।' এই বলে তিনি সেসব অর্থ বাইতুল মালে ফিরিয়ে দিলেন। তখন ওয়ালিদ তাকে বললেন, 'আপনি এমন করলেন কেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে যে ইলম দান করেছেন, তার বিনিময়ে কোনো ধরনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে চাই না।'[৪১২]

অনেক সময় বিচারক একসাথে অনেক কাজ করতেন এবং সবগুলির বিনিময়ও গ্রহণ করতেন।

ওয়াকি বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনু হুজাইরাহ মিশরে আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ানের সাথে বিচার বিভাগ, অপরাধ বিভাগ এবং বাইতুল মাল দেখাশোনা করতেন। তিনি বিচারকার্যের বিনিময়ে ২০০ দিনার, অপরাধ বিভাগ পরিচালনার জন্য ২০০ দিনার এবং বাইতুল মাল দেখাশোনার জন্য ২০০ দিনার গ্রহণ করতেন। এর বাইরে হাদিয়া থাকত ২০০ দিনার, আবার বাড়তি ২০০ দিনার পেতেন। এভাবে সব মিলিয়ে বছরে তিনি এক হাজার দিনার গ্রহণ করতেন। দেখা যেত, বছর না-পেরোতেই তার ওপর যাকাত ফরজ হয়ে যেত। এভাবেই বিচারের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অবশেষে ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪১৩]

ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ থেকে প্রমাণিত হয়, সে-সময় বিচারকদের যথেষ্ট পরিমাণ বেতন-ভাতা দেওয়া হতো। তাদের বেতন মাসের শুরুতে অগ্রিম প্রদান

---

[৪১২] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২০২; আবকারিয়্যাতুল ইসলাম, পৃ. ৪২৩। উমাইয়া যুগে এমন আরও অনেকেই বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। হাসান আল-বাসরি, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-এর পৌত্র কাসিম ইবনু আবদির রহমান ﷺ ছিলেন তাদের অন্যতম। (নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২১৩)

[৪১৩] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৫; রফউল ইসর : ২/৩১৬; নিযামুল হুকমি, পৃ. ৩৫৪; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৩০

করা হতো। কখনো কখনো দুই মাস বা তার চেয়েও বেশি বেতন অগ্রিম পেয়ে যেতেন।[৪১৪]

❁ বিচারালয়ের কিছু চিত্র

উমাইয়া যুগেই সর্বপ্রথম বিচার নথিভুক্তকরণ পদ্ধতি প্রকাশ পেয়েছে। বিচারের রায়গুলো বিচারক তার বিশেষ রেজিস্টারে ইস্যু করতেন। সে যুগে আরও চালু হয়েছিল জুডিসিয়াল অ্যাসোসিয়েশন। বিচারক-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্বশীলগণ প্রয়োজনে সেখানকার শরণাপন্ন হতেন।

মুআবিয়া ﷺ-এর যুগে মিশরের বিচারক সুলাইম ইবনু ইতর আত-তুজিবি সর্বপ্রথম বিচার-সালিশ নথিভুক্তকরণ শুরু করেছিলেন। ঘটনা ছিল এমন, মিরাস বণ্টনের জন্য কিছু ব্যক্তি তার কাছে মোকদ্দমা দায়ের করলে তিনি তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেন। কিন্তু কিছু বাদী-বিবাদী অনুপস্থিত থেকে যায়, যারা পরে বিচার মানতে অস্বীকার করে। তারপর তারা আবার মোকদ্দমা দায়ের করলে তাদের বিচারের হিস্ট্রি বিচারকের মনে পড়ে যায়। বিচারক তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা আগের বিচারের ফয়সালা মেনে নেয়। তখন বিচারক পুনরায় তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন। তখনই বিচারক মুনশিকে ফয়সালা লিখে রাখতে বলে দেন। মুনশি তখন বিচারকের ফয়সালার একটি রেকর্ড তৈরি করে সে ব্যাপারে সাক্ষ্যও লিপিবদ্ধ করেন।[৪১৫]

কিনদি বলেন, 'সে হিসেবে সুলাইমই হলেন মিশরের সর্বপ্রথম বিচারক, যিনি তার বিচার-আচার নথিভুক্ত করেছেন।'

আমরা প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক বলতে পারি, বিচারকার্য আরও মজবুত করার জন্য বিচারক সুলাইমই সর্বপ্রথম বিচারের সাক্ষ্য ব্যবস্থাপনা রেখেছেন। রায় অস্বীকার করার পথ তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এরপর আব্বাসীয় যুগেও এ ধারাবাহিকতা চলমান থাকে এবং ক্রমান্বয়ে আরও ব্যাপকতা লাভ করে।[৪১৬]

এ যুগে বিচারের নথি-পদ্ধতির এক নতুন নিয়ম চালু করা হয়। সেটা হচ্ছে, মামলার বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষই তাদের নাম একটি কাগজে লিখে বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দিবে। তাদের সিরিয়াল আসলে বিচারক বা কোনো কর্মচারী তাদেরকে বিচারের জন্য ডাকবে। তখন তারা বিচারকের কাছে উপস্থিত হবে।

অনেক বিচারক আবার লিখিত হিস্ট্রি গ্রহণ করতেন না। একবার শুরাইহ দুজন

---

[৪১৪] তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/২১৭; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৫৪; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৩০

[৪১৫] নিযামুল হুকমি, পৃ. ২৫৬; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২৮; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩০৯; আবকারিয়্যাতুল ইসলাম, পৃ. ৪৪১

[৪১৬] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩১০; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২৮; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ৩০; আল-কাদ্বাউল ইদারি, পৃ. ৪৭

বাদী-বিবাদীর লিখিত কোনো এক মামলা নিতে অস্বীকার করলে এক ব্যক্তি তাকে ওই মামলার হিস্ট্রি দেখায়। তবুও শুরাইহ সেই মামল্য নিতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, 'আমি কোনো লিখিত মামলা পড়তে পারব না।' ওয়াকি বর্ণনা করেছেন, শুরাইহ লিখিত কোনো মামলার হিস্ট্রি দেখতেন না।[৪১৭]

সুষ্ঠুভাবে মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য স্বাভাবিকভাবেই বিচারকদের অনেক সহযোগীর প্রয়োজন পড়ত। সহযোগীদের মধ্যে থাকত বিচারকের লেখক বা পেশকার কিংবা সেক্রেটারি। রাশিদুন যুগেই সর্বপ্রথম এই পদবিধারীদের প্রচলন হয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে এসব পরিভাষার ব্যবহার আরও বিস্তৃত হয়।

যুগের চাহিদা, জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন, বিচারকদের কর্মপরিধির বিস্তৃতি এবং মামলার আধিক্য ইত্যাদির কারণে উমাইয়া যুগে আরও নতুন নতুন বিভিন্ন সহযোগীর ব্যবহার চালু হয়। এখানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব।

■ ক) ঘোষক

তিনি বিচারকের পাশেই থাকতেন। বিচারকের সম্মান ও মর্যাদার বিবরণ দিতেন। বিচারের আগে বাদী-বিবাদীকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ডাকতেন। তাকে الَّذِيْ عَلَى رَأْسِ الْقَاضِيْ তথা বিচারকের সামনে থাকা ব্যক্তি বা صَاحِبُ الْمَجْلِسِ তথা বৈঠকের পরিচালক নামে অভিহিত করা হতো। এই পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম বিচারক শুরাইহের যুগে শুরু হয়।

ওয়াকি বলেছেন, 'আমর ইবনু কায়স আল-মাজি সূত্রে বর্ণিত আছে, শুরাইহের কাছে একজন ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে আমি দেখেছি। মামলার উভয় পক্ষ বিচারকের সামনে আসলে সে বলত, "তোমাদের মধ্যে যে বাদী সে তার বক্তব্য পেশ করুক।"'

ওয়াকি আরও বলেছেন, 'শুরাইহ বিচারের এজলাসে বসলে ঘোষণা দেওয়া হতো—"আছে কি আরও কোনো বাদী-বিবাদী? কেউ কি বিচারের প্রমাণ চায়? কেউ কি সমস্যার সমাধান বা ফতোয়া পেতে আগ্রহী?" এরপর তিনি উঠে দাঁড়াতেন।'[৪১৮]

■ খ) দারোয়ান

তিনি বিচারকের মূল ফটকে অবস্থান নিতেন। মামলা চলাকালীন সময় বিচারক থেকে লোকদের সরিয়ে রাখতেন। বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা বেশি হলে বা প্রচণ্ড ভিড় হলে লোকদের প্রবেশের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার ব্যবস্থা করতেন। অনেক সময় দারোয়ানই বিচারকের ঘোষকের দায়িত্ব পালন করতেন। একা দুই কাজ সামাল

---

[৪১৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৩০৭; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৫০০

[৪১৮] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৩০৭; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১২৮

দিতেন। দারোয়ান অনেক সময় নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ অথবা বিভাগীয় পুলিশের কাজও করতেন। কখনো-বা বিচারক তাকে আদালতের ভেতরে-বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব প্রদান করতেন।[৪১৯]

ওয়াকি বলেন, 'বিচারক শুরাইহের পুলিশ অফিসারের কাজ করতেন ইবরাহীম নাখায়ি।' মালিক ইবনু আনাসের সূত্রে রবীআ থেকে ওয়াকি বর্ণনা করেছেন, 'আমি মদীনা মুনাওয়ারায় আবু বকর ইবনু হাযামকে মসজিদে বিচার করতে দেখেছি। তার পাশেই চাবুক হাতে রক্ষীবাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল। তখন মালিকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এখানে চাবুক দিয়ে কী করা হয়? উত্তরে মালিক বললেন, এটা দিয়ে মানুষকে ভিড় করা থেকে বিরত রাখা হয়।'[৪২০]

বিচারক ইয়াসের সাথে একজন পুলিশ থাকত। যার দায়িত্ব ছিল বাদী-বিবাদীকে বিচারকের কাছে পাঠানো।[৪২১] আর বিচারক শুরাইহের সামনে চাবুক হাতে একজন পুলিশ অফিসার থাকত।[৪২২]

■ গ) দোভাষী

যেসব অনারব জনগোষ্ঠী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছিল, তাদের আধিক্যের কারণে বিচারকগণ দোভাষী ব্যবহার করতেন। কারণ নতুন নতুন ভিন্নভাষী জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের পরিচয় হচ্ছিল। তারা একে অপরের সাথে মিশে যাচ্ছিল। এটা মূলত আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীরই বাস্তবায়ন :

وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟

> আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।[৪২৩]

তাই তাদের মাঝে কোনো ধরনের বিবাদ, বিরোধ, কিংবা কোনো বিতণ্ডা সৃষ্টি হলে বিচারক তখন আস্থাভাজন কোনো দোভাষীর সাহায্য নিতেন। যাদের কাজ ছিল বিবদমান উভয় পক্ষের বক্তব্য ভাষান্তর করে দেওয়া।[৪২৪]

উমাইয়া যুগে দুর্নীতির বিচার

উমাইয়া যুগের বিচারব্যবস্থার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য ছিল দুর্নীতির বিচার-

[৪১৯] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪১৪-৪১৬; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১২৮ ও ১৩৮

[৪২০] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/২১৫, ২৭৭

[৪২১] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৩১৮

[৪২২] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৩২০

[৪২৩] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩

[৪২৪] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪২৩; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ৫৮; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৩৫

সংক্রান্ত পরিপূর্ণ আইন। ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটার সাথে সাথে সে যুগে প্রাদেশিক শাসক, আমির-উমারা এবং প্রশাসকদের মাঝে ব্যাপক হারে জুলুম, দুর্নীতি এবং অনিয়ম চলছিল বিধায় খলিফারা এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। সরকারি কর্মকর্তারা ইসলামি খিলাফতের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাচুর্যের আধিক্য। আর্থিক অবস্থা সমৃদ্ধ হয়েছিল। রাশিদুন যুগে মানুষের মাঝে যে দ্বীনি চেতনা ছিল, উমাইয়া যুগে তা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আবির্ভাব ঘটেছিল অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির। যাদের কেউ ছিল খলিফার আত্মীয়স্বজন, কেউ-বা ছিল তাদের কাছের মানুষ, কেউ ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের নিকটাত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজন। সেই প্রভাব খাটিয়ে কখনো তারা প্রজাদের প্রতি জুলুম করত, মানুষের অধিকার হরণ করত, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করত।

এ কারণেই স্বয়ং খলিফাদের পক্ষ থেকে সীমা নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশেষ করে খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান এবং উমর ইবনু আবদিল আজিজ এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেন।[৪২৫] খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানই প্রথমে বিভিন্ন দুর্নীতির বিচারের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছেন। এসব কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইমাম মাওয়ারদি বলেছেন, 'তাঁর (অর্থাৎ আলি ﷺ-এর) পর বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা প্রকাশ্যে জুলুম, বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করতে থাকে। ওয়াজ-নসিহতের সতর্কবার্তা অন্যায়, অবিচার, জুলুম ও দুর্নীতি থেকে তাদের দমাতে পারেনি। ফলে দুর্নীতিবাজ ও জালিমদের প্রতিহত করা এবং মজলুমদের প্রতি ইনসাফ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আসলে এটাই দুর্নীতি দমনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা একটি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আর এটা কেবল ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। সে হিসেবে আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি জুলুম, নির্যাতন ও দুর্নীতি সংক্রান্ত বিচারের জন্য বিশেষ একটি দিন নির্ধারণ করেন। সেদিন তিনি জুলুম আর দুর্নীতির বিচারপ্রার্থীদের হিস্ট্রি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। সমস্যা রয়েছে এমন কোনো মামলা, কিংবা ফয়সালা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এমন কোনো হিস্ট্রি সামনে আসা মাত্রই তিনি সেটি বিচারক আবু ইদরিসের কাছে হস্তান্তর করতেন। আর আবু ইদরিসও তৎক্ষণাৎ সেই ফয়সালা বাস্তবায়ন করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে, আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান সকল হিস্ট্রি এবং তার কারণ ভালোভাবেই অবগত আছেন। তাই খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের আদেশে আবু ইদরিস

---

[৪২৫] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৫৫৪, ৫৬১, ৫৬৪; আল-কাদ্বাউল ইদারি, পৃ. ১২৫; আল-ইসলামু ওয়াল-হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/১৮০; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ ফী ইযযিল আরব, পৃ. ৮৪; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৭১

বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।'[৪২৬]

তারপর এই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল দায়িত্ব পালন করেছেন ন্যায়পরায়ণ শাসক খলিফা উমর ইবনু আবদিল আজিজ। এ ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ দক্ষতা এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এ কাজ তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর নিজের ঘর থেকে। সেমতে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর যাবতীয় সম্পদ বাইতুল মালে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারপর উমাইয়া বংশে তাঁর সকল আত্মীয়স্বজনের সম্পদের হিসেব নেন। এরপর তাঁর সকল প্রাদেশিক শাসক এবং আমির-উমারাদের সম্পদের প্রতি লক্ষ করেন। অবৈধ সম্পদ প্রমাণিত হওয়ায় একসাথে বারোজন সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদ তিনি (জনতার মাঝে) বণ্টন করে দিয়েছিলেন। সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য তাঁর দরজা ছিল উন্মুক্ত, যাতে দূর-দূরান্ত থেকে যে-কেউ অভিযোগ দায়ের করতে পারে। তাঁর ইনসাফপূর্ণ বিচার সম্পর্কিত অনেক বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে, যা ইতিহাসে আজও প্রবাদতুল্য।[৪২৭]

মাওয়ারদি বলেন, এরপর প্রশাসকদের জুলুম এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্যায় আরও বেড়ে গেল, যা শক্ত হাতে প্রতিহত করার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল কার্যকর কোনো নির্দেশদাতার। উমর ইবনু আবদিল আজিজ-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি ইনসাফের মূলনীতির সংরক্ষণ করেছেন, নিপীড়িত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন। বনু উমাইয়ার নির্যাতনের বদলা নিয়েছেন। তখন ওরা বলা শুরু করল—'আপনার কঠোরতার কারণে আপনার ব্যাপারে আমরা আশঙ্কা করছি।' উত্তরে তিনি বললেন, 'কিয়ামতের পূর্বে প্রতিটি দিনকেই আমি ভয় করি। কোনো দিনই আমি নিরাপদ নই।'[৪২৮]

খিলাফতের শুরুতে প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে উমর ইবনু আবদিল আজিজ ﵀ বলেছিলেন, 'আপনাদেরকে তাকওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা আল্লাহ শুধু তাকওয়া এবং তাকওয়াবানদেরই গ্রহণ করে থাকেন। প্রশাসকদের কিছু লোক সত্য থেকে দূরে আছে। আমি তাদের থেকে বদলা নেবো। তারা মিথ্যা ছড়িয়ে দিয়েছে। আমি তাদের থেকে বিনিময় গ্রহণ করে তবেই ছাড়ব। আল্লাহর কসম! হকের যে পথকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে, তা আমি আবার সজীব করব। আর মিথ্যার যে রেওয়াজ চালু করা হয়েছে, সেটাকে আমি নিশ্চিহ্ন করব। আমি এক মুহূর্তও বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করি না। আপনারা আপনাদের আখিরাত ঠিক করে

---

[৪২৬] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৭৮; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৮৮

[৪২৭] আল-হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৭২

[৪২৮] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৭৮; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১০২; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৪৫

নিন। আপনাদের দুনিয়া এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে।'[৪২৯]

দুর্নীতির বিচারের জন্য উমর ইবনু আবদিল আজিজ এমন বিশেষ নীতি চালু করেন, যা ছিল অনন্য। আর তা হচ্ছে দুর্নীতি ও অভিযোগের বিচার করা এবং দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে বিচারপ্রার্থীকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।[৪৩০]

কেবল যে উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী দামিস্কেই দুর্নীতির বিচার সীমাবদ্ধ ছিল—এমন নয়। বরং দুর্নীতির বিচারের এই নীতি সর্বজনীন করতে, প্রশাসকদের ওপর এ নীতি আবশ্যক করতে এবং এ বিষয়টি মানুষকে মনে করিয়ে দিতে উমাইয়া বংশের খলিফাগণ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান তার ছেলের কাছে মিশরের নেতৃত্ব অর্পণ করার সময় তাকে পরামর্শ করে চলতে এবং পাওনাদারদের কাছে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তিনি আরও বলেছিলেন, 'বৎস! তুমি কাজের যোগ্য লোকদের প্রতি লক্ষ রাখবে। সকালে তোমার কাছে তাদের কোনো হক পাওনা থাকলে সেটা পরিশোধে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিলম্বিত করবে না। আবার সন্ধ্যায় কোনো হক থাকলে সেটা প্রদানে সকাল পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। যথাসময়ে তাদের হক পরিশোধ করে দেবে। এতে তোমার প্রতি তাদের যে আনুগত্য আছে—সেটা আরও দৃঢ় হবে। তোমার সভাসদ এবং আলিমদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবে। তারপরও কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকলে আমার কাছে পত্র লিখবে। আল্লাহ চাহেন তো সে ব্যাপারে আমার পরামর্শ পাবে। এটাই আমার কথা। তোমার ব্যাপারে আল্লাহকেই আমার স্থলাভিষিক্ত করে দিচ্ছি।'[৪৩১]

খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণের পর উমর ইবনু আবদিল আজিজ তাঁর আগের সকল প্রশাসকদের পরিবর্তন করে সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যাতে দুর্নীতি দমনে তাঁর অনুসৃত নীতির ওপর তারা চলতে পারে। প্রশাসকদের কাছে তিনি লিখেছিলেন, 'মানুষ তো আজ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের মুখোমুখি। কিছু অসৎ আলিম তাদের মাঝে অসৎ আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছে। সত্য, বিনয়, নম্রতা এবং মহানুভবতার ব্যাপারে এদের কোনো আগ্রহ নেই।'

তাঁর প্রথম দিকের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'সুধীমণ্ডলী! যিনি আমাদের সঙ্গ দিতে চান, তিনি পাঁচটি বিষয়ে আমাদের সঙ্গ দিতে পারেন। অন্যথায় তিনি যেন আমাদের ধারেকাছেও না আসেন। প্রথমত, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রয়োজন আমাদের নিকট উত্থাপন করার জন্য। দ্বিতীয়ত, কল্যাণের ব্যাপারে আমাদেরকে সাধ্যমতো

---

[৪২৯] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৮০

[৪৩০] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৫৬১ এবং ১৬৪

[৪৩১] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/১৬৬

সাহায্য করার জন্য। তৃতীয়ত, কল্যাণের এমন রাস্তা দেখানোর জন্য---যার সন্ধান আমরা এখনো পাইনি। চতুর্থত, আমাদের জনগণকে ধোঁকা থেকে বাঁচানোর জন্য। পঞ্চমত, কোনো অনর্থক কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য।'[৪৩২]

আরেকদিনের ভাষণে উমর ﵁ বলেছিলেন, 'হে লোকসকল! না কুরআনের পর আর কোনো নতুন কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, আর না মুহাম্মাদের পর কেউ নবি হবেন। জেনে রাখবেন, আমি কোনো বিচারক নই। আমি শুধু আসমানি বিধানের অনুসারী। আমি কোনো নয়া দ্বীনের আবিষ্কারক নই; বরং আমি দ্বীনের একজন অনুসারী মাত্র। জালিম বাদশাহ থেকে যে পলায়ন করে, সে তো কোনো অবাধ্য নয়। জালিম শাসকই প্রকৃত নাফরমান ও অবাধ্য। স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য চলবে না। ... আপনাদের অধিকার পূরণে আমি সাধ্যমতো সচেষ্ট থাকব।'[৪৩৩]

খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান তার ভাই বিশর ইবনু মারওয়ানকে বসরা এবং কুফার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। অবাধ্যদের ব্যাপারে কঠোরতা এবং অনুগতদের সাথে কোমল আচরণ করার ব্যাপারে তার প্রতি নির্দেশনা ছিল।[৪৩৪]

হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ আস-সাকাফিকে খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান কুফা এবং বসরার প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। পরিমাপ এবং ট্যাক্স সংস্কার তার যুগে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছিল।[৪৩৫] খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের জনৈক সেক্রেটারি উপঢৌকন গ্রহণ করলে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ তাদের শাস্তি দিয়ে সতর্ক করেছিলেন।[৪৩৬] হিশাম ইবনু আবদিল মালিকও ইরাকের প্রশাসকের সাথে এমন আচরণ করেছিলেন।[৪৩৭]

۞ নজরদারি এবং জবাবদিহিতা

খলিফা এবং প্রশাসকরা বিচার-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন না করলেও বিচারকদের কার্যক্রম নজরদারি এবং তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা থেকে বিরত ছিলেন না। বিচারকার্য পরিচালনা, বিচারক নিয়োগ দেওয়া, বরখাস্ত করা এবং দুর্নীতি দমনের কাজ থেকে উদাসীন ছিলেন না। মামলা-মোকদ্দমা এবং বিচারকদের

---

[৪৩২] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/১৭৪; ১৮০; ১৮৪; ১৮৬; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১০৩

[৪৩৩] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/১৮৭

[৪৩৪] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ ফী ইযযিল আরব, পৃ. ৮৩

[৪৩৫] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ ফী ইযযিল আরব, পৃ. ৮৫ এবং ৮৬

[৪৩৬] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ ফী ইযযিল আরব, পৃ. ৮৭

[৪৩৭] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ ফী ইযযিল আরব, পৃ. ১১৫

প্রদত্ত তাবৎ ফয়সালাই পর্যবেক্ষণ করা হতো। কেননা খলিফাই ছিলেন বিচার, দ্বীন, দুনিয়ার নেতৃত্ব-সহ জাতির প্রতিটা সদস্যের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দায়িত্বশীল। কেবল বিচারকদের কাছে বিচারের দায়িত্ব ন্যস্ত করেই খলিফা দুনিয়া-আখিরাতের জবাবদিহি থেকে রেহাই পাবেন না। এজন্যই খলিফারা বিচারকদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তাদের জবাবদিহির মুখোমুখি করতেন। কোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অবহেলা দেখতে পেলে ঠিক করে দিতেন এবং সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ নিতেন।

ইতিপূর্বে আমরা আবুল হাসান নুবাহির বর্ণনা উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছেন, 'মুআবিয়া ﷺ-এর কাছে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর বিচারকদের দেখভালের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরিদের নীতি অনুসারে চলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বিচারব্যবস্থা এ পদ্ধতিতেই আরও কিছুকাল চলেছিল।'[৪৩৮]

১০৫ হিজরির রমজান মাসে ইয়াহইয়া ইবনু মাইমুন মিশরের বিচার বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কিনদি বলেছেন, 'একবার খলিফা হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের কাছে এ সংবাদ আসে, জনৈক ইয়াতিম সাবালক হওয়ার পর বিচারক ইয়াহইয়া ইবনু মাইমুনের কাছে মামলা দায়ের করেছিল। কিন্তু ইবনু মাইমুন তার সাথে সুবিচার করেননি। দলিল-প্রমাণ-সহ বিষয়টি খলিফা হিশামের কাছে পেশ করা হলে তিনি এটি অনেক গুরুতর মনে করলেন। তৎক্ষণাৎ মিশরের গভর্নর ওয়ালি ইবনু রুফাআর কাছে এ মর্মে নির্দেশ পাঠালেন, 'বিচারকের দায়িত্ব থেকে ইয়াহইয়াকে লাঞ্ছিত আর অপদস্থ করে বরখাস্ত করুন। আর আপনার সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে বাছাই করে চরিত্রবান, আল্লাহভীরু এবং কলঙ্কমুক্ত একজনকে বিচারক নিয়োগ দিন। যে আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না।'[৪৩৯]

খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান সব শহরের বিচারকদের খোঁজখবর রাখতেন। তাদের কাজের তদারকি করতেন। ইতিপূর্বে তার ঘটনা আমরা বর্ণনা করেছি। ৭২ হিজরিতে তিনি নাখিলায় আগমন করে বিখ্যাত বিচারক শুরাইহ সম্পর্কে জানতে চান। তাকে দরবারে নিয়ে আসতে বলেন। সেমতে তাকে নিয়ে আসা হলে খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি বিচারকার্য পরিচালনা করেন না?' উত্তরে শুরাইহ বলেন, 'এক ফিতনা নিয়ে দুজনের মাঝে বিচার করতে পারব না।' তখন খলিফা বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাওফিক দান করুন। আপনি আবার বিচারের দায়িত্বে ফিরে যান।'[৪৪০]

---

[৪৩৮] তারীখু কুদ্বাতিল উনদুলুস, পৃ. ২৪; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৮৭

[৪৩৯] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৪১; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ১৭০

[৪৪০] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৩৯৭

ওয়াকি বর্ণনা করেন, বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নরদের দায়িত্ব ছিল বিচারক নিয়োগ দেওয়া। তারা ইচ্ছেমতো বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে লোক নিয়োগ দিত। প্রশাসকদের অনুমতি ছাড়া বিচারক কোনো বাহনে চড়তেন না, বা দরকারে বাইরে যেতেন না।[৪৪১]

বিচারক অনেক সময় খলিফাদের কাছে পত্র লিখে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন। কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকলে তাদের কাছে সমাধান জানতে চাইতেন। ইয়াস ইবনু মুআবিয়া সূত্রে ওয়াকি এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইয়াস ইবনু মুআবিয়া বলেন, উমর ইবনু আবদিল আজিজের যুগে আমি বসরার বিচারক ছিলাম। একবার আমার কাছে একটি মেয়েকে নিয়ে আসা হলো। তার কোলে ছিল একটি শিশু। শিশুর গলায় ছিল একটি মালা। একজন লোক এসে মালাটি ধরে টান দিলে মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে। তখন লোকটিকে ধরে ফেলা হয়। ইয়াস বলেন, আমি এই ব্যাপারে উমর ইবনু আবদিল আজিজের কাছে পত্র লিখলে তিনি উত্তরে লিখলেন, 'অবশ্যই এটা সুস্পষ্ট অভিযোগ। সুতরাং আপনি পুরুষ লোকটিকে অপরাধ পরিমাণ শাস্তি দিন।'[৪৪২]

ইয়াজ ইবনু উবাইদিল্লাহ ছিলেন উমর ইবনু আবদিল আজিজ কর্তৃক নিযুক্ত মিশরের বিচারপতি। তিনি খলিফার কাছে শুফআ তথা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র লেখেন। উত্তরে খলিফা উমর ইবনু আবদিল আজিজ ﵀ লিখলেন, ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার যেন শুধু অংশীদারকেই দেওয়া হয়।[৪৪৩]

বিচারক ইয়াস প্রতিবেশীর ব্যাপারে শুফআর ফয়সালা করতেন। কিন্তু তার কাছে এ মর্মে উমর ইবনু আবদিল আজিজের পত্র আসে, 'শুফআর ফয়সালা দুই অংশীদারের মাঝে করতে হবে। কিংবা এমন বাড়ির ক্ষেত্রে করতে হবে, যার প্রধান দরজা একটা।'[৪৪৪]

ইয়াস ইবনু মুআবিয়ার অভিমত ছিল, তালাকের ক্ষেত্রে মহিলার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে হাসান বসরি মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ফতোয়া দিতেন। এ ব্যাপারে মিশরের প্রশাসক খলিফা উমর ইবনু আবদিল আজিজের কাছে পত্র লিখলে তিনি উত্তর দিলেন, 'হাসান বসরির ফতোয়া সঠিক। আর ইয়াসের ফয়সালা ভুল।'

ইয়াস প্রতিবেশীর জন্য শুফআ সাব্যস্ত করে ফয়সালা দিতেন। কিন্তু উমর

---

[৪৪১] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৪১

[৪৪২] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৩২৬; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/৩১৬; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ২/১১৩

[৪৪৩] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৩৪

[৪৪৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৩৩২

ইবনু আবদিল আজিজ তাকে পত্র মারফত এ ব্যাপারে নিষেধ করেন।[৪৪৫]

উমাইয়া যুগে বিচারের গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা

উমাইয়া যুগের বিচারব্যবস্থা রাশিদুন যুগের কাঠামো অনুসারেই চলছিল। উভয় বিচারব্যবস্থার মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে বিচারের মৌলিক উপাদানের ক্ষেত্রে শাখাগত কিছু পরিবর্তন এসেছিল। আর বিচারের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্ম-পরিধিও ব্যাপকতা লাভ করেছিল।

❁ উমাইয়া যুগে বিচারের বিধিবিধানের উৎস

উমাইয়া যুগের বিচারকগণ রাশিদুন যুগের বিচারকদের মতো একই উৎস থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। উভয় যুগেই কুরআন, সুন্নাহ, পূর্বের বিচারব্যবস্থা এবং শরীয়তের পাশাপাশি ইজতিহাদ মান্য করা হতো।

কুরআন-সুন্নাহ ছিল উভয় যুগের অভিন্ন মৌলিক ভিত্তি। ইসলামি খিলাফত এই দুটিকে কেন্দ্র করেই চলত। এর ওপর ভিত্তি করেই পূর্ণতা লাভ করত খিলাফতের বাইয়াত। যেমনটা হয়েছিল খলিফা আবদুল মালিকের কাছে আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵄-এর বাইয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে। সে-সময় আবদুল্লাহ ﵄ বলেছিলেন, 'আল্লাহর নীতি এবং রাসূলের সুন্নাহর ভিত্তিতে আমি আমিরুল মুমিনীন আবদুল মালিকের কাছে বাইয়াত দিচ্ছি।'[৪৪৬]

সাধারণত সাহাবিদের বক্তব্য এবং তাঁদের ফয়সালা অনুসরণ করেই পূর্বের বিচারব্যবস্থা চলছিল। কেননা তাঁরাই ছিলেন নববি মাদরাসা এবং ওহি অবতরণের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যুগের মানুষ। বিশেষত খুলাফায়ে রাশিদুনের বিচারাচারের সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তদুপরি এ যুগে বিচারকদের বিচারের ক্ষেত্রে উরফ তথা প্রচলিত রীতিনীতির প্রভাব দেখা দেয়। যেহেতু উমাইয়া খিলাফতের অধীনস্থ বিস্তৃত ভূখণ্ডে ছিল উরফ তথা প্রচলিত রীতিনীতির বৈচিত্র্য। এসব অঞ্চলের মানুষের জীবনঘনিষ্ঠতা, তাদের কথাবার্তা আর পরিভাষা স্পষ্ট করে এমন আচার-অনুষ্ঠান, শপথ এবং দাবি-দাওয়ার প্রতি বিচারকদের গভীর দৃষ্টি থাকত।[৪৪৭]

ফকিহ, বিচারক এবং খলিফাগণ বিচারের প্রতি আস্থা-নির্ভরতা সৃষ্টির জন্য নিজেদের রায়কে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাব্যস্ত করতে সবসময় সচেষ্ট থাকতেন। মুআবিয়া ﵁ জাল হাদিসের ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক ছিলেন। একবার কুরাইশের একটি প্রতিনিধি দলের মাঝে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেখানে আল্লাহর

---

[৪৪৫] আখবারুল কুযাহ : ১/৩৩০, ৩৩২

[৪৪৬] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৭২০৩

[৪৪৭] আল-মাদখালুল ফিকহি : ১/১৫০

প্রশংসা করার পর তিনি বলেন, 'আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক এমন এমন কথা বলে বেড়ায়, যেগুলো আল্লাহর কিতাবেও নেই, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহতেও নেই। এরাই হচ্ছে তোমাদের মধ্যকার অজ্ঞ লোক।'[৪৪৮]

খলিফা হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের যুগে আমর ইবনু হাযামের নাতি মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর ছিলেন মদীনার কাযি। মদীনাবাসীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তিনি বিচার করতেন। অনেক সময় তা হাদিসের সাথে সংগতিপূর্ণ হতো না।[৪৪৯]

ইতিপূর্বে আমরা উমর ইবনু আবদিল আজিজ ؒ-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'কুরআনের পর আর কোনো নতুন কিতাব অবতীর্ণ হবে না, আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর পর আর কেউ নবিও হবে না। জেনে রাখবেন, আমি কোনো বিচারক নই। আমি শুধু এক আসমানি বিধানের অনুসারী। আমি কোনো নয়া দ্বীনের আবিষ্কারক নই; বরং আমি দ্বীনের একজন অনুসারী মাত্র।'[৪৫০]

শরীয়তের বিধিমালার উৎস বর্ণনা করে তিনি আদি ইবনু আরতাতের কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ হচ্ছে বিচারব্যবস্থার মূল। তারপর রাসূলের সুন্নাহ। এরপর হিদায়াতপ্রাপ্ত মুসলিম ইমামদের ফয়সালা। সবশেষে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ও বিজ্ঞ আলিমদের পরামর্শ। একজনের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেবেন না। মানুষের মাঝে যে ফয়সালা করবেন, সে সম্পর্কে আপনার জানা থাকতে হবে। অনুমান-নির্ভর বিচার করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ ইলম ছাড়া অনুমান করে বিচারকার্য পরিচালনাকারী অন্ধ পথিকের মতো। সে যদি সঠিক পথের দিশা পায়, তবে তো না জেনেই দিশা পেয়ে গেল। আর যদি সে রাস্তা চিনতে ভুল করে, তাহলে অজ্ঞতার কারণে সে নিজেও ধ্বংস হবে, অন্যদেরকেও ধ্বংস করবে। সুতরাং আপনার কাছে যদি দ্বিধাপূর্ণ কোনো মোকদ্দমা আসে, তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে নিন। কেননা অজানা বিষয়ে প্রশ্নকারীও জ্ঞানীদের একজন।'[৪৫১]

উমর ইবনু আবদিল আজিজ ؒ বিজ্ঞ বিচারকের মাঝে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকার কথা বলতেন। তার একটি হলো, পূর্বের বিচারকার্য এবং তার পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা।[৪৫২]

---

[৪৪৮] ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন : ১/৬৩

[৪৪৯] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৪৩ এবং ১৭৬

[৪৫০] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/১৮৭

[৪৫১] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪৬৮; আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৭৭

[৪৫২] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৭৭

বিচারকরা আলিমদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন। তাদের সহযোগিতা নিতেন। তারা যেমন আলিমদের মজলিসে শরিক হতেন, আলিমরাও তেমনি তাদের বিচারালয়ে উপস্থিত হতেন। যাতে বিচারকরা কোনো ভুল করলে আলিমরা দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। এর বিবরণ সামনে আসছে।[৪৫৩]

বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া হতো খলিফা এবং প্রশাসকদের তরফ থেকে। বিচারের বিভিন্ন নীতি এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিচারকদের কর্তৃত্ব থাকলেও গবেষণামূলক আইনের ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট কোনো মতামত থাকত না। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, পূর্ববর্তীদের বিচারনীতি এবং সাহাবাদের বক্তব্য অনুসারে তারা বিচার পরিচালনা করতেন। এটা সে-সময়ের কথা, যখন ফিকহি মাযহাবের সূচনা হয়নি। শারঈ আইনও পরিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। তাই বিচারকদের কাছেই বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক শহরে থাকা ফকিহ, আলিম ও মুজতাহিদদের সাথে পরামর্শ করে বিচারকরা সিদ্ধান্ত নিতেন। আর তাই ইজতিহাদের ফলাফলে ভিন্নতা থাকত। এজন্যই আমরা বিচারকদের ইজতিহাদ নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব।

❁ রায় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকদের ইজতিহাদ

বিচারকগণ কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজতিহাদের ওপর নির্ভর করতেন। উমাইয়া যুগে ইজতিহাদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। বিচারকরা ছিলেন মুজতাহিদ তথা গবেষক। তারা প্রথমে মোকদ্দমা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন। কুরআন-সুন্নাহর মাঝে কোনো দলিল পেলে সে অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন। কোনো দলিল খুঁজে না পেলে নিজস্ব চিন্তাভাবনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি ফকিহদের সাথে পরামর্শ করতেন। ইজতিহাদ অনুযায়ী বিরোধ মীমাংসা করে দিতেন। সে-সময় অবধি ফিকহ শাস্ত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ না হওয়ায় সুনির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসরণ করার প্রচলন ছিল না। খলিফাও বিচারককে বিশেষ কোনো রায়ে বাধ্য করতেন না। বরং খলিফার পক্ষ থেকে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিচারককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হতো। মূলত এ সময় থেকেই ইজতিহাদের তোড়জোড় শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে বিচারকরা ফকিহদেরকেও সাথে রাখতেন। তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। কারও ফতোয়ার ব্যাপারে আস্থাশীল হলে তারটা গ্রহণ করতেন। বিচারের আইন বাস্তবায়ন, বিরোধ নিরসন আর মোকদ্দমা মিটানোর জন্য বিচারকদেরই ইজতিহাদের বেশি প্রয়োজন পড়ত।

একদিক থেকে ইজতিহাদ ছিল মুজতাহিদের সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিক থেকে প্রতিটি অঞ্চলে ইজতিহাদের নির্দিষ্ট অবস্থান ছিল। একসময় বিভিন্ন শহরে এমন

---

[৪৫৩] আখবারুল কুযাহ : ২/৪১৫ এবং ৩/৮৬

কিছু মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, যার কারণে মদীনা এবং কুফায় দুটি স্বতন্ত্র একাডেমিয়া গড়ে ওঠে। একটি ছিল ইজতিহাদ-নির্ভর, অপরটি হাদিস-নির্ভর। ফলে বিভিন্ন শহরে বিচারের রায়ের ক্ষেত্রেও তারতম্য দেখা দেয়। কেননা বিচারকরা সবাই মুজতাহিদ পর্যায়ের হওয়ায় প্রত্যেকের রায়ই ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তারা নির্দিষ্ট কোনো ফয়সালা অনুকরণ করতেন না। নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসারী তারা ছিলেন না। বিচারকদেরকে খলিফার পক্ষ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া ছিল। তথাপি আলিমদের সাথে পরামর্শ করে এবং খলিফার কাছে পত্র লিখে তারা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[৪৫৪] যেমন প্রতিবেশীর জন্য শুফআর অধিকার প্রযোজ্য হবে কি না—তা নিয়ে শুরাইহ, ইয়াস-সহ অন্যদের মতবিরোধ ছিল।[৪৫৫] ওয়াকি ﷺ উমাইয়া যুগের বিচার-সংক্রান্ত আলোচনায় এটা তুলে ধরেছেন।

বিচারকদের মধ্যে ইখতিলাফের কারণ ছিল তাদের ইজতিহাদ পদ্ধতি ও মূলনীতির ভিন্নতা। কারণ সাহাবিদের বক্তব্য, বিভিন্ন শহরের অধিবাসীদের রীতিনীতি, মাসআলা-মাসায়েল আহরণ এবং শরীয়তের প্রায়োগিক বিধিবিধানের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ছিল। এখানে বিস্তর আলোচনা করার সুযোগ নেই। ইতিপূর্বে আমরা সেগুলো সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছি।[৪৫৬]

উমাইয়া যুগে মক্কার বিচারকদের সম্পর্কে আবুল কাসিম সামনানি ﷺ বলেছেন, 'সে-সময়ে প্রত্যেক বিচারকই নিজের কাজ এবং কথা দিয়ে দলিল পেশ করতেন।'[৪৫৭]

❁ কার্যনির্বাহী বিচারক ও নির্দিষ্ট বিচার

উমাইয়া যুগে ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছিল। জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিজয়াভিযান, রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিরসন, ফিতনা দমন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন খলিফারা। যে কারণে তারা বিচারকার্য পরিচালনা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। বিচার-সংশ্লিষ্ট তাবৎ বিষয় ন্যস্ত করেছিলেন বিচারকদের কাছে। বিভিন্ন অপরাধের বিচার এবং দণ্ড নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ফুরসতও তারা পাচ্ছিলেন না। তাই এগুলোর ভার বিচারকদের কাঁধেই তুলে দিয়েছিলেন।

---

[৪৫৪] তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/২১৬

[৪৫৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৩৩২; ২/২৪৯, ২৫৪, ২৬৯, ২৯২, ৩১৬, ৩৫২, ৩৭৮, ৩৮৯; আল-উম্মাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৩৪। এরকম আরও অনেক রায়ের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা ছিল। যেমন ঋণের ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে বন্দি করা হবে কি না, লক্ষণ আর নিদর্শন দেখে বিচার করা যাবে কি না, নিজের জ্ঞান দিয়ে বিচারকের বিচার করা, মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুশয্যায় সম্পদে হস্তক্ষেপ করার বিধান, তালাকের ক্ষেত্রে মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ, ব্যক্তির পক্ষে তার ছেলের সাক্ষ্য, একক ব্যক্তির সাক্ষ্য, অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য ইত্যাদি।

[৪৫৬] আমাদের উসূলুল ফিকহ গ্রন্থের ৫৭, ১০২ এবং অন্যান্য পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে।

[৪৫৭] রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৯৫

মুআবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান ﷺ ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি জখমের শাস্তি, হত্যা ও কিসাসের দণ্ড দেখাশোনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। মিশরের বিচারক সুলাইম ইবনু ইতরকে পত্র মারফত আদেশ প্রেরণ করে বলেন, জখম-সংক্রান্ত বিচার পরিচালনার দায়িত্ব এখন থেকে তার ওপর। শুনানির দায়িত্বশীল যেন তার কাছে জখম-সংক্রান্ত মোকদ্দমা উত্থাপন করে।

এ হিসেবে বিচারক সুলাইমই প্রথম ব্যক্তি, যিনি জখম-সংক্রান্ত বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। কোনো ব্যক্তি আহত হলে বিচারকের কাছে এসে আঘাতকারীর বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করত। বিচারক সবকিছু শুনে আঘাতকারীর আত্মীয়স্বজনের কাছে সমন পাঠাতেন। এই বিবরণ আবার শুনানির দায়িত্বশীলের কাছেও থাকত। তারপর বার্ষিক জরিমানা আদায়ের সময় আঘাতকারীর আত্মীয়স্বজন থেকে দণ্ড গ্রহণ করা হতো। এই অর্থদণ্ড তিন কিস্তিতে তিন বছরে আদায় করার প্রচলন ছিল। জখমের শাস্তির বিষয়টি তখন এভাবেই চলছিল।[৪৫৮]

উমাইয়া যুগের আরেকটি বিশেষত্ব হলো সামরিক বাহিনীর বিচারক। যিয়াদ ইবনু আবি লাইলা আল-গাসসানি, কুলসুম ইবনু আবদিল্লাহ আল-হাকামি এবং মুহাম্মাদ ইবনুল আসলামি ছিলেন এই বিচারকদের অন্যতম।[৪৫৯]

উমাইয়া যুগে বিচারকের দায়িত্ব ছিল ব্যাপক। মানুষের অধিকার, ধনসম্পদ, পরিবার-নীতি, উত্তরাধিকার সম্পত্তি, মুক্তিপণ এবং শাস্তি-দণ্ড-সহ তাবৎ বিষয় দেখাশোনা এবং তদারকি করা ছিল বিচারকের দায়িত্ব। ওয়াকির গ্রন্থ *আখবারুল কুদ্বাহ* এবং আল-কিনদির *আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ* থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়।[৪৬০] এ ধারাবাহিকতায় ফাদ্বালাহ ইবনু উবাইদ ﷺ দণ্ড-সংক্রান্ত বিচার করতেন এবং আবু হুরায়রা ﷺ-এর কাজ ছিল অপবাদ আরোপের বিচার করা। শাবি ﷺ তো এক লোকের ব্যাপারে হদের ফয়সালা দিয়ে মসজিদেই সেই শাস্তি বাস্তবায়ন করেছিলেন।

উমাইয়া যুগে কাযিদের বিচারিক দায়িত্বের পাশাপাশি কিছু প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হতো। ফলে এ যুগে বিচারকদের কর্মপরিধি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আমরা এখন সেগুলো আলোচনা করব।

❁ বিচারকের আরও কিছু দায়-দায়িত্ব

বিচারকার্যের সাথে সম্পৃক্ত আরও কিছু বিষয় দেখাশোনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব বিচারকের কাছে ন্যস্ত ছিল। বিচারকদের কাছে এসব দায়িত্ব প্রদানের

---

[৪৫৮] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩০৯; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৫৬; আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/১৫৭

[৪৫৯] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২০১ এবং ২০৮

[৪৬০] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২০১, ১/১১১ এবং ২/৪১৫

অন্যতম কারণ ছিল, বিচারকদের প্রতি রাষ্ট্র এবং জনগণের অগাধ আস্থা। উমাইয়া যুগের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

▪ ইয়াতিমদের সম্পদ দেখাশোনা

ইসলামি শরীয়তে ইয়াতিমের সম্পদ তত্ত্বাবধান, মৌলিকভাবে তা সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধি করার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ কারণে খলিফা এবং প্রশাসকরা ইয়াতিমদের সম্পদ তত্ত্বাবধান এবং তা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব বিচারকদের কাছে অর্পণ করেন। কেননা বিচারকরা ছিলেন সমাজের মাঝে সর্বাধিক আমানতদার। জনগণের আস্থার জায়গা এবং তাদের সম্পদের দায়িত্বশীল। ইয়াতিমদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের এই ব্যবস্থা উমাইয়া যুগেই প্রথম শুরু হয়। এই ব্যবস্থাপনার সর্বপ্রথম পরিচালক ছিলেন হিজরি ৮৬ সনে আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ানের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত মিশরের বিচারক আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া ইবনি খুদাইজ।[৪৬১] কিনদি বলেন, আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া ছিলেন ইয়াতিমের সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব পালনকারী সর্বপ্রথম বিচারক। তিনি প্রত্যেক গোত্রের দায়িত্বে তাদের ইয়াতিমদের সম্পদ রেখেছিলেন। এ বিষয়টি তিনি লিখিত আকারে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া ইবনি খুদাইজ বিচারক হওয়ার পর ইয়াতিমদের কিছু মালের সন্ধান পান। সেটা তিনি গোত্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জিম্মায় রাখেন। সেসব সম্পদের কথা প্রচার করে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখেন। তারপর থেকে ইয়াতিমের সম্পদ হেফাজতের বিষয়টি এভাবে চলতে থাকে।[৪৬২]

▪ ওয়াকফকৃত সম্পদের পৃষ্ঠপোষণ

ওয়াকফকৃত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, এই খাতের লভ্যাংশের বণ্টন এবং ওয়াকফকারীর শর্তাদি বাস্তবায়ন ইত্যাদির ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামি শরীয়তের বক্তব্য অনেক সুস্পষ্ট। এর আগে ওয়াকফ-সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কোনো বিচারব্যবস্থা ছিল না। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দাতাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকত কিংবা ওসিয়তকারীদের নিয়ন্ত্রণেই তা পরিচালিত হতো। ওয়াকফের সম্পত্তির কার্যনির্বাহী কোনো বিচারকও ছিল না। খলিফা হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের যুগে বিচারক তাওবা ইবনু নামির সর্বপ্রথম ওয়াকফকৃত সম্পদের পৃষ্ঠপোষণ শুরু করেন।

ইবনু লাহিআহর সূত্রে কিনদি বর্ণনা করেছেন, 'মিশরের ওয়াকফকৃত সম্পদের

---

[৪৬১] তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/২১৬; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৮৬; আবকারিয়্যাতুল ইসলাম, পৃ. ৪৪১

[৪৬২] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩২৫

ওপর সর্বপ্রথম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন খলিফা হিশামের নিয়োগকৃত বিচারক তাওবা ইবনু নামির। এর আগে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দাতা-সদস্যদের অধীনে পরিচালিত হতো। ওসিয়তকারীদের নিয়ন্ত্রণেই তা থাকত। তাওবা বিচারক হওয়ার পর বললেন, "আমার মনে হয়, দরিদ্র আর অসহায় মানুষই এই সম্পদগুলোর প্রকৃত হকদার। তাই এগুলোর ওপর আমি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চাই। নাহয় এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে একজনের পর একজন মুতাওয়াল্লী হয়ে তা নষ্ট করে ফেলবে।" সেমতে তাওবা ইবনু নামিরের ইন্তেকালের আগেই ওয়াকফকৃত সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বড় প্রশাসনিক বিভাগ তৈরি করা হয়।'

অন্য বর্ণনায় আছে, তাওবা ছিলেন মিশরের সর্বপ্রথম বিচারক, যিনি ওয়াকফকৃত সম্পত্তিকে প্রশাসনিক বিভাগের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। এটা ছিল ১১৮ হিজরির কথা।[৪৬৩] এরপর আব্বাসীয় যুগে এ বিষয়টি আরও সুশৃঙ্খল রূপ পায়। আমরা পরবর্তীতে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব।

▪ ফতোয়া প্রদান

বিচারকগণ প্রায় সবাই ছিলেন বড় বড় আলিম এবং ফকিহ। বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার আগেও তারা ফতোয়া প্রদান, পাঠদান ও মানুষকে শরীয়তের বিধিনিষেধ বর্ণনা করার দায়িত্ব পালন করতেন। বিচারক থাকা অবস্থায় এবং বরখাস্ত হওয়ার পরও তারা এ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। বিচারক থাকাকালীন তারা মানুষকে ফতোয়া প্রদান করতেন। অধিকাংশ সময় মামলা বা বিরোধের নিষ্পত্তি হতো ফতোয়া আর শারঈ আইন বর্ণনার মাধ্যমে। যেমন, বসরায় হাসান বসরি ﵀ ফতোয়া প্রদান করতেন। শামে মাকহুল ﵀ এবং আবান ইবনু উসমান ﵀-সহ অন্যদের সাথে ফতোয়া প্রদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন বিচারক নুমাইর আল-আশআরি ﵀।

❁ বিচারকগণ এবং বিভিন্ন দায়িত্ব

বিচারকদের আমানতদারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিচারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির কারণে উমাইয়া যুগের খলিফা এবং প্রশাসকগণ তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু দায়িত্বের বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

▪ পুলিশ

বিচারকগণ তাদের দায়িত্বের পাশাপাশি পুলিশ-প্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন। একইসাথে তারা বিচারকার্য পরিচালনা এবং পুলিশ-প্রধান—উভয় দায়িত্বই পালন

---

[৪৬৩] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৪৬; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২৭; আবকারিয়্যাতুল ইসলাম, পৃ. ৪৪২

করতেন। এই দায়িত্ব পরিচালনার স্থান ছিল কয়েকটি ইসলামি শহর।

ওয়াকি বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া ﷺ ৫৩ হিজরিতে সাঈদ ইবনুল আস ﷺ-কে মদীনার প্রশাসকের পদ থেকে অপসারণ করেন। কেউ কেউ অবশ্য ৫৪ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের কথা বলেছেন। মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাকে পুনর্বহাল করে আবু সালামাকে বরখাস্ত করেন। আবু সালামার জায়গায় তার ভাই মুসআব ইবনু আবদির রহমান ইবনি আউফকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ দেন। পাশাপাশি পুলিশের দায়িত্বও তাকে প্রদান করেন। মুসআব ছিলেন দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত কঠোর। পুলিশের দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি মানুষকে কঠোরভাবে পাকড়াও শুরু করলেন।[৪৬৪]

মাসলামা ইবনু মুখাল্লাদ ﷺ সূত্রে কিনদি বর্ণনা করেছেন, 'মাসলামা ফুসতাত নগরীতে[৪৬৫] এসে সায়েব ইবনু হিশাম ইবনি কিনানা আল-আমিরিকে পুলিশের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে আবিস ইবনু সাঈদকে তার স্থলে নিয়োগ দেন। সুলাইম ইবনু ইতরকেও বিচারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আবিসকে বিচারের দায়িত্ব প্রদান করেন। ফলে আবিস বিচারকার্য এবং পুলিশ-প্রধান—উভয় দায়িত্বই লাভ করেন। আবিসই সর্বপ্রথম একসাথে দুই দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। এটা ৬০ হিজরির কথা।[৪৬৬] ১০ বছরেরও অধিক সময় মিশরের প্রশাসক থাকার পর ৬২ হিজরিতে মাসলামার ইন্তেকাল হয়। ৬২ হিজরির রমজান মাসে সাঈদ ইবনু ইয়াজিদ আল-আজদি মিশরের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও আবিস ইবনু সাঈদকে উভয় পদেই বহাল রাখেন। এরপর আবদুর রহমান ইবনু উতবা আল-ফিহরি মিশরের গভর্নর হওয়ার পরও আবিসকে বহাল তবিয়তে তার উভয় দায়িত্বে রেখে দেন।

কিনদি বলেন, আবিসকে মিশরের প্রশাসক মাসলামা ইবনু মুখাল্লাদ প্রথমে পুলিশ-প্রধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তারপর তাকে পুলিশ-প্রধান এবং বিচারক—উভয় দায়িত্বই প্রদান করেন। এটা ছিল ৬১ হিজরির প্রথম দিকে। এরপর ৬৫ হিজরিতে আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ান মিশরের প্রশাসক হওয়ার পরও আবিসকে উভয় দায়িত্বে বহাল রাখেন। আবিস এভাবে ৬৮ হিজরি পর্যন্ত সারাজীবন এ দায়িত্ব দুটি পালন করে যান।[৪৬৭]

এরপর বিচার এবং পুলিশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইউনুস ইবনু আতিয়্যাহ আল-হাদরামি। ৮৬ হিজরি পর্যন্ত আমরণ তিনি উভয় দায়িত্ব পালন করেন।[৪৬৮] এভাবে

[৪৬৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১১৮

[৪৬৫] ফুসতাত নগরী হচ্ছে আমর ইবনুল আস ﷺ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মিশরের সর্বপ্রথম রাজধানী।

[৪৬৬] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২৬; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩১১-৩১৩

[৪৬৭] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৯ এবং ৩১৩; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ, ১৮৮

[৪৬৮] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৫; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩২২, ৩২৪ এবং ৩২৭

আবদুর রহমান ইবনু খুদাইজ আল-কিনদি এবং ইমরান ইবনু আবদির রহমান আল-হাসানি দুই দায়িত্ব একসাথে পালন করেছিলেন।

মিশরের বিচারকদের ব্যাপারে কিনদি বলেন, 'এরপর বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইউনুস ইবনু আতিয়্যাহ। ... আর হাসসান ইবনু আতাহিয়্যাহর ছেলে আবদুর রহমান ছিলেন আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ানের পুলিশ-প্রধান। ৮৪ হিজরির জুমাদাল উলায় তিনি ইন্তেকাল করলে আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ান তার জায়গায় ইউনুস ইবনু আতিয়্যাহ আল-হাদরামিকে বসান। তাকে প্রদান করেন যুগপৎ বিচার পরিচালনা এবং পুলিশ-প্রধানের দায়িত্ব।'[৪৬৯]

আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়ার দায়িত্বের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে কিনদি বলেন, '৮৬ হিজরির জুমাদাল উলায় আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ান ইন্তেকাল করেন। আর এদিকে আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া তখনো পুলিশ এবং বিচারক হিসেবে বহাল আছেন। আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান জুমাদাল আখিরায় আমির হিসেবে আসেন। আবদুর রহমানকে তিনি ৮৬ হিজরির রমজান অবধি স্বপদে বহাল রাখেন। এরপর তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন।'[৪৭০]

বিচারক ও পুলিশ-প্রধানের উভয় দায়িত্ব একত্রে পালনের আরও অনেক উদাহরণ আছে। যেগুলো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ইনসাফ বাস্তবায়ন করত। বিচারের আইন বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দিত।

▪ বাইতুল মালের দায়িত্ব

খলিফাদের অনেকেই বিচারকদেরকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বের পাশাপাশি বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এটা শুরু হয়েছিল উমর ﷺ কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-কে বাইতুল মালের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করার মাধ্যমে।[৪৭১] এরপর উমাইয়া বংশের শাসনামল এই নীতিই অনুসরণ করে চলেছে।

এ বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে কিনদি বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনু হুজাইরাহ ছিলেন তৎকালীন বিজ্ঞ ফকিহ ও আলিম। উমর ইবনু আবদিল আজিজ ﷺ তাকে একাধারে বিচারক, শিক্ষক এবং বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। প্রতিটি দায়িত্বের জন্য তিনি আলাদা আলাদা করে বেতন পেতেন।'[৪৭২]

---

[৪৬৯] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩২২

[৪৭০] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩২৫; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮৯

[৪৭১] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/১৮৮

[৪৭২] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩১৪ এবং ৩১৭; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৫

▪ নেতৃত্ব

বিচারকদের কেউ কেউ অনেক সময় প্রশাসক নিযুক্ত করার দায়িত্বও পালন করেছিলেন। যেমন, খলিফা দামিস্কের বাইরে কোথাও গেলে বিচারককে তার স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। আবার প্রশাসকদের অনেকে অনুপস্থিত থাকলে বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাইরে গেলে তখন প্রশাসন পরিচালনা এবং নগরের সার্বিক বিষয় দেখাশোনা করার জন্য বিচারককে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন।

আবু যুরআহ বলেন, 'মুআবিয়া ؓ সিফফিনের যুদ্ধে বের হওয়ার সময় ফাদ্বালাহ ইবনু উবাইদ ؓ-কে দামিস্কের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।'[৪৭৩]

হাজ্জাজ মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় বিচারক আবদুল্লাহ ইবনু কায়স ইবনি মাখরামাকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।[৪৭৪] বিচারক আবু বকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি হাযাম মদীনার আমির ছিলেন।[৪৭৫] আবু মূসা আশআরি ؓ-এর পৌত্র বিলাল ইবনু আবি বুরদা অনেক সময় বসরার আমির ছিলেন এবং বিচারকার্যও পরিচালনা করেছেন।[৪৭৬] আবিসকে আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ান বিচারকার্য এবং পুলিশের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আবার তিনি কোনো সময় শামে সফরে গেলে তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যেতেন।[৪৭৭] মালিক ইবনু শারাহিল ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ؓ-এর বিপক্ষে আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ান কর্তৃক প্রেরিত বাহিনীর সেনাপতি। তারপর তাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।[৪৭৮]

উমাইয়া যুগের বিচারকগণ

উমাইয়া যুগে বিচারক সংখ্যা অধিক হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। উমাইয়া যুগের মেয়াদ যেমন দীর্ঘ ছিল, তেমনি উমাইয়া সাম্রাজ্যের সীমানাও ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সে যুগে ব্যাপকভাবে বিচারক পরিবর্তন আর বরখাস্ত করে তাদের স্থলে অন্যদের নিয়োগ দেওয়া হতো। আবার বড় বড় এবং প্রসিদ্ধ শহরগুলিতে একাধিক বিচারকও থাকতেন। এইজন্য আমরা বড় বড় শহরের বিচারকার্যের বিবরণ উল্লেখ করার পাশাপাশি প্রসিদ্ধ বিচারকদের কথাও আলোচনা করব।

---

[৪৭৩] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৪১৩; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ২/২১৮; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮৯

[৪৭৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১২৪

[৪৭৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৩৫

[৪৭৬] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৩৭

[৪৭৭] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩১২

[৪৭৮] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩২১

ক. দামিস্কের বিচারকগণ

দামিস্কের যারা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, তারা ছিলেন খলিফার বিচারক। তাদের কর্মস্থল ছিল ইসলামি খিলাফতের প্রাণকেন্দ্রে। এতদসত্ত্বেও তারা ছিলেন অন্যান্য বিচারকদের মতোই সাধারণ। অন্যদের মাঝে তাদের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। এমনকি বিভিন্ন শহরে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের থেকে কোনো মতামতও নেওয়া হতো না। তবে ইনসাফপূর্ণ বিচারকার্য পরিচালনা এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে দামিস্কের বিচারকরা ছিলেন প্রসিদ্ধ।[৪৭৯] তাদের মধ্যে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

১. ফাদ্বালাহ ইবনু উবাইদ ﷺ: আবুদ দারদা ﷺ-এর প্রস্তাবনামতে মুআবিয়া ﷺ তাঁকে শামের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ করেছিলেন। আমৃত্যু তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ৫৩ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। মুআবিয়া ﷺ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করে খাটলির একাংশ নিজে বহন করেন। খলিফা মুআবিয়া ﷺ দামিস্কের বাইরে কোথাও গেলে ফাদ্বালাহ ﷺ-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যেতেন।[৪৮০]

একবার ফাদ্বালাহ ﷺ-এর কাছে এক চোরকে চোরাই মাল সমেত নিয়ে আসা হলো। বিচারক তখন চোরকে বললেন, 'হয়তো এই সম্পদ তুমি কোথাও পেয়েছ। নয়তো কুড়িয়ে পেয়েছ।' তখন চোরকে ধরে নিয়ে আসা ব্যক্তিটি বলে উঠল, 'ইন্নালিল্লাহ, তিনি তো দেখি চোরকে অজুহাত শিখিয়ে দিচ্ছেন!' তখন চোরটি বলল, 'আল্লাহ আপনার সবকিছু ঠিক করে দিন। আল্লাহর কসম! আমি তো এই মাল কোথাও পেয়েছি।'

এরপর বিচারক দণ্ড রহিত করে লোকটিকে ছেড়ে দেন। ফকিহগণ শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে তালকিন তথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমোদন দিয়েছেন। মাইয ﷺ-এর সাথে রাসূল ﷺ যেমনটা করেছিলেন।

২. নুমান ইবনু বাশির ইবনি সাদ: তার উপনাম ছিল আবু ইদরিস আনসারি খাযরাজি। ফাদ্বালাহ ﷺ-এর পর তিনি শামের বিচারক হয়েছিলেন। হিমসের কাছে ৬৪ হিজরিতে নিহত হন।[৪৮১]

৩. বিলাল ইবনু আবিদ দারদা: নুমান ইবনু বাশিরের পর তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দামিস্কে খলিফা আবদুল মালিকের প্রতিনিধি

---

[৪৭৯] দামিস্ক এবং শামে উমাইয়া যুগের খলিফাদের বিস্তারিত বিবরণ জানতে দেখুন, আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৯৯; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৫০০ এবং কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ১।

[৪৮০] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৯৯ এবং ২০১; কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২

[৪৮১] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২০১; কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৩

হিসেবে নামাজ পড়াতেন এবং তাদের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[৪৮২]

৪. আয়িযুল্লাহ ইবনু আবদিল্লাহ: তার উপনাম ছিল আবু ইদরিস আল-খাওলানি। ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া, মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের সময় তিনি বিচারক ছিলেন। আবদুল মালিকের খিলাফতকালে তার মৃত্যু হয়।[৪৮৩]

৫. আবদুল্লাহ ইবনু আমির আল-ইয়াহসাবি আদ-দিমাশকি: তিনি ছিলেন সাতজন ক্বারির অন্যতম। বিচারক বিলালের পর তিনি দামিস্কের বিচারক হন। দামিস্কের মসজিদের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। শামবাসীরা তাকে ইলমুল ক্বিরাতের ইমামরূপে গ্রহণ করে।[৪৮৪]

৬. যুরআহ ইবনু আইয়ুব আল-মাআররি: খলিফা ওয়ালিদ ইবনু আবদিল মালিকের সময় তিনি বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর বিনিময়ে তিনি কোনো বেতন নিতেন না।[৪৮৫] তাকে যুরআহ ইবনু ছাওব নামেও উল্লেখ করা হয়।

৭. নুমাইর ইবনু আউস আল-আশআরি: খলিফা আবদুল মালিকের সময় তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একপর্যায়ে তার দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। যেসব কঠিন মোকদ্দমায় কুরআন-হাদিসের কোনো দলিল পাওয়া যেত না, সেক্ষেত্রে তিনি খলিফা হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের সাথে পত্র মারফত যোগাযোগ করতেন এবং তার জবাব অনুসারে ফয়সালা দিতেন। তিনি নির্ভরযোগ্য দাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। একবার তিনি দামিস্কের এক লোকের ওসিয়ত অনুসারে ফয়সালা করলে শামের বিজ্ঞ ফকিহ মাকহুল ﵀ তার সাথে সহমত পোষণ করেন। সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি—এমন ওসিয়তের ব্যাপারে সাক্ষ্য নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে তারা দুজনই একমত। নুমাইর শারীরিক দুর্বলতার কারণে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলে খলিফা হিশাম তখন তার স্থলে নিযুক্ত করা যায় এমন বিচারকের পরামর্শ দিতে বলেন। তখন তিনি দামিস্কের ফকিহ ইয়াজিদ ইবনু আবি মালিক-সহ আরও কয়েকজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন। খলিফা তখন ইয়াজিদকে নিয়োগ দেন।[৪৮৬]

৮. সুলাইমান ইবনু হাবিব আল-মুহারিবি: তিনি ছিলেন খলিফা উমর ইবনু আবদিল আজিজ ﵀ এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাদের বিচারক। সুদীর্ঘ ৩০ বছর বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হিমসের বিচারক ছিলেন।

---

[৪৮২] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২০১; কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৩

[৪৮৩] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২০১; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৫০০; তারীখুত তবারি : ৫/৩৫; কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৫

[৪৮৪] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৫; মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৫২

[৪৮৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২০২; কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৬

[৪৮৬] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২০৪; ২০৬; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৫০১; কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৮

আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের সাথে তার পত্র মারফত যোগাযোগ হতো।

সুলাইমান বলেছেন, 'উমর ইবনু আবদিল আজিজ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, অগ্নিপূজারিদের সম্পত্তির হালাল বস্তুর ব্যাপারে আমি যেন মিরাস বণ্টনের ফয়সালা করি। আর হারাম বস্তুর মিরাস যেন রহিত করে দিই।'

কাযি সুলাইমান সাক্ষীর পাশাপাশি কসমের মাধ্যমে বিচার করতেন। ইবনু শিহাব আয-যুহরির সাথে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্বও তিনি পালন করতেন।[৪৮৭]

খ. মদীনার বিচারকগণ

উমাইয়া যুগে মদীনায় অনেক বিচারক ছিলেন।[৪৮৮] তাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এখানে তুলে ধরছি।

১. আবু হুরায়রা আবদুর রহমান ইবনু সাখর ؓ : প্রসিদ্ধ এই সাহাবি মদীনায় বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। নুআইম থেকে ওয়াকি বর্ণনা করেছেন, 'আবু হুরায়রাকে বিচার করতে আমি দেখেছি।' তিনি বাদী-বিবাদীর মাঝে ইনসাফের আদেশ দিতেন। দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে ঋণের দায়ে বন্দি করতেন না। অপবাদদাতা অপরাধীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিতেন। তিনি মদীনাতেই থাকতেন। ৫৯ হিজরিতে মদীনাতেই তাঁর ইন্তেকাল হয়।[৪৮৯] সম্ভবত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসের আগে তাঁকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল।

২. আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনি নাওফাল : কিংবা আবদুল্লাহ ইবনু নাওফাল ইবনিল হারিস। খলিফা মুআবিয়া ؓ-এর খিলাফতকালে তিনি ছিলেন মারওয়ান ইবনুল হাকামের পক্ষ থেকে মদীনার প্রথম বিচারক। মারওয়ান পরিবারের ব্যাপারে তিনিই সর্বপ্রথম যথাযথ বিচার করেছিলেন। ফলে মারওয়ানের কাছে তার মর্যাদা আরও বেড়ে যায়। তিনি বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষীর সাথে শপথও গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন একজন নেককার মুসলিম এবং ফকিহ। ৮৪ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়।[৪৯০]

৩. আবদুর রহমান ইবনু আউফ ؓ-এর ছেলে আবু সালামা : ৯৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় তাবিয়িদের অন্যতম। মুআবিয়া ؓ-এর প্রশাসক সাঈদ ইবনুল আস তাকে মদীনার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ দিয়েছিলেন। একজন সাক্ষী-সহ বাদীর কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করা ছিল তার রীতি।[৪৯১]

---

[৪৮৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/৩১০; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৫০১; কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৯

[৪৮৮] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১১১; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৯৫

[৪৮৯] আখবারুল কুদ্বাহ : ১১০; ১১৪; মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৭

[৪৯০] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১১৩

[৪৯১] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১১৬

৪. আবদুর রহমান ইবনু আউফ ﷺ-এর ছেলে মুসআব : ৬৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ৫৩ বা ৫৪ হিজরিতে মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বের পাশাপাশি পুলিশ-প্রধানের দায়িত্বও পালন করতেন। দায়িত্বের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনেক কঠোর। সে-সময় মদীনায় হত্যার অপরাধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর এ অপরাধ দমনের জন্য তিনি মানুষকে কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন।[৪৯২]

এরপর যখন মুআবিয়া ﷺ-এর ইন্তেকালের পর ইয়াজিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে উসমান ইবনু মুহাম্মাদকে মদীনার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন, উসমান ইবনু মুহাম্মাদ তখন ত্বলহা ইবনু আবদিল্লাহকে বিচারক নিযুক্ত করেন। ত্বলহা ছিলেন অনেক দানবীর। তাকে দানবীর ত্বলহা নামে সবাই চিনত।[৪৯৩] এরপর আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ এবং আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের মধ্যকার ফিতনা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বনু উমাইয়া মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর এ ফিতনার সমাপ্তি ঘটে। ৭৩ হিজরিতে সবাই আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের কাছে বাইয়াত নিলে ৭৪ হিজরিতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত হন।[৪৯৪]

৫. সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু কায়স ইবনি মাখরামা ﷺ : তিনি ছিলেন হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ কর্তৃক নিযুক্ত মদীনার বিচারক। হাজ্জাজ মদীনার বাইরে কোথাও গেলে ইবনু কায়স ﷺ-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন।[৪৯৫]

৬. নাওফাল ইবনু মুসাহিক আল-আমিরি : তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য তাবিয়ি এবং একজন হাদিসবিশারদ। অনেক বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাকে মদীনার বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। একবার জনৈক ব্যক্তি তার কাছে মারওয়ানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে আসে। তখন মারওয়ানের কাছে তিনি এ মর্মে সমন পাঠান, 'রায় আপনার পক্ষে হোক কিংবা বিপক্ষে, তবুও আপনি নিজেই উপস্থিত হোন।'

এরপর ৮২ হিজরিতে আবান ইবনু উসমানকে পদচ্যুত করা হয়। যিনি সাত বছর আগে তার দায়িত্বের সময় নাওফালকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে বহাল রেখেছিলেন।[৪৯৬] আবান ছিলেন খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের পক্ষ থেকে মদীনার প্রশাসক। নাওফালের দায়িত্ব পালনের সময় তিনি বিচার বিভাগের

---

[৪৯২] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১১৮
[৪৯৩] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১২০
[৪৯৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১২৩-১২৪
[৪৯৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১২৪
[৪৯৬] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১২৫; তারীখুত তবারি : ৫/১৬২

তদারকি করতেন। ইবনুয যুবাইর ﷺ-এর মোকদ্দমা সম্পর্কে আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের কাছে জানতে চেয়ে আবান লিখেছিলেন, 'আমিরুল মুমিনীন কী বলেন? ইবনুয যুবাইরের ফয়সালা আমি কার্যকর করব, নাকি করব না?' জবাবে আবদুল মালিক লিখেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা তো ইবনুয যুবাইরকে দোষারোপ করি না। তবে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্য আমরা সমালোচনা করি। আমার পত্র পাওয়ামাত্র তার ফয়সালা কার্যকর করবে। কেননা তার ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করা আমাদের জন্য অসম্ভব।'[৪৯৭]

৭. উমর ইবনু খালদাহ আয-যুরকি: আবানকে বরখাস্ত করার পর তাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তার ব্যাপারে রবীআ বলেছেন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিচারক। আমাদের মাঝে তিনি এমন এক বিচারক ছিলেন, যার ব্যাপারে কোনো সমস্যা ছিল না। বাদী-বিবাদী বিচারের জন্য বসলে তিনি বিচারকের কর্তব্য বাতলে দিতেন। তার ইচ্ছা ছিল যত দ্রুত সম্ভব বিচার করে রেহাই দেওয়া। কারণ এটাই যে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায়।

উমর ছিলেন একজন স্বচ্ছ মানুষ। একবার তিনি একজন অপবাদদাতার বিপক্ষে ফয়সালা দিয়ে তাকে বলেন, 'এই দুষ্ট! যাও, তুমি নিজেই নিজেকে বন্দি করে রাখো।' লোকটির সাথে তখন কোনো পুলিশ ছিল না। সে একা একাই জেলে এসে নিজেকে নিজেই বন্দি করে রাখল।

উমর ইবনু খালদাহকে বরখাস্ত করার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনি যে দায়িত্বে ছিলেন, সে ব্যাপারে আপনার কী মতামত?' তিনি বললেন, 'আমাদের কিছু ভাই ছিল, যাদের সাথে আমরা আজ সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। আমাদের বসবাস করার মতো অল্প-স্বল্প কিছু জায়গা ছিল। যেগুলো আজ আমরা বিক্রি করে তার কিছু মূল্য খরচ করে ফেলেছি।'[৪৯৮]

৮. আমর ইবনু হাযাম আল-আনসারির পৌত্র আবু বকর ইবনু মুহাম্মাদ: মদীনার তৎকালীন প্রশাসক উমর ইবনু আবদিল আজিজ তাকে ৮৭ হিজরিতে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ৯৪ হিজরিতে যখন উমর ইবনু আবদিল আজিজের অপসারণের পর উসমান ইবনু হাইয়ান আল-মুররি প্রশাসক হন, তিনিও আবু বকরকে স্বপদে বহাল রাখেন।

উসমান ইবনু হাইয়ানের পর আবু বকর প্রশাসক হন। তিনি অনেক বিচারাচার পরিচালনা করেছেন। তার প্রশাসক জীবনের অনেক ঘটনা রয়েছে। অপবাদের শাস্তিস্বরূপ তিনি ৮০টি বেত্রাঘাতের ফয়সালা করতেন। কিসাসের বিচার করেছেন। অতর্কিত হামলা করে এক যিম্মি তথা অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করার দায়ে এক

---

[৪৯৭] আখবারুল কুযাহ : ১/১২৯; তবাকাতু ইবনি সাদ : ৫/১১৬

[৪৯৮] আখবারুল কুযাহ : ১/১৩০

মুসলিমকে তিনি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। কোনো রকম ওজর ছাড়া বিবাদী শহরে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আদালতে নিজে উপস্থিত না হয়ে উকিল পাঠালে সেটা তিনি গ্রহণ করতেন। কসম এবং সাক্ষী—উভয়টা নিয়ে তিনি বিচার করতেন। মদীনাবাসীদের ঐকমত্য তার মতে গ্রহণযোগ্য দলিল ছিল। মায়ের পক্ষে ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণে তার আপত্তি ছিল না। মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তার চারপাশে থাকত পাহারাদার। তারা মানুষকে ভিড়াভিড়ি থেকে ফিরিয়ে রাখত। ১২০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪৯৯]

৯. আবদুর রহমান ইবনু আউফ ﷺ-এর পৌত্র সাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু আয-যুহরি : ১২৭ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়। তিনি ছিলেন একজন আল্লাহভীরু ও পরহেজগার ব্যক্তি। তিনি-সহ তার আরও তিন ভাই মসজিদের এক কোণে অনেক নামাজ পড়তেন বলে তাদের লোকেরা 'মসজিদের খুঁটি' বলে অভিহিত করত।

নির্বোধ হওয়ার কারণে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য তিনি গ্রহণ করেননি। একজন নেশাগ্রস্তের ওপর তিনি হদ কার্যকরের ফয়সালা দিয়েছিলেন। ঘটনা ছিল এমন, জনৈক নেশাগ্রস্তকে মসজিদে তার কাছে নিয়ে আসা হলে তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করেন। শাস্তির পর জানতে পারলেন, লোকটি আমিরুল মুমিনীন ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদের মামা। আমিরুল মুমিনীনের সাথে সে মদীনায় এসেছিল। এরপর খলিফা মামার দোষ জানতে চাইলে উত্তরে সাদ বললেন, 'আমিরুল মুমিনীন! আপনিই আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি দেখলাম, আল্লাহর হক নষ্ট করা হচ্ছে। একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মসজিদে ঘুরছে! আর মসজিদে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের মাঝে অনেক সম্মানিত লোকও আছেন। আমার কাছে এটা পছন্দ হলো না যে, মানুষ আপনার কাছ থেকে হদ রহিত হওয়ার ধারণা নিয়ে যাবে। এজন্যই তার ওপর আমি হদ প্রয়োগ করেছি।' খলিফা বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে এর উত্তম বদলা দান করুন।' এরপর তাকে কিছু উপঢৌকন দেওয়ার আদেশ দিলেন।

সাদ ইবনু ইবরাহীম একবার এক লোককে গান গাইতে দেখেন। তারপর ভালো করে লক্ষ করে দেখলেন, সে মদ্যপও বটে। তখন তার নির্দেশে লোকটিকে শাস্তি দেওয়া হয়।[৫০০]

সাদ ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত লোক। সবাই তাকে সমীহ করত। তার পর আরও যারা ধারাবাহিকভাবে মদীনার বিচারক ছিলেন তারা হলেন : যায়িদ ইবনু সাবিত ﷺ-এর ছেলে সাঈদ, মুহাম্মাদ ইবনু সাফওয়ান আল-জুমাহি, সলত ইবনু যুবায়দ ইবনিস সলত আল-কিনদি, আবু বকর ইবনু আবদুর রহমান এবং মুহাম্মাদ

---

[৪৯৯] আখবারুল কুযাত : ১/১৩৫-১৪৬
[৫০০] আখবারুল কুযাত : ১/১৫০

ইবনু আমর ইবনু হাযামের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনু আবু বকর। মুহাম্মাদ ইবনু আবু বকর ছিলেন একজন হাদিসবিশারদ। তিনি মদীনাবাসীদের ইজমা তথা ঐকমত্য অনুসারে ফয়সালা করতেন। তারপর সাদ ইবনু ইবরাহীম আয-যুহরিকে পুনরায় বিচারক বানানো হয়। এর কিছুকাল পরে অল্প সময়ের জন্য বিখ্যাত ফকিহ ও হাদিসবিশারদ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান আত-তাইমি ছিলেন মদীনায় বনু উমাইয়া কর্তৃক নিযুক্ত সর্বশেষ বিচারক। তিনি একাধারে ফিকহ এবং কুরআন-সুন্নাহর ইলমের পাশাপাশি সাহিত্য-জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চমর্যাদাশীল ব্যক্তি। আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন।[৫০১]

❁ গ. বসরার বিচারকগণ

বসরায় অনেকেই বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. উমাইরা ইবনু ইয়াসরিবি আদ-দিব্বি : মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত বসরার প্রশাসক আবদুল্লাহ ইবনু আমির ইবনি কুরাইয তাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। ধার নেওয়া সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে উমাইরা সেটার ভর্তুকি প্রদানের ফয়সালা করতেন। ৪৫ হিজরি পর্যন্ত তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। অবশেষে বসরার পরবর্তী প্রশাসক যিয়াদ তাকে বরখাস্ত করে ইমরান ইবনু হুসাইনকে নিয়োগ দেয়। কিন্তু তিনি অব্যাহতি চাইলে প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনু ফাদ্বালাহকে, এরপর তার ভাই আসিম ইবনু ফাদ্বালাহকে নিয়োগ দেয়। তারপর নিয়োগ পান যুরারাহ ইবনু আউফা। যুরারাহ বিচারের ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যই গ্রহণ করতেন।[৫০২]

২. হাসান বসরি : ইবনু আউন বলেন, হাসান বসরি বিচারক হলে লোকেরা তাঁর কাছে ভিড় জমাল। তখন তিনি বললেন, মানুষকে তার বিবেকই সংশোধন করতে পারে। প্রশাসক আদি ইবনু আরতাত হাসানকে বিচারকার্য পরিচালনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। তার কাছ থেকে বের হয়ে হাসান বললেন, 'এই লোকটি আমাকে মানুষের সামনে বিচারক হিসেবে বসিয়েছে। আমি তাকে আমার বার্ধক্যের কথা বলেছি। আমার দুর্বলতার কথা জানিয়েছি। বিচারকার্য পরিচালনা করার মতো শক্তি আমার নেই। তখন সে বলল, "আপনার জায়গায় আরেকজন লোক বসানোর আগ পর্যন্ত কিছুদিন আমাকে সহযোগিতা করুন।"' হাসান বসরি ﷺ বেশিদিন বিচারকার্য পরিচালনা করেননি।[৫০৩]

---

[৫০১] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৬৭ এবং ১৮৩; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৯৫; তারীখুত তবারি : ৫/৫৩৫

[৫০২] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/২৯০, ২৯২, ২৯৬; তারীখুত তবারি : ৫/৪৫

[৫০৩] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৩; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৯৯; তবাকাতু ইবনি সাদ : ৭/১৫৬, ১৫৮

৩. ইয়াস ইবনু মুআবিয়া ইবনি কুররা আল-মুযানি : তিনি ছিলেন বসরায় বনু উমাইয়া কর্তৃক নিযুক্ত সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ বিচারক। প্রখর মেধা, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদর্শিতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, নির্ভুল সিদ্ধান্ত, সঠিক নির্ভুল মতামত এবং উত্তম চরিত্রে তার প্রসিদ্ধি ছিল। উমর ইবনু আবদিল আজিজ খলিফা হওয়ার পর আদি ইবনু আরতাতকে বসরার প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। আদি তখন ইয়াস ইবনু মুআবিয়াকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করলেন।

ইবনু আরতাত একবার বিদ্বেষবশত কুৎসা রটিয়ে ইয়াসকে অপমান করতে চাইলে তিনি বসরা থেকে বেরিয়ে শামে খলিফা উমর ইবনু আবদিল আজিজের কাছে চলে গেলেন। আদি তখন খলিফার কাছে চিঠি লিখলেন, 'ইয়াস তার দায়িত্ব রেখে পালিয়ে আপনার কাছে গিয়েছে। অগত্যা হাসান ইবনু আবিল হাসানকে আমি বিচারের দায়িত্ব দিয়েছি।' জবাবে উমর ইবনু আবদিল আজিজ বললেন, 'তুমি হাসানকে যে দায়িত্ব দিয়েছ, নিঃসন্দেহে সে তার উপযুক্ত। কিন্তু তোমার সাথে বিচারব্যবস্থার কী সম্পর্ক! তুমি বিচারকাজে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছ। আল্লাহ তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেবেন।'

ইয়াসের অভ্যাস ছিল বিচক্ষণ হাদিসবিশারদ খালিদ আল-হাযযার সাথে পরামর্শ করা। বিভিন্ন মোকদ্দমার ক্ষেত্রে খলিফা উমর ইবনু আবদিল আজিজের সাথে তিনি পত্র বিনিময় করতেন। তিনি দ্রুত-সময়ের মধ্যে বিচার করতে পারতেন। সাধারণত এক বৈঠকে কয়েকটি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করতেন। আইয়ুব বলেছেন, 'ইয়াসের মতো কোনো বিচারক আমি দেখিনি।' তিনি তালাকের ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। বাদীর শপথ ও সাক্ষীর মাধ্যমে বিচার করতেন। তিনি প্রতিবেশীকে শুফআর অধিকার দিতেন। এরপর উমর ইবনু আবদিল আজিজের পত্র আসলে তখন থেকে শুফআর অধিকার অংশীদারদের দেওয়া শুরু করেন। অপবাদের বিষয়টি উদ্ঘাটন এবং যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতেন। দাসদের ক্ষেত্রে কিসাসের ফয়সালা করতেন না। বাবার খরচ দেওয়া ছেলের কর্তব্য বলে ফয়সালা করতেন। অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করতেন না। কিয়াফাহ তথা হাবভাব অনুসারেও বিচার করতেন। তিনি বলতেন, 'মানুষের জন্য সংগতিপূর্ণ ক্ষেত্রে তোমরা অনুমান করে বিচার করতে পারো। এমন বিচার সংগতিপূর্ণ না হলে দলিলভিত্তিক বিচার করবে।'

তার প্রদত্ত ফতোয়ার মতো বিচারকার্যের সংখ্যাও অনেক। তিনি জীবনে যত ফতোয়া দিয়েছেন এবং যত বিচারাচার করেছেন—তা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। তার মেধা, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতা ছিল প্রবাদতুল্য। ওয়াসেত নামক এলাকায় ১২২ হিজরি মোতাবেক ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক জাহিয তার প্রশংসায় বলেন, ইয়াস ছিলেন মুযার

বংশের গৌরব। একজন প্রথম সারির বিচারক। তার অনুমান ছিল নির্ভুল। তথ্য তালাশকারী, প্রখর বিচক্ষণ, বিস্ময়কর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং খলিফাগণের কাছে সমাদৃত।

ইয়াসের প্রশংসায় ইবনু খাল্লিকান বলেন, তিনি ছিলেন বাকপটু, চৌকশ, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারঙ্গম, মেধা ও বিচক্ষণতায় অনন্য, ধীমান এবং সুভাষী, সর্বোপরি প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব। দিগদিগন্তে তার খ্যাতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মানুষ বিচারকার্য পরিচালনা শিখতে তার কাছে আসত। তখন শিক্ষার্থীদের তিনি বলতেন, 'বিচারকার্য শেখার বিষয় নয়; অনুধাবনের বিষয়। তোমরা বলো, "আমাদেরকে ইলমের দীক্ষা দিন।"'[৫০৪] তার জীবনী, জীবনাচার এবং বিচারকার্য সম্পর্কে বিশাল আকৃতির গ্রন্থ লেখা সম্ভব।

৪. আবদুল মালিক ইবনু ইয়ালা : হাসান বসরির সমমতের লোক ছিলেন। ত্রুটির কারণে বিক্রিত পণ্য ফিরিয়ে দেওয়ার ফয়সালা দিতেন তিনি। মিথ্যা সাক্ষীদের শাস্তি দিতেন। ওসিয়তকারীর লিখিত এবং সিলকৃত ওসিয়তের ব্যাপারে না জেনেই সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমোদন প্রদান করতেন।[৫০৫]

৫. সুমামা ইবনু আবদিল্লাহ আনসারি : তিনি ১০৬ সনে বসরার বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। ১১০ হিজরি অবধি সে দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। বকর ইবনু আবদিল্লাহ আল-মুযানি তার আগে বসরার বিচার বিভাগের দায়িত্বে থাকার পরও একসময় ইস্তফা দিয়েছিলেন।[৫০৬]

৬. বিলাল ইবনু আবি বুরদা : আবু মূসা আশআরি ﷺ-এর নাতি। খালিদ আল-কুসারি ১১০ হিজরিতে বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বসরার প্রশাসক এবং বিচারক হয়ে যান।[৫০৭]

৭. আমির ইবনু উবাইদ আল-বাহিলি : তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি উমর ইবনু আবদিল আজিজের কোনো কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ঘটনা ছিল এমন, একবার উমর ইবনু আবদিল আজিজ একটি জানাযার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন একটি চাদর আনা হলো। তৎকালীন খলিফারা কোনো জানাযায় বের হলে বসার জন্য তাদের সামনে চাদর পেশ করা হতো। চাদর পেশ করা হলে আমির ইবনু উবাইদ সেটা পা দিয়ে সরিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।[৫০৮]

---

[৫০৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/৩১২-৩৭৪; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৯৮; তবাকাতু ইবনি সাদ : ৭/৩৩৪; আল-আলাম : ১/৩৭৬; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৩৪; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ৩২; ওয়াফায়াতুল আইয়ান : ১/২২৩

[৫০৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/১৫

[৫০৬] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৩০

[৫০৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/২২-৪২

[৫০৮] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৪২

৮. আব্বাদ ইবনু মানসুর আন-নাজি : তিনি বেশ কয়েকবার বসরার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন। আমিরের পর তিনি বিচারক হয়েছিলেন। ১৩২ হিজরিতে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি বিচারকার্য পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলেন।[৫০৯]

ঘ. উমাইয়া যুগে কুফার বিচারকগণ

সে যুগে কুফা ছিল জ্ঞানতৎপরতায় সর্বাধিক চাঞ্চল্যে ভরপুর নগরী। উমর ﷺ-এর যুগে কুফা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সেটা ছিল তৎপর, গতিমুখর এবং জ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। আলি ﷺ এ শহরকে ইসলামি খিলাফতের রাজধানী বানিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য অনেক বিচারক এখানে ছিলেন, যারা এই শহরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। উরওয়া ইবনুল জাদি আল-বারীকি, সালমান ইবনু রবীআ আল-বাহিলি, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, জাবর ইবনুল কাসআম আল-কিনদি, শারহাবিল ইবনু জাবর এবং আবু কুররা আল-কিনদি ছিলেন তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য। আবু কুররার নাম কেউ কেউ সালামা ইবনু মুআবিয়া বলেছেন। এদের প্রত্যেকেই ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর যুগের বিচারক।

আমিরুল মুমিনীন সর্বশেষে শুরাইহকে কুফার বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি রাশিদুন যুগের দীর্ঘসময় বিচারের দায়িত্ব পালন করেন। উমাইয়া যুগেও শুরাইহ দীর্ঘকাল বিচারের দায়িত্ব পালন করেন। ৩৫ বছরের চেয়েও বেশি সময় তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মাঝে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ এবং আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের মধ্যকার ফিতনার সময় তিনি দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর প্রশাসক হাজ্জাজের কাছে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলে ৭৮ হিজরিতে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[৫১০]

এরপর আরও কয়েকজন বিচারক কুফার বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের কথা আমরা এখানে আলোচনা করব।

☑ **১. মাসরুক ইবনুল আজদা আল-হামাদানি :** মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক যিয়াদের অধীনে বিচারের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম। তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে থাকা কোনো জিনিসের ব্যাপারে দুজন ব্যক্তি দাবি করেছে—এমতাবস্থায় উভয়ের প্রমাণ সমান হলে জিনিসটা উভয় দাবিদারের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।[৫১১]

---

[৫০৯] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৪৩

[৫১০] আখবারুল কাদ্বা : ২/১৮৪; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৩১। আলি h-ও কুফাতে কয়েকজন বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। অবশেষে শুরাইহ সেখানে স্থির হন। (আখবারুল কাদ্বা : ২/৩৯৯)

[৫১১] রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৯৮

☑ **২. আবদুর রহমান ইবনু আবি লাইলা :** হাজ্জাজ কুফায় আগমন করে তাকে বিচারক নিযুক্ত করেন। ফয়সালা প্রদানের পূর্বে পরামর্শ করার জন্য সাঈদ ইবনু জুবায়রকে সাথে নিয়ে তিনি বিচার করতে বসতেন।[৫১২]

☑ **৩. আমির ইবনু আবদুল্লাহ ইবনি কায়স :** আবু বুরদা ইবনু আবি মূসা আশআরি নামে তিনি পরিচিত। ইবনু আবি লাইলার পর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ তাকে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ দিয়েছিল। আবু বুরদা নিজের বাড়িতে বসেই বিচার করতেন। তিন বছর দায়িত্ব পালন করার পর তিনি হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের কাছে অব্যাহতি চাইলে হাজ্জাজ তাকে অব্যাহতি দিয়ে তার ভাই আবু বকর ইবনু আবি মূসাকে তার স্থলাভিষিক্ত করে।

ওয়াকি বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি শাবির কাছে কোনো কিছু জানতে চাইলে তাকে আবু বকর ইবনু মূসার কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আবু বকর ইবনু মূসা তখন বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। উমর ইবনু আবদিল আজিজ বসরার প্রশাসক হওয়ার আগ পর্যন্ত আবু বকর ইবনু মূসা বসরায় বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন।[৫১৩]

৪. আমের ইবনু শারাহিল শাবি : উমর ইবনু আবদিল আজিজ তাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। শাবি ছিলেন বসরার অন্যতম খ্যাতিমান বিচারক। অনেকবার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েও অবশেষে ১০৩ হিজরি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। কেউ কেউ অবশ্য ১০৪ হিজরির কথা বলেছেন। তার অনেক প্রসিদ্ধ বিচারকার্য রয়েছে। বিচারকার্যে তার চমৎকার আচরণ আজও প্রশংসনীয়।[৫১৪]

৫. আবদুল মালিক ইবনু উমাইর আল-লাখমি : শাবির পর কে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আবদুল মালিক। আবার কারও কারও মতে, আল-কাসিম।[৫১৫] আবদুল মালিক ছিলেন অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষী, ধীশক্তির অধিকারী।

৬. কাসিম ইবনু আবদুর রহমান : আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-এর নাতি। তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব বাবদ কোনো ভাতা নিতেন না। উমর ইবনু আবদিল আজিজ ﷺ এ সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইতেন। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী। স্বাধীন ব্যক্তিকে অপবাদ আরোপ করায় একজন ক্রীতদাসকে তিনি ৮০ ঘা চাবুক

---

[৫১২] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৪০৭

[৫১৩] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৪০৬, ৪০৮, ৪১২, ৪১৩

[৫১৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৪১৩; আল-আলাম : ৪/১৮; রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৪৯৭; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৩১

[৫১৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/৩

মেরেছিলেন। মোকদ্দমায় শপথ করা থেকে তিনি বিরত থাকতেন।[৫১৬]

উমর ইবনু হুবায়রা বসরার প্রশাসক হওয়ার পর আল-কাসিমকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় হুসাইন ইবনু হাসান আল-কিনদিকে বিচারক নিযুক্ত করলেন। তারপর খালিদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-কুসারি প্রশাসক হয়ে হুসাইনকে পদচ্যুত করে তার জায়গায় সাঈদ ইবনু আশওয়াকে বিচারক নিযুক্ত করলেন। তারপর নিয়োগ দেন ঈসা ইবনুল মুসাইয়াব আল-বাজালিকে। ঈসা ছিলেন সাঈদের অন্যতম সহযোগী। কেউ কেউ বলেন, সাঈদকে বরখাস্ত করে খালিদ তার জায়গায় হাকাম ইবনু উতাইবা আল-ইজলিকে নিয়োগ দেন। তারপর পর্যায়ক্রমে আবদুল্লাহ ইবনু নাউফ আত-তাইমিকে এবং মুহারিব ইবনু দিসার আস-সাদুসিকে। আবু বকর ﷺ এবং উমর ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা রাখে না—এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য মুহারিব গ্রহণ করতেন না। এরপর আবদুল্লাহ ইবনু শুবরুমাহকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি আব্বাসি যুগ অবধি দায়িত্ব পালন করেন। ১৪৪ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়।[৫১৭]

তার অব্যাহতির পরই কুফার বিচারব্যবস্থার দায়িত্বে আসেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনি আবি লাইলা। ইউসুফ ইবনু উমর আস-সাকাফি যাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কুফাবাসীদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ। ইলম এবং জীবনযাত্রায় তিনি ছিলেন ইবনু শুবরুমাহর সহযাত্রী। কুফার বিচারকার্য পরিচালনায় হাজ্জাজ ইবনু মানসুর আল-মুহারিবিকেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তারপর নিয়োগ দেওয়া হয় মানসুর ইবনু মুতামিরকে। তিনি ছিলেন উমাইয়া যুগে সর্বশেষ নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি।[৫১৮]

❁ ঙ. উমাইয়া যুগে মিশরের বিচারক

১. সুলাইম ইবনু ইতর আত-তুজিবি : মুআবিয়া ﷺ-এর খিলাফতকালে তিনি ছিলেন মিশরের সর্বপ্রথম বিচারক।[৫১৯]

২. আবিস ইবনু সাঈদ আল-মুরাদি : মাসলামা তাকে পুলিশ-প্রধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তারপর সুলাইমকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করে আবিসের কাছে বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ৬০ হিজরিতে বিচারকার্য পরিচালনা এবং পুলিশ-প্রধান—উভয় দায়িত্ব তাকে একসাথে দেওয়া হয়। তিনিই সর্বপ্রথম একসাথে উভয় দায়িত্ব পালন করেন। তারপর সাঈদ ইবনু ইয়াজিদ আল-আযদি মিশরের প্রশাসক নিযুক্ত হওয়ার পরও তাকে উভয় দায়িত্বেই বহাল

[৫১৬] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/৬

[৫১৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/৯; খুলাসাতু তাহযীবিল কামাল : ২/৬৫; ত্বাবাকাতু ইবনি সাদ : ৬/৩৫০

[৫১৮] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১০৭, ১২৯, ১৪৫, ১৪৬

[৫১৯] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাত, পৃ. ৩০৩, ৩০৬, ৩১১; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২১

রাখেন। মিশরে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ-এর প্রশাসকও তাকে উভয় দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছিলেন। মারওয়ান, তারপর আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ানও তাকে উভয় দায়িত্বে স্থির রাখেন। আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ান শামে চলে যাওয়ার সময় তাকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান। এরপর তিনি প্রশাসন, পুলিশ এবং বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। আট বছর দায়িত্ব পালন করার পর অবশেষে ৬৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।[৫২০]

৩. বুশায়র ইবনু নাদর আল-মুযানি : তিনি আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ানের পক্ষ থেকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আজীবন এ দায়িত্ব পালনের পর অবশেষে ৬৯ কিংবা ৭০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।[৫২১]

৪. আবদুর রহমান ইবনু হুজাইরাহ : তিনিও আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ানের পক্ষ থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। তিনি ছিলেন অন্যতম প্রাজ্ঞ ফকিহ। একবার মিশরের জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-এর কাছে একটি মাসআলা জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'তোমাদের মাঝে ইবনু হুজাইরাহ আছে, আর তুমি কিনা আমার কাছে জানতে চাইছ!'

তিনি একইসাথে বিচারকার্য পরিচালনা, পাঠদান এবং বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রতিটি দায়িত্বের বিনিময়ে তিনি আলাদা আলাদা বেতন গ্রহণ করতেন। তিনি উপঢৌকন এবং বাড়তি কিছুও পেতেন। তবে শেষ অবধি সবই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ফেলতেন। একে কেন্দ্র করে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার অপেক্ষা করতেন না। তিনি আমৃত্যু বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে বহাল ছিলেন। ৮৩ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়।[৫২২]

৫. মালিক ইবনু শারাহিল আল-খাওলানি : ৮৩ হিজরিতে আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ান তাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এক বছর এক মাস তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।[৫২৩]

৬. ইউনুস ইবনু আতিয়্যাহ : তিনিও ছিলেন আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। ৮৪ হিজরিতে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা এবং পুলিশের দায়িত্ব পালনে নিয়োগ পান। তিনি ছিলেন মিশরের হাদরামাউতের সর্বপ্রথম বিচারক। এক বছর সাত মাস দায়িত্ব পালনের পর ৮৬ হিজরিতে অসুস্থতা কিংবা মৃত্যুর কারণে তিনি সরে যান।[৫২৪]

---

[৫২০] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩১১-৩১৩; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮৮; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২৬; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৩

[৫২১] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩১৩; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮৮

[৫২২] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩১৪; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৫; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮৮

[৫২৩] আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮৯; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩২১; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৫

[৫২৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৫; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩২২-৩২৩

৭. আউস ইবনু আবদিল্লাহ: তিনি ছিলেন ইউনুস ইবনু আতিয়্যাহর ভাতিজা। আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ান তাকে কেবল বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি আড়াই মাস সে দায়িত্ব পালন করেন। ৮৬ হিজরিতে তাকে পদচ্যুত করা হয়।[৫২৫]

৮. আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া ইবনি খুদাইজ আল-কিনদি: আবদুল আজিজ ইবনু মারওয়ান তাকে প্রথমে পুলিশের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এরপর পুলিশ এবং বিচারক পদে একসাথে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি ছিলেন ইয়াতিমের সম্পদের তত্ত্বাবধানকারী সর্বপ্রথম বিচারক। ৮৬ হিজরিতে আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মালিক ৮৬ হিজরির রমজান অবধি তাকে পুলিশ এবং বিচারক হিসেবে বহাল রেখেছিলেন। এরপর তাকে বরখাস্ত করেন।[৫২৬]

৯. ইমরান ইবনু আবদির রহমান আল-হাসানি: আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মালিক ইবনি মারওয়ান তাকে বিচারকার্য পরিচালনা এবং পুলিশ-প্রধানের দায়িত্ব একসাথে দিয়েছিলেন। এরপর তাকে বরখাস্ত করে বন্দি করে রাখেন। কারণ, মিশরের প্রথম দুর্ভিক্ষের সময়টাতে তিনি কিছু জিনিস নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। বন্দি করার আরও একটি কারণ থাকতে পারে। সেটা হলো, ৮৯ হিজরিতে প্রশাসক আবদুল্লাহর একজন সেক্রেটারি নেশা করেছিল। প্রশাসকের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বিচারক সেই সেক্রেটারিকে হদ প্রদান করেন। এরপর তার জায়গায় বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবদুল ওয়াহিদ ইবনু আবদির রহমান ইবনি মুআবিয়া। তিনি ছিলেন ২৫ বছর বয়স্ক টগবগে এক তরুণ। তবে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। ইমরান এই ঘটনার পর প্রশাসক আবদুল্লাহর সমালোচনা শুরু করেন। অন্য বর্ণনামতে, প্রশাসক আবদুল্লাহ বিচারের দায়িত্ব আবদুল আলা ইবনু খালিদ আস-সাহমির কাছে অর্পণ করেছিল। যা-ই হোক, এরপর প্রশাসক আবদুল্লাহকে মিশর থেকে বরখাস্ত করে কুররা ইবনু শুরাইককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। খলিফা উমর ইবনু আবদিল আজিজ তাকে স্বীকৃতি দেননি। বরং তাকে তিনি জালিম প্রশাসক মনে করতেন।[৫২৭]

১০. আবদুল্লাহ ইবনু আবদির রহমান ইবনু হুজাইরাহ আল-খাওলানি: কুররা ৯০ হিজরিতে তাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তার বাবা থেকে বিচারকার্য শিখেছিলেন। ইয়াজ ইবনু উবাইদিল্লাহ আল-আযদির পরপরই তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ইয়াজকে খলিফা উমর ইবনু

---

[৫২৫] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২৬; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮৯; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৬; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩২৪

[৫২৬] আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮৯; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৬; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩২৪

[৫২৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৭-২২৯; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩২৬; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮৯

আবদিল আজিজ স্বপদে বহাল রেখেছিলেন। কিছু ফয়সালার ক্ষেত্রে তার সাথে পত্র মারফত যোগাযোগও হয়েছিল। ১০০ হিজরি পর্যন্ত তিনি বিচারক হিসেবে নিয়োজিত থাকেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবনু খাদাশ বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিনদি যাকে আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু খুযামির আস-সানআনি নামে উল্লেখ করেছেন। তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন, ১০৫ হিজরি অবধি তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। অনেক মোকদ্দমার ক্ষেত্রে উমর ইবনু আবদিল আজিজ তার সাথে পত্র মারফত যোগাযোগ করেছেন। তারপর ১০৫ হিজরিতে হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের পক্ষ থেকে ইয়াহইয়া ইবনু মাইমুন আল-হাদরামি দায়িত্ব লাভ করেন।[৫২৮]

১১. তাওবা ইবনু নামির আল-হাদরামি : ১১৫ হিজরিতে তিনি বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মিশরের বিচারকদের মাঝে তিনিই সর্বপ্রথম খলিফা হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের যুগে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। এটা ছিল ১১৮ হিজরির কথা। হিজরি ১২০ সালে মিশরের বিচার বিভাগে থাকা অবস্থাতেই তাওবার ইন্তেকাল হয়। তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচারক। তার একটি বিচার ছিল এমন, স্বামী যদি স্ত্রীকে শহর থেকে বের করবে এমন শর্ত দিয়ে বিয়ে করে, তারপর স্বামীর কাছে যদি স্ত্রীকে সাথে নিয়ে বের হওয়া ভালো মনে হয় তাহলে বের হতে পারবে। এ ছাড়াও হকদারের শপথের মাধ্যমে একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মামুলি জিনিসের ব্যাপারে তিনি ফয়সালা করতেন।[৫২৯]

১২. খায়র ইবনু নুআইম আল-হাদরামি : তাওবা ইবনু নামিরের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাকে বিচারকার্য পরিচালনা এবং পাঠদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। খায়র ছিলেন মিশরের অন্যতম প্রাজ্ঞ বিচারক। কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিলে তার ওপর তিনি 'মুতআহ' তথা এক সেট থ্রিপিস প্রদান ধার্য করে দিতেন। শুফআর রায় প্রদান করতেন ভাগীদারের সপক্ষে। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ভরণপোষণ না দিলে তিনি মহিলাকে কাজ করার সুযোগ দিতেন। খ্রিষ্টানের বিপক্ষে খ্রিষ্টানের সাক্ষ্য এবং ইহুদির বিপক্ষে ইহুদির সাক্ষ্য তার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। মুসলিমদের বিচার তিনি মসজিদেই করতেন। তবে খ্রিষ্টানদের বিচারের জন্য আসরের পর মসজিদের দরজায় বসতেন। ১২০ হিজরি থেকে আমৃত্যু তথা ১২৭ হিজরি পর্যন্ত তিনি বিচারকার্য পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলেন।[৫৩০]

১৩. আবদুর রহমান ইবনু সালিম আল-জাইশানি : তাকে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরে পদচ্যুত করা হয়। তিনি অপবাদ দেওয়ার অপরাধে

---

[৫২৮] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২২৯; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৩১; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮৯-১৯০

[৫২৯] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৪৮; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৩১; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৯০

[৫৩০] আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৯০; আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৩১; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩২৮

একজন সৈন্যকে আটক করেছিলেন। প্রশাসক আবু আউন আবদুল মালিক তখন সৈন্যটিকে ছেড়ে দেয়। আবদুর রহমান তখন সৈন্যটিকে আটকের জন্য পীড়াপীড়ি করে বলেন, সৈন্যটিকে ছেড়ে দেওয়া হলে তিনি বিচারকার্য ত্যাগ করবেন। এরপর তাকে বরখাস্ত করা হয়। তাকে ট্যাক্স এবং দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বনু উমাইয়ার খিলাফতের শেষ সময়টাতে এবং আব্বাসি যুগের এক বছর অবধি আবদুর রহমান বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৫৩১]

❁ চ. অন্যান্য শহরের বিচারক

এতক্ষণ আমরা গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি নগরগুলোতে দায়িত্ব পালনকারী প্রসিদ্ধ বিচারকদের কথা আলোচনা করেছি। উমাইয়া যুগে তারা ছাড়াও শহরে এবং শহরতলিগুলোতে আরও অনেকেই বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন। যেমন: ইয়ামানে হানশ ইবনু আবদিল্লাহ আস-সানআনি[৫৩২], আফ্রিকায় মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ বিচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আবদুর রহমান ছিলেন আফ্রিকা বিজয়ের পর মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণকারী সর্বপ্রথম শিশু।[৫৩৩]

এ ছাড়াও শাম, ফিলিস্তিন, আফ্রিকা, মসুল, আন্দালুস (স্পেন), আহভাজ, খোরাসান-সহ পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকাতে উমাইয়া যুগের আরও অনেক বিচারক ছিলেন।[৫৩৪]

উমাইয়া যুগে বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য

এ যাবৎ উমাইয়া যুগের বিচারব্যবস্থা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখন আমরা উমাইয়া যুগের বিচারব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

☑ ১. রাশিদুন যুগের খলিফাদের তুলনায় উমাইয়া যুগের খলিফাদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। উমাইয়া যুগের মেয়াদ ছিল অনেক দীর্ঘ। তাদের শাসিত অঞ্চল ছিল ব্যাপক আর বিস্তৃত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসকের সংখ্যাও অনেক বেশি ছিল। প্রশাসকদের বরখাস্ত করা এবং নিয়োগ দেওয়া ছিল একটি চলমান প্রক্রিয়া। কোনো কোনো প্রশাসককে তো অনেক প্রদেশে একাধিকবারও নিয়োগ দেওয়া হতো। ফলে বিচারব্যবস্থার ওপর এর বড় ধরনের প্রভাব

---

[৫৩১] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৩২; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৩২; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৯০

[৫৩২] রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৫০১

[৫৩৩] রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৫০১

[৫৩৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/৩২২

পড়ত। উমাইয়া শাসনের অধীনে যেসব দেশ এবং অঞ্চল ছিল, সেগুলোও অনেক ব্যাপক আর বিস্তৃত ছিল।

☑ ২. সংগত কারণেই উমাইয়া যুগের বিচারকদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। যা ছিল রাশিদুন যুগের বিচারকদের সংখ্যার তুলনায় বহুগুণ বেশি। বিচারকদের বরখাস্ত করা, পরিবর্তন করা এবং বারংবার নিয়োগ দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল প্রশাসকদের রদবদল এবং তাদের বারংবার নিয়োগ দান।

☑ ৩. উমাইয়া যুগের ইসলামি বিচারব্যবস্থা মৌলিক, প্রশাসনিক, কৌশলগত ব্যবস্থাপনা, উপায়-উপকরণ ও লক্ষ্যের দিক থেকে রাশিদুন যুগ ও নবি-যুগ থেকে অভিন্ন ছিল না। বরং সত্য আর ন্যায় প্রতিষ্ঠায়, স্বচ্ছতা আর বস্তুনিষ্ঠতায় উমাইয়া যুগ ছিল রাশিদুন যুগেরই ধারাবাহিকতা। তবে উমাইয়া খলিফারা রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ এবং অগ্রগতির প্রতিও বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন।

☑ ৪. উমাইয়া যুগের বিচারকরা শারঈ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হুবহু সেসব উপায়-উপকরণই অবলম্বন করতেন, যেগুলো রাশিদুন যুগে ব্যবহার করা হতো। সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সুবিচার পর্যন্ত পৌঁছতে, সত্য এবং সঠিক বিচার উদ্ঘাটনে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে শক্তিশালী কৌশল অবলম্বন করা হতো। এ ক্ষেত্রে বিচারকরা প্রখর দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন।[৫৩৫]

☑ ৫. উমাইয়া যুগে বিচারের বিধিবিধানের নতুন নতুন উৎস সৃষ্টি হয়। নবি-যুগে থাকা মৌলিক উৎস তথা কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি এগুলোও ছিল। যেমন: উরফ তথা প্রচলিত রীতি, সাহাবিদের বক্তব্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে মদীনাবাসীদের ইজমা বা ঐকমত্য। আবার রাশিদুন যুগে চলমান থাকা বিচারের মৌলিক উপাদানগুলো তথা ইজমা, কিয়াস, আগের বিচার এবং মতামতও বাদ ছিল না।

☑ ৬. শামে খলিফারা বিচারকদের নিয়োগ দিতেন। অনেক সময় বিভিন্ন অঞ্চলের কোনো কোনো বিচারককেও বিচারক নিযুক্তির জন্য প্রস্তাব দেওয়া হতো। অবশ্য বিভিন্ন শহরে বিচারক নিয়োগ এবং তাদের বরখাস্ত করা—এসব প্রশাসকরাই করত।

☑ ৭. খলিফা এবং প্রশাসকরা বিচারের দায়িত্ব অর্পণের জন্য ভালো মানুষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কসুর করতেন না। ফকিহ, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত এবং মার্জিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই এমন বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো। যাদের ভেতর একজন ইসলামি বিচারকের গুণাবলি পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যেত। যারা আল্লাহকে ভয় করে সত্য এবং শরীয়ত মেনে চলতেন। মানুষের মাঝে ইনসাফ

[৫৩৫] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৩৭; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ৩, ২৪, ৩১ দ্রষ্টব্য

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যারা কোনো রকম ত্রুটি করতেন না।

☑ ৮. আলিম এবং ফকিহদের মধ্যে অনেকেই বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। অনেকে তো অল্প সময়ের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। তারপর দ্রুতই তারা অব্যাহতি প্রার্থনা করলে তাদের অব্যাহতি দিয়ে দেওয়া হয়।

☑ ৯. উমাইয়া যুগে বিচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অনেক মৌলিক পরিবর্তন এসেছিল। এসব পরিবর্তন উমাইয়া যুগেই প্রথমবারের মতো বিচারব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে,

(ক) বিচারের রায় লিখে রাখা। যাতে ভুলে যাওয়ার শঙ্কা বা অস্বীকারের সম্ভাবনা না থাকে। বিশেষ দফতরের মাধ্যমে সেসব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(খ) সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদ তত্ত্বাবধান করা।

(গ) ইয়াতিমদের মাল হেফাজত এবং ওসিয়তকৃত সম্পত্তির দেখাশোনা করা।

(ঘ) মামলার ধারাবাহিকতা, বাদী-বিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করার জন্য স্লিপ ব্যবহার এবং ধারাবাহিকভাবে বিচারপ্রার্থীদের ডাকা।

(ঙ) বিচারকদের সহযোগিতায় বিভিন্ন রকম ব্যবস্থাপনা। যেমন বিচারের এজলাসে সহযোগী, দারোয়ান এবং পুলিশ মোতায়েন করা।

(চ) মোকদ্দমার কার্যাবলি এবং বিচারের রায় আর সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য পুলিশের সাহায্য গ্রহণ।

☑ ১০. উমাইয়া যুগের বিচারকরা বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও অনেক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যেমন : ফতোয়া প্রদান, সালিশ করা, ইয়াতিমের সম্পদ দেখাশোনা করা এবং ওয়াকফকৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা।

☑ ১১. উমাইয়া যুগের বিচারকগণ অনেক সময় বিচারকার্য পরিচালনার পাশাপাশি প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্বও পালন করেছেন। যেমন: পুলিশ-প্রধানের দায়িত্ব, বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার তত্ত্বাবধান, প্রশাসক এবং খলিফার অনুপস্থিতিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব করা। এ ছাড়াও পাঠদানের দায়িত্বও তারা পালন করতেন।

☑ ১২. শহরতলি এবং ছোট ছোট শহরগুলোতে অধিকাংশ বিচারকগণ মসজিদেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। অধিকাংশ সময় মসজিদেই হদ কায়েম করতেন। অনেক বিচারক নিজের ঘরেই মোকদ্দমা সামাল দিতেন। আবার অনেক সময় আগতদের মসজিদে প্রবেশ করতে অপারগতা কিংবা তাদের প্রয়োজন আর অসুবিধা দেখে কখনো রাস্তায়, আবার কখনো মসজিদের দরজার সামনে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

☑ ১৩. রায় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকরা ছিলেন স্বাধীন। গবেষণা করার অবারিত সুযোগ তাদের থাকত। কুরআন, সুন্নাহ, শারঈ আইনের উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য বিচারের উৎস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। খলিফার মতামত গ্রহণ করতে তারা বাধ্য থাকতেন না। নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের মতামত তারা কেউ মেনে চলতেন না।

কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, প্রাজ্ঞ আলিম এবং বিজ্ঞ ফকিহদের সাথে তারা পরামর্শ করতেন না, বিচার-সংক্রান্ত বৈঠকে তাদের যুক্ত করতেন না। আবার এমনও নয় যে, তারা দামিস্কে খলিফার সাথে পত্র মারফত যোগাযোগ করে তার মতামত এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার পরিচালনা করতেন না।

☑ ১৪. বিচারকরা প্রশাসক এবং খলিফাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হতেন না। নিজেদের কাজে তারা হতেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাজনৈতিক ঝোঁক, নানান বিদ্রোহী আন্দোলন, বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বিরোধিতা এবং আঞ্চলিক ফিতনা আর অরাজকতা তাদের মাঝে কোনো প্রভাব ফেলত না।

☑ ১৫. বিচারকদের গবেষণা করার স্বাধীনতা, শহরগুলোর ব্যাপক সম্প্রসারণ, হাদিস লিপিবদ্ধ না থাকা, আঞ্চলিক রীতির ভিন্নতা এবং ফিকহি মাযহাব না থাকায় বিচারের ক্ষেত্রে নানান মতামত এবং একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দেয়। একই রকম মাসআলায় বিচারের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হতে থাকে। তথাপি আদালত পরিচালনা এবং আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসব কোনো প্রভাব ফেলত না। আব্বাসি যুগে বিভিন্ন ফিকহি মাযহাব চালু এবং ফিকহি ইমামদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে এসবের অনেক বড় প্রভাব ও ভূমিকা ছিল।

০৫

আব্বাসি যুগের বিচারব্যবস্থা

আব্বাসি যুগের বিচারব্যবস্থা ইসলামি রীতিনীতি অনুসারেই ছিল। তবে বাস্তবতা হলো : ব্যাপ্তি, বিকাশ এবং অবস্থা অনুসারে তাতে নানাধরনের পরিবর্তন আসে। বিচারব্যবস্থা মূলত ইসলামি জীবনধারার সমান্তরালে চলে। তবে রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির অধঃপতনের কারণে অনেক সময় তা প্রভাবিত হয়। ফিকহকেন্দ্রিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নানান উপদল এবং বিভিন্ন মতাদর্শের আবির্ভাব ঘটে। এতদসত্ত্বেও আব্বাসি যুগে বিচারব্যবস্থা সাংগঠনিক আর দাপ্তরিক পর্যায়ের পাশাপাশি বস্তুগতভাবেও পূর্ণতা লাভ করেছিল। অবশ্য বিচারক এবং সর্বজনীন অবস্থা অনুসারে তাতে তারতম্য থাকত।

আব্বাসি যুগে বিচারব্যবস্থার ইতিবৃত্ত এবং তাতে আসা সাংগঠনিক আর বস্তুগত ব্যবস্থাপনার রদবদল সম্পর্কে আমরা একটু পরে আলোচনা করব। তার আগে আব্বাসি যুগের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা নিতে হবে। এরপর তৎকালীন প্রসিদ্ধ বিচারকার্য এবং বিচারক সম্পর্কে আমরা জানব। তাহলে সে যুগের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষত্ব সহজেই বোঝা যাবে।

আব্বাসি যুগের ইতিহাস

আব্বাসি খিলাফত হচ্ছে বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে আব্বাসিদের আন্দোলনের ফলাফল। আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ এবং খিলাফতের জন্য বাইয়াত গ্রহণের মাধ্যমে ১৩২ হিজরিতে আব্বাসি যুগের সূচনা হয়। যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ৬৫৬ হিজরিতে তাতারিদের হাতে বাগদাদের পতনের মাধ্যমে। ওই সময় শেষ আব্বাসি খলিফা আল-মুসতাসিম বিল্লাহ তাদের হাতে নিহত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব ؓ-এর দিকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে বলা হয় আব্বাসি।

বংশানুক্রমে আব্বাসি যুগটি ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম দীর্ঘ এই যুগটি ৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান ছিল। ১৩২ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি মোট ৫২৪ বছরব্যাপী এই খিলাফতের সময়সীমা ছিল উমাইয়া যুগ থেকে প্রায় ছয় গুণ এবং রাশিদি যুগ অপেক্ষা ১৮ গুণ বেশি। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে আব্বাসি খিলাফত ছিল সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র। যার অধীনে ছিল বিশালাকারের ভূখণ্ড। দক্ষিণে আরব উপদ্বীপের তাবৎ অঞ্চল থেকে শুরু করে উত্তরে ট্রান্সঅক্সিয়ানা, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, এশিয়া মাইনর, আফগান, বুখারা এবং তাসখন্দ অবধি ছিল এর বিস্তৃত সীমানা। পূর্বে বাঙলা, সিন্ধু, তুর্কিস্তান এবং পশ্চিমে আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

কিন্তু আব্বাসি খিলাফতের সময় মুসলিমদের মধ্যকার ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায়। সমগ্র স্পেন এবং আফ্রিকার একাংশ ইরাকে থাকা খলিফার আনুগত্য থেকে বের হয়ে পৃথক পৃথক সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে।[৫৩৬] যেমন ৮৬৮ থেকে ৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশরে তুলুনি রাজবংশের শাসন চলে। এরপর ৯৩৫ থেকে ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে ছিল ইখশিদি রাজবংশের শাসন। তারপর ৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে জাওহার সিকলি মিশর জয়ের পর সেখানে ফাতিমি সালতানাত চালু হয়।[৫৩৭]

আব্বাসি খিলাফতে ভিন্ন ভিন্ন দুটি সময়ের আবির্ভাব ঘটেছিল।

☑ প্রথমত: সোনালি যুগ। এর সময়সীমা ছিল ১৩২ থেকে ২৪৭ হিজরি। তুর্কিদের হাতে খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ নিহত হলে তার ছেলে আল-মুসতানসির বিল্লাহকে খলিফা বানানো হয়। এ যুগে খলিফার হাতেই সমস্ত কর্তৃত্ব ছিল। রাষ্ট্রের তাবৎ বিষয়ে খলিফার বক্তব্যই শেষ কথা বলে বিবেচিত হতো। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান, শাস্ত্র আর সংস্কৃতির বিকাশে আব্বাসি খিলাফত ছিল অনন্য। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শক্তি এবং প্রভাব দিয়ে তারা অন্য সব যুগকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

☑ দ্বিতীয়ত: দুর্বল যুগ। ২৪৭ থেকে ৬৫৬ হিজরি। এ সময়টায় রাজ্য জুড়ে ছিল বিশৃঙ্খলা। ঐক্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। খিলাফত পরিচালনা হতো উজির, সেনাপতি কিংবা প্রাদেশিক শাসকদের মাধ্যমে। ফলে মাঝে মাঝে উন্নতির দেখা মিললেও নানাধরনের অধঃপতন ঘটত। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ-সহ বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি খলিফাকে সামাল দিতে হতো। ক্ষমতা ও রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে ক্রমশ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। একক কর্তৃত্ব বলতে কিছু তখন ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চল স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া শুরু করে। কিংবা বাগদাদের খলিফাকে মেনে নিজস্ব বিধান পরিচালনা করা যথেষ্ট ভাবতে

---

[৫৩৬] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ২৫৮

[৫৩৭] আল-কাদ্বা ফী সদরিল ইসলাম, পৃ. ১৯৩, ১৯৪ এবং ২১২

থাকে।

এই রীতিটি পূর্বের যুগের একক বিচারব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে। তারপর শাসকরা স্বনির্ভর হয়ে যায়। কিংবা বিভিন্ন শহরের প্রশাসকরা বিচারের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে। ফলে অধিকাংশ প্রশাসকই প্রধান বিচারপতি হয়ে যান।

খিলাফতের রাজধানীও এক স্থানে ছিল না। আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ তো কুফা এবং আনবার-এর মাঝামাঝি যে অংশে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, সেটাকেই খিলাফতের কেন্দ্রভূমি বানিয়েছিলেন। এরপর তিনি হিরা এবং হাশিমিয়্যাহ অঞ্চলের দিকে চলে যান। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো স্থানকে রাজধানী বানাননি। মানসুর ১৪৯ হিজরিতে শান্তির নগরী বাগদাদের গোড়াপত্তন করে সেটাকেই খিলাফতের রাজধানী ঘোষণা দেন। তখন বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ইলম এবং আহলুল ইলমদের সভ্যতা সেখানে গড়ে ওঠে। ফলে বাগদাদ প্রধান নগরীতে পরিণত হয়। প্রধান বিচারপতি সেখানে অবস্থান করে খিলাফতের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা বিচারের কার্যক্রম পরিচালনা, বিচারক নিয়োগ প্রদান এবং তাবৎ অঞ্চলের খোঁজখবর রাখতেন। এরপর খিলাফতের রাজনৈতিক কার্যক্রমের জন্য ২২১ হিজরিতে সামারা অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হলেও ইলম, সভ্যতা এবং নাগরিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদই থেকে যায়। এরপর খলিফা মুতাদিদ বিল্লাহ ২৭৯ হিজরিতে খিলাফতের রাজধানী পুনরায় বাগদাদে ফিরিয়ে আনেন।

আব্বাসি খিলাফতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এর মহান তাৎপর্য, প্রশংসনীয় কীর্তি আর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির বিবরণ, পরবর্তীকালে ঘটে যাওয়া দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং অধঃপতনের বর্ণনা লেখনীর মাধ্যমে প্রদান করা সম্ভব নয়। পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শাসন, বিচারব্যবস্থা, বিজয়ের ক্রমধারা এবং জ্ঞানচর্চায় আব্বাসি যুগ এক অনন্য চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে অন্য কোনো শাসনব্যবস্থার পক্ষে সে পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য শাসনব্যবস্থার মতো এটাও ধীরে ধীরে দুর্বল আর অক্ষম হয়ে পড়তে থাকে। নানারকম বিপদাপদ-দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। পূর্ব দিক থেকে তাতারি শত্রু বাহিনী, উত্তরে রোমক এবং পশ্চিম দিক থেকে ক্রুসেডারদের হামলার কারণে খিলাফত আর রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। ফলশ্রুতিতে বহুবার বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্র পরিচালনা-সহ তাবৎ দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি কিংবা স্বতন্ত্র প্রাদেশিক শাসকদের হাতে চলে যাওয়ায় খলিফারা কেবলই নামসর্বস্ব হয়ে পড়েছিলেন।[৫৩৮] এভাবেই দীর্ঘসময় যাবৎ ধুঁকতে

---

[৫৩৮] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৬৩; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ ফী ইযযিল আরব, পৃ. ১২০; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ৩/৩; তারীখুত তবারি : ৬/৮৭; তারীখুল খুলাফা, পৃ. ২৫৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১০/৫২ এবং রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৫০১ দেখতে পারেন।

ধুঁকতে একপর্যায়ে তাতারিদের হাতে আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটে।

আব্বাসি যুগের বিচারব্যবস্থার দায়িত্বশীলদের পরিচয় জানতে আব্বাসি খলিফাদের নাম-ধাম উল্লেখ করব। তাহলে তৎকালীন বিচারব্যবস্থায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো জানতে সুবিধা হবে।

❁ আব্বাসি খলিফাগণ

☑ ১. আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-এর নাতি মুহাম্মাদ ইবনু আলির ছেলে। তার প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ। ১৩২ হিজরিতে তিনি খিলাফতের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন। ১৩৬ হিজরিতে আনবার-এ তার মৃত্যু হয়।[৫৩৯]

☑ ২. আবু জাফর মানসুর। তার প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি ছিলেন আস-সাফফাহ-এর ভাই। ১৩৭ হিজরি থেকে ১৫৮ হিজরি পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। তিনিই হলেন আব্বাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা। দাপট, সাহসিকতা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, শক্তিমত্তা এবং প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এ বংশের অনন্য ব্যক্তিত্ব।[৫৪০]

☑ ৩. আল-মাহদি মুহাম্মাদ ইবনুল মানসুর। তার খিলাফতকাল ছিল ১৫৮ থেকে ১৬৯ হিজরি পর্যন্ত। হত্যা বা বিশৃঙ্খলার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য সবাইকে তিনি জেলখানা থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। দুর্নীতি দমনে তিনি ছিলেন অগ্রগামী।[৫৪১]

☑ ৪. আল-হাদি মূসা ইবনুল মাহদি মুহাম্মাদ। ১৬৯ থেকে ১৭০ হিজরি পর্যন্ত তিনি খলিফা ছিলেন।

☑ ৫. আর-রাশিদ হারুন। তার খিলাফতকাল ছিল ১৭০ থেকে ১৯৩ হিজরি অবধি। তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় খলিফা এবং অধিকতর সম্মানিত বাদশাহগণের অন্যতম।

☑ ৬. আল-আমিন মুহাম্মাদ ইবনুর রাশিদ। ১৯৩ থেকে ১৯৮ হিজরি তিনি খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন।

☑ ৭. আল-মামুন আবদুল্লাহ ইবনুর রাশিদ। তার খিলাফতকাল ছিল ১৯৮ থেকে ২১৮ হিজরি। আব্বাসি বংশীয়দের মাঝে তার অধ্যবসায় এবং প্রত্যয় ছিল সবার সেরা। জ্ঞান, বিচার, বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে তার কোনো জুড়ি

---

[৫৩৯] রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৫০১

[৫৪০] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/১৯৭; তারীখুল খুলাফা, পৃ. ২৫৯

[৫৪১] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ২৭২; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ৩/৮৬

ছিল না। যেমন ছিল তার বাহাদুরি, তেমনি ছিল নেতৃত্বের গুণ। মহানুভবতা এবং প্রজ্ঞায় তিনি ছিলেন অনন্য। অবশ্য মুতাজিলি মতাদর্শ তার মাধ্যমেই স্থিতি লাভ করছিল।[৫৪২]

☑ ৮. আল-মুতাসিম বিল্লাহ। তার প্রকৃত নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবনু হারুনুর রাশিদ। ২১৮ থেকে ২২৭ হিজরি পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাদের আরামের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলেন।[৫৪৩]

☑ ৯. আল-ওয়াসিক বিল্লাহ হারুন ইবনুল মুতাসিম। ২২৭ থেকে ২৩২ হিজরি।

☑ ১০. আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ জাফর ইবনুল মুতাসিম। ২৩২ থেকে ২৪৭ হিজরি অবধি তিনি খলিফা ছিলেন। খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর তিনি মুতাজিলাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে সুন্নাহর প্রতি অনুরাগী হয়ে যান। তার উদ্যোগেই মুহাদ্দিসদের সম্মানিত করা শুরু হয়।[৫৪৪]

☑ ১১. আল-মুনতাসির বিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল। ২৪৭ থেকে ২৪৮ হিজরি। তার খিলাফতকাল ছিল ৫ মাস কয়েকদিন। প্রজাদের মাঝে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার বিস্তার ঘটানোয় তার প্রতাপ সকলের কাছে পছন্দনীয় হয়। তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এবং কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী।[৫৪৫]

☑ ১২. আল-মুসতাইন বিল্লাহ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল মুতাসিম। ২৪৮ থেকে ২৫১ হিজরি। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন।

☑ ১৩. আল-মুতাজ বিল্লাহ মুহাম্মাদ। কেউ কেউ তার নাম যুবাইর আবু আবদিল্লাহ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল বলেছেন। ২৫১ থেকে ২৫৫ হিজরি। তিনিও খিলাফতের দায়িত্ব থেকে সরে যান।

☑ ১৪. আল-মুহতাদি বিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াসিক ইবনিল মুতাসিম। ২৫৫ থেকে ২৫৬ হিজরি পর্যন্ত। পরহেজগারিতা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি অন্য খলিফাদের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। গান-বাজনা নিষিদ্ধ করেছিলেন। ক্ষমতাসীনদের জুলুম কঠোরভাবে দমন করতেন।

☑ ১৫. আল-মুতামিদ আলাল্লাহ আহমাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল। ২৫৬ থেকে ২৭৯ হিজরি।

---

[৫৪২] তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ৩/১৭৪; তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৬

[৫৪৩] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৬৫; তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৩৩৬; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ৩/২২৯

[৫৪৪] তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ৩/২৫৪; তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৩৪৬

[৫৪৫] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৩৫৬ ও ৩৫৭; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ৩/২৭০

☑ ১৬. আল-মুতাদ্বিদ বিল্লাহ আহমাদ ইবনু তালহা। ২৭৯ - ২৮৯ হিজরি।

☑ ১৭. আল-মুকতাফি বিল্লাহ আলি ইবনু আহমাদ। ২৮৯ - ২৯৫ হিজরি।

☑ ১৮. আল-মুকতাদির বিল্লাহ জাফর ইবনু আহমাদ। ২৯৫ হিজরি থেকে ৩২০ হিজরি অবধি তিনি খলিফা ছিলেন। খলিফা নিযুক্ত হওয়ার সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর। কম বয়স্ক হওয়ায় উজির আবুল হাসান আলি ইবনুল ফুরাতকে তিনি দায়িত্ব প্রদান করেন। আবুল হাসান সুন্দরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি নিজে মজলুমের পাশে থাকার পাশাপাশি খলিফাকেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করতেন।[৫৪৬]

☑ ১৯. আল-কাহির বিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-মুতাদ্বিদ। ৩২০ - ৩২২ হিজরি।

☑ ২০. আর-রাদি বিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু জাফর আল-মুকতাদির। ৩২২ - ৩২৯ হিজরি।

☑ ২১. আল-মুত্তাকি বিল্লাহ ইবরাহীম ইবনু জাফর আল মুকতাদির। ৩২৯ - ৩৩৩ হিজরি।

☑ ২২. আল-মুসতাকফি বিল্লাহ ইবনুল মুতাদ্বিদ। ৩৩৩ - ৩৩৪ হিজরি। তার খিলাফতকালে বুওয়াইয়ারা বাগদাদ দখল করে নিয়েছিল।

☑ ২৩. আল-মুতি লিল্লাহ ফজল ইবনু জাফর আল-মুকতাদির। ৩৩৪ - ৩৬৩ হিজরি। ২৯ বছর খলিফা থাকার পর তিনি অব্যাহতি নেন।

☑ ২৪. আত-তাই বিল্লাহ আবদুল কারীম ইবনুল ফজল। ৩৬৩ - ৩৮১ হিজরি।

☑ ২৫. আল-কাদির বিল্লাহ আহমাদ ইবনু আবি বকর। ৩৮১ - ৪২১ হিজরি। ৪১ বছর কয়েক মাস খলিফা থাকার পর ৮৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন। সে-সময় রাষ্ট্রের পরিস্থিতিরও কিছুটা উন্নতি হয়েছিল।

☑ ২৬. আল-কায়িম বি আমরিল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ। ৪২২ - ৪৬৭ হিজরি। পিতা থেকেও অধিক সময়কাল সর্বমোট ৪৫ বছর তিনি খলিফা ছিলেন।

☑ ২৭. আল-মুকতাদি বি আমরিল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ। ৪৬৭ - ৪৮৭ হিজরি।

☑ ২৮. আল-মুসতাযহির বিল্লাহ আহমাদ ইবনুল মুকতাদি। ৪৮৭ - ৫১২ হিজরি। তিনি অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ন্যায়বিচারক ছিলেন।

---

[৫৪৬] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৩৭৯; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৮০

☑ ২৯. আল-মুসতারশিদ বিল্লাহ ফজল ইবনুল মুসতাযহির। ৫১২ - ৫২৯ হিজরি। খিলাফতকে পুনরুজ্জীবিত করে সুসংহত আর সুদৃঢ় করেছিলেন। শেষে তিনি গুপ্ত-হত্যার শিকার হন।[৫৪৭]

☑ ৩০. আর-রাশিদ বিল্লাহ মানসুর ইবনুল মুসতারশিদ। ৫২৯ - ৫৩২ হিজরি।

☑ ৩১. আল-মুকতাফি লি আমরিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মুসতাযহির। ৫৩২ - ৫৫৫ হিজরি। খিলাফত এবং নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য তিনি নবায়ন করেছিলেন। তার সময়কালে রাজ্যে ইনসাফ আর সুবিচারের পরিবেশ ছিল। হৃত বাগদাদ পুনরায় খলিফাদের হাতে আসে।[৫৪৮]

☑ ৩২. আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ ইউসুফ ইবনুল মুকতাফি। ৫৫৫ - ৫৬৬ হিজরি। সুবিচার, নম্রতা, যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বুদ্ধিমত্তায় তার খ্যাতি ছিল। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহর বিধানের বিরোধীদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন কঠোর। দামিস্কে আইয়ুবিদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল।[৫৪৯]

☑ ৩৩. আল-মুসতাদ্বি বি আমরিল্লাহ হাসান ইবনুল মুসতানজিদ। ৫৬৬ - ৫৭৫ হিজরি।

☑ ৩৪. আন-নাসির লি দ্বীনিল্লাহ আহমাদ ইবনুল মুসতাদ্বি। ৫৭৫ - ৬২২ হিজরি। তার সময়কালই ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ। এ সময়ই তাতারিদের উপদ্রব শুরু হয়। সাধারণ মানুষ খলিফাকে সমীহ যেমন করত, তেমনি জোর-জুলুমের ভয়ে সবসময় তটস্থ থাকত।[৫৫০]

☑ ৩৫. আয-যাহির বি আমরিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুন নাসির। ৬২২ - ৬২৩ হিজরি। তার খিলাফতকাল ছিল মাত্র নয় মাস কয়েক দিন। তিনি ছিলেন খুব জনদরদি শাসক। জুলুম এবং ট্যাক্স প্রথা বাতিল করে মানুষের মাঝে সম্পদ বিতরণ করেন। ইনসাফ আর ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে তিনি যেন উমরের যুগ ফিরিয়ে এনেছিলেন।[৫৫১]

☑ ৩৬. আল-মুসতানসির বিল্লাহ মানসুর ইবনুয যাহির। ৬২৩ - ৬৪০ হিজরি। তিনি সর্বত্র ইনসাফের প্রসার ঘটিয়েছিলেন।[৫৫২]

☑ ৩৭. আল-মুসতাসিম বিল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনুল মুসতানসির। ৬৪০ - ৬৫৬ হিজরি। তাতারিদের হাতে তিনি নিহত হন। তিনিই ছিলেন শেষ আব্বাসি

---

[৫৪৭] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৪৩১

[৫৪৮] তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ৩/৪৫০; তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৪৪১

[৫৪৯] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৪৪৩; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ৩/৪৬৪

[৫৫০] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৪৪৮; আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৬৪

[৫৫১] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৪৫৮; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ৩/৪৭৭

[৫৫২] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৬৫; তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৪৬০

খলিফা। বাবা এবং দাদার মতো ধর্মপ্রাণ এবং সুন্নাহর প্রতি অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাদের মতো দৃঢ় প্রত্যয়ী, সচেতন এবং হুঁশিয়ার ছিলেন না।[৫৫৩]

সোয়া পাঁচশত বছরের সময়কালে অনেক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ মাত্র কয়েক মাস খলিফা ছিলেন। আবার কারও খিলাফতকাল ছিল ৪০ বছরের বেশি। পরিকল্পিতভাবে খিলাফত পরিচালনা, তাকওয়া, পরহেজগারিতা এবং দুনিয়াবিমুখতায় তাদের অনেকেই ছিলেন অনন্য। জাতিগত এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক অধিকারের প্রতি তাদের লক্ষ থাকত। তারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ায় মানুষও তাদের সমীহ করত। খিলাফত পরিচালনা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তাদের দৃষ্টি ছিল সূক্ষ্ম। পক্ষান্তরে নিজেদের বেখেয়ালির কারণে কেউ কেউ পতিত হয়েছিলেন ধ্বংসের অতল গহ্বরে। ফলে তারা পরিণত হন উজির ও সেনাপতিদের খেলার পুতুলে। অনেকেই প্রাণ দিয়েছিলেন, অনেকেই হয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত। আবার কেউ কেউ নিজেই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

খলিফাদের এই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক চিত্রের প্রভাব বিচারব্যবস্থার ওপরও পড়েছিল। খলিফা মানসুর, রাশিদ এবং মামুনের সময় যে বিচারব্যবস্থা উন্নতির চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল, আব্বাসি যুগের শেষ দিকে এসে তা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে বাগদাদে এমনটা হয়েছিল। ফলে কেউ কেউ এটাকে অর্থ কামাইয়ের মাধ্যম বানিয়ে নেয়। ব্যবসায়ী, মূর্খ এবং সম্পদশালীরা এ ব্যবস্থাপনার কর্ণধার হয়ে ওঠে।[৫৫৪]

খলিফা মানসুরের যুগে আলিমরা হাদিস, ফিকহ, তাফসির, আরবি ভাষা এবং ইতিহাসের মতো নানা বিষয় সংকলনে মনোনিবেশ করেন।[৫৫৫] ফিকহ-সংক্রান্ত এবং ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক বিভিন্ন মাযহাব প্রকাশ পায়। বিচারক নিয়োগ, অপসারণ, বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা, তারা কোন মতাদর্শ অনুসরণ করতেন এবং মতাদর্শ অনুসারে বিচারকের সংখ্যাগত তফাত কেমন ছিল—এসব নিয়ে তারা কথা বলেননি। বিষয়টা আমরা সামনে দেখব।

❁ পূর্বের যুগের সাথে আব্বাসি যুগের সম্পর্ক

রাজনৈতিক দিক থেকে আব্বাসি যুগ ছিল উমাইয়া যুগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলাফল। ফলত উমাইয়াদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে তারা ছিল বদ্ধপরিকর। উমাইয়াদের নাম-নিশানা তারা মিটিয়ে ফেলেছিল। এমনকি রাজধানীকেও তারা দামিস্ক এবং শাম থেকে স্থানান্তরিত করে বাগদাদ এবং ইরাকে নিয়ে যায়। রাজনৈতিক জীবন

---

[৫৫৩] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৪৬৪

[৫৫৪] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৬২

[৫৫৫] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ২৬১; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৩৯; তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ৩/৭৭

থেকে আরবির প্রভাব সরে গিয়ে সেখানে ফারসি এবং পরবর্তীতে জায়গা করে নেয় তুর্কি। সেইসাথে আঞ্চলিক আর জাতিগত প্রভাব তো ছিলই।

পক্ষান্তরে জ্ঞানগত এবং বিচার-সংক্রান্ত দিকটি এমন ছিল না। তাতে ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। বিদ্রোহ আর আন্দোলনের প্রভাব এই সেক্টরে তেমন একটা পড়েনি। জ্ঞানগত এবং বিচারগত অবস্থার দিক থেকে আব্বাসি যুগ ছিল উমাইয়া যুগের সম্প্রসারণ। তবে ইসলামি বিচারব্যবস্থার ভিত্তি এবং পদ্ধতি ছিল সেটাই, যা রাশিদুন যুগ থেকে চলে আসছিল।

আব্বাসিরা ক্ষমতা গ্রহণের পরও উমাইয়া যুগের অধিকাংশ বিচারক বহাল রেখেছিলেন। ইমাম তথা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, আলিম এবং ফকিহদের অনেকেই উভয় যুগ পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ আবু হানিফা এবং আওযায়ি ﷺ-এর কথা বলা যায়। উভয় খিলাফতকালেই তাঁরা দুজন ছিলেন সমসাময়িক। আবার মদীনার বিচারক ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আনসারি ﷺ উমাইয়া এবং আব্বাসি—উভয় যুগেই বিচারকার্য পরিচালনা করেন। আবু জাফর মানসুর তাঁকে ইরাকের হাশিমিয়্যাহতে বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন।[৫৫৬]

আব্বাসি খলিফাগণ অধিকাংশ দেশে নিয়োজিত বিচারকদের কোনো রকম অপসারণ করেননি। যেমন উমাইয়া যুগে মদীনার বিচারক হিসেবে থাকা মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান ﷺ-কে খলিফা আবু জাফর মানসুর সেখানেই বহাল রেখেছিলেন।[৫৫৭]

উমাইয়া খিলাফতের বিচার-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা থেকে আব্বাসি খিলাফত অনেক উপকৃত হয়েছে। অবশ্য বিস্তৃতি এবং উন্নতির সাথে সাথে অনেক কিছু তারা নিজেরাও যুক্ত করেছিলেন। উমর ইবনু আবদিল আজিজ ﷺ সূত্রে ইমাম মালিক ﷺ বলেছেন, 'মানুষের মাঝে অন্যায় যত বাড়ে, বিচারব্যবস্থার সীমারেখাও তত বড় হতে থাকে।'[৫৫৮] এই বক্তব্য থেকে বিচারব্যবস্থার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ স্পষ্ট হয়। আসলে বিচারব্যবস্থার আবর্তন জীবনকে ঘিরেই হয়ে থাকে। ফলে সাধারণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং বিশেষভাবে আইনের বিকাশ ঘটতে থাকে।

উমাইয়া খিলাফতকালের শেষ দিককার দুর্বলতা আর ত্রুটি আব্বাসিরা ধরতে পেরেছিলেন। তাই পরিচালনা সুসংহত করার লক্ষ্যে বিচারব্যবস্থাপনার প্রতি তারা বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। বিভিন্ন স্থানে বিচারক নিযুক্ত করার ক্ষমতাটি আবু জাফর মানসুর খলিফার দায়িত্বে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। আব্বাসি খলিফাগণ অভিযোগের তদন্তের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। দুর্নীতি দমন বিষয়ক তাদের বিশেষ ব্যবস্থাপনার কথা আমরা সামনে আলোচনা করব। এ যুগেই মজলুমদের জন্য

---

[৫৫৬] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৮৭, ১৮৯ এবং ৩/২৪১

[৫৫৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৮২ এবং ১৮৩

[৫৫৮] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৩৯

'দারুল আদল' নামে একটি পৃথক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। খলিফাদের অনেকেই অভিযোগের তদন্ত সংক্রান্ত বিচারকার্য নিজেরা পরিচালনা করতেন।

বিচারব্যবস্থা ছিল খলিফা এবং প্রশাসকদের প্রভাবমুক্ত। খলিফা এবং প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষমতা কেবল বিচারক নিযুক্তি এবং অপসারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত। বিচারব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার তাদের ছিল না। তারপরও কোনো কোনো খলিফা বিচারব্যবস্থাকে নিজের মনমতো পরিচালনা করতে চাইলে আলিমগণ দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। আব্বাসি যুগে বিচার সংশ্লিষ্ট অনেক নতুন নতুন বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল। চালু হয়েছিল অনেক রকম ধারা-উপধারা। এসব নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব।

আব্বাসি যুগে বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা আব্বাসি যুগে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। যা-তে প্রকাশ পেয়েছিল অনেক ব্যবস্থাপনা এবং গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ। যা ছিল আব্বাসি যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং জ্ঞানগত ক্রমবিকাশের সাথে সম্পৃক্ত। যা ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং আব্বাসিদের ঐতিহাসিক দীর্ঘ শাসনামলকে অন্তর্ভুক্ত করে। সে-সময় বিচারব্যবস্থার প্রতি পরিপূর্ণরূপে লক্ষ রাখা হতো। আব্বাসি শাসনামলের প্রথম অংশ তথা স্বর্ণযুগে এই বিচারব্যবস্থা শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছেছিল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে তথা আব্বাসি শাসনামলের অবসান পর্যন্ত বিভিন্ন খলিফা, প্রশাসক, সুলতান, সেনাপতি এবং বিচারকদের কারণে তাতে নানারকম উত্থান-পতন চলতে থাকে।

প্রথম দিকের আব্বাসি খলিফাগণ তাদের শাসনামলের শুরু থেকেই বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দেন। উমাইয়া যুগের শেষ দিকে দেখতে পাওয়া দুর্বলতা এবং শিথিলতা তারা সংশোধন করে নিয়েছিলেন।

শাইখ নুবাহি লিখেছেন, 'ইয়াজিদ ইবনু আবদিল মালিক এবং তার পুত্র আল-ওয়ালিদের সময় থেকে বিচারব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে ক্ষমতার পালা-বদল হয়। মসনদে বসে আব্বাসিরা। বিচারব্যবস্থার ব্যাপারে তারা অত্যন্ত কড়াকড়ি আরোপ করে। শারঈ কাজ পরিচালনার জন্য তারা শীর্ষস্থানীয় আলিমদের নিয়োগ দেওয়া শুরু করে।'

বিচারব্যবস্থা এবং বিচারকদের প্রতি খলিফা আবু জাফর মানসুরের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। পরবর্তীকালে খলিফা আল-হাদি, আর-রাশিদ এবং আল-মামুন তার অনুসরণ করেন। তাদের কারণে বিচারব্যবস্থাপনা মজবুত হয়। এরপর সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে সেই কাজ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়, যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল নববি যুগে এবং রাশিদুন ও উমাইয়া যুগে যার নির্মাণ কাজ

চলছিল। এখান আমরা আব্বাসি যুগের উভয় অংশে ঘটে যাওয়া সেই নতুন নতুন অবস্থা এবং বিবর্তনের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথম টার্মের আব্বাসি যুগের বিচারক

বিচারব্যবস্থা খিলাফতের অংশবিশেষ। বিচারক নিযুক্ত করার ক্ষমতা স্বয়ং খলিফা কিংবা খলিফার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক এবং বিচারকের হয়ে থাকে। উমাইয়া যুগে রাজধানী দামিস্কের বিচারক স্বয়ং খলিফাই নিযুক্ত করতেন। আর অন্যান্য অঞ্চলের বিচারক নিযুক্তির দায়িত্ব ছেড়ে দিতেন প্রশাসক, প্রধান বিচারক-সহ নেতৃস্থানীয় লোকদের হাতে। আবু জাফর মানসুর খলিফা হওয়ার পর বিভিন্ন অঞ্চলের বিচারক নিযুক্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। আব্বাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা খলিফা মানসুর মনে করতেন, বিচারক হচ্ছে খিলাফত পরিচালনার জন্য অপরিহার্য চারটি অনুষঙ্গের অন্যতম। অপর অনুষঙ্গ তিনটি ছিল ট্যাক্স কালেক্টর, পুলিশ-প্রধান এবং ডাক বিভাগের ব্যবস্থাপক। ডাক বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত বিচারকদের খবরাখবর রাজধানীতে খলিফার কাছে পৌঁছে যেত। কিন্তু সমস্ত অঞ্চলে বিচারক নিযুক্ত করা খলিফার পক্ষে সম্ভবপর হতো না। এই কাজের ধারাবাহিকতায় ঘাটতি আসাই ছিল স্বাভাবিক। তাই খলিফা প্রশাসকদের কাছে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন। দেখা যায়, মানসুরের সময়ই অনেক প্রশাসক নিজ নিজ এলাকায় বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। ওয়াকি বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান ছিলেন খলিফা মানসুরের যুগে যিয়াদ ইবনু উবাইদিল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত মদীনার বিচারক। সে-সময় আঞ্চলিক শাসনকর্তারাই বিচারক নিয়োগ দিতেন।[৫৫৯]

এরপর খলিফা আর-রাশিদ ইরাক-সহ বিভিন্ন শহরে বিচারক নির্বাচনের জন্য আবু ইউসুফ ﷬-কে কাযিউল কুযাত তথা প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। তিনি নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম খলিফার সামনে পেশ করতেন। আর খলিফা সেসব লোককে নিয়োগের ঘোষণা দিতেন। প্রধান বিচারপতির কাজ ছিল খলিফার সামনে পেশ করার জন্য জ্ঞানী এবং যোগ্য লোক বাছাই করা। এরপর খলিফা সেসব বাছাইকৃত লোকদের ইরাক, খোরাসান, শাম এবং মিশরে নিয়োগ দিতেন।[৫৬০]

এরপর খলিফারা বিচারক নিয়োগ, তাদের দেখাশোনা, পর্যবেক্ষণ এবং অপসারণের দায়িত্ব প্রধান বিচারপতির কাছে ন্যস্ত করেন। খলিফা বা প্রশাসক এ সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালন করতেন না। এভাবেই বিচারব্যবস্থা খলিফা, শাসক, প্রশাসক এবং কর্মকর্তার নির্বাহী ক্ষমতা থেকে পৃথক হয়ে যায়।

প্রথম আব্বাসি যুগে খলিফা, প্রধান বিচারপতি এবং প্রশাসকরা উপযুক্ত,

---

[৫৫৯] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৮৪
[৫৬০] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৭

আস্থাভাজন, বিদ্বান এবং দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন এমন বিচারক মনোনীত করতেন। তারা লক্ষ রাখতেন, নির্বাচিত ব্যক্তির চরিত্র উত্তম হওয়ার পাশাপাশি সমাজে তার অবস্থানটাও যেন উন্নত হয়। লোকদের মাঝে তারা যেন ন্যায়ানুগভাবে ফয়সালা করে। ফিকহ, ফতোয়া এবং শারঈ বিধানাবলি যেন তাদের ভালোভাবে আয়ত্তে থাকে।[৫৬১]

কুফার শাসক ছিলেন ইউসুফ ইবনু ইমরান। সেখানে বিচারক নিযুক্ত করার আগে আবদুল্লাহ ইবনুল আজলাহর কাছে জানতে চাইলেন, বিচারকার্য পরিচালনার উপযুক্ত, বুদ্ধিমান এবং কর্মচঞ্চল ব্যক্তি কেউ আছে কি? ইবনুল আজলাহ তখন মুহাম্মাদ ইবনু আবি লাইলার কথা প্রস্তাব করলেন। ইবনু আবি লাইলা প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করলেও পরে রাজি হয়ে যান।[৫৬২]

শারিক ইবনু আবদিল্লাহ নাখায়িকে কুফার বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সময় খলিফা আবু জাফর মানসুর বলেছিলেন, 'তোমার দৃঢ়তার কথা আমি শুনেছি। সেটা যেন বৃদ্ধি পায় সেদিকে খেয়াল রেখো।'[৫৬৩]

ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ ﷺ ছিলেন তৎকালীন মদীনা মুনাওয়ারার সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাই খলিফা মানসুর তাকে সেখানকার বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন।[৫৬৪]

খলিফা মামুন তার প্রধান বিচারপতি আবু মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ইবনু আকসামের কাছে লিখেছিলেন : বাগদাদের যেসব বিদ্বান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে, তাদের যেন তিনি যাচাই করে নেন।

কোথাও বিচারক নিয়োগ দেওয়ার আগে লোকদের বা সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া ছিল খলিফা বা প্রাদেশিক শাসকদের রীতি।[৫৬৫]

দ্বিতীয় টার্মের আব্বাসি যুগের বিচারক

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের পর বাগদাদ থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রাদেশিক শাসকদের কর্তৃত্ব শক্তিশালী হয়। আব্বাসি খিলাফতের অধীনে থেকেই তারা স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে। বাগদাদেও অনেক সময় খলিফার কর্তৃত্ব কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। খলিফার নাম ব্যবহার এবং তার জন্য দুআর প্রচলন থাকলেও প্রাদেশিক শাসক এবং বিচারকই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। যেমন : ইদরিসীয় রাজবংশ, উত্তর আফ্রিকায় আগলাবি সালতানাত, সিরিয়ার উত্তরাংশে হামদানি রাজবংশ, মিশর ও সিরিয়াতে ফাতিমিরা, বাগদাদ ও

[৫৬১] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৬৮; আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ৩/২৩৯
[৫৬২] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৩০
[৫৬৩] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৫১
[৫৬৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৪৩
[৫৬৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/১৩১ এবং ১৪৫

পারস্যে বুওয়াইয়া রাজবংশ, পূর্ব দিকে খোয়ারিজমীয় সাম্রাজ্য এবং ইয়ামানে ছিল যিয়াদিরা। স্বায়ত্তশাসিত এসব প্রদেশ নিজেরাই নিজেদের বিচারক নিয়োগ দিত। কখনো-বা বিচারক নিয়োগে তারা বাগদাদে থাকা প্রধান বিচারপতিকে সহায়তা করত।[৫৬৬]

সংক্ষেপে বলা চলে, আব্বাসি যুগে অনেকের পক্ষ থেকে বিচারক নিয়োগের প্রচলন ছিল। যেমন খলিফা নিজেই বিচারক নিয়োগ দিতেন। আবার খলিফার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত উজিররা বিচারকদের নিয়োগ দিতেন। আমিরুল উমারা তথা উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং প্রধান বিচারপতি ও বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তাদের মাধ্যমেও বিচারক নিয়োগ হতো।

❁ বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা

আব্বাসি যুগে বিচার বিভাগ প্রশাসন থেকে পৃথক হয়ে যায়। এটার ধারাবাহিকতা মূলত নবি-যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। আসলে সে-সময় প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং বিচার বিভাগ সাধারণত একজনের অধীনেই পরিচালিত হতো। আবু বকর ﷺ-এর পূর্ণ খিলাফতকাল এবং উমর ﷺ-এর খিলাফতকালের একাংশ অবধি পরিস্থিতি এমনই ছিল। অবশেষে উমর ﷺ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্যই মুআবিয়া ﷺ-কে তিনি বলে পাঠিয়েছিলেন, 'উবাদার ব্যাপারে আপনার কোনো কর্তৃত্ব নেই।'[৫৬৭]

কিন্তু খলিফা এবং প্রাদেশিক শাসক কর্তৃক বিচারক নিয়োগ দান এবং অপসারণের রীতি চলমান ছিল। আবার কোনো কোনো প্রশাসক নিজেরাই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এভাবেই চলে আসে মুআবিয়া ﷺ-এর সময়কাল। তখন তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারক নিযুক্ত করার দায়িত্ব প্রাদেশিক শাসকদের ওপর ন্যস্ত করেন। ক্ষমতাকে তিনি এক স্থানে কেন্দ্রীভূত করেননি। কেননা প্রাদেশিক শাসকই তার প্রদেশের লোকদের যোগ্যতা সম্পর্কে ভালো জানবেন। অধিকতর যোগ্য, বিদ্বান, জ্ঞানী এবং পরহেজগার ব্যক্তিকে নিয়োগ দান তাদের পক্ষেই সম্ভব। আর প্রদেশে সুবিচার এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা হলো বিচারকের দায়িত্ব। পরবর্তী সময়ে তার উত্তম সহযোগী এবং শ্রেষ্ঠ সহায়ক তৈরি হবে। আর প্রাদেশিক শাসকের কর্তব্য হলো বিচারকের বিধান বাস্তবায়ন করা। এজন্যই উভয়ের মাঝে জোরদার সম্পর্ক আর পূর্ণ সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই পারস্পরিক সহযোগিতা পূর্ণতা পাবে। এটা ছিল মুআবিয়া ﷺ-এর দৃষ্টিভঙ্গি।

নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ এবং গুরুত্ব আর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের অভিপ্রায়ে

---

[৫৬৬] আল-খিলাফাতুল আব্বাসিয়্যাহ, পৃ. ৮৫, ১০২, ১১৭, ১৬৮ এবং ৩০৯

[৫৬৭] এ ঘটনাটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

খলিফা মানসুর বিভিন্ন স্থানে বিচারক নিযুক্তির দায়িত্ব নিজের কাছে ফিরিয়ে আনেন। আরেকটি কারণ ছিল, বিচারক নিযুক্তি এবং অপসারণের দায়িত্ব পেয়ে কিছু কিছু প্রশাসক সুযোগের অসদ্ব্যবহার করছিল। যার ফলে কতক অঞ্চল নষ্ট হয়ে যায়। তাই মানসুরের ইচ্ছা ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং খিলাফতের প্রতিটি প্রান্তে ন্যায়বিচারের ধারা চালু করে দেওয়া। অবশ্য পরবর্তীকালে এই দায়িত্ব তিনি বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং প্রাদেশিক শাসকদের কাছে ন্যস্ত করেন। এভাবেই চলছিল। অবশেষে খলিফা হারুনুর রাশিদ তার সময়কালে আবু ইউসুফকে প্রধান বিচারপতি বানিয়ে খিলাফতের অধীনস্থ সমস্ত অঞ্চলে বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করেন। খলিফা কেবল প্রধান বিচারপতির মনোনীত লোকদেরই বিচারক নিযুক্ত করতেন। বিচারকদের নিয়োগের আগে যাচাই-বাছাই, সার্বিক খোঁজখবর, নজরদারি, বিচারকার্য পরিচালনার পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া-সহ বিচারকদের ভাতা নির্ধারণ, তাদের সুযোগ-সুবিধা এবং কর্তব্যে অবহেলাকারীকে পদচ্যুত করা ছিল প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব।

আর-রাশিদের পর খলিফাগণ রাজধানী-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারক নিযুক্ত করা থেকে সম্পূর্ণরূপে হাত গুটিয়ে নেন। এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে প্রধান বিচারপতির কাছে ছেড়ে দেন। খলিফা এবং প্রাদেশিক শাসকদের কেউই বিচার-সংক্রান্ত কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। এভাবেই খলিফা এবং প্রাদেশিক শাসকদের প্রভাব থেকে বিচার বিভাগ স্বাধীন হয়ে যায়।

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কার্যগত ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল। প্রাদেশিক শাসক এবং বিচারকদের মাঝে কখনো কখনো ক্ষমতা নিয়ে হালকা রেষারেষি চলত। উভয় পক্ষই একে অপরের কাজে নাক গলানোর চেষ্টায় রত ছিল। তবে জনগণ সাধারণত বিচারককেই বেশি মূল্যায়ন করত। নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণে তাদের কাছেই মানুষের যাতায়াত ছিল বেশি। অনেক সময় জালিমরা প্রশাসকদের আশ্রয়-প্রশ্রয় লাভ করত। ফলে প্রশাসক এবং বিচারক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেতেন। কখনো তো ক্ষমতা নিয়ে খলিফা এবং বিচারককে বিরোধে জড়িয়ে পড়তেও দেখা গেছে। একবার এক মহিলা কুফু বিবেচনায় সমকক্ষ নয় এমন এক পুরুষকে বিবাহ করে। মহিলার অভিভাবক তা মেনে নিতে পারেনি। সে বিচারক সমীপে বিবাহ বাতিলের আবেদন জানায়। কিন্তু বিচারক তা নাকচ করে দেন। কারণ কুফুতে অসমতা বিবাহ বাতিল করার যৌক্তিক কারণ নয়। মহিলার পরিবার তখন বিষয়টি নিয়ে আমিরের কাছে গেলে তিনি বিচারককে বিবাহ বাতিলকরণের নির্দেশ দিতে বলেন। কিন্তু হাকিম নড়লেও হুকুম নড়ল না। অবশেষে আমির নিজেই মহিলা এবং তার স্বামীকে পৃথক করে দিলেন।[৫৬৮]

[৫৬৮] যুহরুল ইসলাম : ২/২৪৯

আবু হামিদ আল-ইসফারাঈনি (মৃত্যু ৪০৬ হিজরি) ছিলেন বাগদাদের বিচারপতি। একবার কোনো কারণবশত খলিফা তাকে বরখাস্ত করলে তিনি খলিফার উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, 'জেনে রাখুন, আল্লাহ আমাকে যে পদে অধিষ্ঠিত করেছেন, আপনি চাইলেই আমাকে তা থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন না। খোরাসানের উদ্দেশ্যে আমার দুটি বা তিনটি শব্দ বলাই যথেষ্ট। আমিই আপনাকে বরখাস্ত করলাম।'[৫৬৯]

বিচারকরা বিভিন্ন ধরনের মোকদ্দমা এবং সাক্ষ্য সংক্রান্ত কাজ নিয়ে খলিফা এবং প্রশাসকদের কাছে আসতেন। খলিফা-সহ প্রশাসকদের অনেকেই প্রসন্ন চিত্তে বিচারককে সাদরে গ্রহণ করতেন। বিচারকের ইনসাফভিত্তিক কথা মানতে কোনো রকম আপত্তি জানাতেন না তারা। অবশ্য কোনো কোনো প্রশাসক বিরক্তি প্রকাশ করতেন। বিচারকের কথা তারা গ্রাহ্যই করতে চাইতেন না। বিচারক তখন পীড়াপীড়ি করতে থাকতেন। কিংবা পদচ্যুত করার হুমকি দিয়ে বিষয়টি উত্থাপন করতেন খলিফার কাছে। অথবা জনসাধারণের কাছে বিচার চাইতেন।

মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান আত-তুলাহি যখন মদীনার বিচারক ছিলেন, তখনকার কথা। একবছর খলিফা আবু জাফর মানসুর হজে এলেন। খলিফার ইচ্ছা ছিল, উটচালকদের নিয়ে শামে যাবেন। কিন্তু তারা এতে সম্মত ছিল না। একপর্যায়ে তারা ইবনু ইমরানের কাছে অভিযোগ দায়ের করল। বিচারক তখন খলিফার কাছে আদালতে উপস্থিতির জন্য সমন পাঠালেন। চাপরাশিকে বলে দিলেন, খলিফাকে যেন সম্মানের সাথে না ডাকা হয়। বরং তাকে নাম ধরে ডাকতে হবে। অবশেষে খলিফা উপস্থিত হলে বিচারক তার সাথে বিশেষ কোনো আচরণ করলেন না। এমনকি বিচারের রায়ও দিলেন খলিফার বিপক্ষে। বিচারকার্য সমাপ্তির পর তিনি খলিফাকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। খলিফাও তখন বিচারকের আচরণ সমর্থন করলেন এবং তার জন্য বরকতের দুআ করে দিলেন। বিচারক তখন এ কথাও বলেছিলেন, 'অনেকে তো আপনার বিপক্ষে জুলুমের অভিযোগ করে থাকে। এমনটা হলে আপনি অভিযুক্ত হিসেবে নিজেই তাদের সাথে উপস্থিত হবেন। নাহয় আপনার উকিলকে পাঠাবেন।'[৫৭০]

বিচারকার্যের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান ছিলেন অনমনীয়তার মূর্ত প্রতীক। মানবিকতাই তার কাছ মুখ্য ছিল। অন্যায়ভাবে কেউ তার কাছে বিন্দুমাত্রও সুবিধা নিতে পারত না। আবু আইয়ুব আল-মূরিয়ানি ছিলেন খলিফা মানসুরের মন্ত্রী এবং কয়েকটি দপ্তরের দায়িত্বশীল। একবার তার কয়েকজন আত্মীয় তার বিপক্ষে মুহাম্মাদ ইবনু ইমরানের কাছে অভিযোগ দায়ের করল। বিচারক তখন সমন

---

[৫৬৯] যুহরুল ইসলাম : ২/২৫০

[৫৭০] আখবারুল কুজাত : ১/১৯৩; তারীখুল খুলাফা, পৃ. ২৬৬

পাঠালেও আবু আইয়ুব উপস্থিত হলেন না। পরবর্তীকালে মদীনার প্রশাসক যিয়াদ ইবনু উবাইদিল্লাহ আল-হারিসির কাছে তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'আপনার কাছে আমি সমন পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নিজেও উপস্থিত হননি, আপনার উকিলও পাঠাননি।' আবু আইয়ুব তখন বিচারকের সাথে রূঢ় আচরণ করলেন। ইবনু ইমরান তখনই হাত বাড়িয়ে আবু আইয়ুবকে ধরতে যাচ্ছিলেন। সামনে আমির-উমারা এবং নিরাপত্তাকর্মী থাকায় সে যাত্রায় রেহাই পেয়ে গেলেন আবু আইয়ুব।[৫৭১]

মুরগাব নদী নিয়ে বসরাবাসী খলিফা আল-মাহদির খিলাফতকালে বিচারক উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান আল-আনবারির কাছে মোকদ্দমা দায়ের করেছিল। কিন্তু তিনি কোনো ফয়সালা করেননি। এরপর খলিফা আল-হাদির সময়ও বিষয়টির সুরাহা হয়নি। অবশেষে খলিফা আর-রাশিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কর্মকর্তা জাফর ইবনু ইয়াহইয়া তখন খলিফার কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানালেন। বসরাবাসীদের কাছে প্রমাণ না থাকায় খলিফা তাদের সপক্ষে ফয়সালা করেননি। অবশ্য পরবর্তীকালে তাদের এমনিতেই দিয়ে দেন।[৫৭২]

অধিকাংশ বিচারকই প্রভাবশালী ছিলেন। বিচারকার্যে তাদের সুনাম ছিল। এজন্য জনগণের বড় একটা অংশের সমর্থনের পাশাপাশি খলিফা এবং প্রধান বিচারপতির ওপর তারা একদিক থেকে নির্ভর করতেন। অপরদিকে তাদের নির্ভরতা ছিল শারঈ বিধান পালন এবং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বীনি অনুভূতির ওপর। এ কারণে বিচারক কোনো আমিরকে বন্দি করার নির্দেশ দিতে পারতেন।[৫৭৩] এর থেকেই বিচারকদের বিচার-সংক্রান্ত নিরাপত্তা প্রকাশ পায়। বিচারকরা সত্য, ন্যায়, দ্বীন এবং শরীয়ত বাস্তবায়ন করতেন বিধায় খলিফা বা প্রশাসক কেউই বিচারকদের বরখাস্ত করার দুঃসাহস দেখাতেন না। তাদের দুনিয়াবিমুখতা, পরহেজগারি ও অবিচলতার কারণে জনগণ তাদের সমর্থন করত এবং মেনে নিত।

আমিররা স্বয়ং বিচারকের কাছে আসতেন। আবার বিচারকরাও আমিরদের কাছে গমন করতেন। চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মিশরে এই রীতির প্রচলন ছিল। ইবনুস সুবকি লিখেছেন, বিচারক আলি ইবনুল হুসাইন ২৯৩ হিজরিতে বিচারক নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ইবনু হারবুওয়াইহ নামে পরিচিত। ৩১৯ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন মিশরের শেষ বিচারক, যার কাছে আমিররা আগমন করতেন। আত্মসম্মান এবং ন্যায়পরায়ণতার খাতিরে তিনি

---

[৫৭১] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/১৮৪; কাসাসুল আরব : ৩/৬৫

[৫৭২] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৯০-৯১

[৫৭৩] যুহরুল ইসলাম : ২/২৪৯

আমিরের সম্মানার্থে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকতেন।[৫৭৪]

বিচারকদের এই রীতির কথা সবাই জানত। তৎকালীন লেখক আর সাহিত্যিকদের লেখাতেও এ বিষয়টি উঠে এসেছে। এখানে এ সংক্রান্ত কয়েকটি শিরোনামের দিকে আমরা শুধু ইঙ্গিত প্রদান করছি। বিচারকের সামনে খলিফা, বিচারের কাঠগড়ায় আমির, বিচারক কর্তৃক খলিফার সাক্ষ্য গ্রহণ না করা এবং আল-মামুনের বিরুদ্ধে জনৈক ব্যক্তির অভিযোগ।[৫৭৫]

খলিফাদের মতো প্রশাসক আর আমিরদের অনেকেই সাধারণ মানুষের মতো সুবিচার এবং ন্যায়পরায়ণতা মেনে নিতেন। শুধু তা-ই নয়; বিচারককে তার অবস্থানে অনমনীয় থাকতে তারা সহায়তাও করতেন। রাক্কাহ নগরীর আমিরকে অভিযুক্ত হয়ে বিচারকের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে আমরা দেখতে পাই। বিচারকার্য সমাপ্তির পর তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম করে বলছি—সবল এবং দুর্বলের ওপর সমানভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে যে ব্যক্তি অক্ষম, সে সফল বিচারক নয়।'[৫৭৬]

❁ বিচারক বরখাস্ত করা

উমাইয়া যুগের আলোচনায় আমরা অধিক হারে বিচারক বরখাস্ত করতে দেখেছি। কারণ সে যুগে সাধারণত বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো আমির কিংবা প্রশাসকের পক্ষ থেকে। প্রশাসক বা আমির পরিবর্তন হলে আগের বিচারক বরখাস্ত হয়ে সে জায়গায় নতুন কাউকে নিয়োগ দেওয়া হতো। অনেক সময় প্রশাসক নিজেও বারংবার বিচারক বরখাস্ত করতেন।

পক্ষান্তরে আব্বাসি যুগে বিচারক খুব কম বরখাস্ত হয়েছে। সে-সময় বিচারকরা বেশির ভাগই স্থায়ী নিয়োগ পেতেন। কারণ প্রশাসক এবং আমিরদের বিচারক বরখাস্ত করার অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। এ অধিকার ছিল সাধারণভাবে প্রধান বিচারপতি এবং খলিফার জন্য সীমাবদ্ধ। তাই বিচারক বরখাস্তকরণ কদাচিৎ ঘটত। শারিক বলেছেন, 'বিচারক নিয়োগ দান এবং বরখাস্ত কেবল খলিফাই করতে পারতেন।'[৫৭৭] পূর্বে আমাদের আলোচিত বিচার-সংক্রান্ত সুরক্ষার কথা বলে এটাই বোঝানো হয়েছে। আব্বাসি যুগে বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটা ছিল প্রসিদ্ধ।

বিচারক অপসারণ এবং নতুন বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি প্রশাসনিক নিয়ম ছিল। নব নিযুক্ত বিচারক নির্ভরযোগ্য দুজন ব্যক্তিকে সাবেক বিচারকের কাছে পাঠাতেন। লোক দুজন তখন বিচার-সংক্রান্ত নথিপত্র সাবেক বিচারক থেকে

---

[৫৭৪] তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতুল কুবরা : ৩/৪৪৭; যুহরুল ইসলাম : ২/২৪৯; হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ১/৩১২

[৫৭৫] কাসাসুল আরব : ৩/৪৭, ৬৫, ৭১, ৭৪, ৭৮; যুহরুল ইসলাম : ২/২৪৯

[৫৭৬] কাসাসুল আরব : ৩/৭৮

[৫৭৭] আখবারুল কুযাহ : ৩/১৮২; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ১৮৯

নিয়ে নতুন বিচারকের কাছে পৌঁছে দিতেন।[৫৭৮]

বিচারের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকা

খলিফা এবং দায়িত্বশীলরা বিচারকার্য পরিচালনার জন্য সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতেন। বড় বড় এবং প্রসিদ্ধ আলিমদের নিযুক্ত করতে চাওয়ার মৌলিকভাবে কয়েকটি কারণ ছিল। যেমন, এর মাধ্যমে হাদিসের নির্দেশনা বাস্তবায়িত হবে। মানুষের অধিকার এবং সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে সমাজে সুবিচার আর ন্যায় যেমন প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি জনগণের কাছাকাছিও থাকা যাবে। ফলে বিচারব্যবস্থার মান রক্ষার মতো খলিফা এবং প্রশাসকদের কাজের সপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে তাতে শরীয়তের রং চড়ানোও সহজ হবে।

নবি-রাসূল এবং নেককার ব্যক্তিদের অনুসরণে আলিমদের অনেকেই বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মাঝে ছিল অর্পিত দায়িত্ব পালনের চেতনাবোধ। সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সওয়াব আর পুরস্কার লাভের ব্যাপারে তাঁরা আশাবাদী ছিলেন। তাই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।[৫৭৯]

তবে অনেক আলিম বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। এ তালিকায় সর্বাগ্রে পাওয়া যাবে রাশিদুন যুগে আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ-এর নাম। উমাইয়া যুগে এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা যে বেড়ে গিয়েছিল, ইতিপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি। আব্বাসি যুগে তা আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এমনকি বিচারকার্য থেকে দূরে সরে যাওয়া আলিমদের একাংশের কাছে প্রশংসনীয় রীতিতে পরিণত হয়। কারণ খলিফা এবং প্রশাসকগণ কিছু প্রসিদ্ধ আলিমদের বিচারকের পদ গ্রহণে বাধ্য করছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে খলিফা এবং প্রশাসকদের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। আসলে তারা চাচ্ছিলেন, সবাই যেন আলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করে। তাঁদের ইলম এবং ফিকহ থেকে সবাই যেন উপকৃত হতে পারে। সাধারণ

---

[৫৭৮] শারহু আদাবিল কাযি : ১/২৫৮

[৫৭৯] যুহরুল ইসলাম : ২/২৪৯-এ অধ্যাপক আহমাদ আমিন দাবি করেছেন, আব্বাসি যুগের বিচারকরা বাধ্য হয়ে নয়তো সম্পদের লোভে পড়ে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে বানোয়াট ইতিহাস এবং বাস্তবতা বিবর্জিত কথা। এ কথা ঠিক যে, কোনো কোনো বিচারক সম্মানত বা বস্তুগত চাপের কারণে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তবে নিরাপত্তার খাতিরে যারা এ দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী হয়েছিলেন, তাদের কথা ভিন্ন। আর কারও কারও দায়িত্ব গ্রহণ ছিল সম্পদের লোভে পড়ে কিংবা জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে। তবে এ ধরনের অবস্থা খুবই বিরল আর কম ছিল। বিরল বিষয় দিয়ে উদাহরণ পেশ করা যায় না। বরং তা ব্যতিক্রম হিসেবেই সাব্যস্ত হয়। আবার দ্বিতীয় আব্বাসি যুগের একটা সময় পর্যন্তই সেটা সাব্যস্ত বলে জানা যায়। কিন্তু ঢালাওভাবে এবং ব্যাপক হারে সবার ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া কোনোমতেই বৈধ হতে পারে না। যেসব বিচারক জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তারাও যে সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতি যত্নবান ছিলেন—তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মানুষ যেন আলিমদের সম্মান করে; তাঁদের ওপর থেকে যেন আস্থা না হারায়।

বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে অনুৎসাহের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। যেমন :

- ☑ ১. হাদিসে থাকা নানাধরনের ভীতি প্রদর্শন এবং দায়িত্ব পালনকারীর প্রতি সতর্কবার্তা। উলামায়ে কেরাম এ কারণে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে বিরত থাকতেন। এ ছাড়া দুনিয়া-আখিরাতে কঠিন জবাবদিহিতার আশঙ্কা তাদের ছিল। এ ভয় থেকেই তারা দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করতেন। কারণ ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ হেরফের বা জুলুম করে ফেললে জাহান্নামি হতে হবে।[৫৮০]
- ☑ ২. দুনিয়াবিমুখতা। পার্থিব পদ-পদবির কারণে আল্লাহর নৈকট্য থেকে মাহরুম হওয়ার পাশাপাশি নেককার, দরিদ্র এবং দুর্বল লোকদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়া।
- ☑ ৩. ইলম চর্চা, গবেষণা, দাওয়াত এবং শিক্ষাদানের কাজকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বের ওপর প্রাধান্য দেওয়া।
- ☑ ৪. আকীদাভিত্তিক এবং ফিকহকেন্দ্রিক নানান ফিরকা সৃষ্টি হওয়া। খলিফা বা প্রশাসকরা নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শের অনুসরণ করতেন। তাই কোনো কোনো আলিম এমন খলিফা বা প্রশাসকের অধীনে কাজ করে তাদের সমর্থন জোগানো অপছন্দ করতেন। তাদের ভয় ছিল, খলিফা বা প্রশাসক নিজেদের মতাদর্শ প্রচারে আলিমদের সুখ্যাতির অপব্যবহার করবেন।
- ☑ ৫. খলিফা বা প্রশাসকদের বিচারক-সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এবং বিচারককে একদিকে ঝুঁকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার আশঙ্কা করা। এ কারণে অনেক বিচারকই খলিফা এবং প্রশাসককে অনুরোধ করতেন, তাকে যেন স্বাধীনভাবে কাজের সুবিধা দেওয়া হয়। তার কাজে যেন কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করা হয়। খলিফা বা প্রশাসক থেকে তারা এ মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন যে, ফয়সালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব হবে শাসকগোষ্ঠীর। শাসকের আত্মীয়স্বজন, সহযোগী, এমনকি আমিরদের বিপক্ষে হলেও তারা সত্য এবং ন্যায় বাস্তবায়ন করবেন। খলিফা বা প্রশাসক শুধু যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেন তা-ই নয়; বরং কার্যত বাস্তবায়নও করতেন। পক্ষান্তরে যেসব আলিম দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন তাদের আশঙ্কা ছিল যে, শাসকগোষ্ঠী তাদের গবেষণার সাথে সহমত পোষণ করবেন না। বরং ফয়সালা তাদের বিপক্ষে

---

[৫৮০] ফুদ্বাইল ইবনু ইয়াদ্ব ﵀ বলতেন, 'বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারীর উচিত এক দিন দায়িত্ব পালন করা এবং এক দিন কান্না করা।' আখবারুল কুদ্বাহ : ১/২৪-২৫

গেলে চাপ প্রয়োগ করবেন।

☑ ৬. অনেক সময় খলিফা এবং প্রশাসকদের সাথে আলিম এবং ফকিহদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকত। ইমাম এবং আলিমদের অনেকেই এইসব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করতেন। অনেক সময় তো খলিফা এবং প্রশাসক-বিরোধী আন্দোলনের সাথে তাদের পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকত। অনেক সময় শাসকগোষ্ঠীর কার্যকলাপ অপছন্দ করার কারণে আলিমগণ তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। কেউ যাতে তাদের প্রতি ভুল ধারণা না করে বসে, এজন্য বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইতেন না। তারা মনে করতেন, বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে কেউ ভাবতে পারে যে, তারা শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থন করছেন। কিংবা রাজনৈতিক কার্যক্রমে তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করছেন।

বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অসম্মত ছিলেন—এমন কয়েকজনের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

■ ইমাম আবু হানিফা নুমান

খলিফা আবু জাফর মানসুর তাঁকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বললে তিনি কেবল বিরতই থাকেননি; বরং পালিয়ে বেড়িয়েছেন। এর কারণ কী ছিল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু হানিফা খলিফা মানসুর কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকায় প্রহারের স্বীকার হয়েছিলেন। কারণ নিন্দুকরা এ কথা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, আবু হানিফা খলিফার বিরুদ্ধে বসরায় বিদ্রোহকারী ইবরাহীম ইবনু আবদিল্লাহকে সমর্থন করেন।[৫৮১]

আরেক বর্ণনামতে তাকওয়া, পরহেজগারি এবং দুনিয়াবিমুখতার কারণেই আবু হানিফা ﷺ বিচারকের দায়িত্ব থেকে দূরে ছিলেন। খলিফার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহকে ভয় করুন। এমন ব্যক্তিকেই কেবল দায়িত্ব প্রদান করুন, যে আল্লাহকে ভয় করে। সন্তুষ্টির ক্ষেত্রেই আমি বিশ্বাসযোগ্য নই। তাহলে অসন্তুষ্টির ব্যাপারে কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারি? আপনার বিপক্ষে রায় প্রদান করলে আমাকে বলা হবে: 'রায় পরিবর্তন করো, নয়তো ফুরাত নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে।' এ ক্ষেত্রে ডুবে যাওয়াটাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আপনার আশেপাশে থাকা লোকেরা আপনাকে তোষামোদী করে চলে, যা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।'[৫৮২]

---

[৫৮১] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৭৩ এবং ৭৪
[৫৮২] যুহরুল ইসলাম : ২/২৪৯

অন্য বর্ণনায় এসেছে, খলিফা মানসুর ইমাম আবু হানিফাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু ইমাম সাহেব তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিরত থাকেন। তখন মানসুর শপথ করেন, আবু হানিফাকে দিয়ে কোনো দায়িত্ব পালন না করানো অবধি তিনি নিবৃত্ত হবেন না। এদিকে আবু হানিফা ﷺ-ও শপথ করেন যে, তিনি খলিফার থেকে কোনো দায়িত্ব নেবেন না। অবশেষে তাকে খলিফা মানসুর নির্মাণ-শ্রমিকদের কাজ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেন। এভাবেই খলিফার কসম পূর্ণ হয়, আবার আবু হানিফা ﷺ-এর কসমও রক্ষা পায়।[৫৮৩]

কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, আবু হানিফাকে মানসুর বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিতে চাইলে ইমাম সাহেব তা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। খলিফাও পীড়াপীড়ি শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁকে প্রহার করে জেলে ভরে রাখেন। এর কিছুদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয়।[৫৮৪] লেখকরা আরও অনেক কারণ এবং অন্যান্য বর্ণনাও অবশ্য উল্লেখ করেছেন।[৫৮৫]

▪ ইমাম মালিক

তিনি আব্বাসিদের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। শাইখ আবুল হাসান নুবাহি লিখেন, '... অবশেষে আব্বাসিদের আত্মপ্রকাশ ঘটল। একপর্যায়ে তারা শাসনক্ষমতা লাভ করে। বিচারব্যবস্থার ব্যাপারে অনেক কড়াকড়ি করল তারা। শারঈ কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য তারা সেরা আলিমদের বেছে নিলো। সে হিসেবে মালিক ইবনু আনাস, ইবনু আবি যিব এবং আবু হানিফাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়। মালিক তখন দায়িত্ব গ্রহণ না করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, "আমি একবার শাস্তির সম্মুখীন হয়েছি। আর সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিচারকার্য পরিচালনার উপযুক্ত নয়।" তখন ইবনু আবি যিব বলেন, "আমি তো কুরাইশ বংশীয়। বংশগতভাবে সমকক্ষ ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে সমকক্ষ হওয়া উচিত নয়।" ওদিকে আবু হানিফা বললেন, "আমি তো মিত্র গোষ্ঠীভুক্ত। আর মিত্র গোষ্ঠীর কেউ বিচারকার্য পরিচালনার উপযুক্ত নয়।" এভাবে তাঁদের তিনজনই নিজেদের নিয়তের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে দায়িত্ব পালন থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন।'[৫৮৬]

▪ ইমাম শাফিয়ি

নুবাহি লিখেন, 'বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ থেকে পিছিয়ে থাকা

---

[৫৮৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১০/৯৭

[৫৮৪] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ২৫৯; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৭২

[৫৮৫] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৭২ এবং ৭৪; তারীখু কুদ্বাতিল উনদুলুস, পৃ. ১৫ এবং ২৪

[৫৮৬] তারীখু কুদ্বাতিল উনদুলুস, পৃ. ২৪; যুহরুল ইসলাম : ২/২৪৯

অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরিস আশ-শাফিয়ি। আমিরুল মুমিনীন তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন, "আপনার বংশীয় কেউ এ কাজের যোগ্য নয়। এমন ব্যক্তিও এ কাজের অনুপযুক্ত, যে সব কাজ ছেড়ে দেয়।" তিনি আরও বলতেন, "বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পরও যে ব্যক্তি নিঃস্ব হয়নি, সে তো চোর। আর যে ব্যক্তি নিজেকে বাঁচাতে পারেনি, তার ইলম কোনো কাজে আসেনি।"'[৫৮৭]

■ ওয়াকি ইবনুল জাররাহ

তিনি খলিফা হারুনুর রাশিদের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু ইদরিস, হাফস ইবনু গিয়াস এবং ওয়াকি ইবনুল জাররাহকে খলিফা হারুনুর রাশিদের কাছে নেওয়া হলো। উদ্দেশ্য ছিল, তাদেরকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা। ইবনু ইদরিস তো দরবারে প্রবেশ করে খলিফাকে সালাম দিয়ে এমন ভাব প্রকাশ করলেন, যেন তিনি একজন প্যারালাইজড ব্যক্তি। খলিফা তখন উপস্থিত লোকদের বললেন, 'তোমরা শাইখের হাত ধরো। একে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।' এরপর ওয়াকি এক হাত দিয়ে নিজের এক চোখ চেপে ধরে বললেন, 'আমিরুল মুমিনীন! এই চোখ দিয়ে আমি দেখতে পাই না।' খলিফা তখন তাকেও ছাড় দিলেন। তারপর হাফস বললেন, 'ঋণের বোঝা এবং পরিবারের দায়িত্ব আমার কাঁধে না থাকলে আমি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকতাম।'[৫৮৮] এই বলে পরিবারের ভরণপোষণের সুবিধার্থে তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তবে এ কাজে তিনি খুব যে আগ্রহী ছিলেন—এমনও নয়। বরং তার জীবনীতে এসেছে, বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং হাদিসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হওয়া—এ দুয়ের মাঝে তাকে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

বিশুদ্ধতম মতানুসারে, ১৯৪ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন কুফার বিচারক। পরে অবশ্য বাগদাদের বিচারকার্যও পরিচালনা করেছেন।[৫৮৯]

■ মুগীরা আল-মাখযুমি

আমিরুল মুমিনীন আর-রাশিদ চার হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তাকে মদীনার বিচারক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সম্মত হননি। খলিফা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি বলেন, 'আমিরুল মুমিনীন! বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন অপেক্ষা শয়তানের ক্রোধের পাত্র হওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।' তখন

[৫৮৭] তারীখু কুদ্বাতিল উনদুলুস, পৃ. ১৫
[৫৮৮] আখবারুল কুদ্বাহ : ১/২৭ এবং ৩/১৮৪
[৫৮৯] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৮৪; খুলাসাতু তাহযীবিল কামাল : ১/২৪১; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৯/২২

খলিফা বললেন, 'এরপর তো আর কিছু বলার বাকি থাকে না।' তারপর তাকে অব্যাহতি দিয়ে দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন।[৫৯০]

অনেক মুতাজিলা মতাদর্শের ব্যক্তি তো দুনিয়াবিমুখতা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যে, ভীষণ অভাবে পড়েও তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ গ্রহণ করেননি। বর্ণিত আছে, মুতাজিলা নেতা আহমাদ ইবনু দাউদের কাছে একবার খলিফা আল-ওয়াসিক বিল্লাহ জানতে চেয়েছিলেন, 'আপনি মুতাজিলাদের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন না কেন?' উত্তরে আহমাদ বলেছিলেন, 'তারা এ কাজের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। যেমন, ধরুন জাফর ইবনু বিশরের কথা। তার কাছে আপনি দশ হাজার দিরহাম পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেটা গ্রহণ করেননি। তারপর আমাকে নিয়ে তার কাছে আপনি গেলেন। তখন আমি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেননি। অগত্যা অনুমতি ছাড়াই ঢুকতে চাইলে তিনি তরবারি কোষমুক্ত করে আমাকে হুমকি দেন, "ভেতরে ঢুকলে আর জান নিয়ে ফিরতে পারবে না।" তখন আমি ফিরে আসি। এমন লোকদের কিভাবে দায়িত্ব দেওয়া যায় সেটা আপনিই বলুন!' এরপর আহমাদ নিজের প্রয়োজন সমাধার জন্য মাত্র দুই দিরহাম গ্রহণ করলেন।[৫৯১]

▪ আবদুল্লাহ ইবনু ফাররুখ

বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব যারা এড়িয়ে চলতেন, তাদের শীর্ষে ছিলেন কাইরুওয়ানের ফকিহ আবদুল্লাহ ইবনু ফাররুখ। খলিফা আর-রাশিদের পক্ষ থেকে তার কাছে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন রাওহ ইবনু হাতিম। কিন্তু তিনি সম্মত হননি। তখন ইবনু হাতিমের নির্দেশে তাকে বেঁধে মসজিদের ছাদে তোলা হয়। এরপর তাকে পুনরায় প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তাকে ছাদের কিনারায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধাক্কা দিয়ে নিশ্চিত ফেলে দেওয়া হবে দেখে তিনি দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। তখন কয়েকজন প্রহরী-সহ তাকে মসজিদের ভেতরে বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর দুজন ব্যক্তি তার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে আসে। তাদের দেখে তিনি দীর্ঘসময় ধরে কান্না করেন। তারপর মাথা তুলে তাদের বলেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে এ মোকদ্দমা থেকে আমাকে রেহাই দিন।'

লোক দুজন তখন তার জন্য দুআ করতে করতে চলে গেল। প্রহরীরা রাওহকে বিষয়টি জানালে সে বলল, 'ঠিক আছে। তবে এ কাজের উপযুক্ত কে হতে পারে, সেটা তার থেকে জেনে নাও।' তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনু গানিমের কথা বলেন। কারণ বিচার-সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে তাকেই বেশি আগ্রহী দেখা

---

[৫৯০] তারীখু কুদাতিল উনদুলুস, পৃ. ১৫; মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩৯৯

[৫৯১] তারীখুল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৬৩

গেছে।[৫৯২]

▪ আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব

তিনি ছিলেন ইমাম মালিকের সহচর। দুনিয়াবিমুখতা এবং সততার কারণে তিনি খলিফা কর্তৃক প্রদত্ত বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। জনসমাজ থেকে সরে গিয়ে তিনি ঘরে অবস্থান করতে থাকেন।[৫৯৩]

▪ আবদুল মালিক ইবনু আবদিল আজিজ

ইবনুল মাজিশুন নামে পরিচিত মালিকি মাযহাবের এই ফকিহ ছিলেন ইমাম মালিক ﷺ-এর ছাত্র। খলিফা আল-মামুন তাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে পত্র প্রেরণ করলে তিনি সম্মত হননি।[৫৯৪]

▪ মূসা ইবনু সুলাইমান আল-জুযজানি

খলিফা আল-মামুন তাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি বললেন, 'বিচারব্যবস্থার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আমার মতো ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করবেন না। কারণ আমি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমার মনে হয় না, আল্লাহর জমিনে তাঁর বান্দাদের বিচার করার মতো যোগ্যতা আমার মাঝে আছে।' উত্তরে খলিফা বললেন, 'আপনি সত্য বলেছেন। আমরা আপনাকে অব্যাহতি দিচ্ছি।'

মূসা তখন খলিফার জন্য দুআ করলেন। তিনি ছিলেন মুআল্লা ইবনু মানসুর (মৃত্যু ২১১ হি.) -এর সহচর। খলিফা তাকেও বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও সম্মত হননি।[৫৯৫]

▪ সুফইয়ান আস-সাওরি

খলিফা মানসুর তাঁকে কুফায় বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সম্মত না হয়ে ১৪৪ হিজরিতে কুফা থেকে হিজাজে চলে যান। পরবর্তীকালে খলিফা মাহদি তাঁকে একই প্রস্তাব দিলে তিনি আত্মগোপন করেন। কিন্তু একসময় তিনি ধরা পড়ে যান। অবশেষে খলিফা তাঁকে বলেন, 'আপনি এখানে-ওখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন! আপনি কি ভেবেছেন, আমরা আপনাকে শাস্তি দিতে পারব না? এখন তো আপনি ঠিকই ধরা পড়ে গেলেন।'

খলিফা তখন সুফইয়ান ﷺ-কে কুফার বিচারপতি নিয়োগ দিয়ে একটি ফরমান

---

[৫৯২] তারীখু কুদ্বাতিল উনদুলুস, পৃ. ১৫ এবং ২৫

[৫৯৩] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ১/৩০২; মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪০০

[৫৯৪] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪০১

[৫৯৫] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩৭৮

লেখালেন। যা-তে এ কথাও লেখা ছিল, সুফইয়ানের কথার ওপর কারও কথা চলবে না। ফরমানটি সুফইয়ানের হাতে তুলে দিলে তিনি সেটা নিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর সেটি দজলা নদীতে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেলেন। এরপর আর তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আসলে তিনি বসরায় চলে গিয়েছিলেন। আত্মগোপনরত অবস্থায় সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়।[৫৯৬]

▪ ইবনু সুরাইজ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আহমাদ ইবনু আমর ইবনি সুরাইজ। তাঁর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। শাফিয়ি মাযহাবের ফকিহ এবং মুজতাহিদ ছিলেন। তৎকালীন শাফিয়ি মাযহাবের পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। ৩০৬ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তিনি শিরাজে কিছুদিন ইনসাফের সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন। এরপর পুনরায় দায়িত্ব দিতে চাওয়া হলে তিনি আর সম্মত হননি। ঘরে আটকে রেখেও তাঁকে রাজি করানো যায়নি। সৈন্যরা প্রায় ১০ দিন তাঁর ঘর ঘেরাও করে রাখে। কিন্তু তিনি নিজের অবস্থানেই অটল থাকেন। তখন উজির আলি ইবনু ঈসা জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমরা মূলত শাইখের কোনো ক্ষতি করতে চাইনি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়াবাসীকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া—আমাদের রাজ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিতে চাওয়া হয়, কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান।'[৫৯৭]

আব্বাসি যুগে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনে অসম্মতি সংক্রান্ত উদাহরণের আমরা এখানেই ইতি টানছি। এমন অসম্মত ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক। অধিকাংশ সময়ই সেটা অনুসরণীয় রীতি আর প্রশংসনীয় পন্থায় পরিণত হয়েছিল। আবু বকর ইবনু মূসা আল-খাওয়ারিযমি (৪০৩ হিজরি), শামবাসীদের ফকিহ আওযায়ি (১৫৭ হিজরি), জাসসাস আল-হানাফি (৩৭০ হিজরি) -সহ আরও অনেকেই আছেন এই তালিকাতে।

❁ প্রধান বিচারপতি

আব্বাসি যুগে ইসলামি বিচারব্যবস্থায় প্রথমবারের মতো 'কাযিউল কুযাত' তথা প্রধান বিচারপতির পদ চালু হয়েছিল। হিজরি ১৭০ সালে বা তারও পরে আব্বাসি খলিফা হারুনুর রাশিদ বাগদাদে এই পদ চালু করেন। এ সময় ইতিহাসে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়েছিল। খিলাফতের নানাধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে খলিফা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাষ্ট্রের দায়িত্বগুলো বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। তাই খলিফা নিজের বোঝা লাঘব করার জন্য

---

[৫৯৬] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১২৯; মুজজুম যাহাব : ৩/৩২২

[৫৯৭] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪২০

এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এমন কাউকে দেবেন বলে মনস্থ করলেন, যিনি বিচারব্যবস্থা সহজীকরণ এবং বিচারকদের তত্ত্বাবধান করার ক্ষেত্রে খলিফার স্থলবর্তী হবেন। এসব চিন্তা করেই খলিফা আর-রাশিদ এই পদ চালু করেন। প্রথমবার এই পদের অধিকারী হলেন বাগদাদের বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ ﷺ। তিনি ছিলেন আবু হানিফা ﷺ-এর সহচর এবং *আল-খারাজ* গ্রন্থের লেখক। ১৮২ হিজরিতে ইন্তেকাল করা পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। আল-হাদি, আল-মাহদি এবং আর-রাশিদ—এই তিন আব্বাসি খলিফার সময় তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আবু ইউসুফ ﷺ-কে খলিফা আর-রাশিদ খুব সম্মান করতেন। পরবর্তীকালে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে বিচারক নিয়োগ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর কাছে অর্পণ করেন। তখন তাঁকে 'কাযি কুযাতিদ দুনইয়া' তথা দুনিয়ার প্রধান বিচারপতি বলা হতো।[৫৯৮]

কোনো কোনো লেখক প্রধান বিচারপতি নিয়োগের এই পদ্ধতিটি পারসিকদের থেকে গৃহীত বলেছেন। তাদের মাঝে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রচলন ছিল। প্রমাণস্বরূপ তারা আরবি সাহিত্যিক আল-জাহিযের সাথে সম্পৃক্ত পত্রের কথা উল্লেখ করেন, যা খলিফা হারুনুর রাশিদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল। আবার এ কথাও বলা হয় যে, হারুনুর রাশিদের যুগে বার্মাকিরা ইসলামি রাষ্ট্রে এ পদটি চালু করেছিল। তারপর খলিফা নিজেই তার প্রচলন এবং বাস্তবায়ন করেন।[৫৯৯]

প্রধান বিচারপতির পদটি বর্তমানে আইনমন্ত্রীর সমপর্যায়ের ধরা যায়। এর মাধ্যমে খলিফা ও প্রশাসকদের কর্তৃত্ব থেকে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা যেমন পোক্ত হয়, তেমনি প্রশাসনের নাগপাশ থেকে বিচারকরা মুক্তি লাভ করেন। তারা কেবল প্রধান বিচারপতিরই অনুগত থাকতেন। খিলাফতের মাঝে বিচার-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল হতেন প্রধান বিচারপতি। বিচারক নিয়োগ, তাদের তত্ত্বাবধান, বিচারকদের নজরদারিতে রাখা ছিল প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব। বিচারকদের জীবনচরিত তালাশ, তাদের প্রদত্ত রায় নিরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ তিনিই করতেন। প্রয়োজনবোধে বিচারকদের পদচ্যুত যেমন করতেন, তেমনি তাদের কর্মপরিধিও নির্দিষ্ট করে দিতেন।[৬০০] প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিচারক হলেও বাস্তবে তিনি ছিলেন প্রধান বিচারপতি। তার নির্বাচনের মাধ্যমেই বিচারকরা ধারা মেনে কাজ করতেন।[৬০১] পরবর্তীকালে বাগদাদের এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিচারক নিযুক্ত করা প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব হয়ে যায়।[৬০২]

---

[৫৯৮] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩৭৭

[৫৯৯] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৬; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৪২; তবাকাতু ইবনি সাদ : ৭/১৮৩

[৬০০] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৬

[৬০১] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ ফী ইযযিল আরব, পৃ. ১৪৭

[৬০২] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৫

প্রধান বিচারপতির অবস্থান ছিল খলিফার অতি নিকটবর্তী। অনেক সময় তাকে 'খলিফার বিচারক' নামেও অভিহিত করা হতো। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নির্ধারণে তার সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। অনেক সময় সফরে, শোভাযাত্রায় এবং মন্ত্রীদের বিচারের শুনানিতে তিনি খলিফার সাথেই থাকতেন। আর খলিফা হারুনুর রাশিদ তো ইরাক, খোরাসান, শাম এবং মিশরে কেবল সেসব লোকদেরই বিচারকরূপে নিযুক্ত করতেন, যাদের ব্যাপারে বিচারপতি আবু ইউসুফ সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।[৬০৩]

আবু ইউসুফ ﵀ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ভালোমতোই পালন করেছিলেন। বিচারকদের তত্ত্বাবধানের কাজে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে মনোযোগী। তিনিই সর্বপ্রথম আলিম এবং বিচারকদের পোশাক পরিবর্তন করে বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধানের রেওয়াজ চালু করেন। এর আগে সাধারণ মানুষের পোশাকের সাথে তাদের কোনো তফাত ছিল না। লম্বা টুপির ওপর পাগড়ি এবং সবুজ রঙের লম্বা চাদর পরিধানের পদ্ধতি চালু করেন তিনি। যা ছিল আপমার জনতার মাঝে তাদেরকে সহজে চেনার পরিচায়ক এবং বিচারকদের বিশেষ মর্যাদা জানতে পারার সুবিধাজনক পদ্ধতি।[৬০৪]

বাগদাদে ছিল 'দিওয়ানু কাযিল কুযাত' তথা প্রধান বিচারপতির বিশেষ দফতর। এখানে যারা চাকরি করতেন তাদের মাঝে দেহরক্ষী, মুনশি, পেশকার এবং নথি সংরক্ষক ছিল প্রসিদ্ধ। এখানে বিচার-সংক্রান্ত বিষয়াদি সুসংগঠিত করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারকের কার্যাবলি বিন্যস্ত করা হতো।

প্রধান বিচারপতির পদটি প্রথম যখন চালু হয়, তখন সেটি বাগদাদেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাগদাদের বিচারককেই কেবল এই পদবি প্রদান করা হতো। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ইসলামি অঞ্চলগুলো যখন বাগদাদের শাসন থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন প্রশাসকরা প্রতিটি অঞ্চলে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিচারক নিয়োগ দেন। এই বিচারকরা ছিলেন প্রধান বিচারপতির স্থলবর্তী। অনেক সময় তাদেরকে এই পদবিও প্রদান করা হতো। দামিস্ক, মিশর, বাগদাদ, মদীনা, খোরাসান-সহ অন্যান্য অঞ্চলে আলাদা আলাদা প্রধান বিচারপতি ছিলেন। কখনো কখনো একই অঞ্চলে একাধিক প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করতেও দেখা গেছে। সেটা হতো চার মাযহাবের ভিত্তিতে কিংবা স্থানগত পরিধি হিসেবে। যেমন, মিশরের উচ্চ ভূমি এবং নিম্ন ভূমিতে পৃথক পৃথক প্রধান বিচারপতি ছিল।[৬০৫]

ফাতিমি সাম্রাজ্যের সময় মিশরে প্রধান বিচারপতি ছিল ফাতিমি শিয়া। তার

---

[৬০৩] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৫; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৭

[৬০৪] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৭; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৪৮; আবকারিয়্যাতুল ইসলাম, পৃ. ৪২৪

[৬০৫] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৪৩; আল-কাদ্বাউল ইদারি, পৃ. ৪৮; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৮; হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১৫৩

দায়িত্ব ছিল মিশরের প্রতিটি শহরে বিচারক নিয়োগ দেওয়া। যাদেরকে 'নাওয়াবুল হুকম' নামে অভিহিত করা হতো। ফাতিমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ছড়িয়ে পড়া শিয়াদের নীতি থেকেই অধিকাংশ বিচারকরা সহায়তা গ্রহণ করতেন। আবুল হাসান আলি ইবনুন নুমান ছিল একজন কট্টরপন্থি শিয়া। ৩৬৬ হিজরিতে সে মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে-ই মিশরে নিযুক্ত সর্বপ্রথম প্রধান বিচারপতি। তার ওপর ছিল তৎকালীন মিশরের সর্বোচ্চ দায়িত্ব। মিশরের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি ছিল সে। তাকে কেউ টেক্কা দিতে পারত না। আইনি বিধানাবলি, নামাজ কায়েম, শাস্তি বিষয়ক অধিদপ্তর এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের কোষাগার তার অধীন হতো। সে ছিল মন্ত্রীর পদমর্যাদায়। মিশরের সুলতান তাকে সাথে নিয়ে মিম্বরে বসত। তাকে কিছু বলার সাহস কেউ রাখত না, আর তার পদের প্রতিও আকাঙ্ক্ষা করার সাহস কারও হতো না। আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের খোঁজখবর রাখা, তাদের কাজ পর্যালোচনা করা এবং তাদের ফয়সালার ওপর সে নজরদারি করত। ফাতিমি সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলোর ওপর তার কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটছিল।[৬০৬]

আইয়ুবি যুগে মিশরে একজন মাত্র বিচারক কায়রোতে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। আর বাকি অন্য সব প্রদেশ ছিল কায়রোর অনুগামী। কায়রোর বিচারকই কেবল অন্যান্য প্রদেশে বিচারক নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। এ হিসেবে তিনি ছিলেন প্রধান বিচারপতির সমপর্যায়ের। আবার অনেক সময় কায়রোর জন্য এবং মিশরের নিম্ন ভূমির জন্য একজন বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো। যেমনটা ঘটেছিল আল-ইজ্জ ইবনু আবদিস সালামের ক্ষেত্রে। তিনি কায়রো এবং মিশরের উঁচু ভূমিতে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

যাহির বাইবার্সের সময় মিশরে চার মাযহাব অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য চারজন বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই চারজনের প্রত্যেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচারক নিয়োগ প্রদানের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন। সে হিসেবে এদের প্রত্যেকেই ছিলেন নিজ নিজ মাযহাবের প্রধান বিচারপতি।[৬০৭] যারা প্রধান বিচারপতি নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন—ইয়াকুব আবু ইউসুফ ইবনু ইবরাহীম, ইয়াহইয়া ইবনু আকসাম, আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইবনু আবি দাউদ, আবু ইসহাক ইসমাঈল আল-আযদি এবং আবু আবদিল্লাহ দাউদ আল-আয়াদি প্রমুখ। আবু ইউসুফের মাধ্যমে এই পদের সূচনা হয়েছিল। ইবনু আকসাম ছিলেন খলিফা আল-মামুনের প্রধান বিচারপতি এবং মন্ত্রী। এই পদের মাধ্যমে তিনি যে সম্মান আর মর্যাদা পেয়েছিলেন, তা অন্য কেউ পাননি। আবু আবদিল্লাহ

---

[৬০৬] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৮; আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৭; হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ১/৫২১, ২/১৪৮; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৪৪

[৬০৭] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৮

দাউদ ছিলেন খলিফা আল-মুতাসিম কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি। খলিফার শোভাযাত্রাতেও তিনি শরিক থাকতেন।[৬০৮]

❁ বিচারকের সহকারী

আব্বাসি যুগে প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি প্রধান বিচারকের সহায়কের কথাও জানা যায়। উমাইয়া যুগেও এই সহকারীর প্রচলন ছিল। আব্বাসি যুগে রাজত্বের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে জনগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্বভাবতই ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ আগের যুগের তুলনায় শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে মামলা-মোকদ্দমাও বেড়ে চলছিল। তাই সুষ্ঠুভাবে মোকদ্দমা নিরসন করার জন্য সহকারী আবশ্যক হয়ে পড়ে।

ক. সহকারী বিচারক: তার দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন শহরে এবং গ্রামে বিচারকের প্রতিনিধি হিসেবে মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করা। সফর, অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো কারণে বিচারক অনুপস্থিত থাকলে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েও তিনি বিচার করতেন। এ ক্ষেত্রে শর্ত প্রযোজ্য ছিল। প্রধান বিচারপতির পদ চালু হওয়ার পর তার পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ অনুমতি ছাড়া কেউ তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারতেন না। আর তিনিই দেশের সর্বত্র বিচারক নিযুক্ত করতেন।[৬০৯]

খ. মুনশি: রাশিদুন যুগ এবং উমাইয়া যুগেও ক্ষেত্রবিশেষে এই মুনশির প্রচলন ছিল। তবে আব্বাসি যুগে তার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়। মুনশির বিবরণ নিয়ে আলিমদের অনেকেই বই লিখেছেন। যাদের মাঝে আছেন মুনশি আবদুল হামিদ। যার গ্রন্থের অনেক রেফারেন্স ইবনু খালদুনের *আল-মুকাদ্দিমাহ* গ্রন্থে আছে। এ ছাড়াও জাহশিয়ারি, আল-মাওয়ারদি-সহ আরও অনেকেই এ বিষয়ে কলম ধরেছেন।[৬১০] মুনশি কী কী কাজ করতেন, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য, সাক্ষীদের সাক্ষ্য আর বিচারকের রায় লিখে রাখা, বাদী-বিবাদীর উপস্থিতি অনুসারে মোকদ্দমা প্রস্তুত করা, বিচারকের সামনে তা সুন্দরভাবে পেশ করা এবং মুসাফির বা অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া কাউকে সুবিধা না দেওয়াটাও ছিল তার কাজের অন্তর্ভুক্ত।[৬১১]

গ. ঘোষক: তার দায়িত্ব ছিল বিচারকের পাশে দাঁড়িয়ে তার মর্যাদা বিষয়ক ঘোষণা দেওয়া। বাদী-বিবাদীর উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন ঘোষণা দিতেন। উমাইয়া যুগেও

---

[৬০৮] কাযিউল কুযাতকে স্পেনে কাযিউল জামাআত বলা হতো। এই পদাধিকারীর কর্তব্য ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারক নিযুক্ত করা। সামনে বিষয়টি আলোচনা হবে। (নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৪৪)

[৬০৯] তারীখুল কাদা, পৃ. ৯৬

[৬১০] ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২৪৮; আল-উযারাউ ওয়াল কুত্তাব, পৃ. ৭৪; আদাবুল কাযি: ২/৫৭; উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ, পৃ. ৬৬

[৬১১] আন-নুযুমুল কাদাইয়্যাহ, পৃ. ৬৯

এ ঘোষকের প্রচলন ছিল।[৬১২]

ঘ. প্রহরী, পুলিশ এবং সহায়ক : এরা ছিলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য। বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে হওয়ার জন্য পরিবেশ নিরাপদ রাখা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বাদী-বিবাদী পক্ষের লোকেরা কে কোথায় বসবে সেটা ঠিক করে দেওয়া ছিল এদের কাজ। আদালতে প্রবেশের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, বিচারকের কাছে হুজুম না করা, এজলাসের নীতি মেনে চলা, আদালতের বাইরের পরিবেশ সুশৃঙ্খল রাখা এবং বিচারক আর এজলাসের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখার দায়িত্বও তারা পালন করতেন।[৬১৩]

ঙ. তদন্ত কর্মকর্তা : আব্বাসি যুগেই এ পদটি সর্বপ্রথম চালু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বিচারকের সামনে উত্থাপিত বিষয়ের যথার্থতা যাচাই করা। আবু হানিফা ؓ-এর বিশিষ্ট সহচর বিচারক মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান ইবনি আবি লাইলা সর্বপ্রথম এ পদটি চালু করেন। উমাইয়া যুগেও তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। সর্বমোট ৩৩ বছর বিচারকার্য পরিচালনার পর অবশেষে ১৪৮ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল-কিনদি বর্ণনা করেন, ১৭৪ হিজরিতে মিশরের বিচারক ছিলেন আল-মুফাদদাল ইবনু ফাদ্বালাহ। সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনি তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছিলেন। যার মূল কাজ ছিল সততা যাচাই করা। সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে নাকি প্রত্যাখ্যাত, যাচাইকারী সেটা বিচারকের কাছে উল্লেখ করতেন।[৬১৪] আল-কিনদি আরও বলেছেন, খলিফা মানসুরের সময় গাউস ইবনু সুলাইমানই সাক্ষীদের ব্যাপারে প্রথম তদন্ত করেন।[৬১৫]

চ. বণ্টনকারী : পাওনাদারদের মাঝে পাওনা বণ্টন করা এবং জমি-সংক্রান্ত মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল তার কর্তব্য। অনেক সময় তাকে 'হিসাবকারী'-ও বলা হতো।[৬১৬] যার বিবরণ ও নীতি সম্পর্কে আল-মাওয়ারদি বলেছেন, 'বিচারকের মতোই গবেষণার ভিত্তিতে বণ্টনের দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। তবে মুনশি কর্তৃক রায় সংরক্ষণ করা এবং শোনা বক্তব্য নথিভুক্ত করার বিষয়টি ছিল ভিন্ন। তার কোনো রকম গবেষণার সুযোগ থাকত না।'[৬১৭] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ؓ-এর পৌত্র কাসিম ইবনু আবদির রহমান ؓ বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন, 'চারটি

---

[৬১২] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪০৮

[৬১৩] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪১১; আন-নুযুমুল কাহ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৯

[৬১৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৩৮; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৮৫; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪০৯; উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ, পৃ. ৬৬

[৬১৫] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৬১

[৬১৬] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪০৭

[৬১৭] আদাবুল কাদ্বি : ২/৬৫

কাজে কোনো ধরনের পারিশ্রমিক নেওয়া যায় না। সেগুলো হচ্ছে : বিচারকার্য পরিচালনা, আযান দেওয়া, হিসাব-নিকাশ করা এবং কুরআন পড়া বা পড়ানো। আর হিসাব-নিকাশ মানে হচ্ছে বণ্টন করা।'[৬১৮]

ছ. দায়িত্বশীল : এই কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ছিল বিচারকদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করা। যেমন ইয়াতিম, অসহায়-অক্ষম, নাবালেগ এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিদের সম্পদ দেখাশোনা করা। উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি বণ্টন হওয়ার আগ পর্যন্ত দেখভাল করাও ছিল তাদের দায়িত্ব।[৬১৯] বিচারক আবদুল্লাহ ইবনু সাওয়্যার সর্বপ্রথম লোক নিয়োগ দিয়ে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব প্রদান করেন। এর আগে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ওসিয়তকৃত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দেওয়া হতো। হারিস ইবনু মিসকিন ছিলেন মিশরে এ পদ চালুকারী বিচারকদের অন্যতম।[৬২০]

জ. আদালতের নথি সংরক্ষক : এ পদের লোকের দায়িত্ব ছিল বিচারকের সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ বিশেষ স্থানে সংরক্ষণ করে রাখা। যাতে বহিরাগত লোকজন থেকে তা নিরাপদ থাকে এবং বিচারক সহজেই তা খুঁজে বের করতে পারেন। আবার বিচারকের মৃত্যু হলে কিংবা তাকে পদচ্যুত করা হলে নতুন নিযুক্ত বিচারকও যেন তা দেখতে পারেন। প্রয়োজনে পূর্ববর্তী সাক্ষ্য, মোকদ্দমা ও রায়কে সামনে রাখতে পারেন। এ ধরনের ব্যবস্থা মিশরেও চালু ছিল বলে আল-কিনদি জানিয়েছেন।[৬২১]

এসব সহায়ক ছাড়া দোভাষীরও প্রচলন ছিল। কারণ অনেক জনগোষ্ঠী ইসলামি খিলাফতের অধীনে চলে আসছিল। যাদের মাঝে ভাষাগত কোনো মিল ছিল না। তাই ভিনভাষী বাদী-বিবাদী এবং সাক্ষীদের বক্তব্য বোঝার সুবিধার্থে বিচারকরা দোভাষী নিয়োগ দিয়েছিলেন। বিচারকের রায় ভাষান্তর করে দেওয়াও ছিল এই দোভাষীদের কাজ।[৬২২]

আব্বাসি খলিফাগণ এবং অন্যায়ের বিচার

আব্বাসি খিলাফতকালে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা এবং অপসারণের দায়িত্ব থেকে খলিফাদের সরে যাওয়ার কথা শুনলে মনে হতে পারে, তারা বুঝি বিচারকার্য সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, সত্য এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না। অথচ বাস্তব চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিচারব্যবস্থার প্রতি পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে তারা ভীষণ যত্নবান ছিলেন। তবে তা বাস্তবায়নের জন্য বিচারক এবং প্রধান বিচারপতিকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। অপরদিকে

[৬১৮] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/৭
[৬১৯] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪১৮; আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৯
[৬২০] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪৬৯; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪১৯
[৬২১] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৫৭৪
[৬২২] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪২৩

বিচারব্যবস্থার এমন দিকে তারা নিজেরা মনোনিবেশ করেছিলেন, যা বাস্তবায়ন করতে ন্যায়পরায়ণতার পাশাপাশি প্রশাসকের ক্ষমতারও দরকার পড়ে। সেটা হলো অন্যায় দমন সংক্রান্ত বিচার। আব্বাসি খলিফাগণ প্রথম থেকেই এর প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

উমাইয়া যুগে শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসক এবং নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে হওয়া দুর্নীতি আর অন্যায়ের বিচারকার্যের জন্য সপ্তাহে একদিন বরাদ্দ ছিল। পরবর্তীকালে কোনো কোনো খলিফা এই নীতির ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে আব্বাসি যুগের খলিফাগণ এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অনেক সময় তারা নিজেরাই এ কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। আবার কখনো-বা কোনো মন্ত্রী বা বিচারককে দায়িত্ব দেওয়া হতো।

সরকারি কর্মকর্তাদের দেখভাল করা এবং তাদের ন্যায়পরায়ণতার ওপর নজরদারি করার ব্যাপারে খলিফা মানসুর নিজেই উদ্যোগ নেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের থেকে এক দানিকের[৬২৩] হিসাবও তিনি গ্রহণ করতেন। এজন্য তাকে 'আবুদ দাওয়ানিক' বা প্রধান ব্যবস্থাপক বলা হতো।[৬২৪] মানসুরের পর অন্যায়ের বিচারের জন্য খলিফা আল-মাহদি নিজেই এজলাসে বসতে শুরু করেন। আব্বাসি খলিফাদের মাঝে এ রীতি তিনিই প্রথম চালু করেছিলেন। তিনি এত বিপুল পরিমাণে দান-খয়রাত শুরু করেন যে, খলিফা মানসুরের সঞ্চয়কৃত সম্পদ শেষ হয়ে যায়। দুর্নীতি দমন আর অন্যায়ের বিচার করার জন্য তিনি বিশেষ প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত দফতরও খুলেছিলেন। যা 'দিওয়ানুল মাযালিম' বা মজলুমদের অধিদপ্তর নামে পরিচিত ছিল।[৬২৫] তার পর এজলাসে বসেন খলিফা আল-হাদি। এরপর খলিফা আর-রাশিদ এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অনেকটা সময় এই কাজে ব্যয় করতেন। যার পেছনে অনুঘটক ছিল আবু ইউসুফ ﵀-এর হিতাকাঙ্ক্ষাসূচক পত্র। যা-তে খলিফার উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন, 'ন্যায়পরায়ণতা, অত্যাচারিতের প্রতি সুবিচার এবং অত্যাচার থেকে বিরত থাকলে দেশ আবাদ হবে। ... আমিরুল মুমিনীন! আপনি মাসে কিংবা দুই মাসে এক বার প্রজাদের সাথে হওয়া অন্যায় নিয়ে বসলে ভালো হবে। উক্ত বৈঠকে আপনি মজলুমের কথা শুনবেন এবং জালিমকে শাস্তি দেবেন।'[৬২৬]

খলিফাদের মাঝে আর-রাশিদই প্রজাদের ব্যাপারে অধিক খোঁজখবর রাখতেন।

---

[৬২৩] এক দিরহাম তথা রৌপ্যমুদ্রার ছয় ভাগের এক ভাগকে এক দানিক বলা হয়।

[৬২৪] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ২৫৯; আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২০১; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১২৭

[৬২৫] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৭৮; তারীখুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ, পৃ. ৯৪; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৩৬; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ৯৪

[৬২৬] আল-খারাজ, পৃ. ১১১ এবং ১১২

এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেশি যত্নবান। এ ক্ষেত্রে তিনিই সর্বাধিক দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন।[৬২৭]

আমিরুল মুমিনীন আল-মামুন প্রতি রবিবার অন্যায়ের বিচার করতে বসতেন। অন্যায়কারী কর্মকর্তাদের শাস্তি খলিফা কিংবা উজিরদের সামনেই কার্যকর হতো।[৬২৮]

খলিফা হওয়ার পর আল-ওয়াসিক বিল্লাহ বনু উমাইয়ার দখলকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[৬২৯] এরপর আল-মুহতাদি বিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াসিক খলিফা হলে তিনি চারটি দরজাবিশিষ্ট একটি গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন। যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'কুব্বাতুল মাযালিম' তথা অত্যাচার দমনের গম্বুজ। খলিফা নিজেই সাধারণ এবং বিশেষ শ্রেণির নাগরিকের বিচারকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে সেখানে বসতেন। আব্বাসি খলিফাদের মাঝে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ, যিনি সেখানে অন্যায় দমনের উদ্দেশ্যে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বসতেন। অবশেষে উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে রাজত্ব চলে যায়।[৬৩০]

প্রথম মন্ত্রী বা সুলতান অথবা কোনো বিচারক অন্যায় দমনের জন্য বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[৬৩১] এরপর খলিফা আয-যাহির বি আমরিল্লাহও মজলুমের কাছে তার হক ফিরিয়ে দিতেন।[৬৩২]

সাধারণত সৈনিকরা তাদের বেতন কমিয়ে দেওয়া কিংবা বেতন প্রদানে বিলম্ব হওয়ার যে অভিযোগ করত, তা দেখা ছিল অন্যায় দমন সংক্রান্ত বিচারকের দায়িত্ব। যদিও এর সমাধান করা সাধারণ বিচারকের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বাগদাদের আব্বাসি খিলাফত থেকে যেসব অঞ্চল পৃথক হয়ে গিয়েছিল, সেসব অঞ্চলেও অন্যায় ও দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত বিচারে নজরদারি করার বিষয়টি ছড়িয়ে পড়েছিল। মিশরে তুলুনি রাজবংশ, ইখশিদি রাজবংশ এবং ফাতিমি খিলাফতের সময়ও অন্যায় আর দুর্নীতি দমন বিষয়ক অধিদপ্তর ছিল। ফাতিমি খলিফাগণ অন্যায় ও দুর্নীতির বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এর আগে ৩৪০ হিজরি সালে মুহাররম মাসের শুরুতে প্রত্যেক শনিবারে কাফুর আল-ইখশিদিও দুর্নীতির বিচার করতে বসতেন।[৬৩৩]

দুর্নীতি-সংক্রান্ত আদালতের কার্যক্রম চলত খলিফা, মন্ত্রী, প্রশাসক কিংবা

---

[৬২৭] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৪০; আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৭৮

[৬২৮] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৭৮; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৬৭

[৬২৯] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৭০

[৬৩০] মুরূজুয যাহব : ২/৪৩১; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৭৫; আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৪৫

[৬৩১] সুবহুল আ'শা : ৩/৪৯৭, ৩/৫২৫, ৪/৪৪, ৫/১৪৪, ৬/২০২, ৬/২০৪ এবং ৬/২০৭ দ্রষ্টব্য

[৬৩২] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৬৫

[৬৩৩] আন-নুযুমুল কাহিরিয়্যাহ, পৃ. ৭১; সুবহুল আ'শা : ৩/৪৯৭; আল-কাদ্বা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৯৫

এ সংক্রান্ত বিচারকের নেতৃত্বে। এ আদালতে পাঁচটি ইউনিটের কাজ ছিল। ইউনিটগুলো এবং তাদের কাজ ছিল এমন,

- ☑ ক. রক্ষীবাহিনী এবং তাদের সহযোগী। যাদের কাজ ছিল সহিংসতা করতে বা পালাতে চাওয়া লোকদের নিয়ন্ত্রণ করা।
- ☑ খ. প্রশাসক এবং বিচারক। বিচারের রায় পরিপূর্ণরূপে জেনে হকদারের কাছে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণ পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের ওপর শারঈ আইন বাস্তবায়ন করার জন্য এরা থাকতেন।
- ☑ গ. ফকিহগণ। শারঈ কোনো মাসআলায় জটিলতা তৈরি হলে তার সমাধানকল্পে পরামর্শের জন্য তারা উপস্থিত থাকতেন।
- ☑ ঘ. মুনশি। এ ইউনিটের কাজ ছিল পক্ষে-বিপক্ষের দলিল-প্রমাণ এবং বক্তব্য লিখে রাখা।
- ☑ ঙ. বাদী-বিবাদী এবং বিচারকের ফয়সালার ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে একটি ইউনিট থাকত।[৬৩৪]

অনেক সময় খলিফা নির্দিষ্ট একটি দিনে বিচারপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বসতেন। বিচার নিয়ে লোকেরা তার কাছে আসত। আবার অনেক সময় নির্ধারিত ব্যক্তির অন্যায় বা দুর্নীতির বিচার করতে ডাকা হতো। প্রতিদিনই এরকম কার্যক্রম চলমান ছিল।[৬৩৫] দুর্নীতি ও অন্যায় দমনে আব্বাসি যুগের চমৎকার সব উদাহরণ রয়েছে। সেগুলোর প্রতিটির ধরনে যেমন ভিন্নতা ছিল, তেমনি সেসবের গভীরতাও ছিল চমকপ্রদ। তবে এখানে তা আলোচনা করা আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য।[৬৩৬]

❁ আব্বাসি যুগে 'হিসবাহ' বিচার

আমরা ইতিপূর্বে হিসবাহ-এর সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি। সেখানে আমরা এটাও স্পষ্ট করেছি যে, এর বীজ নববি যুগেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। খুলাফায়ে রাশিদুন নিজেরাই হিসবাহ পরিচালনা করতেন। তাঁরা নিজেরাই বাজার পর্যবেক্ষণ করতেন। কিংবা বাজার পরিদর্শনের জন্য কাউকে নিযুক্ত করতেন। উমর ﷺ রাতে-দিনে বাজার এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা পরিদর্শন করতেন। উমাইয়া যুগের খলিফাগণ, এমনকি আব্বাসি যুগের অনেক প্রশাসকও নিজেরাই এই কাজ করতেন।

তবে আব্বাসি যুগে নতুন যে বিষয়টি চালু হয়েছিল তা হলো স্বাধীন হিসবাহ

---

[৬৩৪] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৭১; আল-কাদ্বাউল ইদারি, পৃ. ১৩৭

[৬৩৫] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৭৯

[৬৩৬] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৮৪, ৮৫, ৯০ এবং ৯১। আরও দেখতে পারেন, আল-কাদ্বাউল ইদারি, পৃ. ১৪৬; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ১৮৩, ৫৫৩, ৫৬১ এবং ৫৮৫।

সংক্রান্ত বিচারব্যবস্থা। যার ফলে এর একটি বিশেষ অবকাঠামো গড়ে ওঠে। এটি পরিণত হয় বিশেষ রাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগে। একজন বিশেষ বিচারক এটার দায়িত্ব পালন করতেন। এটা প্রথমবারের মতো হয়েছিল ১৫৮ হিজরিতে আব্বাসি খলিফা আল-হাদির শাসনামলে। তারপর গোটা আব্বাসি সাম্রাজ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। হিসবাহ-এর বিশেষ দফতর তৈরি করা হয়। চালু হয় স্বতন্ত্র বিভাগ। যা বিলায়াতুল হিসাবাহ তথা হিসবাহ ব্যবস্থাপনা নামে পরিচিতি লাভ করে। এ বিভাগ থেকে পরিচালিত হওয়া বিভিন্ন কার্যাবলির মাঝে একটি হলো বিচারকার্য। খলিফা আল-মাহদির অভ্যাস ছিল রাষ্ট্রের জটিল জটিল সব বিষয় দেখাশোনা করে সেসব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। তাই নিজের খিলাফতের সময় তিনি হিসবাহ-সহ আরও অনেক নতুন কিছুর প্রচলন করেছিলেন।[৬৩৭]

হিসবাহকে বিচারব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কারণ মুহতাসিব বা হিসবাহ পরিচালকের কাজ ছিল—সৎ কাজ করা হচ্ছে না দেখলে সৎ কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজ হতে দেখলে বাধা প্রদান করা। আদেশলঙ্ঘনকারীকে তিনি বিচারের মুখোমুখি করবেন এবং শাস্তি দেবেন। প্রয়োজনবোধে তাকে বন্দি করবেন। তিনি নিজে অথবা নিজের সহযোগীদের মাধ্যমে সরাসরি অন্যায় প্রতিহত করবেন। কারও পক্ষ থেকে মোকদ্দমার ওপর নির্ভর না করে শারঈ নীতির প্রতি লক্ষ রেখে জনগণের মাঝেই তার বিচার করবেন। হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ বিধানের প্রতি তার দৃষ্টি থাকবে। আল্লাহর হক যেমন মনে রাখবেন, তেমনি জাতি, সমাজ এবং ব্যক্তির অধিকার ভুলে যাবেন না।

আসলে হিসবাহ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। কারণ সাধারণ বিচারব্যবস্থা দরকার পড়ে কেউ যদি অন্যের অধিকারের ব্যাপারে অন্যায় করে। দুই ব্যক্তির মাঝে কোনো বিবাদ হলে সুনির্দিষ্ট জায়গায় বিচারক এবং বিচারালয়ের প্রয়োজন পড়ে। যা বাদীর আবেদন এবং মামলা দায়েরের ওপর নির্ভরশীল। উভয় পক্ষের কেউ কোনো দিক থেকে দুর্বল হলে বা সাধারণ বিচারের কোনো একটি শর্ত হারিয়ে গেলে বিচারব্যবস্থা আর কোনো কাজ করতে পারে না। এ দিকগুলো থেকে বিচারালয় বেকার হয়ে যায়। দুর্বল হয়ে পড়ে বিচারব্যবস্থা।

এই বিষয়গুলো দৈনন্দিন জীবনে প্রচুর পরিমাণে এবং বারংবার ঘটে থাকে। বিচার বিভাগকে এসব বিষয়ে জড়িত হওয়া থেকে দূরে রাখতে ইসলামে হিসবাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাহলে খলিফা, প্রশাসক, আমির-উমারা এবং বিচারকদের দায়িত্বের বোঝা লাঘব যেমন হবে, তেমনি কাজ বণ্টন হয়ে যাবে।

---

[৬৩৭] উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ, পৃ. ২১; নিযামুল হিসবাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ৩৩১; আদ-দাওলাতু ওয়া নিযামুল হিসবাহ ইনদা ইবনি তাইমিয়্যাহ, পৃ. ৭৬; আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ১৩; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৩৫

ফলে সমগ্র মুসলিম জাতির ওপর প্রয়োগ হবে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুরক্ষিত থাকবে তার অধিকার। সর্বসাধারণের অধিকার নজরদারিতে থাকবে।

অনেক সময় মামলায় বাদী পক্ষ থাকে। সে ধরনের মামলায় বাদীর ক্ষতি এবং দাবি তুলনা করে দেখা হয়। তার অধিকার পুনরুদ্ধারে কর্মতৎপরতা দেখা যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অর্জন না হওয়ায় সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে অন্যায়কারীর আগ্রাসন বেড়ে যায়। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে প্রতারণা করে এবং বিধিবিধান লঙ্ঘন করে, সে আরও আশকারা পেয়ে যায়। অন্যায় তখন আগের থেকে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। জুলুম বৃদ্ধি পায় মারাত্মকভাবে। পূর্বের তুলনায় সীমালঙ্ঘন হয়ে যায় আরও গুরুতর। আপামর জনসাধারণের জন্যে যা বিশাল হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর হক এবং জনসাধারণের অধিকারের ক্ষেত্রে তা বিরাট ঝুঁকি হয়ে যায়। সর্বোপরি তা সমাজের নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে। নষ্ট হয়ে যায় এর মূল্যবোধ, বিধিবিধান এবং নৈতিকতা।

পরিচালকের দায়িত্ব ছিল এ ক্ষেত্রগুলোকে দেখভাল করা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিজের পরিধির মধ্যে অন্যায় নিয়ন্ত্রণ করা। তিনি হেঁটে হেঁটে হাট-বাজার, রাস্তাঘাট, সেতু, নদী এবং জনসমাগমের স্থানগুলো পরিদর্শন করার জন্য কাউকে দায়িত্ব দিতেন। নির্মাণ স্থাপনার সমস্ত নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, সমাজের নৈতিকতা এবং মানুষের অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত হচ্ছে কি না—তা খতিয়ে দেখতে বলতেন। অনেক সময় তিনি নিজেই বিষয়টির মীমাংসা করতেন। ভালো কাজের নির্দেশ এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করতেন। অত্যাচারী আর আগ্রাসীদের প্রতিহত করতেন। সামাজিক মর্যাদা এবং পবিত্রতা রক্ষায় অনুপ্রেরণা দিতেন। সামাজিক ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর বিরোধগুলো মিটমাট করে দিতেন। এ ব্যাপারে সাধারণ বিচারব্যবস্থার নিয়ম, মামলা, প্রমাণের উপায় তিনি মেনে চলতেন না। কারণ তার বিচার হতো বাহ্যিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। সাধারণ বিচারে বিবাদ ও বিরোধের যে সকল কৌশল অবলম্বন করা হতো, যেসব দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন হতো—সেগুলোই তিনি অবলম্বন করতেন। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, নৈতিকতা বিরোধী কাজগুলোর ক্ষেত্রে কঠোরতা করা এবং আনুগত্য, ইবাদত আর নৈতিকতাপূর্ণ কাজে উৎসাহ দেওয়া ছিল পরিচালকের দায়িত্ব।[৬৩৮]

মুহতাসিব বা হিসবাহ পরিচালকের অন্যতম দায়িত্ব ছিল পরিমাপ মনিটরিং, সিন্ডিকেট আর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধ করা। নির্মাণশিল্প ও উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়া। শিল্পের ক্ষেত্রে কে কতটা নিখুঁত—তার গুণমান যাচাই করা। জালিয়াতি প্রতিরোধ, বাজার এবং মসজিদের পরিচ্ছন্নতা তত্ত্বাবধান করা। কর্মচারী

---

[৬৩৮] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ২৪০

এবং মুয়াযযিনদের নজরদারি করা। ওই সময় মুহতাসিবের কর্তৃত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি বিচারকরা দায়িত্ব পালনে বিলম্ব করলে বা বিচারকার্য পালন না করলেও তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হতো।

বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের পেশা এবং পেশাগত ক্ষেত্রে তাদের নৈপুণ্যের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য মুহতাসিবরা তাদের পরীক্ষা করতেন। যাতে তারা অন্যদের শোষণ করতে না পারে। আব্বাসি খলিফা আল-মুতাদিদ বিল্লাহ তৎকালীন প্রধান চিকিৎসক সিনান ইবনু সাবিতকে বাগদাদে থাকা সকল চিকিৎসককে যাচাই করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তখন সেখানে প্রায় ৮৬০ জন ডাক্তার ছিলেন। মুহতাসিবের প্রতি খলিফার নির্দেশনা ছিল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া একজন চিকিৎসককেও যেন প্র্যাকটিস করতে দেওয়া না হয়। ফার্মাসিস্ট এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও একই বিধান ছিল। কায়রোতে ওজন পরিমাপক দফতরটিতে বিক্রেতারা নির্দিষ্ট সময়ে যাতায়াত করত। তাতে কোনো ধরনের ত্রুটি থাকলে তা পরিবর্তন করা বা সারিয়ে নেওয়ার আদেশ ছিল। আদেশ অমান্যকারীকে শাস্তি দেওয়া হতো। এই দফতরটি মামলুকদের রাজত্বকাল পর্যন্ত বহাল ছিল।[৬৩৯]

এভাবে হিসবাহ বিভাগ সাধারণ বিচার বিভাগের পাশাপাশি একটি স্বাধীন বিভাগে পরিণত হয়েছিল। প্রকাশ পেয়েছিল এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক। যেগুলোতে মুহতাসিবের শর্তাবলি এবং তার এখতিয়ারের সীমার বর্ণনা থাকত। একজন সাধারণ বিচারক এবং দুর্নীতি-সংক্রান্ত বিশেষ বিচারকের মধ্যকার পার্থক্য এবং তাদের ওপর আরোপিত দায়িত্ব নির্ধারণ করাও ছিল হিসবাহর কর্তব্য। অনেক প্রসিদ্ধ আলিম এবং ফকিহ বাগদাদ এবং বাগদাদের বাইরে বিভিন্ন শহরে হিসবাহর দায়িত্বে ছিলেন। আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আল-আসতাখারি শাফিয়ি ছিলেন তাদের অন্যতম।

সামরিক বাহিনীর বিচার

আব্বাসি যুগে চালু হওয়া আরেকটি পদ ছিল সামরিক বাহিনীর বিচারক। সামরিক বাহিনীর নিজেদের মধ্যকার বিরোধ কিংবা অন্যদের সাথে তাদের ঘটে যাওয়া বিরোধ নিরসনের জন্য বিচারক তাদের সাথেই থাকতেন।[৬৪০]

সামরিক বাহিনীর বিচারক পদ্ধতি চালু হয়েছিল প্রথম আব্বাসি যুগে। ওয়াকি এ সংক্রান্ত প্রথম ঘটনাটি সাদ ইবনু ইবরাহীম আয-যুহরির জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। সাদ ইবনু ইবরাহীম ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবি আবদুর রহমান ইবনু আউফ

[৬৩৯] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ২৪৩; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৫৯৯; আল-কাদ্বাউল ইসলামি, পৃ. ২৮৭

[৬৪০] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৫৮; আল-কাদ্বাউল ইসলামি, পৃ. ৫৯

ﷺ-এর বংশধর। বাগদাদের পূর্বাঞ্চলে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। আল-মানসুর ইবনুল মাহদির ফিতনার সময় সাদকে পদচ্যুত করা হয়। সে-সময় আল-মুরতাদ্বা নাম দিয়ে ইবনুল মাহদির খিলাফতের জন্য মিম্বরে দুআ করা হতো। পদচ্যুতির পর সাদ গিয়ে হাসান ইবনু সাহলের সাথে মিলিত হন। ইবনু সাহল ছিলেন খলিফা আল-মামুনের মন্ত্রী। তিনি সাদকে সামরিক বাহিনীর বিচারক নিযুক্ত করেন। এটা হিজরি ২০১ সালের কথা।[৬৪১]

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের আগে ১৫১ হিজরিতে আল-মাহদি রায় নগরীতে নিজেই সামরিক বাহিনীর মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কেবল সৈন্যদের মাঝে কলহ মিটিয়ে দেওয়ার কাজ করতেন। অন্যদের ব্যাপারে তার কোনো কাজ ছিল না।

সামরিক বাহিনীর বিচারক একটি ভালো জায়গা করে নেয়। বিভিন্ন স্থানে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আবুল আব্বাস আল-কালকাশান্দি তার *সুবহুল আ'শা* গ্রন্থে ধর্মীয় দায়িত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় লিখেছেন, 'দ্বিতীয় প্রকার ধর্মীয় দায়িত্ব হচ্ছে সামরিক বাহিনীর বিচারকার্য পরিচালনা করা। এটা এক সম্মানজনক প্রাচীন দায়িত্ব, যা সুলতান সালাহুদ্দিন ইউসুফের সময় চালু ছিল। এ দায়িত্ব পালনকারী মিশরে বিচারকদের সাথে বিচারালয়ে উপস্থিত থাকতেন। সুলতানের সফরকালে তারা সাথে থাকতেন। তারা তিনজন যথাক্রমে শাফিয়ি, হানাফি এবং মালিকি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। সেখানে হাম্বলি মাযহাবের কেউ থাকতেন না। বিচারালয়ে তারা ছাড়াও চারজন বিচারক থাকতেন। ... পরবর্তীকালে হাম্বলি মাযহাবের বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়।'[৬৪২]

সামরিক বাহিনীর বিচারকদের অন্যতম ছিলেন ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব ইবনি কাসির আল-আনসারি। খলিফা আর-রাশিদ তাকে আল-মাহদির বাহিনীতে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইসমাঈল ইবনু ইসহাক ২৫৫ হিজরি পর্যন্ত আল-মাহদির সেনানিবাসে বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন। এরপর তিনি দায়িত্ব থেকে সরে যান।[৬৪৩]

❁ বিচারকের ভাতা

আব্বাসি খলিফাগণ কর্তৃক বিচারকদের ভাতা বৃদ্ধি করার বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। খলিফা মানসুর মিশরে আবদুল্লাহ ইবনু লাহিআহকে বিচারক নিযুক্ত করার সময় তার মাসিক ভাতা ৩০ দিনার নির্ধারণ করেছিলেন।[৬৪৪] খলিফা

---

[৬৪১] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৬৯

[৬৪২] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৬

[৬৪৩] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৮০

[৬৪৪] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৬৯; যুহরুল ইসলাম : ২/২৫১; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২১৩

আর-রাশিদের যুগে বিচারক প্রধান প্রধান নগরীগুলোতে বার্ষিক ১ হাজার দিনারের কমে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না। আল-মুফাদদাল ইবনু ফাদ্বালাহকে খলিফা মাসিক ৩০ দিনারের বিনিময়ে মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ দিয়েছিলেন।[৬৪৫]

১৯৮ হিজরিতে খলিফা আল-মামুনের সময় ১৬৮ দিনারের বিনিময়ে আল-ফাদল ইবনু গানিমকে মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন এমন ভাতা ধার্য করা প্রথম বিচারক।[৬৪৬] মিশরের বিচারক ইবনু হারবুইয়াহ'র মাসিক ভাতা ছিল ১২০ দিনার।[৬৪৭] এরপর বিচারকের জন্য প্রতিদিন সাত দিনার ধার্য করা হয়। এরপর আবুল জায়শ তার বিচারক মুহাম্মাদ ইবনু আবদিহি ইবনি হারব (মৃত্যু ৩১৩ হিজরি) -এর জন্য মাসে ৩ হাজার দিনার ধার্য করেন।[৬৪৮] পর্যটক নাসির খসরুর সূত্রে আহমাদ আমিন বর্ণনা করেছেন, 'মিশরে প্রধান বিচারপতির মাসিক ভাতা ছিল ২ হাজার দিনার।'[৬৪৯]

সাধারণভাবে বিচারক নিযুক্তির প্রধান কারণ ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সকলের অধিকার সুরক্ষা এবং দ্বীন ও শরীয়ত কার্যকর করা। এ কারণেই বিচারকদের কাছে পারিশ্রমিকের বিষয়টা ছিল গৌণ। ভাতা গ্রহণ করা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। এ কারণে অনেকেই বেতন গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। ধর্মীয় কর্তব্য বিবেচনা করে স্বেচ্ছাশ্রম দিতেন তারা।[৬৫০] ঈসা ইবনু আবান এভাবে দশ বছর (২১১ থেকে ২২১ হিজরি পর্যন্ত) বসরার বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন।[৬৫১] খলিফা আল-হাদি মূসা কর্তৃক নিযুক্ত কাসিম ইবনু মা'ন ছিলেন তাদের অন্যতম।[৬৫২] অপরদিকে বিচারকগণ যে তাদের কাজের বিনিময়ে অনেক সম্পদশালী হয়ে গিয়েছিলেন—এমনটাও নয়। বরং তাদের অনেকেই কেবল পরিবারের ভরণপোষণ চালানোর নিমিত্তে অন্য কোনো কাজ করতেন। এই বাস্তবতার স্বীকৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক ইবনু খালদুন লিখেছেন, 'ধর্মীয় দায়িত্ব পালনকারী যেমন বিচারক, ফতোয়াদাতা, শিক্ষক, ইমাম, খতিব এবং মুয়াযযিন—সাধারণভাবে এদের অবস্থা কখনোই স্বচ্ছল হয় না। ... নিজেদের কর্মের জন্য মানুষের মাঝে তারা শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। নিজেদেরও তারা এমনটাই মনে করে থাকেন। তাই পদমর্যাদার অধিকারীদের কাছে নতিস্বীকার

[৬৪৫] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৪৮

[৬৪৬] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৭৭

[৬৪৭] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪২১; যুহরুল ইসলাম : ২/২৫১; আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৪৮

[৬৪৮] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ২৩৩, ২৪১

[৬৪৯] যুহরুল ইসলাম : ২/২৫১

[৬৫০] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২১৪

[৬৫১] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/১৭১-১৭২। মৃত্যুকালে সন্তানের জন্য তিনি কিছু রেখে যাননি।

[৬৫২] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/১৭৫, ১৭৭

করে অধিক সম্পদ সঞ্চয়ের পথে তারা অগ্রসর হন না। আসলে তারা যে মহান কর্মে মশগুল আছেন, এর মর্যাদাই তাদেরকে পার্থিব ক্ষমতার পেছনে দৌড়ানো থেকে বিরত রাখে। কারণ এমন করাটা তাদের জন্য শোভনীয় নয়। এজন্যই বিত্তশালী হওয়াটা সাধারণত তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ... আমার হাতে খলিফা আল-মামুনের হিসাব দফতরের কিছু ছিন্নপত্র আছে, যা-তে তৎকালীন আয়-ব্যয়ের অনেক হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। বিচারক, ইমাম এবং মুয়াযযিনের ভাতার যে হিসাব আমি দেখলাম, তা থেকে আমার ওপর্যুক্ত কথাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।'[৬৫৩]

বিচারকদের ভাতা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দেওয়া হতো।[৬৫৪] তবে এটা সত্য যে, আব্বাসি যুগের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু সময় এ অবস্থার অবনতি হয়েছিল। কোনো কোনো বিচারক নিজেদের কর্মকে সম্পদ জমানোর কাজে লাগিয়েছিল। ট্যাক্স বসিয়ে আপামর সাধারণ মানুষের সম্পদ লুটে নিত। এ নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব।

❁ বিচারের স্থান

আব্বাসি যুগে বিচারকার্য পরিচালনার কোনো নির্ধারিত স্থান ছিল না। অনেক বিচারক নিজের ঘরে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এদের অন্যতম ছিলেন খায়র ইবনু নুআইম। ১২০ হিজরি থেকে ১২৭ হিজরির মাঝামাঝি সময়টাতে তিনি মিশরের বিচারক ছিলেন।[৬৫৫]

রাজধানী কিংবা বড় বড় শহরে বিচারালয় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও সর্বত্র তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। বিচারব্যবস্থা সকলের জন্য উন্মুক্ত। তাই বিচারকরা সাধারণত মসজিদে বা মসজিদের দরজায় বসতেন। খায়র ইবনু নুআইম মসজিদে বসে মুসলিমদের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, আর খ্রিষ্টানদের বিচার করতেন মসজিদের দরজায় বসে।[৬৫৬] খলিফা আল-মামুন ২১৭ হিজরিতে মিশরে এসে ইয়াহইয়া ইবনু আকসামকে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য মসজিদে বসতে বললে তিনি শনিবারে সেখানে বসতে শুরু করলেন।[৬৫৭]

২১৭ হিজরির রমজান মাসে হারুন ইবনু আবদিল্লাহকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ দিয়ে তার কর্মক্ষেত্র মসজিদে নির্ধারণ করলেন। হারুন শীতকালে কিবলার দিক পেছনে রেখে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মসজিদের সামনে বসতেন। আর

---

[৬৫৩] ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

[৬৫৪] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৪৮

[৬৫৫] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৫১; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪৭৪

[৬৫৬] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৫০ এবং ৩৯০

[৬৫৭] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪৪১-৪৪২

গ্রীষ্মকালে বসতেন মসজিদের ভেতরে।[৬৫৮]

আল-মুফাদদাল ইবনু ফাদ্বালাহ মসজিদের ভেতর জুমুআর পর থেকে আসর পর্যন্ত বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এরপর দুআয় মনোনিবেশ করতেন।[৬৫৯]

হিজরি তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে খলিফা আল-মুতাদিদ মসজিদের ভেতরে বিচারককে বসতে নিষেধ করেন। তবে এই নিষেধাজ্ঞাটি সর্বজনীন ছিল না বিধায় তা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িতও হয়নি। অনেক বিচারক মসজিদেই বিচারকার্য পরিচালনা করতে থাকেন।[৬৬০]

❁ একাধিক বিচারকের পদ

আব্বাসি যুগে বিচারব্যবস্থায় যে বিষয়টি নতুন সংযোজিত হয়েছিল, তা হলো একই পদে একাধিক বিচারক। পূর্বে এমনটা ছিল না। এর পদ্ধতি ছিল এমন যে, একই সময়ে একাধিক বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো। এই নিয়োগ দানের পদ্ধতি ছিল তিন রকমের। এক ধরনের পদ্ধতি ছিল বিরল এবং তার বিধান কী হবে—তা নিয়ে ফকিহগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। এক ধরনের পদ্ধতি যে বৈধ—এ ব্যাপারে ফকিহগণ একমত। আরেক ধরনের পদ্ধতি ঐতিহাসিক অবস্থা অনুসারে আবশ্যক ছিল, কিন্তু বর্তমানে তার প্রয়োজনীয়তা নেই।

▪ ক. দলবদ্ধভাবে বিচার করা

একটি মোকদ্দমার জন্য দুই বা ততোধিক বিচারক একসাথে নিযুক্ত হওয়া। বিচারকার্য পরিচালনার সুস্পষ্ট শারঈ বিধান অনুসারে এই পদ্ধতিটি বৈধ হবে কি না—তা নিয়ে ফকিহগণ দুই ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন।[৬৬১] অবশ্য এমনটা খুব কমই সংঘটিত হতো। সাধারণভাবে ইসলামের ইতিহাসে এবং বিশেষভাবে আব্বাসি যুগে এমন ঘটনার সংখ্যা নগণ্য। কেবল দুয়েকটা ঘটনার কথাই আমরা জানতে পেরেছি।

প্রথম ঘটনা: উমর ইবনু আমির আস-সুলামির জীবনীতে ওয়াকি লিখেছেন, বসরার প্রশাসক সুলাইমান ইবনু আলি ১৩৭ হিজরিতে বসরার বিচারক আব্বাদ ইবনু মানসুরকে পদচ্যুত করে তার জায়গায় উমর ইবনু আমির এবং সাওয়্যার ইবনু আবদিল্লাহকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। তারা দুজনই একসাথে এজলাসে বসতেন। উমর বাদী-বিবাদীর সাথে কথা বলতেন, আর সাওয়্যার নীরব থাকতেন। একবার তাদের কাছে একটি মোকদ্দমা আসে। মোকদ্দমাটি ছিল বিক্রিত পণ্য

---

[৬৫৮] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪৪৩; যুহরুল ইসলাম : ২/২৫০

[৬৫৯] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৮০

[৬৬০] যুহরুল ইসলাম : ২/২৫০

[৬৬১] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯১; উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ, ৮৯

ত্রুটিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে। ইবনু আমির তখন মদীনাবাসীদের অনুসরণে ত্রুটিযুক্ত পণ্যের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ফয়সালা করেন। পক্ষান্তরে সাওয়্যার বলেন, এ ক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্য ফেরত দেওয়া হবে। উভয়ের ফয়সালা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় প্রশাসক সুলাইমান তখন সাওয়্যারকে অপসারণ করে উমরকে বহাল রাখেন।[৬৬২]

দ্বিতীয় ঘটনা : খতিব বাগদাদি বর্ণনা করেছেন, আল-মাহদি একবার একসাথে দুজন বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন। সাওয়্যার ইবনু আবদিল্লাহ আল-আনবারির পর উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান বসরার বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন। উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান এবং উমর ইবনু আমির একসাথে বসরার বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। উভয়ে একসাথে এজলাসে বসতেন এবং একসাথে ফয়সালা করতেন।[৬৬৩] এরপর খতিব বাগদাদি ত্রুটিযুক্ত বিক্রিত পণ্যের ঘটনা আলোচনা করেছেন। যা থেকে বুঝে আসে, পূর্বোল্লেখিত এবং বর্তমান ঘটনা—উভয়টিই অভিন্ন।

তৃতীয় ঘটনা : হারুন ইবনু ইবরাহীমের জীবনীতে আল-কিনদি লিখেছেন, 'তারপর হারুন ইবনু ইবরাহীমকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলে তার নিয়োগপত্রটি আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক আল-জাওহারি এবং আহমাদ ইবনু আলি আল-মাদায়িনির কাছে পেশ করা হয়। ... এরপর তারা উভয়েই নির্দেশনাটি মেনে নেন। এটা ছিল ৩১৩ হিজরির ৯ রবিউল আউয়াল জুমুআর দিনের কথা। সেদিন লোকদের সামনে নিয়োগপত্রটি পড়ে শোনানো হয়। এরপর ৩১৩ হিজরির যিলহজ মাসে আবদুর রহমান এবং ইবনু ইসহাককে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য এককভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়।'[৬৬৪]

অবশ্য অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিচারকার্য পরিচালনার জন্য চার মাযহাবের বিচারকদের একসাথে নিয়োগ দেওয়া হতো। এমন ক্ষেত্রের বর্ণনা আমরা সামনে উল্লেখ করব।

বিচারকদের সম্মিলিত রায়ের কথা পাওয়া যায়—এমন অনেক ঘটনার বিবরণও ইতিহাসে আছে। যেমন ঈসা ইবনুল মুসাইয়াব আল-বাজালির জীবনীতে ইবনু সাদ লিখেছেন, 'ঈসা ছিলেন খালিদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-কাসরির পক্ষ থেকে নিযুক্ত কুফার বিচারক। তিনি বয়স্ক হয়ে যাওয়ায় জাবির ইবনু ইয়াজিদ আল-জুফি তার সাথে এজলাসে বসতেন। আবু জাফরের খিলাফতকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।'[৬৬৫]

আল-ইকদুল ফারীদ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে যাফির আল-কাসিমি লিখেছেন, 'খলিফা আল-হাদি পশ্চিম দিকের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নূহ ইবনু দাররাজ

---

[৬৬২] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/৫৫

[৬৬৩] তারীখু বাগদাদ : ১০/৩০৭

[৬৬৪] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪৮২-৪৮৩

[৬৬৫] আখবারুল কুদ্বাহ :.২/৫৫; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ১৪৩

এবং হাফস ইবনু গিয়াসকে একসাথে নিয়োগ দিয়েছিলেন।'[৬৬৬] অবশ্য এটা অসম্ভব। কারণ ওয়াকির বর্ণনামতে কাসিম ইবনু মা'নের মৃত্যুর পর নূহ ইবনু দাররাজকে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য খলিফা হারুন নিয়োগ দিয়েছিলেন। এরপর তাকে পদচ্যুত করে হাফস ইবনু গিয়াসকে নিয়োগ দান করেছিলেন। ১৯৪ হিজরিতে বসরায় তার মৃত্যু হয়।[৬৬৭]

আল-কাসিমি এটাও বর্ণনা করেছেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ এবং ইবনু ইয়াজিদকে খলিফা আল-মাহদি একত্রে বিচারকার্যের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তারা দুজন একসাথে রুসাফার মসজিদের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।'[৬৬৮] কিন্তু এ বর্ণনা থেকে উভয়ের এক রায় দেওয়ার কথা স্পষ্ট হয় না। বরং তাদের দুজনের একসাথে মসজিদে থাকার কথা প্রমাণিত হয়। সামনে এ বিষয়টি আমরা আলোচনা করব। অবশ্য আল-কাসিমি নিজেও আগের পৃষ্ঠাতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

▪ খ. এক দেশে একাধিক বিচারক

এমনটা হওয়ার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। বিচারক দুজন দেশের দুই অংশে দায়িত্ব পালন করার শর্তে এভাবে বিচারক নিয়োগ দেওয়া ফকিহদের সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।[৬৬৯] যেমন একজন বিচারককে বাগদাদের পূর্ব অংশে, আর অপরজনকে পশ্চিম অংশে নিয়োগ দেওয়া হতো। খলিফা আল-মাহদির সময় বাগদাদে এবং অন্যান্য শহরে এটা হয়েছিল। ওয়াকির বর্ণনায় পাওয়া যায়, ২৫৩ হিজরিতে বাগদাদের পূর্ব অংশ খলিফা মানসুর কর্তৃক নির্মিত মাদীনাতুস সালামে ইবরাহীম ইবনু ইসহাক বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[৬৭০] সে-সময় পশ্চিম অংশের বিচারক ছিলেন সাদ ইবনু ইবরাহীম।[৬৭১]

একই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থাকলে এর বিধান কী হবে—তা নিয়ে ফকিহদের ইখতিলাফ রয়েছে। তবে বৈধ হওয়ার মতটিই প্রাধান্য দেওয়ার মতো।[৬৭২] যেমন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ এবং আফিয়াহ ইবনু ইয়াজিদের জীবনীতে ওয়াকি লিখেছেন, 'খলিফা আল-মাহদি এরপর মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহকে আল-মাহদি সেনানিবাসে[৬৭৩] বিচারকার্য পরিচালনায় নিয়োগ দিয়েছিলেন। তার সাথে আফিয়াহ

[৬৬৬] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ১৪৪
[৬৬৭] আখবারুল কুদ্বাহ : ২/১৮২, ২/১৮৪, ২/২৮৫
[৬৬৮] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ১৪৩
[৬৬৯] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৯৮
[৬৭০] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯১
[৬৭১] আখবারুল কাদ্বা : ৩/২৬৫; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯২
[৬৭২] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯১
[৬৭৩] এই এলাকাটি বর্তমানে রুসাফা নামে পরিচিত। (মারাসিদুল ইত্তিলা : ২/৬৪১)

ইবনু ইয়াজিদকেও দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ইবনু সাঈদ বলেছেন, আলি ইবনুল জাদ আমাকে জানিয়েছেন, "তাদের দুজনকে আমি রুসাফার জামে মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করতে দেখেছি। একজন এপাশে ছিলেন, আরেকজন ছিলেন ওপাশে।"'[৬৭৪]

বাগদাদের পশ্চিম অংশে যারা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, ওয়াকি তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। তাদের আখ্যায়িত করেছেন মানসুরের নগরীর বিচারক হিসেবে।[৬৭৫] শাইখ মুহাম্মাদ আরনুস বলেছেন, 'ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, বড় বড় অঞ্চলে একাধিক বিচারক দায়িত্ব পালন করতেন। বাগদাদ অনেক সময় একজন বিচারকের অধীনে ছিল। আবার অনেক সময় দুজন বিচারকও সেখানে দায়িত্ব পালন করেছেন।'[৬৭৬]

▪ গ. একাধিক মাযহাবের বিচারক

নববি যুগ, রাশিদুন যুগ এবং উমাইয়া যুগের বিচারকরা ছিলেন মুজতাহিদ। শরীয়তের মৌলিক উৎস অনুসারে কৃত নিজেদের ইজতিহাদের মাধ্যমে তারা মোকদ্দমা, বিরোধ এবং কলহ নিষ্পত্তি করতেন। কিন্তু আব্বাসি যুগে অনেক ফিকহি মাযহাব চালু হয়। চারটি মাযহাব স্থিতি লাভ করে। অনেক মাযহাব আবার বিলুপ্তও হয়ে যায়। স্থিতি লাভ করা মাযহাবগুলো ভৌগোলিকভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিচারকরা সাধারণত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বক্তব্য এবং তাদের অঞ্চলে থাকা নির্ভরযোগ্য মাযহাব অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। সে হিসেবে শামের বিচারকরা আওযায়ি ﵀-এর মাযহাব অনুসারে ফয়সালা করতেন। এই মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে গেলে তারা শাফিয়ি মাযহাব অনুসরণ করতে থাকেন। মিশরেও শাফিয়ি মাযহাবের প্রচলন ছিল। খোরাসানে শাফিয়ি এবং হানাফি—উভয় মাযহাবই চলত। বাগদাদে এবং ইরাকে চার মাযহাবের অনুসারীই ছিলেন। তবে বিচারকরা সাধারণত আবু ইউসুফ ﵀-এর সময় থেকে হানাফি মাযহাব অনুসরণ করতেন। ইবনু সুরাইজ এবং আবু হামিদ আল-আসফারাইনির মতো শাফিয়ি মাযহাবের বিচারক, আবদুল ওয়াহাব মালিকির মতো মালিকি মাযহাবের বিচারক এবং আবু ইয়ালা আল-ফাররার মতো হাম্বলি মাযহাবের বিচারক বাগদাদে এবং ইরাকে বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

মাযহাবের সিদ্ধান্ত ভিন্ন হওয়ায় বিচারকার্যের ফয়সালার মাঝেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতো। এই মতভিন্নতার কারণে পরিস্থিতি অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়ে পড়ত। যেমন, মিশরে ওয়াকফ ব্যবস্থা হানাফি এবং শাফিয়ি মাযহাব অনুসারে চলত। তারপর হানাফি মাযহাব অনুসারে তা নিষিদ্ধের রায় দেওয়া হয়। শপথ এবং

[৬৭৪] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৬৯
[৬৭৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/৩৬২; তারীখুল কাদ্বা, পৃ ৯৩
[৬৭৬] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৩

কসম অনুসারে ফয়সালা করার ক্ষেত্রে ভিন্নতা, পড়শির জন্য অগ্রে ক্রয়াধিকারের ফয়সালার ক্ষেত্রে মতভিন্নতা, ত্রুটিযুক্ত বিক্রিত পণ্য ফেরত দেওয়া হবে নাকি জরিমানা দেওয়া হবে—এ সংক্রান্ত মতপার্থক্য-সহ আরও নানান জটিলতা দেখা দেয়।

প্রথম আব্বাসি যুগের সময় বিচারকরা দেশে এবং শহরে প্রচলিত মাযহাব অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। দ্বিতীয় যুগের সময় প্রথম যুগে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানকল্পে চার মাযহাবের চারজন বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। এটা হয়েছিল মিশরে আল-মালিকুয যাহির বারকুক-এর শাসনামলে। কিন্তু অনেক আলিমই নব আবিষ্কৃত এ পন্থাটি পছন্দ করেননি। কেউ কেউ তো একে মুসলিম ভূমিতে মুসলিমদের মাঝে আপসে বিভক্তির কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ কারণেই মিশরের প্রধান বিচারপতি তাজুদ্দিন আবদুল ওয়াহাব শাফিয়ি (মৃত্যু ৬৬৫ হিজরি) -এর জীবনীতে ইবনুস সুবকি লিখেছেন, 'তার সময়ে আল-মালিকুয যাহির বাইবার্স প্রথমে কায়রোতে, তারপর দামিস্কে নতুন তিনজন বিচারক নিয়োগ দেন। এ বিষয়টি ছিল কেবল শাফিয়ি মাযহাব কেন্দ্রিক। তারা ছাড়া অন্য কেউ মিশরে বিচারকার্য পরিচালনা করার কথা জানা যায় না। ২৮৪ হিজরিতে আবু যুরআহ মুহাম্মাদ ইবনু উসমান মিশরের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আয-যাহিরের সময় অবধি এ অবস্থা চালু ছিল। তবে মোকদ্দমার অংশবিশেষের ক্ষেত্রে কিছু শাফিয়ি মাযহাবের বিচারক স্থলবর্তী হয়ে কার্য পরিচালনার বিষয়টি ছিল ভিন্ন। দামিস্কেও একই অবস্থা ছিল। আবু যুরআহর পর সেখানে কেবল শাফিয়ি মাযহাবই চালু ছিল। কারণ তিনি এমনটাই নিয়োগ দিয়েছিলেন। তবে তুর্কি আত-তালাশাউনি অল্প কিছুদিন সেখানে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি উমাইয়া মসজিদে নতুনভাবে হানাফি ইমাম নিয়োগ দিতে চাইলে দামিস্কের লোকেরা মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং বিচারককে পদচ্যুত করে। ফলে উমাইয়া মসজিদ শাফিয়িদের নিয়ন্ত্রণে থেকে যায়। যেমনটা ছিল ইমাম শাফিয়ি رحمه الله-এর জীবদ্দশায়। শামের বিচারক এবং উমাইয়া মসজিদের খতিব ও ইমাম নির্ধারণ আওযায়ি رحمه الله-এর মাযহাব অনুসারেই চলত। অবশেষে শাফিয়ি মাযহাব ছড়িয়ে পড়লে সেটাই সেখানে কার্যকর হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে মিশর, হিজাজ এবং শামের এই অঞ্চলগুলোতে শাফিয়ি মাযহাব ছাড়া অন্য কোনো মাযহাব চলবে না। অন্য কোনো মাযহাবের শাসক ক্ষমতায় আসলে দ্রুতই তার পতন হবে। এই অঞ্চলের জন্য এটাই আল্লাহর নির্ধারণ। তদ্রূপ মরক্কো ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর জন্য মালিকি মাযহাব এবং বুখারা-সমরকন্দের জন্য হানাফি মাযহাব নির্ধারিত।'[৬৭৭]

---

[৬৭৭] তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা : ৮/৩১৯-৩২০; হুসনুল মুহাযারাহ : ২/১৬৫-১৬৬; আন-নুযুমুল কাহিরাহ, পৃ. ৬৮

এরপর ইবনুস সুবকি লিখেছেন, 'তিনজন বিচারককে একত্র করার কথা শুনে আবু শামা মাকদিসি বলেছিলেন, "এমনটা কখনো হয়েছে বলে মনে হয় না।" তিনি সত্যই বলেছেন। পূর্বে এমনটা কখনোই হয়নি। এটার মাধ্যমে মাযহাবগুলোর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং ফকিহগণ ফিতনায় পতিত হয়েছেন।'[৬৭৮]

সুয়ূতি ﷺ *তারীখু মিশর* গ্রন্থে ইবনু মুয়াসসার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, '৫০৫ হিজরিতে আবু আহমাদ ইবনুল আফদাল বিচারকার্য পরিচালনার জন্য চারজন বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব মাযহাব অনুসারে ফয়সালা করতেন। ... এখন আমাদের যুগেও চার মাযহাবের ভিত্তিতে চারজন বিচারক রয়েছেন।'[৬৭৯]

আয-যাহির কর্তৃক একাধিক বিচারক নিয়োগ দানের পর শাফিয়ি মাযহাবের বিচারককে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া প্রসঙ্গে ইবনুস সুবকি লিখেন, 'নতুন বিচারকদের শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারী বিচারকের সাথে মিলানোর পর শাফিয়ি মতাবলম্বীদের জন্য স্বতন্ত্র ওয়াকফ বিভাগ, রাষ্ট্রীয় কোষাগার, ইয়াতিমের তত্ত্বাবধান-সহ আরও নানান অধিদপ্তর চালু করেন এবং তাদের উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তার মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখল। লোকটি তার হালত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন: চারজন বিচারক নিয়োগ দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে ভীষণ শাস্তি দিয়ে বলেছেন, "তুমি মুসলিমদের মধ্যকার ঐক্য বিনষ্ট করেছ।"'[৬৮০]

চার মাযহাবের বিচারকদের প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব-স্ব মাযহাবের প্রধান বিচারপতি পর্যায়ের। দেশে স্থলবর্তী নিয়োগ দেওয়া, বিচারক নিয়োগ দান এবং পদচ্যুতির খোঁজখবর রাখতেন এবং তাদের অবস্থা নজরদারি করতেন।[৬৮১] অনেক সময় চার মাযহাবের বিচারকগণ একত্র হয়ে হত্যা, কিসাস এবং হদের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় মোকদ্দমাগুলো দেখতেন। *মাসালিকুল আবসার* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে কাযি মাহমুদ আরনুস লিখেছেন, ভিন্ন ভিন্ন বিচারক থাকা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমাগুলো চারজন বিচারকের সামনেই পেশ করা হতো। দামিস্কের মসজিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'এখানে চারজন বিচারক এবং আলিমরা এমন সব জটিল মোকদ্দমা নিয়ে বসতেন, কোনো বিচারকের পক্ষে একাকী যেগুলো নিরসন করা সম্ভব নয়। সুলতানের প্রতিনিধির নির্দেশনা অনুসারে তারা একত্রে বসে সেগুলো নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করার পর সর্বসম্মতিক্রমে ফয়সালা

---

[৬৭৮] তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা : ৮/৩২১
[৬৭৯] হুসনুল মুহাদারাহ : ২/১৬৫; তারীখুল কাদা, পৃ. ১০৫
[৬৮০] তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা : ৮/৩২০, ৩২১
[৬৮১] আন-নুযুমুল কাদাইয়্যাহ, পৃ. ৬৮

করতেন।[৬৮২]

বিচারকার্য এবং মোকদ্দমার পদ্ধতি

আব্বাসি যুগে নতুন চালু হওয়া বিচারকার্য এবং মোকদ্দমা সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এর মাধ্যমেই তৎকালীন বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কথা শেষ হবে।

ক. মোকদ্দমা এবং বাদী-বিবাদীর ধারাবাহিকতা

বিরোধকারীরা একটি কাগজে বাদী এবং বিবাদীর নাম আদালতের উদ্দেশ্যে লিখে জমা দিত মুনশির কাছে। মুনশি তখন উপস্থিত ব্যক্তিদের ধারাক্রম অনুসারে নামগুলো সাজিয়ে নিত। এরপর বিচারক আগমন করলে তার কাছে সেগুলো পেশ করত। তারপর ধারাবাহিকভাবে বাদী-বিবাদীকে ডাকা এবং মীমাংসা করার কাজ চলতে থাকত। এ ক্ষেত্রে পদমর্যাদা বা সামাজিক অবস্থানের কারণে কিংবা বিত্তশালী হওয়ায় কাউকে আগে সুযোগ দেওয়ার প্রচলন ছিল না। তবে দূর থেকে আগত ব্যক্তিদের আগে সুযোগ দেওয়া হতো। যাতে তার ফিরে যেতে অসুবিধা না হয়। এভাবেই সমস্ত স্লিপ শেষ হওয়া অবধি আদালতের কার্যক্রম চলত। কোনো দিন সময় সংক্ষিপ্ত হলে অবশিষ্ট কার্যক্রম পরদিন শেষ করা হতো।[৬৮৩]

খ. সাক্ষী যাচাই

জীবনের ব্যাপ্তির সাথে বিচারব্যবস্থার কর্মপরিধি ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে চলছিল। সময়ের সঙ্গে মিথ্যা সাক্ষ্যরও প্রচলন ঘটে। তাই বিচারকরা সাক্ষীকে যাচাই করে নিতে শুরু করেন। সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা ও তার সম্পর্কে আপত্তিজনক কিছু না জানা গেলেই কেবল তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো। সাক্ষীর অবস্থা অজানা থাকলে তার সাক্ষ্য বিচারক গ্রহণ করতেন না। সাক্ষী অজ্ঞাত হলে তার পড়শি কিংবা পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে তার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হতো। আব্বাসি যুগে এভাবেই সাক্ষীদের যাচাইকরণ পদ্ধতি চালু হয়। পাশাপাশি তৈরি হয় তদন্ত কর্মকর্তাদের একটি টিম। সহকারী বিচারক সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা এর উল্লেখ করেছি।

খলিফা মানসুরের সময় মিশরে গাউস ইবনু সুলাইমান সর্বপ্রথম সাক্ষীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেন। এর আগে মানুষ যাকে ভালো বলে জানতেন, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। যার সম্পর্কে জানা থাকত না, বাহ্যিক অবস্থার বিচারে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না। একসময় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া শুরু

---

[৬৮২] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৬; উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ, পৃ. ৯০

[৬৮৩] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৩৯; যুহরুল ইসলাম : ২/২৫০; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৫০০

হয়। গাউসের সময় তা ব্যাপক হয়ে যাওয়ায় তিনি সাক্ষীদের সম্পর্কে গোপনে খোঁজ নিতে শুরু করেন। বিষয়টি তখন এভাবেই চলছিল।[৬৮৪]

বিচারক আল-মুফাদদাল ইবনু ফাদ্বালাহ ১৭৪ হিজরিতে মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সাক্ষীদের যাচাই করার জন্য এক ব্যক্তিকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেন।[৬৮৫]

মুহাম্মাদ ইবনু মাসরুক ১৭৭ হিজরিতে খলিফা হারুনুর রাশিদের পক্ষ থেকে মিশরে বিচারক নিযুক্ত হয়ে আসেন। এ কাজের জন্য একটি টিমকে তিনি অফিসিয়ালি নিযুক্ত করে সাধারণ মানুষকে তা জানিয়ে দেন।[৬৮৬] এরপর ১৮৫ হিজরিতে মিশরে খলিফা হারুনুর রাশিদের পক্ষ থেকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ আল-উমরি। সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনিও মাসরুকের অনুসরণ করেন। তবে তিনি এর পাশাপাশি সাক্ষীদের নাম লিখে রাখতে শুরু করেন। তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম নথিভুক্তকারী। পরবর্তী বিচারকরাও তাকে অনুসরণ করতে থাকেন।[৬৮৭]

শাইখ মুহাম্মাদ আল-খিদ্বরি বর্ণনা করেছেন, ৬৩৫ হিজরিতে শামসুদ্দিন আহমাদ আল-জুনি দামিস্কের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই শহরের মাঝে সর্বপ্রথম সাক্ষীদের জন্য অফিস চালু করেন। এর আগে সাক্ষী নির্ধারণের জন্য ন্যায়পরায়ণ লোকদের ঘরে যাওয়ার প্রচলন ছিল।[৬৮৮]

▪ গ. রায় সংরক্ষণ এবং নথিভুক্তকরণ

উমাইয়া যুগেও বিচারের রায় নথিভুক্ত করে রাখার প্রচলন ছিল। তবে সেটা ছিল সীমিত পর্যায়ে এবং স্বল্প পরিসরে। আব্বাসি যুগের বিচারকগণ সাধারণ মানুষের অধিকার সংরক্ষণ এবং বিধানের স্থিতির জন্য বিচারের রায় সংকলন এবং নথিভুক্ত করার প্রচলন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আল-মুফাদদাল ইবনু ফাদ্বালাহ (১৬৮-১৬৯ হিজরি) ওসিয়ত এবং ঋণ সংক্রান্ত ফয়সালা সংরক্ষণ করতে থাকেন। বিচারকদের মাঝে তার নথিই সর্বপ্রথম দীর্ঘ হয়েছিল। যা-তে তিনি রায়গুলো কপি করে রেখেছিলেন। তার আগে কেউ এমনটা করেনি।[৬৮৯]

১৯৮ হিজরিতে লাহিআহ ইবনু ঈসা আল-হাদরামি মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর ওয়াকফ সম্পত্তি সুবিন্যস্ত করে তার হিসাব

---

[৬৮৪] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ২৬১
[৬৮৫] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৮৫
[৬৮৬] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৮৯
[৬৮৭] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৯৪
[৬৮৮] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৪৬২
[৬৮৯] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ২৭৯

নথিভুক্ত করেন। এরপর মিশরে থাকা উপযুক্ত ব্যক্তিদের মাঝে তা বিতরণ করে তাদের জন্য ভাতা চালু করে দেন। তিনি ছিলেন এই পদ্ধতির সর্বপ্রথম প্রবর্তক। তার পর থেকে এই পদ্ধতি চালু হয়ে যায়, যা মানুষের মাঝে 'লাহিআহর পদ্ধতি' বলে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে সেটাকে 'বিচারকের পদ্ধতি' বলে নামকরণ করা হয়।[৬৯০]

এভাবেই আলিমদের মাঝে নথিভুক্তকরণের প্রচলন ঘটে। যা-তে পর্যায়ক্রমে ভিন্নতা আসে এবং ধীরে ধীরে মানুষ তার ওপর নির্ভরশীল হতে থাকে।[৬৯১]

ওয়াকি বর্ণনা করেছেন, 'মিশরের বিচারকদের মাঝে ফাদল ইবনু ফাদ্বালাহ-ই সর্বপ্রথম নথিপত্রের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুণী মানুষ এবং সজ্জন ব্যক্তি। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন বিদ্বান।'[৬৯২]

■ ঘ. বিচারের দফতর

আব্বাসি যুগেই সর্বপ্রথম বিচারের দফতর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচারকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত নথি এবং দলিল-দস্তাবেজের নানান কপি সেখানে সংরক্ষণ করা হতো। এই দফতরে মুনশি, রক্ষী এবং বিচারকের সহায়কের মতো বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী চাকরি করতেন। এর সদর দফতর ছিল বাগদাদে। খলিফা আর-রাশিদের যুগে জাফর আল-বারমাকি এই দফতরের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। এরপর পর্যায়ক্রমে তা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে।

■ ঙ. বিচারকের কোষাগার

আব্বাসি যুগে বিশেষ এলাকা বা জায়গাকে নির্দিষ্ট করে বিচারকের কোষাগার নামকরণ করা হয়। বিচারক সেখানে তার দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করতেন। এই জায়গা থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো যথাস্থানে ব্যয় করা এবং ওসিয়ত বাস্তবায়নের জন্য ওসিয়তকৃত সম্পত্তির দেখাশোনা করা ছিল বিচারকের দায়িত্ব। ইয়াতিম, পাগল, দেউলিয়া এবং নির্বোধের সম্পদের তত্ত্বাবধান, বিতর্কিত উত্তরাধিকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, মালিকের খোঁজ পাওয়া অবধি কুড়িয়ে পাওয়া সম্পত্তির হেফাজত করা এবং ভিনদেশি ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিশ আসার আগ পর্যন্ত তার সম্পত্তি দেখাশোনা করা প্রভৃতির জিম্মাদারিও বিচারককেই পালন করতে হতো। ফলে বিচারকের কাছে আমানতের অনেক সম্পত্তি জমা হয়ে যেত। সেগুলো তিনি এই কোষাগারে জমা করে রাখতেন।[৬৯৩]

---

[৬৯০] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪১৯; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩৬৪
[৬৯১] আদাবুল কাদ্বি : ২/৭৩; আদাবুল কাদ্বা, পৃ. ৪৯৪
[৬৯২] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/২৩৭
[৬৯৩] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১১৮

আগে বিচারকরা এসব সম্পত্তি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের জিম্মায় রাখতেন। কিন্তু তাতে বড়সড় গরমিল পরিলক্ষিত হতে থাকে। বিচারক খায়র ইবনু নুআইম যখন দ্বিতীয়বারের মতো দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন আমিরুল মুমিনীন আবু জাফরের নির্দেশে প্রথমবারের মতো ইয়াতিমের সম্পদ কোষাগারে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন। কোষাগারে যা রাখা হতো এবং সেখান থেকে যা নেওয়া হতো—সবকিছুই লিখে রাখার প্রচলন ছিল।[৬৯৪]

বিচারকরা নিজেদের সম্পত্তির তুলনায় এসব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি অধিক যত্নবান ছিলেন। এ ব্যাপারে তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের পরোয়া করতেন না। এমনকি এসব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের খাতিরে প্রয়োজনবোধে শাসককে উপেক্ষা করার মতো মানসিক প্রস্তুতিও তাদের থাকত।[৬৯৫] অবশ্য কেউ কেউ যে এসব সম্পত্তির ব্যাপারে লালায়িত ছিল না—এমনটা বলা যায় না। আল-কিনদি লিখেছেন, 'বিচারকের কোষাগার থেকে ইবরাহীম ইবনু আবি আইয়ুব ত্রিশ হাজার দিনার চুরি করেছিল।'[৬৯৬] এর বাইরে অনেক অসৎ বিচারকেরও এ ব্যাপারে লালায়িত হওয়ার কথা জানা যায়। *রফউল ইসর* গ্রন্থে আছে, 'ইবরাহীম ইবনু মাহমুদের কার্যক্রম প্রশংসনীয় ছিল না। তিনি বিচারের রায় দিতেন, আবার তার জিম্মায় থাকা সম্পত্তিও আত্মসাৎ করতেন।'[৬৯৭]

▪ চ. বিচারকের সিন্দুক

বিচারকরা যাতে কোষাগারের সম্পদ রক্ষা করতে পারেন সেজন্য সিন্দুকের ব্যবস্থা করা হয়। সম্পত্তি সিন্দুকে ভরে সংরক্ষণ করা হতো। আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ আল-উমারি ছিলেন আমানতদার বিচারক। কোষাগারে সিন্দুক রাখার পদ্ধতি তিনিই প্রথম চালু করেছিলেন।[৬৯৮] আল-কিনদি লিখেছেন, বিচারক মুহাম্মাদ ইবনু আবিল লাইস কোষাগারের সিন্দুকের দায়িত্ব হারুন ইবনু আবদিল্লাহকে দিয়েছিলেন। হারুন একবার অবিশ্বস্ত লোকের হাতে সিন্দুকের চাবি দেওয়ায় কোষাগারের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যায়। বিচারক তখন ইবনু আবদিল্লাহকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং শাস্তি দেন।[৬৯৯]

---

[৬৯৪] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৫৫
[৬৯৫] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১১৮; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪৭০
[৬৯৬] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪৭০। আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ গ্রন্থের ৪০৪ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
[৬৯৭] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৫৩৪
[৬৯৮] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪০৫
[৬৯৯] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪৫০

আব্বাসি যুগের গঠনমূলক বিচারব্যবস্থা

আব্বাসি যুগের গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ যুগে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিচারব্যবস্থার নির্ধারিত মৌলিক নীতিমালা এবং বৈশিষ্ট্য ছিল। বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ আর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। ইসলামি আইনশাস্ত্র পৌঁছে গিয়েছিল পরিপক্বতা, উন্নতি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও বিকাশের সর্বোচ্চ চূড়ায়। সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বিচার বিভাগের উৎস, দলিল-প্রমাণের পদ্ধতি এবং ফয়সালার বাস্তবায়ন। ইসলামি বিচারব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। এরপর দুর্নীতি এবং অবক্ষয় দেখা দিলে শুরু হয় সংস্কারের আহ্বান। আব্বাসি যুগের দ্বিতীয় অংশে বিচার বিভাগের দুটি দিক এবং দুটি চিত্র দেখা দেয়। সামনের আলোচনাগুলোতে আমরা এটাই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করব।

ফিকহি মাযহাবের প্রচলন

ফিকহ হচ্ছে শরীয়তের উৎস থেকে গৃহীত বিধানের ব্যবহারিক রূপ। হালাল-হারাম ও মানুষের অধিকারের সীমারেখা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি ফিকহ আল্লাহর বিধানের প্রতিনিধিত্ব করে। ফিকহ-শাস্ত্রই মানবজীবনের তাবৎ চাহিদার সমাধান দিয়ে থাকে।

শরীয়তের ব্যবহারিক রূপ জানার সূচনা হয়েছিল নববি যুগ থেকে। ওহির মাধ্যমে। এরপর ফকিহ, আলিম এবং মুজতাহিদ সাহাবিদের একটি বিশাল দল গড়ে ওঠে। ফকিহ সাহাবিদের ইজতিহাদ এবং অভিমতগুলো ছিল স্বতন্ত্র মাযহাব বা প্রতিষ্ঠানের মতোই। পরবর্তীকালে এর সাথে যুক্ত হয় ফকিহ তাবিয়িদের ইজতিহাদ। এদের অনেকেই ছিলেন বিজ্ঞ এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ। এর মাঝে মদীনার সাতজন ছিলেন সবার সেরা। এভাবে হিজরি প্রথম শতাব্দীর দীর্ঘ সময় ধরে শাম, ইরাক এবং মিশরে তাঁদের মতো আরও অনেক ফকিহ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অবশেষে গোটা বিষয়টি দুটি দৃষ্টিভঙ্গির রূপ নেয়। একটি হিজাজে 'মাদরাসাতুল হাদিস' নামে, আর অপরটি ইরাকে 'মাদরাসাতুর রায়' নামে পরিচিতি লাভ করে।[৭০০]

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যক্তি ফিকহের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। এই ব্যক্তিরা পূর্বের সমস্ত ফিকহি ও ইলমি তৎপরতা থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের জন্য বিশেষ ধরনের কিছু পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। অনেক বড় বড় গৌরবময় কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের চারপাশে জড়ো হয়েছিল ইলমপিপাসু ছাত্ররা। শাসকবর্গ এবং আপামর জনসাধারণ এই ফকিহগণের শরণাপন্ন হয়ে তাঁদের মতামত অনুসরণ করত। শুরু হয় তাঁদের

[৭০০] ফিকহের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানতে মানাহিজুল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩১২ এবং তার পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখুন।

বক্তব্য সংকলন কার্যক্রম। একটা সময় তাঁদের ফতোয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বতন্ত্র মাযহাব।

এই ফকিহদের মধ্য থেকে ১৩ জন ছিলেন সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ। তাঁরা হলেন :

নাম	এলাকা	মৃত্যু (হিজরি)
সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ	মক্কা	১৫৮
মালিক ইবনু আনাস	মদীনা	১৭৯
হাসান বসরি	বসরা	১১০
আবু হানিফা নুমান	কুফা	১৫০
সুফইয়ান সাওরি	কুফা	১৬১
আওযায়ি	শাম	১৫৭
শাফিয়ি	মিশর	২০৪
লাইস ইবনু সাদ	মিশর	১৭৫
ইসহাক ইবনু রাহওয়া	নিশাপুর	১৬১
আবু সাওর	বাগদাদ	২৪০
আহমাদ ইবনু হাম্বাল	বাগদাদ	২৪১
দাউদ জাহিরি	বাগদাদ	২৭০
ইবনু জারির তাবারি	বাগদাদ	৩১০

এরপর কিছু ফিকহি মাযহাব চালু হয়, যেগুলো তৎকালীন কোনো কোনো ইমাম এবং ফকিহদের দিকে সম্পৃক্ত করা হতো। বিষয়টি ছিল শিয়াদের 'ইমামিয়্যাহ' মতবাদকে ইমাম জাফর সাদিক (১৪৮ হি.) -এর দিকে, তাদের 'যায়িদিয়্যাহ' মতবাদকে যায়িদ ইবনু আলি (১২২ হি.) -এর দিকে এবং 'ইবাদিয়্যাহ' মতবাদকে আবদুল্লাহ ইবনু ইবাদ আত-তাইমি (৮০ হি.) -এর দিকে সম্পৃক্ত করার মতো। এগুলো ছাড়াও মিশরে শিয়াদের ফাতিমি মতবাদ চালু ছিল। পরবর্তীকালে এই ফিকহি মাযহাবগুলোর অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাঝে প্রসিদ্ধ চার মাযহাব তথা হানাফি, মালিকি, শাফিয়ি এবং হাম্বলি-ই কেবল বিদ্যমান রয়েছে।

এগুলোর পাশাপাশি ইমামিয়্যাহ মতাবলম্বী শিয়াদের কাছে জাফরি মাযহাব এবং ইয়ামানে যায়িদিয়্যাহ ও ইবাদিয়্যাহ মাযহাব আছে। মিশরে অবশ্য কিছুকাল

ফাতিমি শিয়াদের উবায়দি মাযহাব এবং মরক্কো ও আন্দালুসে যাহিরি মাযহাব চলত। পরবর্তীকালে ফাতিমি ও যাহিরি মাযহাব দুটি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৭০১]

❁ মাযহাব অনুসারে বিচারক

পূর্ববর্তী যুগগুলোতে এবং আব্বাসি যুগের প্রথম অংশে বিচারক নিয়োগের বিষয়টি বিভিন্ন শর্তের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বিচারকের পরিপূর্ণ গুণাবলি পাওয়া গেলেই কেবল তাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো। বিচারক নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতো বিচারক নিয়োগের প্রকৃত লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে বিচারক কোন ফিকহি মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন কিংবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি কোন মাযহাব অনুসরণ করবেন, সেটা দেখা হতো না।

অধিকাংশ সময়ে বিচারকগণ মুজতাহিদ হতেন। শরীয়তের উৎস থেকে সরাসরি বিধিবিধান বের করতেন। অবশেষে ফিকহি মাযহাব প্রকাশ পাওয়ার পরও বিভিন্ন মাযহাব থেকেই বিচারক নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টির প্রচলন ছিল। বাগদাদ, ইরাক-সহ বাদবাকি শহরে নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসারীদের সাথেই বিচারব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই ইরাকে ইবনু সুরাইজ, হুসাইন মারুযি, আবু হামিদ আল-ইসফারাঈনি, মাওয়ারদি এবং বায়যাবি-সহ শাফিয়ি ফকিহদের অনেককেই কাযির দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। আবার কাযি আবদুল ওয়াহাব আল-মালিকি, কাযি আবু ইসহাক ইসমাঈল ইবনু ইসহাক (২৮২ হি.), কাযি আবু উমর মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ, আবুল হুসাইন উমর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি ইউসুফ এবং তার ছেলে আবু নাসর ইউসুফ ইবনু উমরের মতো মালিকি মাযহাবের কয়েকজন ফকিহও বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন।[৭০২] হাম্বলি ফকিহদের মাঝে কাযি আবু ইয়ালা আল-ফাররা, তার ছেলে এবং নাতি বিচারক ছিলেন। আবার কিছু মুতাযিলাও বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন। যেমন: কাযি আবুল হুসাইন বসরি এবং কাযি আবদুল জাব্বার আল-মুতাযিলি। অবশ্য কোনো কোনো বিচারক ছিলেন শিয়া কিংবা কাদিরিয়া মতবাদের লোক। মিশরের বিচারক ইবনু হারবুয়াহ ছিলেন আবু সাওর এবং দাউদ যাহিরির অনুসারী। আবু সাওরের অধীনে তিনি কাজ করতেন।[৭০৩]

বাগদাদের প্রধান বিচারপতি (কাযিউল কুযাত) ছিলেন ইমাম আবু হানিফার ছাত্র আবু ইউসুফ। হানাফি মাযহাবের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অনেক। তাঁর অনুসারীদের অনেককে তিনি নিয়োগও দিয়েছিলেন। তবে কেবল তাদের মাঝে

[৭০১] মারজিউল উসূলিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩৬৪; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৪০
[৭০২] তবাকাতুল ফুকাহা লিশশিরাযি, পৃ. ১৪৬
[৭০৩] তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা : ৩/৪৪৬

সীমাবদ্ধ রাখেননি।

সাধারণত কোনো অঞ্চলে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের প্রচলন থাকলে সেই মাযহাবের অনুসারীদের মধ্য থেকেই বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো। সে হিসেবে দীর্ঘ সময় অবধি মিশরের বিচারব্যবস্থা শাফিয়ি ফকিহদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। শামের বিচারব্যবস্থা ছিল ইমাম আওযায়ির অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারপর সেটা শাফিয়ি ফকিহদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ইরাকের বিচারব্যবস্থা সাধারণত হানাফিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। মরক্কো এবং আফ্রিকাতে বিচারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ছিল মালিকি ফকিহদের কাছে। তবে হানাফি এবং যাহিরি মাযহাবের কিছু বিচারকও সেখানে ছিলেন। মিশরে ফাতিমি সাম্রাজ্যের সময় বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব শিয়া মতাবলম্বীদের কাছে অর্পণ করা হয়। তারপর বিভিন্ন অঞ্চলে তার প্রতিনিধিও নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সেই বিচারক দ্বীনের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর অনুসরণ থেকে বিরত থাকত। তাই আহলুস সুন্নাহর অনুসারীগণ শাফিয়ি এবং মালিকি মাযহাবের কয়েকজন বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন।[৭০৪]

৫৬৪ হিজরিতে আইয়ুবিদের যুগে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ফিকহকেন্দ্রিক দুটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শিয়া মতাবলম্বী সমস্ত বিচারককে বরখাস্ত করে তাদের জায়গায় শাফিয়ি মাযহাবের কাযিদের নিয়োগ প্রদান করেন। মাদরাসা দুটির একটি ছিল শাফিয়ি মাযহাবের, আর অপরটি ছিল মালিকি মাযহাবের।[৭০৫]

সুলতান যাহির বাইবার্স ক্ষমতায় আসার পর মিশরের বিচার বিভাগের দায়িত্ব কেবল শাফিয়ি মাযহাবের হাতে রেখে দেননি। বরং চার মাযহাবের মাঝে ভাগ করে চার মাযহাব থেকে চারজন প্রধান কাযি নিয়োগ প্রদান করেন। যাদের প্রত্যেকের অনুসরণ আবশ্যক করার পাশাপাশি গোটা দেশের মাঝে তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করার অনুমতিও দিয়ে দেন।[৭০৬]

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রায়ের ক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজ নিজ মাযহাবের দর্শন মেনে চলতেন বিধায় একই বিষয়ে ফয়সালার ক্ষেত্রে ভিন্নতা সৃষ্টি হতো। অনেক সময় এ কারণে নানাধরনের জটিলতা, গোলযোগ, মতানৈক্য এবং অস্থিরতা দেখা দিত। যেমনটা ঘটেছিল ইসমাঈল ইবনুল ইয়াসা আল-হানাফির সাথে। তাকে

---

[৭০৪] আন-নুযুমুল কাব্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৭; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৫৮। ৫২৫ হিজরিতে আহমাদ ইবনুল চারজন বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন। এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাযহাব অনুসারে বিচার এবং মিরাসের ফয়সালা করতেন। বিচারক চারজনের একজন শাফিয়ি, একজন মালিকি, একজন ইসমাঈলি এবং একজন ছিলেন ইমামি। ইতিপূর্বে এমনটা কেউ করেছেন বলে শোনা যায়নি। উবাইদিদের পতনের পর মিশরের বিচারব্যবস্থা পুনরায় শাফিয়ি মাযহাব অনুসারে চলতে থাকে। (তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১০৫)

[৭০৫] আন-নুযুমুল কাব্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৮; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৫৮

[৭০৬] আন-নুযুমুল কাব্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৮; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১০৫

মিশরে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলে তিনি সম্পত্তির ওয়াকফ পদ্ধতি বাতিল করে দিয়েছিলেন। মিশরবাসীদের কাছে কঠিন হয়ে ওঠে। তারা বিরক্ত হয়ে প্রশাসকের কাছে ইসমাঈলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। যার দরুন পরবর্তীকালে ১৬৭ হিজরিতে তাকে সরিয়ে নেওয়া হয়।[৭০৭] এ কারণটি নিয়ে আব্বাসি যুগের বিচার-সংক্রান্ত বিধিবিধানের উৎসতে আমরা আলোচনা করব।

বিচারিক বিধিবিধানের উৎস

হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে বিচারকগণ সাধারণত নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুসারে বিচার করতেন। মূলত তারা নির্ভর করতেন পূর্বোল্লেখিত শরীয়তের উৎসাদির ওপরেই। পূর্বোল্লেখিত উৎসগুলো হচ্ছে—কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ, পূর্ববর্তী কাযিদের বিচারাচার, সাহাবিদের বক্তব্য, উরফ তথা প্রচলিত রীতিনীতি।

ইমাম আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনু শাইবান আল-হাশিমিকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ দেওয়ার সময় আব্বাসি খলিফা তার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তিনামা লিখেছিলেন। যা-তে লেখা ছিল—তিনি (অর্থাৎ আবুল হাসান) যেন কুরআনকে যাবতীয় মতামতের সামনে রাখেন। এর ওপর ভিত্তি করেই যেন বিচারকার্য এবং মোকদ্দমার ফয়সালা বাস্তবায়িত হয়। কুরআনকে যেন তিনি নিজের দিকনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করেন। কুরআনই যেন হয় তার ভরসার স্থান। রাসূলের সুন্নাহকে যেন তিনি আলোর মিনাররূপে গ্রহণ করে অনুস্মরণীয় আদর্শ হিসেবে রাখেন। তার খেয়াল যেন থাকে ইজমার প্রতি। খুলাফায়ে রাশিদুনের অনুসরণ থেকে তিনি যেন বিচ্যুত না হন। যে ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার কোনো দলিল পাওয়া যাবে না, সে ক্ষেত্রে তিনি যেন ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করেন।

হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে অধিকাংশ ফকিহ ও বিচারকগণ নিজেদের মাযহাব অনুযায়ী ইজতিহাদ করতেন। বিচারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিচারক নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব মেনে চলতেন না। বরং মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের রায় অনুসারে ইজতিহাদ করতেন, যাতে বিচারের ক্ষেত্রে তারা ইজতিহাদের স্তর অর্জন করতে পারেন। অবশ্য কোনো না কোনো মাযহাবের সাথে সাধারণভাবে তাদের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কেবল সেটার ওপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকতেন না।[৭০৮]

---

[৭০৭] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৪৫; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৭১-৩৭৩

[৭০৮] আল-মাওয়ারদি বলেছেন, ঘটনা এবং বিধানাবলির ক্ষেত্রে মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত থাকা বিচারকের জন্য জরুরি নয়। বিচারক শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারী হয়ে থাকলে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ির বক্তব্যসমূহের দিকে না গিয়ে তিনি ইজতিহাদ করবেন। ইজতিহাদ মোতাবেক আবু হানিফার বক্তব্য তার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলে সেটাই গ্রহণ করবেন এবং তদনুসারে রায় প্রদান করবেন। (আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৬৭)

আল-মাওয়ারদি বলেছেন, 'শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারী কোনো কাযি হানাফি মাযহাব অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারবেন। কেননা বিচারকের জন্য নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও রায় অনুসারে ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে।'[৭০৯] এ নীতি অনুসারেই কাযি আবু ইউসুফ ؓ ওয়াকফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবু হানিফা ؓ-এর বক্তব্য গ্রহণ না করে মালিকি মাযহাব অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[৭১০]

হিজরি পঞ্চম শতকে ফিকহি মাযহাব নির্ধারিত হয়ে যায়। অধিকাংশ আলিম, ফকিহ, বিচারক এবং সাধারণ জনগণ পাঠদান, ফতোয়া এবং বিচারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একজন ইমামের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যান। ফলে বিচারকরা পূর্ববর্তীদের ফয়সালা অনুসারে বিচার করতে বাধ্য হয়ে পড়েন, যাতে সাধারণ জনগণ তাদের বিচারকার্য নিয়ে কোনো ধরনের সন্দেহে না থাকে।[৭১১]

কাযির মাযহাব থেকে ভিন্ন কোনো মাযহাবের অনুসারী মামলা নিয়ে আসলে বিচারক তখন বাদী-বিবাদীর মাযহাবের অনুসারী কোনো বিচারককে ফয়সালা করার জন্য প্রতিনিধি বানিয়ে দিতেন। এ কারণেই আল-মাওয়ারদি বলেছেন, 'যে বিচারক নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব অনুসরণ করেন, কোনো কোনো ফকিহ তাকে অন্য মাযহাব অনুসারে বিচার করতে নিষেধ করেছেন। শাফিয়ি মাযহাবের বিচারক আবু হানিফা ؓ-এর মাযহাব অনুসারে বিচার করতে পারবেন না। আবার হানাফি মাযহাবের বিচারক নিজস্ব ইজতিহাদ মোতাবেক শাফিয়ি মাযহাব অনুসারে বিচার করতে পারবেন না। কারণ এতে বিচারকার্য পরিচালনা এবং রায় প্রদানের ক্ষেত্রে অপবাদ আরোপ এবং কূটকৌশলের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'[৭১২]

আল-মাওয়ারদি আরও বলেন, 'বিচারক যখন নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব অনুসারে বিচার করবেন, ভিন্ন কোনো মাযহাব ফলো করবেন না, তখন কোনো অপবাদের সুযোগ থাকবে না। বাদী-বিবাদীও এতে সন্তুষ্ট থাকবে। রাজনৈতিক তথা শারঈ আইন এ ধরনের বিচারকার্য সমর্থন করে বটে, কিন্তু আবশ্যক করে না। কেননা তাকলিদ তথা শুধু নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুকরণ করতে বলা হয়নি। বরং শরীয়ত ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে গবেষণা করার সুযোগ দিয়েছে।'[৭১৩]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি বর্ণনা করেছেন, 'কোনো কোনো বিচারক রায় প্রদানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে লাগলে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা তখন নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব অনুসারে বিচার করা কাযিদের জন্য আবশ্যক করে দিলেন। তারা নিয়ম বেঁধে দিলেন, নির্দিষ্ট মাযহাবের পরিধি যেন অতিক্রম না করা হয়। সাধারণ

[৭০৯] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৬৭
[৭১০] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৪৩
[৭১১] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৮১
[৭১২] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৬৭
[৭১৩] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৬৭

জনগণকে সন্দেহে না ফেলে—এমন বিচারকার্যই কেবল তাদের থেকে গৃহীত হবে। তাদের বিচার যেন পূর্ববর্তীদের মতো উন্মুক্ত না হয়।'[৭১৪]

প্রত্যেক মাযহাবের গ্রন্থসমূহে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য যেসব মতামত এবং বক্তব্য লিখিত আছে, বিচারক ও ফকিহগণ সেসবের ওপরই নির্ভর করতে শুরু করলেন। শাইখ ইযযুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম (৬৬০ হি.) এটা সুস্পষ্ট করেছেন এভাবে—'নির্ভরযোগ্য ফিকহি গ্রন্থাবলি অনুসরণ করা যে বৈধ, এ ব্যাপারে বর্তমানের সব আলিম একমত। নির্ভরযোগ্যভাবে বর্ণিত হওয়ায় এসবের ওপর সবার আস্থা রয়েছে। এ কারণেই ত্রুটির সম্ভাবনা থাকার পরও আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র, ভাষা, চিকিৎসাবিজ্ঞান-সহ তাবৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত গ্রন্থসমূহের ওপর মানুষ আস্থা রাখে। ... এতটুকু বৈধতা না থাকলে ইসলামের অনেক অর্জন বেকার হয়ে পড়ত।'

শাইখ ইযযুদ্দিনের ছাত্র কারাফি আল-মালিকি (৬৮৪ হি.) -ও এমন কথাই বলেছেন। তিনি বলেন, 'মূলনীতি ছিল—ফতোয়া হবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সূত্রে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী। এটাই আসল মত। ফতোয়াদাতা যে মুজতাহিদকে অনুসরণ করবে, ফতোয়াও সে অনুযায়ী হতে হবে। যাতে মুজতাহিদের কাছে হাদিস সহিহ হওয়ার মতো ফতোয়া প্রদানকারীর কাছে ফতোয়াও সঠিক হয়। কেননা এটা মূলত দুদিক থেকে আল্লাহর দ্বীনের বর্ণনা। এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা নিষিদ্ধ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তবে বর্তমানে মানুষের মাঝে ব্যাপকতার মানসিকতা কাজ করে। তাই বর্ণনা ছাড়া কেবল বই পড়েই ফতোয়া প্রদান শুরু হয়েছে। যা দ্বীনের ক্ষেত্রে বিরাট এক ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় এবং কুরআন ও হাদিসের মূলনীতি-বহির্ভূত কাজ। তবে প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির কথা ভিন্ন। প্রসিদ্ধির কারণে সেগুলো বিকৃতি ও মিথ্যা থেকে মুক্ত থাকায় বাহ্যিকভাবে মানুষ এসবের ওপর নির্ভর করে।'

এসবের ফলে বিচারের উৎসগুলো ফিকহের কিতাবের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এসব কিতাবের অধিকাংশই ফিকহি মাযহাব অনুসারে লেখা। কোনো কোনো উৎসের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকায় এই মাযহাবগুলোও ভিন্ন ভিন্ন। যেসব উৎসের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকায় এসব মাযহাবের মাঝে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে, সেগুলো হচ্ছে : আল-ইস্তিহসান (সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত বর্জন করে উপযুক্ত মতামতকে অগ্রাধিকার প্রদান), আল-ইস্তিসলাহ (কল্যাণ যাচাই করা), আল-ইস্তিসহাব (ধারাবাহিকতার অনুমতি), সাহাবির বক্তব্য, পূর্ববর্তী আইন, আল-উরফ (প্রচলিত রীতিনীতি), ইজমাউ আহলিল মাদীনা (মদীনাবাসীদের ঐকমত্য) এবং অন্যায় নির্মূল ইত্যাদি। এগুলোর কারণে বিচারক যেসব ফিকহি মূলনীতির ওপর নির্ভর করেন, সেগুলো ভিন্ন হয়ে থাকে। এই ভিন্নতা হঠাৎ করে হয়েছে কিংবা ফিকহি মাযহাবের উত্থানের

[৭১৪] তারীখুল কাযা, পৃ. ৯৫

কারণে হয়েছে—এমন নয়। বরং বিচারকরা যখন নিজেদের ইজতিহাদ তথা ব্যক্তিগত গবেষণা অনুসারে বিচার করতেন, তখন থেকেই এই ভিন্নতা দেখা গিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইজতিহাদ ভিন্ন হওয়ার কারণে অভিমত বা দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে ভিন্নতা এসেছে। এ কারণেই খলিফা মানসুরের সময় বিচারের সমস্ত বিধান এক করার আহ্বান শুরু হয়। বিচারব্যবস্থার কিছু দিক সংস্কার করার ডাক আসতে থাকে। এটা আমরা সামনে দেখব।

❁ ফিকহি গ্রন্থাবলি সংকলন

আব্বাসি যুগে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান সংকলনের ধারা সর্বজনীনভাবে এবং বিশেষভাবে ইসলামি আইনকানুনের গ্রন্থ সংকলনের সূচনা হয়েছিল। ফিকহি মাযহাবগুলোর উত্থান এবং সেসবের স্থিতির জন্য মাযহাবের ইমামগণ, তাদের ছাত্ররা এবং তাদের পরবর্তীরা পর্যায়ক্রমে অনেক কাজ করে গেছেন। যেমন: রায় এবং দলিল-প্রমাণ পরিমার্জন করা, অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া, মাসআলা উদ্ঘাটন এবং সেসবের দলিল পেশ করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা। এ ছাড়াও তারা আমলযোগ্য দলিল আলোচনা করেছেন, মাযহাবের অনুসারীদের ফিকহি আলোচনা-পর্যালোচনার সুযোগ রেখেছেন। আবার প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীরা যেসব বিধান সংকলনে গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন—সেসব জানা, সেগুলোর প্রচার-প্রসার, পাঠদান এবং সেগুলোর ওপরই নির্ভরশীল হওয়ার প্রতিও তাদের জোর ছিল। অবশ্য সেটা সম্ভব বিচারক ও মুফতিদের জন্য মাযহাবের বিধানাবলি জানা সহজ করে দেওয়ার মাধ্যমে।

মাযহাবের ইমামগণ নিজেরাও লেখালেখি এবং সংকলনের কাজে অনেক সময় দিয়েছেন। তাদের প্রবীণ অনুসারীরাও সংকলনের কাজ করেছিলেন, যাদের মাঝে নির্দিষ্ট মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত বিচারকগণও ছিলেন। ফিকহের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ছিল উঁচু স্তরে। বিচারকার্য এবং মোকদ্দমার ক্ষেত্রে মাযহাবের বিধানাবলি সমন্বয়ের চেষ্টা করতেন তারা।

ফিকহ-সংক্রান্ত গ্রন্থের সংখ্যা কত—তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। আবার প্রত্যেক মাযহাবের গ্রন্থ পৃথক পৃথকভাবে সংকলন করা হয়েছে। এজন্য আব্বাসি যুগে লেখা গ্রন্থসমূহ এবং বিশেষভাবে বিচারব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলো নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

▪ হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

যহিরুর রিওয়ায়াহ হানাফি মাযহাবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটা মূলত মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানি ﷺ (১৮৯ হি.) কর্তৃক বর্ণিত কয়েকটি গ্রন্থের সমষ্টি। যা-তে তিনি হানাফি মাযহাবের বিধানাবলি এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত

মতসমূহের ব্যাপারে আবু হানিফা ﵀-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যগুলো সংকলন করেছেন। পরবর্তীকালে হাকিম আশ-শাহিদ (৩৩৪ হি.) *যহিরুর রিওয়ায়াহ*-এর আলোচনাগুলো একত্রিত করে সেগুলোর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন এবং রিপিট হওয়া বিষয়গুলো বাদ দিয়েছেন। এ গ্রন্থটির নাম তিনি *আল-কাফী* রেখেছেন। এরপর *আল-কাফী*-এর ব্যাখ্যায় আস-সারাখসি (৪৮৩ হি.) তাঁর ফতোয়া বিশ্বকোষ *আল-মাবসূত* লিখেছেন, যা আজ পর্যন্ত হানাফি মাযহাবের অন্যতম কিতাব।

এসব ছাড়াও হানাফি মাযহাবের আরও কিছু গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন :

- ☑ আল-খাসসাফ (২৬১ হি.) রচিত *আদাবুল কাদী* এবং সদরুস শাহিদ (৫৩৬ হি.) কৃত তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
- ☑ আস-সামনানি (৪৯৯ হি.) রচিত *রাওদাতুল কুদ্বাহ ওয়া তরীকুন নাজাহ*।
- ☑ আল-কাসানি (৫৮৭ হি.) -এর লেখা *বাদাউস সানায়ে* এবং
- ☑ আল-মুরগিনানি (৫৯৩ হি.) লিখিত *আল-হিদায়া*

▪ মালিকি মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

ইমাম মালিক ﵀ (১৭৯ হি.) কর্তৃক সংকলিত *আল-মুওয়াত্তা* হচ্ছে মালিকি মাযহাবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে হাদিস, সাহাবিদের বক্তব্য এবং ফতোয়া আছে। ইমাম মালিকের দিকে সম্পর্কিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে *আল-মুদাওয়্যানাতুল কুবরা*, যার সংকলন এবং বর্ণনা করেছেন আবদুস সালাম ইবনু সাঈদ আত-তানুখি (২৪০ হি.)। তাঁর উপাধি ছিল সাহনুন। অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মাঝে আছে আল-কারাফি (৬৮৪ হি.) রচিত *আয-যাখীরাহ*।

- ☑ খলিল ইবনু ইসহাক (৭৭৬ হি.) লিখিত *মুখতাসারু খলিল* মালিকি মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত একটি গ্রন্থ।
- ☑ ইবনু ফারহুন (৭৯৯ হি.) কর্তৃক সংকলিত *তাবসিরাতুল হুক্কাম ফী উসূলিল আকদিয়াতি ওয়া মানাহিজিল আহকাম* ইসলামি বিচারব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

▪ শাফিয়ি মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

শাফিয়ি মাযহাবের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ ইমাম শাফিয়ি ﵀ (২০৪ হি.) নিজেই রচনা করেছেন। তাঁর মাযহাবের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে *আল-উম্ম*। আল-মুযানি ﵀ (২৬৪ হি.) যার সংক্ষেপণ করে *মুখতাসারুল মুযানি* নাম রেখেছেন। ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনি (৪৭৮ হি.) উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা

করেছেন। যার নাম হলো *নিহায়াতুল মাতলাব ফী দিরায়াতিল মাযহাব*।

- ☑ শাফিয়ি মাযহাবের অন্যতম বিশাল আর বৃহৎ গ্রন্থ হচ্ছে *আল-হাভীল কাবীর*। যা আল-মাওয়ারদি ﵀ (৪৫০ হি.) সংকলন করেছেন। এ ছাড়াও *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ* নামে আল-মাওয়ারদির আরেকটি গ্রন্থ আছে।
- ☑ আশ-শিরাযি (৬৪২ হি.) প্রণীত দুটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে *আল-মুহাযযাব* এবং *আত-তাম্বীহ*।
- ☑ আল-গাযালি (৫০৫ হি.) কর্তৃক রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে *আল-বাসিত, আল-ওয়াসিত,* এবং *আল-ওয়াজিয*। এগুলোর মধ্যে *আল-ওয়াজিয*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন আর-রাফিয়ি (৬২৩ হি.), যার নাম *ফাতহুল আযিয*।
- ☑ ইবনু আবিদ দাম আল-হামাবি (৬৪২ হি.) লিখিত *আদাবুল কাদা*।
- ☑ এ ছাড়াও আন-নববি (৬৭৬ হি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থগুলো শাফিয়ি মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ রচনার অন্তর্ভুক্ত।

▪ হাম্বলি মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

হাম্বলি মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির অন্যতম হচ্ছে আবুল কাসিম ইবনুল হুসাইন ইবনি আবদিল্লাহ আল-খিরাকি (৩৩৪ হি.) কর্তৃক সংকলিত *মুখতাসারুল খিরাকি*। এই গ্রন্থটির বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ হচ্ছে *আল-মুগনী*, যা ইবনু কুদামাহ (৬২০ হি.) লিখেছেন। তাঁর লিখিত আরেকটি গ্রন্থের নাম *আল-মুকনি*। তা ছাড়া *আল-কাফী* নামেও তাঁর একটি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থগুলোও হাম্বলি মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদির অন্যতম।

- ☑ *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*-এর সংকলক কাযি আবু ইয়ালা আল-ফাররা আল-হাম্বলি (৪৫৮ হি.)।
- ☑ *আল-মুহাররার*-এর লেখক মাজদুদ্দিন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (৬৫২ হি.)।
- ☑ ইবনুল কাইয়িম ﵀ (৭৫১ হি.) -এর *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়্যাহ*।
- ☑ এ ছাড়াও ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ (৭২৮ হি.) এবং মানসুর আল-বাহুতি (১০৫১ হি.) -এর কিছু গ্রন্থের কথা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

▪ শিয়া ও যাহিরিদের কিতাব

শিয়াদের জাফারি ইমামিয়্যাহ মতাদর্শের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির মাঝে আছে নাজমুদ্দিন আবুল কাসিম আল-মুহাক্কিক আল-হিল্লি (৬৭৬ হি.) কর্তৃক সংকলিত

শারাই'উল ইসলাম এবং *আল-মুখতাসারুন নাফি*।

শিয়াদের যায়িদিয়্যাহ মতাদর্শের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো হচ্ছে ইমাম যায়িদ ইবনু আলি (১২২ হি.) কর্তৃক সংকলিত *আল-মাজমূ*, আল-মুরতাযা (৮৪০ হি.) কর্তৃক সংকলিত *আল-বাহরুয যাখখার* এবং আস-সিয়াগি (১২২১ হি.) কর্তৃক সংকলিত *আর-রাওদুন নাদীর*।

যাহিরি মতাদর্শের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে *আল-মুহাল্লা*, যা ইবনু হাযাম (৪৫৬ হি.) রচনা করেছেন।

অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা

বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সূচনা নবি-যুগেই হয়েছিল। তবে এই দীর্ঘ সময়ে বিচারব্যবস্থার যে উন্নতি এবং পরিপূর্ণতা লাভ এবং সুসংহত হয়েছিল, সেটা হলো সাধারণ বিচারব্যবস্থা। উমাইয়া যুগে পরিপূর্ণরূপে এবং বিশেষভাবে দুর্নীতির বিচারের সূচনা ঘটে। আব্বাসি যুগে 'হিসবাহ' সংক্রান্ত বিচারব্যবস্থা সুসংহত হয়ে উঠেছিল। সরকারি অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই বিভাগটির কিছু বিশেষত্ব ছিল। এখানে স্বতন্ত্র এবং পৃথক কিছু দায়িত্ব থাকত।

তদ্রূপ আব্বাসি যুগেই সামরিক বিচার বিভাগ পূর্ণতা লাভ করে। এর মাধ্যমেই আব্বাসি যুগের বিচার বিভাগের অধীনস্থ তাবৎ প্রতিষ্ঠান পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অবস্থানের পাশাপাশি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা, নির্ধারিত কাজ এবং নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল। আলিম, ফকিহ এবং বিচারকগণ সব ক'টি প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু রচনা করেছেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্রভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে রাখার মতো কিছু গ্রন্থ লিখে গেছেন। এসবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাজ নির্ধারিত হয়ে থাকত। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে তা পৃথক হয়ে যেত। এগুলো ছিল বিচার বিভাগ, বিচারব্যবস্থাপনা, বিচার-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি, বিচারের নীতিমালা, রাষ্ট্রীয় অনুশাসন এবং আইনের অন্তর্ভুক্ত।[৭১৫]

পরিধি নির্দিষ্টকরণ

আব্বাসি যুগে বিচারব্যবস্থার পরিধি নির্দিষ্ট ছিল। আলিমগণ মূলত সাধারণ বিচারব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও অন্যায় সংক্রান্ত বিচার, জনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিচার এবং সামরিক বিচার সংক্রান্ত পরিধি নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকেন। কিন্তু এসব পরিধি চূড়ান্ত বা স্থায়ী ছিল না। বরং সময়ভেদে এসব পরিধি একটি অপরটির সাথে

---

[৭১৫] আল-মাওয়ারদির আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ-এ বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব, পৃ. ৬৫; অন্যায় দমন সংক্রান্ত দায়িত্ব, পৃ. ৭৭ এবং হিসবাহর বিধান, পৃ. ২৪০ দেখুন। আবু ইয়ালার আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ-এ বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব, পৃ. ৬০; অন্যায় দমন সংক্রান্ত দায়িত্ব, পৃ. ৭৩ এবং হিসবাহর বিধান, পৃ. ২৮৪-ও দেখা যেতে পারে।

মিলে যেত। কখনো-বা পরিস্থিতি কিংবা বিচারকের ব্যক্তিত্ব অনুপাতে, খলিফা, প্রশাসক বা প্রধান বিচারপতির সীমা অনুসারে এটি বিস্তৃত হতো। আবার একজন বিচারককে অন্য বিচারকের অধীনস্থ বিষয়ের মাঝে দিতেও দেখা গেছে। সাধারণ বিচার বিভাগ কিংবা জনশৃঙ্খলা অধিদপ্তরের পরিধিতে পড়ে—এমন কিছু দায়িত্ব পুলিশকে অর্পণ করা হতো। কখনো ঘটত এর উলটোটাও। যেমন, কিছু প্রশাসনিক এবং আধা বিচারিক বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব বিচারকের কাছে অর্পণ করা হতো।

আমরা এখানে কেবল সাধারণ বিচারব্যবস্থার পরিধি সংক্রান্ত আলোচনা করব। নিপুণ এবং পূর্ণাঙ্গ বিচারব্যবস্থা ছিল আব্বাসি যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর একটি অংশ ছিল সময়সীমা। অর্থাৎ বিচারক কোন দিনগুলোতে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন এবং কোন দিনগুলোতে ছুটিতে থাকবেন, আব্বাসি যুগে সেটা নির্ধারিত থাকত। যেমন, ঈদের দিন এবং সরকারি ছুটির দিনগুলোতে বিচারকার্য চলত না। আবার দৈনিক কতটুকু সময় বিচারকার্য চলবে, সেটাও নির্ধারিত ছিল। বর্তমানে তা 'কর্মঘণ্টা' হিসেবে পরিচিত।

তদ্রূপ স্থানগত পরিধিও ছিল নির্দিষ্ট। প্রথম আব্বাসি যুগে পুরো প্রশাসনিক কাজের জন্য বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো। পরবর্তী জামানার আব্বাসি বিচারকরা নিজ নিজ মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করতেন। বিচারকের পরিধি নির্দিষ্ট শহরে বা শহরের প্রান্তে সীমাবদ্ধ থাকত। যেমন: বাগদাদের পূর্ব প্রান্তের বিচারক এবং পশ্চিম প্রান্তের বিচারক, দামিস্কের বিচারক এবং কায়রোর বিচারক, মিশরের নিম্ন ভূমি এবং উচ্চ ভূমির বিচারক ইত্যাদি।

বিচারকগণ সাধারণত মসজিদেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু একসময় খলিফা আল-মুতাদিদ মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করতে নিষেধ করেন। বিচারক কখনো মসজিদের ভেতরে বসতেন, আবার কখনো মসজিদের সামনে। অনেক সময় নিজের বাড়িতে বা রাস্তাতেই বিচার করতেন। একপর্যায়ে বিচারের আদালত মসজিদের সাথেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। আবার কখনো শহরের মাঝে প্রশস্ত কোনো জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। যাতে বিচারপ্রত্যাশী লোকেরা সেখানে সহজে বসতে পারে। তাহলে বাদী-বিবাদীর কষ্ট করে বসে থাকতে বা অপেক্ষা করতে হবে না।[৭১৬]

আব্বাসি যুগে বিচারকের ক্ষমতা ছিল বিস্তৃত। আর্থিক, দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং সমস্ত মামলার ক্ষেত্রে সাধারণত বিচারকই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। অনেক সময় তাকে পুলিশি ক্ষমতা, দুর্নীতি দমনের দায়িত্ব, কিসাস বা বদলা গ্রহণ, জনশৃঙ্খলা, টাকশাল এবং কোষাগারের দায়িত্বও প্রদান করা হতো।[৭১৭]

---

[৭১৬] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৫

[৭১৭] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৫; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৯৭

তৎকালীন সাধারণ বিচারব্যবস্থার ধরন কেমন ছিল, আল-মাওয়ারদি তার বিবরণ দিয়েছেন। যা থেকে বোঝা যায়, সে যুগে সাধারণ বিচারব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।

▪ দেওয়ানি বিচার বিভাগ

আল-মাওয়ারদির বর্ণনা অনুসারে, বিচারকের ক্ষমতা সাধারণ হলে এই বিভাগের পরিধি থাকত দশটি। সেগুলো হচ্ছে :

- ☑ (১) বিরোধ-মীমাংসা এবং অধিকার আদায়,
- ☑ (২) অভিভাবকহীন লোকদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ,
- ☑ (৩) ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশোনা করা,
- ☑ (৪) ওসিয়ত বাস্তবায়ন,
- ☑ (৫) বিধবাদের বিয়ের ব্যবস্থা,
- ☑ (৬) অপরাধীদের দণ্ড কার্যকর,
- ☑ (৭) জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখা,
- ☑ (৮) রাস্তাঘাটে অন্যায় প্রতিহত করা,
- ☑ (৯) সাক্ষী এবং আমানতদারদের তদারকি এবং
- ☑ (১০) প্রতিনিধি নির্বাচন করা এবং জনগণের মাঝে মীমাংসা করার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা। নিয়োগের প্রজ্ঞাপন অনুসারে কখনো কখনো একটা ক্ষেত্রের মধ্যেই বিচারকের ক্ষমতা নির্ধারিত থাকত।[৭১৮]

▪ ফৌজদারি বিচার বিভাগ

এটা ছিল অপরাধ, অন্যায় এবং বিবেচনামূলক শাস্তির সাথে সম্পৃক্ত। তবে এটা সাধারণ দেওয়ানি বিচারকের আওতায় পড়ত না। কারণ আল-মাওয়ারদি তার পরিধি-সংক্রান্ত আলোচনায় এটা উল্লেখ করেননি। বরং স্বতন্ত্রভাবে 'অপরাধের বিধিবিধান' শিরোনামের অধীনে অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এ থেকে বুঝে আসে, একজন স্পেশাল কাযি এ দায়িত্ব পালন করবেন। এ বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ বিশেষভাবে নিযুক্ত সেই কাযির ওপর বর্তায়। বিশেষত অপবাদ আরোপ সংক্রান্ত বিষয়াদি যাচাই-বাছাই করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দণ্ডবিধি আরোপ করা তার দায়িত্ব। এখানে অপরাধ, মুক্তিপণ ও বিশেষ বিবেচনাধীন শাস্তির কথা আল-মাওয়ারদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।[৭১৯]

---

[৭১৮] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৭০

[৭১৯] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ২২১-২৪১

আব্বাসি খিলাফতের পরবর্তী সময়গুলোতে বিচারকের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে যায়। খিলাফতের দুর্বলতা, একাধিক নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার কারণে বিচারকের কর্তৃত্ব সীমিত হয়ে পড়ে। কিছু কিছু বিচারকের কাজ হয়ে যায় কেবল অর্থনৈতিক বিবাদের মীমাংসা এবং ব্যক্তিগত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা।[৭২০]

আব্বাসি যুগে কোনো কোনো বিচারকের পরিধি ছিল নিতান্তই সীমিত। ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বসরার আমিরগণ জামে মসজিদে বিচারক নিয়োগ করতেন। এদেরকে বলা হতো 'মসজিদের কাযি'। তাদের বিচারের বিষয়গুলো ২০০ দিরহাম বা ২০ দিনারের চেয়ে কম হতো। তিনি নাফাকাহ বা খরচের হুকুম দিতেন। নিজের পদ কিংবা নির্ধারিত পরিমাণের বাইরে কোনো বিচারকার্য তিনি পরিচালনা করতেন না। তাদের অবস্থা ছিল বর্তমান যুগের সালিশি বৈঠকের মতো।[৭২১]

ওয়াকি বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু আকসাম বসরায় এসে আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আসাদ আল-কিলবিকে মসজিদের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেন। তখন তিনি কিছু ঋণের ব্যাপারে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। স্বামীকে তার স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব আবশ্যক করে দেওয়া-সহ ছোটখাটো বিষয়ের সুরাহা করতেন। তারপর ইয়াহইয়া তাকে চিঠি পাঠিয়ে বললেন, '২০ দিরহামের বেশি হয়—এমন কোনো অর্থদণ্ডের বিচার করা থেকে আপনি বিরত থাকবেন।'[৭২২]

❁ বিচারকদের অন্যান্য দায়িত্ব

বিচারকরা সাধারণত খলিফা, প্রশাসক এবং প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে নিযুক্ত হতেন। সে কারণে তারা ছিলেন জনগণের আস্থার জায়গা। অধিকাংশ সময় এমন সব জটিল এবং নাজুক কাজের ভার তাদের দেওয়া হতো, যা কেবলই বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ লোকদেরই অর্পণ করা যায়।

উমাইয়া যুগের আলোচনাতে আমরা বিচারকদের আধা-বিচারিক বা বিচারবহির্ভূত অনেক কাজ পরিচালনা করতে দেখেছি। যেমন ইয়াতিমদের সম্পত্তি দেখাশোনা, ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, ফতোয়া প্রদান ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ সাধারণত বিচারকের হাতেই থাকত।

উমাইয়া যুগে বিচারকরা আরও বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন। যেমন পুলিশের আইজি, রাষ্ট্রীয় কোষাগার, প্রশাসনিক দপ্তর এবং প্রশাসকের প্রতিনিধি ইত্যাদি।

---

[৭২০] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৬

[৭২১] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৭৩; আল-কাদ্বাউল ইদারি, পৃ. ৫৯

[৭২২] আখবারুল কুদ্বাহ: ২/১৬১

রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অস্থিরতা এবং বিভাজনের কারণে আব্বাসি যুগের বিচারকরা তুলনামূলক কম হলেও এ জাতীয় অনেক দায়িত্বই পালন করেছেন।

আব্বাসি যুগে বিচারকরা নতুন যেসব দায়িত্ব পালন করেছেন, সেসব নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

▪ ১. রমজান এবং অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখা

কারণ শরীয়তের অনেক বিধিবিধান চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। মাসের শুরুতে নানাধরনের কর পরিশোধ, প্রতিশ্রুতি পূরণ, মানত আদায় এবং ইবাদত পালিত হয়ে থাকে। তাই বিচারকরা এই দ্বীনি দায়িত্ব আবশ্যকীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ এ নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ঘটে এবং মতবিরোধের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আল-কিনদি বর্ণনা করেছেন, 'ইবনু লাহিআহ যখন বিচারের দায়িত্বে ছিলেন (১৫৫-১৬৪ হি.), তখনকার কথা। একবার লোকেরা রমজান মাসের চাঁদ দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কেউই চাঁদ দেখতে পেল না। এমতাবস্থায় দুজন লোক এসে দাবি করল, তারা চাঁদ দেখেছে। প্রশাসক মূসা ইবনু আলি তখন ইবনু লাহিআহর কাছে পাঠিয়ে তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কিন্তু তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কিছু জানা গেল না। এদিকে লোকেরা নিজেদের মাঝে মতানৈক্য হওয়ার অভিযোগ করল।

পরের বছর আবদুল্লাহ ইবনু লাহিআহ সৎ এবং বিশ্বস্ত একদল মুসল্লি নিয়ে নিজেই বের হয়ে গেলেন। তারা নীলনদের পশ্চিম তীরে গিজায় গিয়ে চাঁদ অনুসন্ধান করলেন। ইবনু লাহিআহই প্রথম বিচারক, যিনি রমজানের চাঁদ দেখার জন্য স্বশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার পর থেকে চাঁদ দেখার বিষয়টি বিচারকরা এভাবেই পালন করে আসতেন।'[৭২৩]

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশে রমজানের চাঁদ দেখার বিষয়টি আজও বিচার বিভাগের অধীনে রয়েছে।

▪ ২. অনুপস্থিত ব্যক্তিদের তহবিল পরিচালনা

কোনো নিখোঁজ ব্যক্তির যদি অনেক সম্পদ থাকে, কিন্তু তার কোনো ম্যানেজার না থাকে, আর সাধারণ লোকেরাও উক্ত সম্পদ রক্ষা করতে অপারগ হয়—তখন বিচারকের কাছে সেসব হস্তান্তর করা হলে তিনি তাতে নিখোঁজ ব্যক্তিটির নাম লিখে এবং চিহ্ন দিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সংরক্ষণ করে রাখতেন। কিংবা মালিক উপস্থিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির জিম্মায় দিয়ে দিতেন। এ দায়িত্ব আজও বিচারকের অধীনে রয়েছে।[৭২৪]

---

[৭২৩] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৭০

[৭২৪] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৮২

▪ ৩. প্রকাশনা বিভাগের তত্ত্বাবধান

রফউল ইসর গ্রন্থ থেকে আল-কিনদির বর্ণনায় এসেছে, 'গভর্নর তার প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব বিচারক আবদুল আজিজ ইবনু মুহাম্মাদকে দিয়েছিলেন। গভর্নর নিজেই ছিলেন উক্ত প্রকাশনা দপ্তরটির প্রতিষ্ঠাতা। এ ক্ষেত্রে তিনি নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থে সমৃদ্ধ একটি বিভাগ। ফকিহদের জন্য তাতে বসা এবং নিজের অভিরুচি অনুযায়ী তা থেকে উপকৃত হওয়ার অবারিত সুযোগ ছিল।'[৭২৫] গভর্নরের দৃষ্টিতে বিচারকই ছিলেন এই দপ্তর দেখাশোনা এবং পরিচালনার অধিক যোগ্য ব্যক্তি। অনেক দেশেই প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব এভাবে পরিচালিত হতো।

▪ ৪. অন্যান্য

এমন আরও কিছু বিচারকার্য বহির্ভূত দায়িত্ব ছিল, যেগুলো শুধু বিচারকরাই পালন করতেন। যার কারণে মানুষের মধ্যে এবং সমাজের মাঝে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিচারকগণ সম্মানজনক অবস্থান এবং শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করতেন।

এ ব্যাপারে আল-কিনদি বর্ণনা করেন, বিচারক হারিস ইবনু মিসকিন (২৩৭-২৪৫ হি.) -কে খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। হারিস ছিলেন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। তাকে হুইল চেয়ারে করে জামে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হতো। তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। আমরা সেগুলোর মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি:

- ☑ হানাফি এবং শাফিয়ি সমর্থকদের মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া। কারণ আলোচনা-পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তারা বিতর্কের রীতি মেনে চলত না। মসজিদে নামাজ আদায়কারীদের পরিবেশ তারা ঘোলাটে করে ফেলেছিল। তাদেরকে মসজিদে সমবেত হতে নিষেধ করে সাধারণ মুয়াযযিনদের আযান দিতে বারণ করেন। রমজান মাসে কুরাইশ এবং আনসারিগণ তাদেরকে খাবার দিত। সে ব্যাপারেও তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।
- ☑ জামে মসজিদ নির্মাণ এবং আলেকজান্দ্রিয়াতে খাল খননের আদেশ করেছিলেন।
- ☑ শিকারের জন্য ফাঁদ পাততে নিষেধ করলেও পরবর্তীকালে অনুমতি দিয়েছিলেন।
- ☑ জানাযার ঘোষণা দিতে নিষেধ করতেন। জানাযার ঘোষণা দেওয়া ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- ☑ মসজিদে মাহমুদ-সহ অন্যান্য মসজিদে যারা গানের সুরে তিলাওয়াত করত,

---

[৭২৫] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৮৩; আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৬০০

তাদের বাধা দিতেন।

☑ জামে মসজিদে কুরআন শিক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার পাশাপাশি তার পক্ষ থেকে একজনকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বিচারকদের মাঝে তিনিই সর্বপ্রথম এই কাজ করেছিলেন।

☑ তিনি প্রশাসকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং সালাম বিনিময় করতেন না।[৭২৬]

রফউল ইসর সূত্রে আল-কিনদির বর্ণনায় আরও এসেছে, বিচারক মালিক ইবনু সাঈদ আল-ফারুকি ৩৯৮ হিজরিতে মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। সে-সময় তিনি অনেক কাজ করেছিলেন :

☑ মক্কা-মদীনার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ফাতিমি প্রশাসকের কাছে আসলে তাদের সাথে কথা বলা, তাদের সার্বিক বিষয় দেখভাল করা এবং প্রশাসকের কাছে তাদের পক্ষ থেকে দূতিয়ালি করেছেন। এমনকি প্রশাসক তার হাতেই আগত মেহমানদের উপঢৌকন দিয়েছেন। তারপর থেকে প্রশাসকের কাছে বিচারকের মর্যাদা বেড়ে যায়। তার কাছে বিচারকের অবস্থান হয়ে যায় আগের থেকেও সুদৃঢ়।

☑ উপহার-উপঢৌকন, জায়গা-জমি এবং জায়গিরের দলিল-দস্তাবেজের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়। তিনি নিজেই এসব দায়িত্ব পালন করতেন।

☑ অন্যান্য শহরের গভর্নরদের পক্ষ থেকে লিখিত চুক্তিপত্রের প্রতিও তার নজর থাকত। বিভিন্ন কর্মীদের সাথে প্রশাসকের পত্র মারফত যোগাযোগ তার মাধ্যমেই হতো। যাবতীয় দায়িত্বের ক্ষেত্রে তিনিই প্রশাসকের মুখোমুখি হতেন এবং সবার পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন।[৭২৭]

এখানে আরও অনেক বিষয় এবং কর্মপরিধি আছে, যেগুলো যাফির আল-কাসিমি উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে শুধু সেগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকব—অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ; ঋণে জর্জরিত ব্যক্তির বাড়ি খিলাফতের কাছে বিক্রি করা; নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পদ পরিচালনা; শারঈ বিধানাবলি নিয়ে পুলিশকে কথা বলার অধিকার না দেয়া, যাতে সাধারণ মানুষ পুলিশের কথাকে শরীয়ত মনে না করে বসে; বিভিন্ন বিভাগে পরিচালক নিয়োগ; মালিকানা-বিহীন সম্পদের তত্ত্বাবধান; অশ্বারোহী এবং যোদ্ধাদের আদমশুমারি; জামে মসজিদগুলো পরিচালনা এবং সেখান থেকে বিদআত নির্মূল করা।

মুসেলের বিচারক কামালুদ্দিন আশ-শাহরাজুরির (৫৭২ হি.) অনেকগুলো কর্মপরিধি ছিল। সেগুলো হচ্ছে—জামে মসজিদ দেখাশোনা; টাকশাল পরিচালনা;

---

[৭২৬] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪৬৭-৪৬৯

[৭২৭] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৬০৫-৬০৬

নগরীর প্রাচীর নির্মাণ; জনস্বার্থ তত্ত্বাবধান; মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, হাসপাতাল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ।[৭২৮] আরও ছিল—জুয়ার সরঞ্জামাদি ধ্বংস করা; যুদ্ধবন্দিদের দেখাশোনা; নৈশ আড্ডা বাতিল করা; বিচারব্যবস্থা এবং খানকার প্রবীণ সুফিদের মাঝে সমন্বয় সাধন; দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ; ওজন এবং পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ; মহিলাদেরকে হট্টগোল করা থেকে নিবৃত্ত করা; খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় এবং খলিফার কাছে প্রেরিত অর্থ হস্তান্তর করার সময় মহিলাদের উপস্থিত হওয়া থেকে বাধা প্রদান; রাতের বেলা ছদ্মবেশে সাক্ষীদের যাচাই-বাছাই করতে বাধা দেওয়া; রাষ্ট্রীয় কোষাগারের চাবি বুঝে নেওয়া; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগত কালেকশনের অর্থ ছাত্রদের জন্য ব্যয় করা; মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা; যথাসময়ে দোকানপাট বন্ধ করা এবং বন্যার সময় নীলনদের পানির উচ্চতা পরিমাপ করার জন্য দায়িত্বশীল নির্বাচন করা।[৭২৯]

আব্বাসি যুগে বিচারব্যবস্থার অধঃপতন

আব্বাসি যুগের প্রথম অংশ ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগের প্রতিনিধিত্ব করত। আব্বাসি খিলাফত উন্নতির শীর্ষে পৌঁছার পর শুরু হয় পতনের ধারা। রাষ্ট্র এবং সমাজের অভ্যন্তরে অস্থিরতা আর গণ্ডগোল দানা বাঁধতে থাকে। ধীরে ধীরে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে থাকে মুসলিম দেশগুলো। আব্বাসি খিলাফতের দ্বিতীয় ধাপে নাগরিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে জুলুম-নির্যাতন ছড়িয়ে পড়ে। যার প্রভাব পড়তে থাকে বিচারব্যবস্থার মাঝেও। এই অঙ্গনে কিছু অসৎ বিচারকের দেখা মিলে, যারা বিচারব্যবস্থার এক কালো অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করছিল।

আব্বাসি খিলাফত ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং চারিত্রিক অধঃপতনের শিকার হতে লাগল। এর প্রভাব পড়ছিল বিচারব্যবস্থা এবং বিচারকদের ওপর। আগেকার ন্যায়পরায়ণ কাযিদের আলোকজ্জ্বল চিত্রের পাশে যুক্ত হলো দুরাচার জালিম কিছু বিচারকের কালো অধ্যায়। যাদের মধ্যে ছিল না পূর্বসূরিদের মতো বিনম্রতা, আধ্যাত্মিকতা এবং সমীহবোধ। তাদের অবস্থা ছিল আগেকার যুগের অসৎ বিচারকের মতো।[৭৩০]

সরকারি চাকরি এবং দায়িত্বগুলো বেচাকেনার পণ্য হয়ে যাওয়া ছিল বিচারব্যবস্থার অন্ধকার ট্রাজেডির অন্যতম অংশ। বিচারকের পদ-প্রত্যাশী ব্যক্তিকে বিশাল পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হতো। নিয়োগদাতাকে বার্ষিক প্রতিশ্রুত অর্থ (ঘুস) পরিশোধ করার শর্তে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছিল।[৭৩১]

---

[৭২৮] কুব্বাতু দিমাশক, পৃ. ৪৭
[৭২৯] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৮০-২৯৩
[৭৩০] যুহরুল ইসলাম : ২/২৫১
[৭৩১] আন-নুযুমুল কাযাহিয়্যাহ, পৃ. ৬৫

ফকিহ এবং আলিমগণ এ ব্যাপারে সতর্কবার্তা প্রদান করেছিলেন। তারা এটাকে সুস্পষ্ট ঘুস হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আল-মাওয়ারদি লিখেছেন, 'বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব লাভের উদ্দেশ্যে বিনিময় প্রদান করা নিষিদ্ধ। কেননা এটা স্পষ্টতই ঘুস। এটা নির্ঘাত হারাম। এর দাতা এবং গ্রহীতা—উভয়েই সমান অপরাধী।'[৭৩২]

খলিফা আল-মুতি লিল্লাহর (৩৩৪-৩৬৩ হি.) সময়কাল সম্পর্কে আবুল কাসিম আস-সামনানি বলেন, 'ইবনু আবিশ শাওয়ারিব ১১২০ দিরহামের বিনিময়ে কাযির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শরীয়ত বেকার সাব্যস্ত হয়ে পরিস্থিতি আগাগোড়াই পালটে যায়। এরপর খলিফা আল-কাদির বিল্লাহর (৩৮১-৪২২ হি.) সময় ৪০৫ হিজরিতে ইবনু আবিশ শাওয়ারিব প্রধান বিচারপতি হয়ে যান।'[৭৩৩]

প্রথম আব্বাসি যুগ থেকেই বিচারের রায়ের ক্ষেত্রে বিরোধ ছড়িয়ে পড়েছিল। ইজতিহাদগত তফাতের কারণে বিচারকদের মাঝে একই বিষয়ে সাংঘর্ষিক বিচার দেখা দিয়েছিল। তখন ফিকহি মাযহাবের আবির্ভাব ঘটে। বিচারের ক্ষেত্রে মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী রায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর থেকে তলে তলে বিরোধ দানা বাঁধতে শুরু করে। ক্রমেই বিষয়টি ব্যাপক হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় বিচারকের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। তার কর্মপরিধি সংকুচিত হয়ে যায়। এ কারণেই বিচার বিভাগ সংস্কারের আওয়াজ ওঠে। বিচার বিভাগের তাবৎ বিষয় ঢেলে সাজানোর ডাক আসতে থাকে।

❁ বিচারব্যবস্থার সংস্কার

আব্বাসি যুগে বিচারব্যবস্থায় অনেক সংস্কার করা হয়েছিল। এই সংস্কারগুলো ছিল দুই ধরনের।

■ সংস্কারের প্রথম ধরন

উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং সমৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য কিছু সংস্কার করা হয়। যেমন : (ক) বিচারের রায়, ওসিয়ত এবং ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যাপারে নথিপত্র ব্যবহারে যত্নবান হওয়া এবং তার ব্যাপক প্রচলন ঘটানো; (খ) ইয়াতিমদের তহবিল, ওয়াকফ সম্পদ, অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পত্তি এবং কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদের জন্য বিভিন্ন ধরনের অধিদপ্তর তৈরি করা; (গ) রাষ্ট্রে আশ্রিতদের ব্যবস্থা করা; (ঘ) জনশৃঙ্খলা বিভাগকে কাজের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান; (ঙ) ওয়াকফকৃত সম্পদ পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (চ) বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক করার জন্য জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ।

---

[৭৩২] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৭৫

[৭৩৩] রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৫১৫, ৪/১৫১৬; কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৩২, ৩৩

মুহাম্মাদ ইবনু মাসরুক আল-কিনদি ১৭৭ হিজরিতে খলিফা হারুনুর রাশিদের পক্ষ থেকে মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিচারের ক্ষেত্রে তার অবস্থান ছিল শক্তিশালী। সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে একদিকে তিনি কঠোর নীতি অবলম্বন, অন্যদিকে তাদেরকে পরিপূর্ণ ইনসাফ প্রদান করেন। নিজের অবস্থানকে উন্নত রাখতে কাজ করেন তিনি। বিচারককে প্রশাসকের অধীনে চলার নীতি বর্জন করেন। প্রশাসকের দরবারে উপস্থিত হওয়া থেকে তিনি বিরত থাকতেন। এটা ছিল তার অভ্যাস। তার পরবর্তী বিচারকদের জন্য যা অনুসরণীয় নীতিতে পরিণত হয়।[৭৩৪]

আল-কিনদি বলেছেন, 'মিশরের প্রশাসকরা তাদের দরবারে উপস্থিত হতে বিচারকদের বাধ্য করতেন। যেমনটা বর্তমানের ফকিহদের করা হয়। ইবনু মাসরুক মিশরে আসার পর প্রশাসক আবদুল্লাহ ইবনু মুসাইয়াব দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য তার বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। উত্তরে ইবনু মাসরুক বলেন, "এ ব্যাপারে আপনার কাছে আসলে আপনার সাথে আমি যাচ্ছেতাই আচরণ করব।" এরপর থেকে দরবারে বিচারকদের যাতায়াত-রীতি বন্ধ হয়ে যায়।'[৭৩৫]

■ সংস্কারের দ্বিতীয় ধরন

আব্বাসি যুগের দ্বিতীয় অংশে যেসব অধঃপতন, অশান্তি, দুর্নীতি আর অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, সেসবের সংস্কার। এই সংস্কারগুলোর মধ্যে ছিল—(ক) মিথ্যা সাক্ষীদের প্রতিহত করার জন্য যাচাই ও স্বচ্ছতার প্রক্রিয়া গ্রহণ এবং (খ) আদালত ও বিচারব্যবস্থায় ছড়িয়ে পড়া ত্রুটি-বিচ্যুতির সংস্কার।

এগুলোর মাঝে সর্বোচ্চ সংস্কার ছিল বিচারের রায়গুলোকে শ্রেণি-বিভক্তকরণ। যাতে বিচারব্যবস্থাকে করে নতুন নতুন ঘটনা প্রবাহে বিচারকদের স্বাধীন ইজতিহাদের ওপরে ছেড়ে না দেওয়া হয়। কারণ বিচারকদের স্বাধীন ইজতিহাদের ফলে বিচারব্যবস্থায় ব্যাপক অসংগতি আর বিরোধ সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হচ্ছিল।

এ কারণে তৎকালীন চিন্তাবিদ আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফফা খলিফা আল-মানসুরের কাছে বিচারব্যবস্থা নিয়ে একটি আইন প্রণয়নের অনুরোধ করেন। যা-তে বিচারের তাবৎ বিধান এক করে দেওয়া হবে। ইবনুল মুকাফফা কর্তৃক লিখিত এ পত্রটি ইতিহাসে *রিসালাতুস সাহাবাহ* তথা (খলিফার) সহচরদের পত্র নামে পরিচিত। পত্রটিতে খলিফার উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন, 'উভয় শহর এবং তার আশপাশে যেসব শহর ও শহরতলি রয়েছে, এগুলোতে চলতে থাকা পরস্পর

[৭৩৪] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৭
[৭৩৫] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৮৮

সাংঘর্ষিক বিচারের রায়ের বিষয়ে আমিরুল মুমিনীন অবগত আছেন। সাধারণ মানুষের জান, মাল এবং সম্ভ্রমের ওপর এর বিরাট প্রভাব পড়েছে। যার কারণে হিরা অঞ্চলে রক্তপাত এবং অশ্লীলতাকে বৈধ মনে করা হচ্ছে। অথচ কুফাতে এ দুটিকে সবাই অবৈধ বলেই জানে। আবার কুফার মধ্যেও এ ধরনের অনেক বিভেদ চলছে। কুফার এক অংশে কোনো জিনিসকে বৈধ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, পক্ষান্তরে অন্য অংশে বলা হচ্ছে তা নাকি অবৈধ। এসব নির্দেশনা আবার বিভিন্নভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে খোদ মুসলিমদের বিপক্ষে। তাদের জীবন এবং সম্মানের ব্যাপারে বিচারকরা এভাবেই নিজেদের বিচারকার্য পরিচালনা করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকে তো আবার সুন্নত পালনের দাবি করে। আদতে সে এমন বিষয়কে সুন্নত মনে করে চলছে, যা প্রকৃত অর্থে সুন্নত নয়। ফলে কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই রক্তপাত ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কিংবা তাঁর পরবর্তী হিদায়াতপ্রাপ্ত নেতাদের যুগে অন্যায়ভাবে রক্তমাখা কোনো জামা দেখাতে পারবে না। তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় : এটা আবার কেমন সুন্নত, যা-তে (হারাম) রক্তপাত করা হয়? তখন তারা উত্তর দেয় : আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান এমনটা করেছেন; কিংবা এসব নেতাদের কেউ কেউ এমনটা করেছেন। মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ভরশীল—এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় অনেকে তা অতি দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে। অথচ তাদের বিচারকার্য পূর্ববর্তী মুসলিম কাযিদের সাথে একেবারেই মিলে না। সুতরাং আমিরুল মুমিনীন যদি এসব বিচারাচারের পদ্ধতি সম্পর্কে আদেশ দেওয়া সংগত মনে করেন, তাহলে ভালো হবে। প্রস্তাবিত পদ্ধতি হলো, এসব বিষয় সম্পর্কে আমিরুল মুমিনীনের কাছে একটি লিখিত ডকুমেন্ট পেশ করা হবে। যা-তে প্রতিটি গ্রুপের পক্ষের দলিল-আদিল্লা স্থান পাবে। এরপর আমিরুল মুমিনীন সবগুলো পর্যালোচনা করে প্রত্যেক বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর মতামত কার্যকর করবেন। আর বিপরীত মতামতের বিচারকার্য নিষিদ্ধ বলে আদেশ জারি করবেন। এভাবে আমিরুল মুমিনীন এ ব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। তাহলে আমরা আশা করতে পারি, ভুল-শুদ্ধ-মিশ্রিত বিচারের এই রায়গুলোকে আল্লাহ তাআলা একটি সঠিক বিধানে পরিণত করবেন। আমাদের আরও আশা আছে, আমিরুল মুমিনীনের মতানুসারে বিচারের এই একক পদ্ধতি তাবৎ বিষয় কার্যকর করার উপলক্ষ্য হবে।'[৭৩৬]

এই আগ্রহের মূল্যায়ন করে খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর তখন মদীনার ইমাম মালিক ইবনু আনাসকে মানুষের জন্য এমন একটি কিতাব লিখে দিতে বললেন, যা-তে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄-এর ছাড়ের নীতি এবং আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵄-এর কঠোরতার নীতি—দুটোই এড়িয়ে চলবেন। মালিক ﵀ তখন আল-

[৭৩৬] তারীখুল কাদা, পৃ. ৮৪-৮৫

মুওয়াত্তা সংকলন করলেন। খলিফা তখন মানুষকে *আল-মুওয়াত্তা* অনুসারে আমল করতে বাধ্য করতে চাইলেন, যেভাবে উসমান ﷺ সবাইকে এক মুসহাফ অনুযায়ী কুরআন পড়তে বাধ্য করেছিলেন। তখন ইমাম মালিক ﷺ বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনীন! এখন আর সে সুযোগ নেই। কারণ রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তখন প্রত্যেকেই যার কাছে যেটা সঠিক মনে হয়েছে, সে অনুযায়ী আমল করতেন। আর তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁদের প্রত্যেকের মুখ্য উদ্দেশ্য।' তখন খলিফা মানসুর এই সংকল্প থেকে সরে আসেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবির সূত্রে বিচারক মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আরনুস বর্ণনা করেছেন, বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিচারক জুলুম করতে শুরু করলে প্রশাসকরা তখন নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসারে বিচার করা আবশ্যক করে দেন। নিজেদের মাযহাব ছাড়া ভিন্ন কোনো মাযহাব যেন তারা অনুসরণ না করেন। জনগণ সংশয়ে পড়বে না—এমন বিচারকার্যই কেবল তাদের থেকে গৃহীত হবে। তাদের বিচারকার্য পূর্বসূরিদের মতোই হতে হবে।[৭৩৭]

❁ বিচারকের সংশোধন বিষয়ক পত্রাবলি

আব্বাসি খিলাফতের সুদীর্ঘ সময়ে অনেক খলিফা, আলিম এবং ফকিহ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তখন ছিল আব্বাসি খিলাফতের সমৃদ্ধির যুগ। তারপর রাষ্ট্রীয় অস্থিরতা আর গোলযোগ শুরু হয়। এরপর তা ক্রমান্বয়ে অধঃপতনের দিকে যেতে থাকে। আব্বাসি খিলাফতের স্বর্ণযুগেও বিচারব্যবস্থা সংস্কারের প্রতি অনেক আহ্বান জানানো হয়েছিল। আলিম এবং কাযিদের তরফ থেকে প্রশাসক এবং খলিফাগণের কাছে বহু আবেদন পেশ করা হয়েছে। এসব পত্র ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ইতিহাসে সেগুলো আজও সোনালি পত্র হিসেবে গণ্য হয়। সেগুলো থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ উল্লেখ করে আমরা হালকা-পাতলা আলোচনা করব।

▪ খলিফার উদ্দেশ্যে আল-আম্বারির পত্র

বিচারক আল-আম্বারি ১৫৬ হিজরিতে খলিফা আবু জাফর আল-মানসুরের পক্ষ থেকে বসরার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর ১৫৭ হিজরিতে খলিফা তাকে বিচারকার্যের পাশাপাশি নামাজ পড়ানো-সহ বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানের দায়িত্বও প্রদান করেন। ওয়াকির বর্ণনানুসারে জানা যায়, কাযি আল-আম্বারির অনেক মর্যাদা ছিল। অনেক বড় বড় বিচারকার্য তিনি পরিচালনা করেছিলেন।

আল-আম্বারি খলিফা মাহদি বরাবর সুদীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্র প্রেরণ

[৭৩৭] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৫

করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল,

'আমিরুল মুমিনীনের এটা ভালোভাবেই জানা আছে যে, একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন, ষাট বছর (নফল) ইবাদত করার চেয়েও উত্তম—এ ধরনের একটা কথা প্রচলিত আছে। সুতরাং হে আমিরুল মুমিনীন! প্রশাসকদের উচিত এমন কাজে প্রতিযোগিতা করা। আমিরুল মুমিনীন তো খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের কারণে মানুষের পক্ষ থেকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। বিশাল দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁর আশাও আছে। আবার লোকেরাও তাঁর কাছে এই প্রত্যাশা করে যে, তারা একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক নেতা পাবে। যিনি নিজেও পূর্বসূরিদের মত ও পথের ওপর চলবেন। আবার তাদেরও সে পথে পরিচালনা করবেন। ফলাফলে তারা পূর্বসূরিদের মতো সফলতা লাভ করবে। সুখময় জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা তাদের নসিবেও জুটবে। দ্রুতই আসবে ক্ষমতা, বিজয়, সফলতা, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, শান্তি আর ভালোবাসা। জনগণের পক্ষ থেকে খলিফার জন্য হিতকামনা যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি তাদের প্রতিও থাকবে খলিফার সহনশীলতা, কোমলতা, দয়া আর ইনসাফপূর্ণ আচরণ। আর বিচারের রায়ের ব্যাপারে লক্ষণীয় হচ্ছে, বিচার হতে হবে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী।

'কোনো বিধান আল্লাহর কিতাবে না পাওয়া গেলে যেসব বিধানের ওপর পূর্ববর্তী ইমাম এবং ফকিহগণ একমত হয়েছেন, সে অনুযায়ী রায় হবে। আর যদি রাসূলের সুন্নাহতে বিধান না পাওয়া যায়, তাহলে বিচারের রায় হবে কাযির ব্যক্তিগত গবেষণা অনুযায়ী। খলিফার নিয়োগকৃত বিচারক আলিমদের সাথে পরামর্শের পাশাপাশি ব্যক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রেও কোনো ধরনের গড়িমসি করবেন না।

'একজন বিচারকের মধ্যে ন্যূনতম যে যোগ্যতা থাকা দরকার, ইন-শা-আল্লাহ আমিরুল মুমিনীন সে সম্পর্কে অবগত আছেন। সেটা হচ্ছে আল্লাহর ভয় এবং বিচক্ষণতা। এ দুটির একটিতে ভুল হলে আলিমরা তাকে নির্বাচন করবেন না। বিচারককে পরামর্শ দেওয়া হবে যে, তার চেয়ে উপযুক্ত এবং উত্তম ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখতে হবে। এ যোগ্যতাগুলির পাশাপাশি তার মাঝে যদি কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান থাকে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

'এর বাইরে তার মধ্যে ন্যায়বিচার, সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মানুষের রুচিবোধ, মন-মানসিকতা এবং জটিল বিষয় বোঝার যোগ্যতা থাকতে হবে। তাকে বুঝতে হবে কিসের জোরে সাধারণত মানুষ অন্যের ওপর জুলুম করে, একে অন্যকে তার দ্বীন এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে হারানোর প্রতিযোগিতায় করে। তবেই তিনি হবেন একেবারে পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ বিচারক।

'সাধারণ মানুষের সাথে যাদের ঘরবাড়ি আছে, তাদের মাঝে সমতা রক্ষা

করা দরকার। আমিরুল মুমিনীন ভালো মনে করলে শহরের কিছু সুনাগরিক তাঁর আশপাশে রাখতে পারেন। যারা হবে সুন্নাহর জ্ঞান, তাকওয়া, সততা এবং সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত। যাদের থাকবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তা। কারণ আমিরুল মুমিনীনের কাছে মানুষ নানাধরনের সমস্যা, বিচার-আচার এবং দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে হাজির হয়ে থাকে।'

বিচারক আল-আম্মারি তার প্রেরিত পুরো পত্রে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাতে আরও লেখা আছে, এই নির্দেশনাটি ১৫৯ হিজরির সফর মাসে লেখা হয়েছিল।[৭৩৮]

▪ আবু ইউসুফের পত্র

এই পত্রটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। খলিফা হারুনুর রাশিদের উদ্দেশ্যে প্রধান বিচারপতি আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম (১৮২ হি.) লিখেছিলেন। খলিফার কাছে তিনি সম্মানজনক স্থানের অধিকারী ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। হারুন তাই আবু ইউসুফের কাছে একটি গ্রন্থ রচনার আবেদন জানালেন। যা-তে ট্যাক্স, কর, ওশর এবং যাকাত সংক্রান্ত মূলনীতির বিবরণ থাকবে। সেমতে ইমাম সাহেব একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে তার নাম *আল-খারাজ* রাখেন। তাতে তিনি দূরদর্শী অর্থনীতির বিবরণ দিয়েছিলেন। সেখানে আরও ছিল দ্বীনি উপদেশমালা-সহ নানান প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এনেছেন। যার কিয়দংশ এখানে তুলে ধরছি।

খলিফার উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন, 'আমিরুল মুমিনীন! সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তো আপনার কাঁধে বিশাল এক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যার প্রতিদান যেমন সবচেয়ে বড়, তেমনি যার শাস্তিও সর্বাধিক কঠিন শাস্তি। আল্লাহ আপনার কাঁধে এই উম্মতের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

আজকের কাজ যেন আগামীকাল পর্যন্ত বিলম্বিত না হয়। এমনটা করলে আপনার সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে। নির্ধারিত সময় এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা তো এক নয়। অতএব আপনি সময়ের কাজ সময়ের মাঝে করুন। কেননা নির্ধারিত সময়ের পর আর কোনো কাজ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, তার মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করুন। যদিও তা দিনের সামান্য সময় হয় না কেন। কেননা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান দায়িত্বশীল সে ব্যক্তিই হবে, যার মাধ্যমে তার জনগণ সৌভাগ্যবান হয়েছে। আপনার যেন কোনো ধরনের বিচ্যুতি না হয়। এমনটা হলে তো আপনার জনগণ বিচ্যুত হয়ে যাবে। প্রবৃত্তির তাড়নায় আপনি কোনো আদেশ করবেন না। উত্তেজিত

---

[৭৩৮] আখবারুল কুযাহ : ২/৯৭-১০৮; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩০৬

অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।

'আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয়, দূর সম্পর্কের আত্মীয়, কাছের এবং দূরের সমস্ত মানুষকে আপনি সমান দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবেন না।

'একটি উজ্জ্বল সময়, একটি অনুসৃত পথ, একটি গৃহীত রাস্তা, একটি সংরক্ষিত কাজ এবং সর্বজনস্বীকৃত একটি মতাদর্শের জন্য আপনি কাজ করে যান। কেননা এটাই সত্য আদর্শ। এখানেই সর্বোচ্চ অবস্থান। হৃদয়গুলো যেখানে উড়ে বেড়ায়। দলিল-প্রমাণ যেখানে চূড়ান্ত হয়ে যায়। এমন এক পরাক্রম অধিপতি, যার সর্বোচ্চ ক্ষমতার সামনে সকলেই পরাস্ত। সবার সৃষ্টি যার সামনে অবনত। তাঁর বিচারের অপেক্ষায় আছে সবাই। সবাই তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।

'আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে দায়িত্ব সংরক্ষণ করতে দিয়েছেন—তা সংরক্ষণ করতে এবং যে কর্তব্য আপনাকে পালন করতে বলেছেন—তা পালন করার জন্য আপনাকে আমি নসিহত করছি। সর্বক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টি যেন কেবল আল্লাহ তাআলার প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। আপনার সব কাজ যেন কেবল তাঁর জন্যই করা হয়। রাখালের হাতে নষ্ট হওয়া সম্পদের ক্ষতিপূরণের জিম্মাদারি তার ওপরই আসে। আল্লাহ তাআলা তো নিজ অনুগ্রহে, দয়া করে এবং তাঁর মহানুভবতার কারণেই ক্ষমতাবানদের পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আলো দান করেছেন। যার মাধ্যমে তারা জনগণের অন্ধকার দূর করবে। অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া অধিকারগুলো সে আলোর মাধ্যমে স্পষ্ট করতে পারে।

'ক্ষমতাবানরা আলোকিত করার অর্থ হলো দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করা। হকদারদের কাছে তাদের অধিকার দৃঢ়তার সাথে এবং স্পষ্ট প্রমাণের সাথে ফিরিয়ে দেওয়া। নেককার লোকদের মাধ্যমে সূচিত হওয়া মহান কাজগুলো পুনরায় চালু করা। কেননা আদর্শবানদের আদর্শ পুনর্জীবিত করা চিরন্তন কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। দায়িত্বশীল ব্যক্তির জুলুম করা মানে জনগণের ধ্বংস অনিবার্য। আস্থাহীন এবং মন্দ লোকদের কাছে দায়িত্বশীলদের সাহায্য চাওয়ার অর্থ সাধারণ জনগণকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া।

'আল্লাহর কাছে সংশোধন অপেক্ষা উত্তম কোনো কাজ নেই এবং ফিতনা-ফাসাদের চেয়ে ঘৃণিত কোনো কাজ নেই। গুনাহে লিপ্ত হওয়া আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে অস্বীকার করার নামান্তর। যারা আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামত অস্বীকার করে কুফরিতে লিপ্ত হয়, এরপর তাওবা করে—এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের ইজ্জত ছিনিয়ে নেন এবং তাদের

শত্রুকে তাদের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেন।'[৭৩৯]

▪ তাহির ইবনুল হুসাইনের পত্র

খলিফা মামুন যখন আবদুল্লাহকে খারিজি ইবনু শাবসের সাথে লড়াইয়ের জন্য সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেন, তখন আবদুল্লাহর পিতা তাহির ইবনুল হুসাইন নিজের ছেলের উদ্দেশ্যে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রটি সে যুগে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। লোকেরা তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত হয়। একে কেন্দ্র করে লেখালেখি শুরু করে দেয়। সবাই সেটি পড়তে থাকে। পত্রটির খ্যাতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, তা খলিফার কানেও পৌঁছে যায়।

পত্রটি ছিল দ্বীনি উপদেশমালায় ভরপুর। রাজনৈতিক কৌশল, শিক্ষা-দীক্ষা, আধ্যাত্মিক এবং প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তাতে যুক্ত ছিল। পত্রটির বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

'যেসব কাজে মানুষকে নিয়োগ দেবে, যাচাই-বাছাই না করে সেসব কাজের ক্ষেত্রে কাউকে অপবাদ দিতে যেয়ো না। মানুষকে অপবাদ দেওয়া এবং কারও প্রতি খারাপ ধারণা করা একটি গুনাহের কাজ।

'সহকর্মীদের ব্যাপারে ভালো ধারণা এবং অধীনস্থদের প্রতি দয়া যেন তোমাকে তাবৎ বিষয় অনুসন্ধান করা থেকে বিরত না রাখে। তুমি নিজেই সমস্ত বিষয় তদারকি করবে। অধীনস্থদের প্রতি তোমার যেন সদা সতর্ক দৃষ্টি সতর্ক থাকে। তাবৎ বিষয়ে সংশোধন এবং পরিমার্জনের প্রতি যেন তোমার মনোযোগ থাকে।

'অপরাধীদের মাঝে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির বিধান প্রয়োগ করবে। এটাকে হালকা মনে করবে না। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব কোরো না। কেননা এই অবহেলা তোমার প্রতি মানুষের সুধারণা নষ্ট করে দেবে।

'প্রবৃত্তির নিকৃষ্ট চাহিদা ও অন্যায় থেকে বেঁচে থাকবে। এসব থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে রেখো। এ ব্যাপারে অধীনস্থদের কাছে তোমার পরিচ্ছন্নতা ফুটিয়ে তুলবে। ইনসাফের মাধ্যমে তাদের নেতৃত্ব দাও। তাদের মাঝে হক প্রতিষ্ঠা করো। যে জ্ঞান তোমাকে হিদায়াত অবধি পৌঁছে দেয়, সেই জ্ঞান তাদের মাঝে প্রসার করো।

'কোনো অপরাধকেই ছোট করে দেখবে না। কোনো হিংসুককে সহযোগিতা করবে না। কোনো পাপাচারীর প্রতি নরম হবে না। কোনো অকৃতজ্ঞের সাথে সম্পর্ক রাখবে না। কোনো শত্রুকে তোষামোদ করবে না। কোনো চোগলখোরকে সত্যবাদী মনে করবে না। আখিরাত তালাশে অবহেলা করবে না। কোনো দিনকে তিরস্কার করে কাটাবে না। জালিমের ভয়ে জুলুম দেখেও না-দেখার ভান করবে না। দুনিয়ায় থেকে আখিরাতের প্রতিদান প্রত্যাশা করবে না।

---

[৭৩৯] আল-খারাজ লিআবি ইউসুফ, পৃ. ৩-৬; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩১৭

'ফকিহদের সাথে বেশি বেশি পরামর্শ করবে। নিজেকে সহনশীলতার সাথে কাজে লাগাবে। অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ, চিন্তাশীল এবং প্রজ্ঞাবানদের পরামর্শ গ্রহণ করবে। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট এবং তাদের ব্যারাকগুলোতে গিয়ে তাদের খোঁজখবর নেবে। তাদের পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা দেবে। তাদেরকে জীবিকা নির্বাহের সুবিধা দেবে।'

এরপর তাহির বিচারব্যবস্থা এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'জনগণ যেন যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। রাস্তাগুলো সব যেন নিরাপদ হয়ে যায়। মজলুম যেন ইনসাফ পায়। মানুষ যেন ফিরে পায় তাদের অধিকার। যেন সুন্দর হয় নাগরিকের জীবন। আল্লাহর আনুগত্যের হক যেন আদায় করা হয়। সত্যের ওপর চলতে সমস্ত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। কেননা এটাই তোমার প্রতি তাদের আন্তরিকতা সৃষ্টি করবে। সাধারণ জনগণের সন্তুষ্টিকে তোমার জন্য আবশ্যক করে নেবে।

'জেনে রাখবে, তোমার কাজের সুবিধার্থে একজন কোষাধক্ষ, একজন রক্ষক এবং একজন দায়িত্বশীলকে নিয়োগ দিয়েছ। তোমার কর্মচারীরা কিন্তু তোমারই অধীন। কারণ তুমিই তাদের পরিচালক। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে বিচক্ষণ, অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ও রাজনৈতিক স্বচ্ছতার অধিকারী ব্যক্তিদেরই নিয়োগ দিয়ো। তাদেরকে বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দিয়ো।

'দিনের কাজ দিনেই করে ফেলবে। আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দিয়ো না। তুমি নিজে সরাসরি থেকে তোমার কাজ পরিচালনা করবে। তোমার কাছের কর্মকর্তা এবং সচিবকে নজরদারিতে রাখবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন একটা সময় নির্ধারণ করবে। যে-সময় ওরা তোমার সাথে দেখা করবে। তাদের কাজের মধ্য থেকে যেটা সঠিক হবে, তা কার্যকর করবে। কার্যকর করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণ কামনা করবে। তাদের কাজের মধ্য থেকে যা কার্যকর করার অনুপযুক্ত, তা পুনঃনিরীক্ষণ এবং যাচাইয়ের জন্য স্থগিত রাখবে। জনগণ ও অন্যদের প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করবে, তার খোঁটা দিয়ো না। তাদের পক্ষ থেকে তুমি শুধু বিশ্বস্ততা, অবিচলতা এবং আমিরুল মুমিনীনের কাজে সহযোগিতা গ্রহণ করবে। হককে যথাযথ স্থানে ব্যবহার করবে।'[৭৪০]

আব্বাসি যুগের বিচারকগণ

আব্বাসি যুগের বিচারকদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। কারণ আব্বাসি খিলাফতের ভৌগোলিক সীমানা যেমন বিশাল ছিল, তেমনি এর সময়কালও ছিল

---

[৭৪০] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৫১-১৫৬; আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২২৩-২২৮

অনেক দীর্ঘ। এ কারণেই ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে সাধারণভাবে বিচারকদের কথা থাকলেও আব্বাসি বিচারকদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা থাকে। অধিকাংশ লেখকই স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি অঞ্চলের বিচারকের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন মিশরের বিচারক, শামের বিচারক, ইরাকের বিচারক ইত্যাদি। ওয়াকি ﷺ তো তার যুগ অবধি বিচারকদের কথা উল্লেখ করেছেন দেশের হিসেবে ভাগ করে। কিন্তু আব্বাসি যুগের বিচারকদের কথা সবিস্তারে বলতে গিয়ে শহর এবং নগর হিসেবে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন এভাবে :

আব্বাসি যুগে মদীনায় নিযুক্ত বিচারকগণ (১/২০০), মক্কা এবং তায়িফে নিযুক্ত বিচারকগণ (১/২৬১), বসরার বিচারকগণ (১/২৬৯), কুফার বিচারকগণ (২/১৮৪), শাম এবং দামিস্কবাসীর বিচারকগণ (৩/১৯৯), ফিলিস্তিনের বিচারকগণ (৩/২১৩), আফ্রিকা (৩/২১৫), মুসেল (৩/২১৯), মিশরের বিচারকগণ (৩/২২০), মানসুর-নগরীর বিচারকগণ (৩/২৮২), বাগদাদের পূর্বাঞ্চলের বিচারকদের আলোচনা (৩/২৮৫), সামাররার বিচারকদের কথা (৩/২৯৪), বিভিন্ন অঞ্চলের বিচারকগণ (৩/৩০৩), ওয়াসিতের বিচারকগণ (৩/৩০৭) এবং অবশিষ্ট অঞ্চলসমূহের বিচারকগণ (৩/৩১৯)। এভাবে তিনি আলোচনা সমাপ্ত করেছেন। আর আস-সামনানি তো তার যুগ অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ অবধি প্রত্যেক খলিফার যুগের প্রসিদ্ধ বিচারকদের কথা আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে বাগদাদের খলিফার বিচারকদের কথা উল্লেখ করেছেন বিশেষভাবে।[৭৪১]

এ ছাড়াও মিশরের প্রশাসক এবং বিচারকদের নিয়ে আল-কিনদি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেছেন। ইবনু তুলুন লিখেছেন দামিস্কের বিচারকদের নিয়ে। বর্তমান যুগেও ডক্টর ইসাম মুহাম্মাদ শাবারু আব্বাসি যুগের বিচারব্যবস্থা এবং বিচারকদের নিয়ে কলম ধরেছেন।

সে যুগের প্রসিদ্ধ বিচারকদের সম্পর্কে জানতে ইবনু খাল্লিকান রচিত *ওয়াফায়াতুল আইয়ান* গ্রন্থের ৬ষ্ঠ তালিকা দেখা যেতে পারে। প্রথম দিকে বাগদাদে প্রত্যেক খলিফার একাধিক বিচারক ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রধান বিচারপতির পদ্ধতি চালু হয়। এরপর খোরাসান, শাম এবং মিশরের মতো বড় বড় শহরে এর প্রচলন ঘটে।

আমরা এখানে কয়েকজন আব্বাসি বিচারকের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাদের কয়েকটি বিচারকার্য নিয়ে আলোচনা করব। এদের মাঝে প্রথম দুজন উমাইয়া এবং আব্বাসি—উভয় যুগেই বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। অবশ্য পেছনেও বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য আব্বাসি বিচারক এবং তাদের বিচারকার্যের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[৭৪১] রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ : ৪/১৫০১-১৫২২

কাযি ইবনু শুবরুমাহ

তাঁর পূর্ণ নাম আবদুল্লাহ ইবনু শুবরুমাহ ইবনিত তুফায়ল ইবনি হাসসান। উপনাম ছিল ইবনু শুবরুমাহ। তিনি ছিলেন তাবিয়ি, কুফার বিচারক, প্রবীণ ব্যক্তি এবং শীর্ষস্থানীয় ফকিহ।

খলিফা হিশাম ইবনু আবদিল মালিক কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের প্রশাসক ছিলেন ইউসুফ ইবনু উমর আস-সাকাফি। ইবনু শুবরুমাহকে তিনিই ১২১ থেকে ১২৬ হিজরি অবধি কুফার বিচারক পদে বহাল রেখেছিলেন। এরপর তাঁকে পদচ্যুত করে সে জায়গায় নিয়োগ দেন ইবনু আবি লাইলাকে। মুগীরা বলেন, 'ইবনু শুবরুমাহ ছিলেন আমার বন্ধু। বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর বিচার-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর সাথে কোনো কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।' পরবর্তীকালে আবু জাফর মানসুর খলিফা হওয়ার পর তাঁকে কুফার উপকণ্ঠে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন চরিত্রবান, জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ। তাঁকে দেখতেই দুনিয়াবিমুখ বলে মনে হতো। ১৪৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৭৪২]

ফিকহের ক্ষেত্রে ইবনু শুবরুমাহ নিজেই ছিলেন স্বয়ংসম্পন্ন মুজতাহিদ। কুফা নগরীতে তিনি ফতোয়া প্রদান করতেন। ইমাম আবু হানিফা ﷺ-এর সমসাময়িক হওয়ায় হানাফিগণ তাঁর অভিমত বেশি বেশি উল্লেখ করে থাকেন। বিচারকার্য এবং সুবিচার করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। এ ছাড়া তিনি হাদিস বর্ণনাও করতেন। শুবা, সুফইয়ান সাওরি, সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা এবং ইবনুল মুবারক ﷺ-সহ অনেকেই তাঁর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু শুবরুমাহর অভ্যাস ছিল বিচার-সংক্রান্ত বিষয়ে ইয়াস ইবনু মুআবিয়ার সাথে মতবিনিময় করা। একবার ইয়াস ইবনু মুআবিয়া তাঁকে বললেন, 'এক ব্যক্তির কাছে আমানত রাখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সে ব্যক্তি আমানত রাখার কথা স্বীকার করেছে। এটাও বলেছে যে, আমানত নাকি সে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমানত রেখেছিল, সে তা বুঝে পাওয়ার কথা অস্বীকার করছে। এখন বিষয়টির সুরাহা হবে কিভাবে?' উত্তরে ইবনু শুবরুমাহ বললেন, 'এখানে মূল বিষয় তথা আমানত রাখা তো নিশ্চিত। সুতরাং শাখাগত বিষয় তথা আমানত ফিরিয়ে দেওয়াটাও নিশ্চিতই হবে।' ইয়াস তখন ইবনু শুবরুমাহর মতামতের প্রশংসা করার পর বললেন, 'আপনার সম্পর্কে কে কী বলল—তা নিয়ে মোটেই ভাববেন না। আপনার উচিত বিচারকার্য পরিচালনা করা।'

খলিফা উমর ইবনু আবদিল আজিজের ছেলে আবদুল্লাহ ছিলেন আমির। একবার তিনি ইবনু শুবরুমাহকে বলেন, 'আপনার প্রয়োজনের কথা আমাকে

---

[৭৪২] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/৩৬; মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১২৬; তবাকাতু ইবনি সাদ : ৬/৩৫০; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৬৬

জানান। আমি সেটা পূরণ করব। আপনি যদি বাড়তি কিছু গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে দেওয়া হবে।' উত্তরে ইবনু শুবরুমাহ বললেন, 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। মানুষের কাছে বেশি কিছু চাওয়া তো পরের কথা, মামুলি জিনিস চাওয়া থেকেও আমি বিরত থেকেছি।'

তিনি অনেক বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব গবেষণামূলক পদ্ধতিতে ফয়সালাও করেছেন। যেমন মিথ্যা সাক্ষ্য দাতাকে তিনি মসজিদেই প্রহার করতেন। বন্ধক দাতা এবং বন্ধক গ্রহীতা—উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য হলে বন্ধক দাতার কথাই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হতো। সাক্ষ্য এবং শপথের মাধ্যমে ফয়সালা করতেন। অনুপস্থিত ব্যক্তি ও উপস্থিত ব্যক্তির ফয়সালায় তিনি কোনো রকম তফাত করতেন না। তিনি কবিতা আবৃত্তিও জানতেন।[৭৪৩]

❁ কাযি ইবনু আবি লাইলা

তাঁর পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান ইবনি আবি লাইলা। উপনাম ছিল আবু আবদির রহমান। ফকিহ এবং কুফার বিচারক হওয়ার পাশাপাশি ক্বারিও ছিলেন তিনি। ১৪৮ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

প্রথমে উমাইয়া যুগে এবং পরবর্তীকালে আব্বাসি যুগেও বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। সর্বমোট ৩৩ বছর দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট হাদিসবিশারদ। সুনান গ্রন্থের সংকলকগণ তাঁর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বয়ংসম্পন্ন মুজতাহিদ ছিলেন। ইমাম আবু হানিফার সাথে তাঁর কিছুটা মতভিন্নতা ছিল। গবেষক পর্যায়ের ফকিহদের অন্যতম ছিলেন তিনি। ফতোয়া প্রদানের কাজও করতেন।

ইবনু আবি লাইলা ﵀ সম্পর্কে আবু ইউসুফ ﵀ বলেছেন, 'কাযিদের মাঝে ইবনু আবি লাইলা ছিলেন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে অধিক সমঝদার। কুরআনের পঠনপদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি সর্বাধিক অবগত। আল্লাহর ব্যাপারে তাঁর চেয়ে অধিক সত্যবাদী এবং সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁর চেয়ে অধিক নির্মোহ কোনো বিচারক ছিলেন না।'[৭৪৪]

ওয়াকি বর্ণনা করেছেন, ইউসুফ ইবনু উমর সর্বপ্রথম ইবনু আবি লাইলাকে কুফার বিচারক নিযুক্ত করেন। তাঁর জন্য ১৫০ দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে ইউসুফ বলেছিলেন, 'আপনি মুসলিমদের বেতনভুক্ত কর্মচারী মাত্র। সুতরাং সকাল-সন্ধ্যায় তাদের কল্যাণার্থে বের হবেন।'[৭৪৫]

---

[৭৪৩] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/৪৯, ৩/৭৩, ৩/৮৯, ৩/১২৯

[৭৪৪] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১২৬

[৭৪৫] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১২৯-১৩০

কুফাবাসীদের মাঝে তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তিনি শিয়াদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না। সাক্ষীদের ভালোমতো যাচাইয়ের নির্দেশ দিতেন। হদ কায়েম করতেন মসজিদের মধ্যেই। ওজর ছাড়া দাম্ভিকতা দেখায়—এমন লোকদের সাক্ষ্য তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হতো না। তিনি অন্ধ ব্যক্তিকে সাক্ষ্যর অনুমোদন দিতেন। তাঁর একজন ব্যক্তিগত সচিব ছিল।[৭৪৬]

❁ কাযি শারীক আন-নাখায়ি

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শারীক ইবনু আবদিল্লাহ ইবনিল হারিস। উপনাম আবু আবদিল্লাহ। বিচারক এবং ফকিহ হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন হাদিসবেত্তা ছিলেন। বুখারার খোরাসানে ৯৫ হিজরিতে তাঁর জন্ম এবং ১৭৭ হিজরিতে কুফায় তাঁর ইন্তেকাল।

শারীক অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। ইলম অর্জনে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন তিনি। আজীবন নিজেকে নিমগ্ন রেখেছিলেন। প্রকৃত অর্থেই আলিম এবং ফকিহ ছিলেন শারীক ইবনু আবদিল্লাহ।[৭৪৭]

তিনি ছিলেন কুফা এবং আহভাজ নগরীর বিচারক। খলিফা আবু জাফর মানসুর বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের জন্য তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি বিনয় সহকারে বললেন, 'আমিরুল মুমিনীন! আমি তো কেবল নামাজ-রোজাই জানি। বিচারকার্যের বিষয়ে আমি কিছু বুঝি না।' তখন খলিফা বললেন, 'আপনি যেটা বুঝেন, সেটাই বাস্তবায়ন করবেন। আর যেটা বুঝবেন না, সেটার বিষয়ে আমার কাছে চিঠি পাঠাবেন।'

খলিফা একবার তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনার অনমনীয়তার কথা আমি জানতে পেরেছি। আপনি সেটা আরও বাড়িয়ে দিন।' শারীক তখন বললেন, 'তাহলে আপনার কথায় আমি কি ভরসা পেতে পারি?' উত্তরে খলিফা সম্মতি জানিয়েছিলেন।

তিনি নিজে থেকেই দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। কিন্তু খলিফা আল-মাহদি তাঁকে পুনরায় নিয়োগ দেন। অবশেষে খলিফা মূসা আল-হাদি তাঁকে পদচ্যুত করেন।

শারীকের বিচার ছিল ইনসাফপূর্ণ। অধিকাংশ বিচারকার্যই ছিল নির্ভুল। যে-কোনো পরিস্থিতিতে উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগাতে পারতেন। বিচারব্যবস্থায় তাঁর অনেক কীর্তি রয়েছে।

একবার খলিফা আল-মাহদির কাছে অভিযোগ দায়ের করা হলো যে, শারীক

---

[৭৪৬] আখবারুল কুদ্বাহ : ৩/১৩১

[৭৪৭] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৩২

একজন শিয়া। তখন খলিফা তাঁর কাছে এর সত্যতা জানতে চাইলেন। জবাবে শারীক বললেন, 'শিয়ারা যদি প্রকৃত অর্থেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আহলে বাইতের প্রতি অধিক ভালোবাসা রেখে থাকে, তাহলে আমিরুল মুমিনীনকে সাক্ষী রেখে আমি নিজেকে তাদের অনুসারী ঘোষণা করছি।' তখন খলিফা বললেন, 'আল্লাহর পানাহ, এ কী বলছেন আপনি! আমরা তো আপনাকে পরহেজগার এবং সম্মানিত হিসেবেই জানি।'[৭৪৮]

আরেকবার বিতর্কের সময় তাঁকে অপবাদ দেওয়া হলো যে, তিনি নাকি আবু বকর এবং উমর ؓ-কে গালমন্দ করেন। তখন শারীক বললেন, 'যুবাইর ؓ-কে গালমন্দ করাটাই আমি যেখানে বৈধ মনে করি না, সেখানে আবু বকর এবং উমর ؓ-এর অবস্থান তো আরও ঊর্ধ্বে।'

খলিফা আল-মাহদির সাথে, খলিফা আর-রাশিদের উপস্থিতিতে আবু ইউসুফের সাথে, কাসিম ইবনু মা'নের সাথে তাঁর অনেক ঘটনা রয়েছে। খলিফা আল-মাহদি বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি কিছু অজুহাত দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আমি এই দায়িত্বের উপযুক্ত নই।' এমনকি তিনি এ কথাও বলেছিলেন, 'বিচারের ক্ষেত্রে আমি কাউকে ছাড় দিই না। যে-কোনো পরিস্থিতিতে সবাইকে পাকড়াও করি।' তখন খলিফা বললেন, 'আপনি আমার এবং আমার ছেলের বিচারও করতে পারবেন।' তখন শারীক বললেন, 'তার মানে আমি আপনার সঙ্গ পাচ্ছি?' খলিফা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আপনার সাথেই আছি।'[৭৪৯]

শারীক সকালে এজলাসে বসার আগেই একটি কাগজের টুকরা বের করে ভালো করে দেখতেন। এরপর বাদী-বিবাদীকে হাজির করা হতো। তাঁর সহচররা একবার আগ্রহী হয়ে কাগজের টুকরাটি খুলে দেখল। তাতে লেখা ছিল, 'হে শারীক ইবনু আবদিল্লাহ! পুলসিরাতের কথা স্মরণ করো, যা তোমাকে একাই পাড়ি দিতে হবে। হে শারীক ইবনু আবদিল্লাহ! তোমাকে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াতে হবে—এ কথা ভুলে যেয়ো না।'[৭৫০]

কাযি সাওয়্যার

তাঁর পূর্ণ নাম সাওয়্যার ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি সাওয়্যার ইবনি কুদামাহ আল-আনবারি আত-তামিমি। উপনাম আবু আবদিল্লাহ। ইমাম নাসায়ি এবং ইবনু হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযি এবং নাসায়ি তাঁর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। মূলত বসরার অধিবাসী হলেও তিনি বাগদাদে

---

[৭৪৮] আখবারুল কুযাহ : ৩/১৫৫

[৭৪৯] আখবারুল কুযাহ : ৩/১৭৪; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ৩৮

[৭৫০] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১০/১৭১

বসবাস করতেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল রুসাফায় বিচারকার্য পরিচালনা করা। ২৪০ হিজরিতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন তিনি।

খলিফা মানসুর তাঁকে বসরার বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। একবার খলিফা তাঁকে লিখেছিলেন, 'যে জমিটি নিয়ে ব্যবসায়ী এবং সেনাপতির মাঝে বিরোধ দেখা যাচ্ছে, তাতে আপনি সেনাপতির পক্ষে রায় দিন।' উত্তরে সাওয়্যার লিখলেন, 'প্রাপ্ত দলিল হিসেবে আমি বুঝতে পারছি, ব্যবসায়ীই হচ্ছেন জমিটির মালিক। এখন আমি তো অন্যায়ভাবে তার থেকে সেটি নিতে পারি না। ... আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ীর জমিটি দখল করব না।' জবাব পেয়ে মানসুর বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। আমার নিযুক্ত বিচারক আমার বিরোধিতা করে সত্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।'[৭৫১]

আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ বিচারক

আমরা এখানে কেবল কয়েকজন আব্বাসি বিচারকের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

- ☑ কাযি আবদুল ওয়াহাব ইবনু আলি আল-মালিকি (৩৬২ হি.)।[৭৫২]
- ☑ কাযি হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ আল-মারুযি (৪৬২ হি.)। শাফিয়ি ফিকহের বিখ্যাত পার্শ্বটীকার রচয়িতা।[৭৫৩]
- ☑ কাযি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ, আবু হামিদ আল-ইসফারাঈনি আশ-শাফিয়ি (৪০৬ হি.)। খলিফাকে পদচ্যুত করার হুমকি দিয়ে তিনি পত্র লিখেছিলেন।[৭৫৪]
- ☑ কাযি আলি ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি হাবিব আল-মাওয়ারদি (৪৫০ হি.)। বিচারকার্য পরিচালনায় সর্বাধিক পারদর্শী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[৭৫৫]
- ☑ কাযি মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন, আবু ইয়ালা আল-ফাররা (৪৫৮ হি.)। তাঁর ছেলে এবং নাতির নামও ছিল মুহাম্মাদ। তারাও বিচারক ছিলেন। তাঁর নাতি আবু ইয়ালা আস-সগির (৫৬০ হি.) নামে পরিচিত।[৭৫৬]
- ☑ কাযি আবু বকর আল-বাকিল্লানি, মুহাম্মাদ ইবনুত তাইয়িব। তিনি ছিলেন মালিকি মাযহাবের ফকিহ, মূলনীতি বিশেষজ্ঞ এবং কালামশাস্ত্রে পারদর্শী।

---

[৭৫১] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ২৬৫

[৭৫২] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪০৭

[৭৫৩] তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা : ৪/৩৫৬; ওয়াফায়াতুল আইয়ান : ১/৪০০; তাহযীবুল আসমা : ১/১৬৪; আল-আলাম : ১/২৭৮

[৭৫৪] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪২৫; যুহরুল ইসলাম : ২/২৫০

[৭৫৫] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪২৮

[৭৫৬] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৮১

৩৩৭ হিজরিতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদে থাকতেন। ৪০৩ হিজরিতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন।[৭৫৭]

- ☑ কাযি আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি হিবাতিল্লাহ (৫৮৫ হি.)। ইবনু আবি আসরুন নামে তিনি পরিচিত। দামিস্কের বিচারক ছিলেন।[৭৫৮]
- ☑ কাযি ইবরাহীম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি আবদিল মুনইম (৬৪২ হি.)। ইবনু আবিদ দাম আল-হামাবি নামে পরিচিত ছিলেন। হামা শহরে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন তিনি।[৭৫৯]

❁ মিশরের কয়েকজন বিচারক

আমরা এখানে মিশরের কয়েকজন আব্বাসি বিচারকের নাম উল্লেখ করছি :

- ☑ গাউস ইবনু সুলাইমান আল-হাদরামি। ১৩৫ থেকে ১৪০ হিজরি অবধি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। দীর্ঘসময় বিচারকার্য পরিচালনার পর দ্বিতীয়বারের মতো দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খলিফা মানসুরের যুগে মিশরে তিনিই সর্বপ্রথম সাক্ষ্যদের সম্পর্কে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। মোট তিন বার মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[৭৬০]
- ☑ আবদুল্লাহ ইবনু লাহিআহ ১৫৫ হিজরির শুরুতে খলিফা আবু জাফরের পক্ষ থেকে বিচারক নিযুক্ত হন। মিশরে খলিফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত সর্বপ্রথম বিচারক ছিলেন তিনি। তাঁর বেতন ছিল মাসে ৩০ দিনার।[৭৬১]
- ☑ ইসমাঈল ইবনুল ইয়াসা আল-কিনদি। তিনি ছিলেন মিশরে হানাফি মাযহাবের অনুসারী প্রথম বিচারক। খলিফা আল-মাহদির পক্ষ থেকে বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিচারকদের অন্যতম। মিশরের বাসিন্দাদের সাথে তাঁর ফিকহি মতাদর্শের অমিল হওয়ায় তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়।[৭৬২]
- ☑ আল-মুফাদদাল ইবনু ফাদ্বালাহ। খলিফা আল-মাহদির তরফ থেকে প্রেরিত পত্র মারফত তিনি মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বেতন ছিল মাসে ৩০ দিনার। তিনিই প্রথম নথি সম্প্রসারণ করে তাতে ওসিয়ত এবং ঋণ অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর আগে এটার প্রচলন ছিল না।[৭৬৩]

---

[৭৫৭] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩৩৯
[৭৫৮] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৩১; কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৪৯
[৭৫৯] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৩২
[৭৬০] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৫৯, ৩৬১ ও ৩৭৩
[৭৬১] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৬৮
[৭৬২] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৭১
[৭৬৩] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৩৭৭

☑ আলি ইবনুল হুসাইন ইবনি হারব। বাগদাদের লোকদের কাছে ইবনু হারবুয়াহ নামে পরিচিত ছিলেন তিনি। ২৯৩ হিজরিতে মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৮ বছর এ দায়িত্বরত ছিলেন। তাঁর অনেক কীর্তি রয়েছে।[৭৬৪]

আব্বাসি যুগের বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য

ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসি যুগ ছিল সর্বাধিক দীর্ঘ যুগ। আর আব্বাসি খিলাফত ছিল সর্বাধিক বিস্তৃত রাষ্ট্র। যা পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে—এক কথায় চতুর্দিকেই সর্বাধিক সীমানা ছড়িয়েছিল। ইসলামি বিচারব্যবস্থাও আব্বাসি যুগের ক্রমবিকাশ থেকে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি সমস্ত প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছিল। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং জান, মাল ও অধিকার রক্ষা করা ছিল তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়কে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য পন্থায় দমন করতে সে সক্ষম হয়েছিল।

আব্বাসি যুগের বিচারব্যবস্থার আরও কিছু বিশেষত্ব ছিল, যা আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব:

☑ এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সে-সময় ইসলামি বিচারব্যবস্থা মৌলিক এবং শাখাগত পর্যায়ে পূর্ণতা লাভ করেছিল। লিপিবদ্ধ হয়েছিল যাবতীয় ধারা-উপধারা, বিধিবিধান এবং পদ্ধতি। ফলে ইমারত নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি সামগ্রিক চিত্র এবং ব্যবস্থাপনাও পরিব্যাপ্ত হয়।

☑ পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আব্বাসি যুগে বিচারব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত চিত্রের পাশাপাশি কিছু দোষত্রুটিও প্রকাশ পায়। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। বিচারব্যবস্থার উজ্জ্বল চিত্র এবং দীপ্তিমান প্রসিদ্ধি আর বহাল থাকেনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে তার সংস্কার, সংশোধন এবং রক্ষণাবেক্ষণের আওয়াজ উঠতে থাকে।

☑ প্রথম আব্বাসি যুগে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ইজতিহাদ বিকাশ লাভ করেছিল। বিচারক মাত্রই ছিলেন মুজতাহিদ। তখনকার দিনে ইমামগণও পরিচিতি লাভ করেন। ফিকহ-সংক্রান্ত মাযহাবের সূচনা ঘটে। শারঈ বিধানাবলি সংকলিত হতে থাকে। ফিকহ-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি এবং বিশেষভাবে বিচার-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচিত হতে থাকে।

☑ হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে ব্যক্তিগত পর্যায়ের গবেষণা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফিকহি মাযহাব স্থিতি লাভ করে। সাধারণ মানুষ তো বটেই, বিচারকরাও মাযহাবগুলোর রায়, ধারা-উপধারা এবং গবেষণা মেনে চলতে থাকেন।

[৭৬৪] আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ, পৃ. ৪৮১, ৫২৩; তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা : ৩/৪৪৬ এবং ৪৮০

বিচারকরা অনুকরণ-প্রবণতা এবং নির্দিষ্ট মাযহাবের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। মামলা-মোকদ্দমা, দাবি-দাওয়া এবং রায়ের ক্ষেত্রে সেটার প্রতিফলন ঘটতে থাকে।

☑ চার মাযহাবের চারজন বিচারক নিয়োগের মতো একই শহরে একাধিক বিচারক নিয়োগের ধারাও চালু হয়ে যায়।

☑ প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রথা চালু হয়। যিনি হতেন বিচারব্যবস্থা এবং বিচারকদের ব্যাপারে প্রধান দায়িত্বশীল। বিচারকদের জন্য বিশেষ পোশাক পরিধানের ব্যবস্থা করা হয়। খলিফা, প্রশাসক এবং আমিরদের থেকে বিচার বিভাগ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

☑ জনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত বিচারব্যবস্থা পূর্ণতা পায়। এর জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি রচিত হয়। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অধিকার রক্ষায় এর কার্যকর প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। ফলত সংরক্ষিত থাকে বিধিবিধান। ব্যবস্থাপনা হয় সুসংহত এবং প্রতিষ্ঠিত হয় শিষ্টাচার।

☑ সামরিক বাহিনীর জন্য আলাদা বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় তা স্বয়ংসম্পন্ন এবং পৃথক বিচারব্যবস্থায় রূপ নেয়। বিচার-সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং পরিধিগুলো অন্যান্য বিচারিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়।

☑ আব্বাসি খলিফাগণ অন্যায় ও দুর্নীতির বিচার করতে বসতেন। এ বিষয়ে তারা বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। আব্বাসি খিলাফতের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তা বহাল ছিল। এরপর তারা এ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বিচারকের কাছে অর্পণ করেন।

☑ বিচারকের ক্ষমতা বেড়ে যায়। লেনদেন, শাস্তি প্রদান, ব্যক্তিগত অবস্থা, শারীরিক দণ্ডবিধি-সহ বিভিন্ন ধরনের মামলা-মোকদ্দমায় তাদের হস্তক্ষেপ বাড়তে থাকে। চালু হয় 'মসজিদের বিচারক' নামে নতুন পদ। যারা ২০০ দিরহামের কম পরিমাণ দণ্ডের মোকদ্দমা পরিচালনা করতে পারতেন।

☑ বিচারকরা নিজেদের কাজের পাশাপাশি আরও কিছু কাজ করতেন। এর কিছু কিছু ছিল বিচারকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর কিছু পরিচালনা সংক্রান্ত। ফলে বিচারককে ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে হতো। ইয়াতিমদের সম্পদ দেখভাল করা, ওসিয়ত পূর্ণ করা, কোষাগারের খোঁজখবর রাখা, টাকশালের ওপর নজরদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা, মসজিদ এবং ব্রিজ সংস্কারের দায়িত্ব ছিল তাদের হাতে। এ ছাড়াও নির্মাণকাজের পর্যবেক্ষক, পুলিশ এবং জনশৃঙ্খলার দায়িত্বও তারা পালন করতেন। জুমুআ এবং ঈদের নামাজ

পরিচালনা, সর্বজনীন অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ এবং খলিফা নির্বাচন বা অপসারণ এই বিচারকরাই করতেন। কোনো কোনো বিচারক মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ এবং নাজুক বিষয়ে তারা প্রশাসকের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে কর্মরত থাকতেন।

☑ আব্বাসি যুগে বিচারকার্য পরিচালনায় বিচারকের জন্য সহযোগীর ব্যবস্থা করা হয়। যেমন: সহকারী বিচারক, আদালতের মুনশি, ঘোষক, প্রহরী, তদন্ত কর্মকর্তা, পেশকার এবং আদালতের নথিরক্ষক ইত্যাদি।

☑ আব্বাসি যুগে বিচারকরা মামলা-মোকদ্দমার জন্য নতুন নতুন ধারা এবং বিচারব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যবস্থাপনা চালু করেছিলেন। যেমন: বাদী-বিবাদীর ধারাবাহিকতা রক্ষা, সাক্ষী যাচাই, রায় সংরক্ষণ, নথিভুক্তকরণ, বিচারকের দফতর ও কোষাগার ব্যবস্থাপনা, বিচারকের সিন্দুক, ন্যায়পরায়ণ কিংবা সার্বক্ষণিক উপস্থিত সাক্ষীর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। বিচারকের দফতরে তাকের ব্যবস্থা ছিল। নথিপত্র সিল করে সেখানে সংরক্ষণ করে রাখা হতো।

☑ অনেক আলিম এবং ফকিহ নানান কারণে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। যেমন তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা, রাজনৈতিক কারণ এবং মতাদর্শগত অমিল। তাদের ভয় ছিল, ন্যায়বিচার পরিচালনা হয়তো তাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। কারণ প্রভাবশালীরা তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।

☑ বিচারকরা নিজেদের প্রভাব এবং গাম্ভীর্য ধরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। এ কারণে প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাদের দরবারে যাতায়াত থেকে বিরত থাকতেন। তাদের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে স্বাধীনভাবে রায় দিতেন। খলিফা বা প্রশাসক—যে-ই অপরাধী হোক না কেন, তাকে বিচারকের সামনে হাজিরা দিতে হতো। এমন অনমনীয়তার কারণে বিচারকের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ তাদের প্রতি আস্থা রাখতে শুরু করে। সরকারের সাথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে বিচারককে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করা হলে জনতা বিচারকের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। বিচারিক নিরাপত্তা আব্বাসি যুগে জারি ছিল।

☑ বিচারকদের ইজতিহাদের ফলে প্রথম দিকে একই রকম মামলার আদেশে ভিন্নতা দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা বিরোধপূর্ণ রায়ের ক্ষেত্রে ফিকহি মাযহাব অনুসরণ করতে থাকেন।

☑ আব্বাসি যুগে বিচারকের সংখ্যা ছিল বেশি। সে-সময় থেকেই বিচারকদের নিয়ে বিশেষ গ্রন্থাবলি রচিত হতে থাকে। যেমন: ওয়াকি (৩০৬ হি.) রচিত *আখবারুল কুদ্বাহ*, আল-কিনদি (৩৫০) রচিত *আল-উলাতু ওয়াল কুদ্বাহ* এবং

আবু উবাইদ মামার ইবনুল মুসান্না (২০৯ হি.) রচিত *আখবারু কুদ্বাতিল বাসরাহ*। এসব গ্রন্থের হাত ধরেই পরবর্তীকালে লেখালেখির ধারা চলতে থাকে।

০৬

আন্দালুসে ও মরক্কোতে বিচারব্যবস্থা

মুসলিমরা আন্দালুসকে 'আল-ফিরদাউসুল মাফকুদ' তথা 'হারানো স্বর্গ' নামে অভিহিত করে থাকে। কারণ অতীতে সেখানে মুসলিমদের সভ্যতা এবং উন্নতি ছিল প্রবাদতুল্য। পরবর্তী সময়ে সেটা কেবল ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি থেকেই হারিয়ে যায়নি, বরং ওই অঞ্চলে মুসলিমদের নাম-নিশানাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ইসলামি সভ্যতার জোয়ার দুদিকে চলছিল। একটি আন্দালুস ও উত্তর আফ্রিকার মরক্কোতে। অপরটি পূর্ব দিকের মিশর, হিজাজ, শাম, ইরাক, পারস্য, খোরাসান এবং ট্রান্সঅক্সিয়ানা জুড়ে। পশ্চিমে ইসলামি ইতিহাসের সূচনালগ্নে আন্দালুস ও মরক্কোর সভ্যতা ছিল ইসলামি খিলাফতের ইতিহাসে মূল্যবান মুকুটতুল্য।[৭৬৫]

আন্দালুস এবং মরক্কোর বিচারব্যবস্থার ইতিহাস উমাইয়া এবং আব্বাসি যুগের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসের সমসাময়িক হলেও সেখানে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। নির্দিষ্ট বিশেষত্বের পাশাপাশি সেখানে পার্থক্যও ছিল অনেক। এই পার্থক্যটা ছিল বিশেষভাবে রাজনৈতিক এবং ফিকহকেন্দ্রিক। সেখানে বিশেষ বিশেষ পরিভাষার ব্যবহার এবং স্বতন্ত্র বিচারিক ব্যবস্থাপনা চালু ছিল। এ কারণেই আমরা দেশ দুটির আলোচনা পৃথকভাবে করছি।

আন্দালুস এবং মরক্কোর মাঝে থাকা মিশ্র নৈকট্য এ পরিচ্ছেদে উভয় অঞ্চলের আলোচনা একসাথে করার অন্যতম কারণ। তাদের অবস্থান পাশাপাশি হওয়ায় পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা এবং লেনদেন বজায় ছিল। ভৌগোলিক অবস্থান মুখোমুখি হওয়ায় অনেক সময়ই অঞ্চল দুটি একক শাসনকার্যের অধীনে থাকত। বিচারব্যবস্থার গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষত্বের ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলই ছিল বরাবর।

এ কারণেই আমরা আন্দালুস এবং মরক্কোর কয়েকটি রাজনৈতিক ঝলক দেখে

---

[৭৬৫] সাধারণ আলিমগণ, বিশেষভাবে আন্দালুসের আলিমগণ আন্দালুস এবং মরক্কোর বিবরণ সংবলিত অনেক বই লিখেছেন। তাদের লেখাতে সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে। আন্দালুস সম্পর্কে জানতে যুহরুল ইসলাম বইয়ের তৃতীয় খণ্ড এবং আল-মু'জিব ফী তালখীসি আখবারিল মাগরিব গ্রন্থ দেখুন।

নেবো। এরপর সেখানকার বিচারব্যবস্থার পরিচালনা সংক্রান্ত এবং গঠনমূলক ব্যবস্থাপনার প্রতি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব। এ ক্ষেত্রে অঞ্চল দুটির স্বতন্ত্র দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আমরা ভুলব না। আবার সেখানকার প্রসিদ্ধ বিচারকদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এখানে থাকবে। পূর্বে প্রতিটি যুগের বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা শেষে আমরা সে যুগের বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। সে ধারাবাহিকতায় বরাবরের মতো এ অধ্যায়েও আমাদের আলোচনা শেষ হবে আন্দালুস এবং মরক্কোর বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

ঐতিহাসিক সারাংশ

আন্দালুসে ইসলাম এবং মুসলিমরা টিকে ছিল আটশত বছর। এরপর তাদের পর্ব এমনভাবে শেষ হয়ে গেল যেন মাত্র অল্প কয়েকটা দিনই সেটা অবশিষ্ট ছিল। মুসলিমদের এই নিশ্চিহ্ন হওয়ার পেছনে কারণ ছিল দুটো। প্রথমত আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর কিতাব পালনে শিথিলতা। দ্বিতীয়ত স্প্যানিশদের শত্রুতা এবং ইউরোপীয়দের তিক্ত বিদ্বেষ।

কোনো চিন্তাশীল ঈমানদার যদি নিরপেক্ষভাবে আন্দালুসের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ইতিহাস পড়ে, তাহলে সে কোনোভাবেই স্থির থাকতে পারবে না। মুসলিমদের বেদনাদায়ক ক্রান্তিলগ্নের কথা জেনে তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠবে। অস্থিরতায় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে তার অন্তর। আন্দালুসে মুসলিমদের সাথে হওয়া জুলুমের কথা জেনে দুঃখ-যন্ত্রণায় সে কাতরাতে থাকবে। মুসলিমদের ওপর নেমে আসা দুর্যোগের কথা জানতে পেরে ঘর্মাক্ত হয়ে যাবে সে ব্যক্তির কপাল। এ ন্যাক্কারজনক কলঙ্কের দায়ভার সাধারণভাবে ইউরোপ এবং বিশেষভাবে স্পেনকে চিরকাল বয়ে বেড়াতে হবে। বিশেষত তা আরও পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে, যখন মুসলিমদের বিজয়গাথার সাথে স্প্যানিশদের হিংস্রতা এবং চারিত্রিক অধঃপতনের তুলনা করা হবে। অবশ্য উদাহরণ হিসেবে আমরা মুসলিমদের ফিলিস্তিন বিজয়ের কথাও বলতে পারি। সে-সময় খ্রিষ্টানদের ধর্ম, উপাসনালয় এবং তাদের জীবনের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা মুসলিমরা কেবল চুক্তিপত্রেই লিখেনি, বরং তা কার্যকর করে ইতিহাসও রচনা করেছিল। পক্ষান্তরে স্প্যানিশরা আন্দালুসে নাসরি রাজবংশ আর মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে। মুসলিমদের সাথে তাদের লিখিত এবং ব্যবহারিক আচরণ অত্যন্ত জঘন্য ছিল। নগ্ন পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল তারা। ইসলাম, মুসলিম, আরবি ভাষা এবং মুসলিম সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তারা বইপত্র ও পাঠাগার জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বাধ্য করা হয়েছিল খ্রিষ্টান হওয়ার জন্য। তারা মুসলিমদের খুঁজে খুঁজে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছিল। হিংস্রতা এবং ভয়াবহতায় তাতারিদেরও হার মানিয়েছিল স্প্যানিশরা।

সুদীর্ঘ ৮০০ বছর ধরে মুসলিমদের মরক্কো[৭৬৬] এবং আন্দালুস পরিচালনার কিছু চিত্র আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরব।[৭৬৭]

আফ্রিকা বিজয়

উমর ইবনুল খাত্তাব -এর যুগেই বিখ্যাত সাহাবি আমর ইবনুল আস মিশর জয় করেছিলেন। ইসলাম এবং মুসলিমরা সেখানে স্থির হওয়ার পর তারা উত্তর আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। সেখানে সত্তর বছর যাবৎ চালু ছিল বিজয়াভিযান। হিজরি ৯০ সালে মূসা ইবনু নুসাইর আটলান্টিক মহাসাগর অবধি পৌঁছে যান। ভূমধ্যসাগর প্রণালির আর কোনো নগরীই তখন বিজিত হওয়া বাকি ছিল না।

উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের সময়টা যে কেবলই লড়াই-যুদ্ধের জন্য ছিল, তা কিন্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল মানবজাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যে ইসলামের দাওয়াত বহনকারী জিহাদ। দেশের সমৃদ্ধি, নগর প্রতিষ্ঠা, আস্তাবলের ব্যবস্থাপনা, দুর্গ নির্মাণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করাটাও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই বার্বার জাতি-সহ উত্তর আফ্রিকার আপামর জনগণ ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে সামান্যতমও ইতস্তত বোধ করেনি। বরং ইসলাম গ্রহণ করে তারা নিজেরাই দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। মুজাহিদদের দলে যোগ দিয়ে পদে পদে তাদের অনুসরণ করেছে। আফ্রিকা প্রদেশের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রথমে কায়রুওয়ান নগরী এবং পরবর্তীকালে রাবাত-সহ অন্যান্য শহর প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুজাহিদদের সাথে থেকে বার্বাররাও ইসলামের দাওয়াত প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত থাকে। ক্রমাগত চলতে থাকা বিজয়াভিযানে মূসা ইবনু নুসাইর এবং তারিক ইবনু যিয়াদকে তারা সঙ্গ দিয়েছিল।[৭৬৮]

---

[৭৬৬] তৎকালীন মরক্কো ছিল বর্তমানের উত্তর আফ্রিকার আরবিভাষী কয়েকটি দেশের সমষ্টি। সেগুলো হচ্ছে মৌরিতানিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া এবং লিবিয়া। এ বিষয়টি মনে থাকলে আমাদের আলোচনা বুঝতে সুবিধা হবে।

[৭৬৭] আবদুল ওয়াহিদ আল-মারাকিশি 'আল-মু'জিব ফী তালখীসি আখবারিল মাগরিব' নামে একটি পুস্তক সংকলন করেছেন। যা-তে তিনি তৎকালীন মরক্কোর সুবিশাল সীমানার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, 'আন্দালুসের উপদ্বীপ পিরেনিজ পর্বতমালা থেকে আটলান্টিক মহাসাগর অবধি। আন্দালুসের দক্ষিণে আফ্রিকার উপকূল থেকে আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া হয়ে পশ্চিম মিশরের বর্ডার অবধি। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এটাই ছিল মরক্কোর সীমানা।' (তাহকীককারীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য। পৃ. ১ এবং ৪৩১)

ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস আল-খুশানি (৩১১ হি.) সুস্পষ্টভাবে গোটা উত্তর আফ্রিকা এবং আন্দালুসকে মরক্কো বলে আখ্যায়িত করেছেন। যার রাজধানী ছিল কর্ডোভা। তার লেখা 'কুদ্বাতু কুরতুবা' বইয়ের ১ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'বিচারকদের ফরমান কেবল তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত, যারা মরক্কোর রাজধানী কর্ডোভাতে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।'

[৭৬৮] উত্তর আফ্রিকাতে বিজয়াভিযান পরিচালনার পর আরবদের নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ নগরসমূহ এবং গ্রিক উপকূলীয় শহরগুলোর মানচিত্র দেখতে আতলাসুত তারীখিল আরাবি, পৃ. ৫৬ এবং আল-মু'জিব ফী তালখীসি

আন্দালুস বিজয়

মূসা ইবনু নুসাইর সাগর-পথে আন্দালুস অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের সাথে পরামর্শ করেন। আবশ্যিক পরিকল্পনা এবং পর্যাপ্ত অনুসন্ধানের পর খলিফার অনুমোদন মিলে। মূসা তখন তারিফ ইবনু মালিক নামে তাঁর এক সেনাপতিকে ৪০০ মুজাহিদ এবং ১০০ অশ্বারোহী দিয়ে প্রেরণ করেন। এটা ৯০ হিজরি মোতাবেক ৭০৯ খ্রিষ্টাব্দের কথা। ইসলামি বাহিনী বন্দরে প্রথমবারের মতো স্পেনের সৈন্যদের মোকাবিলা করে। বন্দরটি এখন তারিফের নামেই পরিচিত। তারা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গনিমতের সম্পদ নিয়ে আফ্রিকায় ফিরে আসেন।

এরপর মূসা পুনরায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেন নিজের সাবেক ক্রীতদাস তারিক ইবনু যিয়াদকে। তারিক ৯২ হিজরির রজব বা শাবান মাস মোতাবেক ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল বা মে মাসে প্রণালি অতিক্রম করে ঘাঁটি স্থাপন করেন। ৯২ হিজরির ২৮ রমজান রডারিকের বিশাল বাহিনীর সাথে তার মোকাবিলা হয়। সপ্তাহব্যাপী চলমান এই যুদ্ধে অবশেষে মুসলিমরা জয়লাভ করে। আন্দালুসে শুরু হয় ইসলামের অগ্রযাত্রা। ৯২ থেকে ৯৫ হিজরি অবধি উত্তর দিক থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ব এবং পশ্চিমে বিজয়াভিযান এগিয়ে চলে। ৭ লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশি এলাকা ইসলামের অধীনে চলে আসে। যার অধীনে ছিল স্পেন এবং পর্তুগালের মতো দেশ। লোকেরা ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে নিতে থাকে। আবার কেউ কেউ খ্রিষ্টধর্মে বহাল থেকে স্পেনের উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নেয়। এদের অবস্থা ছিল পিঠের ওপর গজিয়ে ওঠা বিষফোঁড়া এবং টাইমবোমের মতো। অপরদিকে দক্ষিণ ফ্রান্স পর্যন্ত এলাকা মুসলিমদের অধীনে চলে আসে।

ইসলামি সাম্রাজ্যের মাঝে মরক্কো অবধি বিস্তৃত আন্দালুসের রাজধানী ছিল কায়রুওয়ান নগরী। বর্তমানে এটি তিউনিসিয়ায় অবস্থিত। পরবর্তী সময়ে আন্দালুসকে স্বতন্ত্র প্রদেশ বানিয়ে ইশবিলিয়াকে এর রাজধানী করা হয়।

প্রশাসকদের যুগ

৯৬ হিজরিতে মূসা ইবনু নুসাইর এবং তারিক ইবনু যিয়াদকে তৎকালীন খলিফা দামিস্কে ডেকে পাঠালেন। মূসা তখন ছেলেদেরকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। আবদুল আজিজকে নিয়োগ দেন আন্দালুসের আমির হিসেবে। যার দফতর ছিল ইশবিলিয়াতে। আবদুল মালিককে মরক্কোতে এবং আবদুল্লাহকে আফ্রিকার আমির নিযুক্ত করে তিনি দামিস্কে গমন করেন। এরপর আবদুল আজিজ নিহত

আলবায়ানুল মাগরিব, পৃ. ৩২ দ্রষ্টব্য।

হন এবং তার দুই ভাইকে পদচ্যুত করা হয়। তারপর আন্দালুসের প্রশাসক কখনো দামিস্ক থেকে, কখনো কায়রুওয়ান থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়। কখনো কখনো আন্দালুসে থাকা সেনাপতিদের পক্ষ থেকেও নিয়োগ দেওয়া হতো।

ইতিহাসের পাতায় এই সময়টি 'প্রশাসকদের যুগ' বলে পরিচিত। কারণ আন্দালুসে ৪০ বছরে ২০ জন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এদের প্রথমজন ছিলেন আইয়ুব ইবনু হাবিব আল-লাখমি। আবদুল আজিজ ইবনু মূসা নিহত হওয়ার কয়েক মাস পর তিনি নিয়োগ পেয়েছিলেন। ৯৭ হিজরি মোতাবেক ৭১৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন তিনি। এরপর অন্য কেউ দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। একসময় কর্তৃত্ব আর প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব আসে ইউসুফ ইবনু আবদির রহমান আল-ফিহরির কাছে। যিনি ১৩৮ হিজরি মোতাবেক ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষ অবধি নিয়োজিত ছিলেন।[৭৬৯]

ইসলামের আহ্বায়কদের নতুন দ্বীন প্রচার, তার বৈশিষ্ট্য এবং তাত্ত্বিক বিশেষত্বের সাথে এই যুগটি ছিল অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে প্রশাসকদের স্থিরতা না থাকায় তাতে বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে। স্পেনে লাগাতার যুদ্ধ ও ওপর্যুপরি হামলার কারণে এই বিশৃঙ্খলা আরও দীর্ঘায়িত হতে থাকে। তবে এতকিছুর পরও মুসলিমদের জীবনে জ্ঞানচর্চা, স্থাপত্যশিল্প, সভ্যতার বিনির্মাণ এবং আরবি ভাষার প্রসার কখনোই থেমে থাকেনি। এ যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ছিল তিনটি :

- ☑ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাজনীতির জন্য প্রশাসক।
- ☑ আল্লাহর দ্বীন কায়েম, ন্যায়বিচার এবং মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য বিচারক।
- ☑ শিক্ষাদান, দিক-নির্দেশনা এবং দাওয়াতি কাজের জন্য দাঈ।

উমাইয়া নেতৃত্ব

১৩২ হিজরিতে বাগদাদে আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। যা দামিস্ক থেকে উমাইয়া খিলাফতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। উমাইয়া খলিফা হিশাম ইবনু আবদিল মালিকের নাতি আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া ছিলেন অত্যন্ত চৌকশ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক। তিনি আব্বাসিদের হাত থেকে পালাতে সমর্থ হন। সেখান থেকে যাত্রা করেন পশ্চিমে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক মরুভূমি এবং বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে থিতু হন আন্দালুসে। নিজস্ব দক্ষতা এবং প্রতিভার জোরে তিনি আন্দালুসের আরব, বার্বার এবং স্প্যানিশদের নিজের অধীনে আনেন। এরপর বাগদাদ এবং আব্বাসিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্য

---

[৭৬৯] প্রশাসকদের নাম এবং তাদের প্রত্যেকের শাসনামল সম্পর্কে জানতে দেখুন, ডক্টর আহমাদ বাদর লিখিত দিরাসাতুন ফী তারীখিল আন্দালুসি ওয়া হাদারাতিহা, পৃ. ২৪; যুহরুল ইসলাম : ৩/৩১৪; আল-মু'জাব, পৃ. ৩৫ ও ৩৯।

প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এটা ১৩৯ হিজরি / ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের কথা। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ডোভা।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল প্রথম দিকে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মানসুরের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাতেন। পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র নেতৃত্ব প্রকাশ করার পাশাপাশি তার নাম ধরে দুআ করার রীতিও প্রচলন করেন। নিজেকে 'আমির' ঘোষণা করার কারণ ছিল, যাতে খিলাফত নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি না হয় এবং একাধিক খলিফা হওয়ার ধারণাও কেউ না করে। তার বংশের আমিররাও তার রীতিই অনুসরণ করেছিলেন।[৭৭০]

অন্যায়ের কথা তুলে ধরা এবং ইনসাফ কায়েমের সুবিধার্থে কর্ডোভার বিচারক সবসময় আমিরের সাথে থাকতেন। ৩৪ বছর আমির হিসেবে থাকার পর ৬০ বছর বয়সে আবদুর রহমান আদ-দাখিল মৃত্যুবরণ করেন। তাকে 'সাকরু কুরাইশ' তথা 'কুরাইশের বাজপাখি' নামে অভিহিত করা হতো। তিনি যে এ নামের উপযুক্ত—সেটা স্বয়ং খলিফা আল-মানসুরও স্বীকার করতেন। সুবিশাল পরিসরের শক্তিশালী একটি রাজ্যের ভিত তিনি গড়ে দিয়েছিলেন। যার স্থায়িত্ব ছিল আগের উমাইয়া রাজ্যের প্রায় তিনগুণ বেশি সময়ব্যাপী।[৭৭১] শাসনব্যবস্থা বিশেষত সেনাবাহিনী, প্রশাসন এবং বিচার বিভাগকে তিনি সুসংহত করেছিলেন। এ বিষয়ে আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করব।

আবদুর রহমানের পর তার বংশধরের মধ্যে ১৮০ হিজরিতে হিশাম, ২০৮ হিজরিতে হাকাম, ২৩৮ হিজরিতে আবদুর রহমান আল-আওসাত, ২৭৩ হিজরিতে মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান, ২৭৫ হিজরিতে মুনযির এবং ৩০০ হিজরিতে আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৩০০ হিজরি মোতাবেক ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে আবদুর রহমান আন-নাসিরের যুগটি সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষের যুগ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তার শাসনামলেই আন্দালুসে সর্বপ্রথম খিলাফতের ঘোষণা আসে। ফলে আন্দালুসে ইমারতের পরিবর্তে চালু হয় খিলাফত।[৭৭২]

আন্দালুসে উমাইয়া খিলাফত

আবদুর রহমান আন-নাসির ৩১৭ হিজরিতে নিজেকে আন্দালুসের খলিফা

---

[৭৭০] দিরাসাতুন ফী তারীখিল আন্দালুসি ওয়া হাদ্বারাতিহা, পৃ. ৬৪; আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/৪৬৮; আস-সহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল আন্দালুস, পৃ. ৩১। আন্দালুসের খলিফা এবং আমিরদের নাম জানতে যুহরুল ইসলাম : ৩/৩১৫ দেখুন। সেখানে ২৪জন আমির এবং খলিফা ছিলেন।

[৭৭১] দিরাসাতুন ফী তারীখিল আন্দালুসি ওয়া হাদ্বারাতিহা, পৃ. ৯৩; আস-সহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল আন্দালুস, পৃ. ৩১; আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/৪৬৮

[৭৭২] আস-সহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল আন্দালুস, পৃ. ৩৩; দিরাসাতুন ফী তারীখিল আন্দালুসি ওয়া হাদ্বারাতিহা, পৃ. ৯৯; যুহরুল ইসলাম : ৩/৩১৫

হিসেবে ঘোষণা দেন। তার সময় উমাইয়ারা আন্দালুসে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে। আন্দালুসের খলিফাদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক ক্ষমতাধর ছিলেন। তিনি ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পর আন্দালুস সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। তবে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি কমে ৪.৪০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারে নেমে আসে। মুসলিমদের অনেক অঞ্চল স্প্যানিশরা দখল করে নেয়।

৩৫০ হিজরিতে (৯৬১ ঈ.) আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর বেশ কয়েকজন উমাইয়া খলিফা দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তারা কেউ আবদুর রহমানের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারেননি। তাদের সময়কালে রাজ্য ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। হিজরি ৫ম শতকের শুরুতে উমাইয়া খিলাফত সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। অবশেষে ৪২২ হিজরিতে (১০২১ ঈ.) তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর আন্দালুস বিভাজিত হয়ে যায় বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজাদের কাছে। এইসব রাজারা বাগদাদের আব্বাসি খলিফাদের উপাধি নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করতেন।

❁ মুলূকুত তাওয়াইফ বা আঞ্চলিক রাজা

আন্দালুসে উমাইয়া খিলাফত অবসানের পর বিভিন্ন অঞ্চল আর শহরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। প্রতিটি রাজ্য চলত একজন পৃথক রাজার অধীনে। একপর্যায়ে রাজার সংখ্যা ২৩ জনে গিয়ে ঠেকে। প্রত্যেক রাজা খলিফা নাম ধারণ করে জনগণ থেকে বাইয়াত নিতেন। এর ফলে, কোথাও কোথাও ৮০ কিলোমিটার দূরত্বের মাঝে চারজন আমিরুল মুমিনীনের দেখা মিলত। যেমন: ইশবিলিয়া, আল-জাযিরাতুল খাদ্বরা, মালাকা এবং সাবতাহ অঞ্চল।[৭৭৩]

স্প্যানিশরা মুসলিমদের এই বিভক্তির সুযোগ নেয়। তারা একের পর এক ইসলামি অঞ্চল দখল করতে থাকে। অবশেষে ৪৮৭ হিজরিতে (১০৮৫ ঈ.) টলেডো নগরীর পতন হয়। আন্দালুসের মুসলিমরা তখন মরক্কোর আমির ইউসুফ ইবনু তাশফিনের কাছে সাহায্য চেয়ে খবর পাঠান।

❁ আল-মুরাবিত রাজবংশ

আমির ইউসুফ ইবনু তাশফিন আল-মুরাবিতি আন্দালুসের মুসলিমদের সাহায্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ৪৭৯ হিজরিতে (১০৮৬ ঈ.) তার বাহিনী যালাকার যুদ্ধে স্প্যানিশ খ্রিষ্টানদের পরাজিত করে। আঞ্চলিক রাজাদের বিচার করে আন্দালুসকে তিনি মরক্কোর সাথে জুড়ে দেন। আব্বাসি খলিফাদের জন্য দুআ করার নীতি প্রচলন করেন। খলিফার আদবের প্রতি লক্ষ রেখে তাকে 'আমিরুল

---

[৭৭৩] আঞ্চলিক রাজাদের সময় আন্দালুসের সীমানা, রাজাদের নাম এবং আল-মুরাবিত রাজবংশের আমিরগণের নাম জানতে আতলাসুত তারীখিল আরাবি, পৃ. ৫৩ দেখুন। যুহরুল ইসলাম : ৩/৩১৬; আল-মু'জিব, পৃ. ১১১

মুমিনীন' না বলে 'আমিরুল মুসলিমীন' বলা হতো।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে বলতে হয়, আন্দালুসের সীমানা তখন ২৫ হাজার বর্গ কিলোমিটারে নেমে আসে। টলেডো-সহ বিশাল অঞ্চল জুড়ে চলতে থাকে খ্রিষ্টানদের শাসন।[৭৭৪]

❁ মুওয়াহহিদদের রাজত্ব

শাসকদের অবহেলা, ইবাদতে ব্যস্ত থাকা এবং যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ মহিলাদের হাতে চলে যাওয়ার দরুন তাশফিন বংশের রাজত্ব দুর্বল হয়ে যায়। আন্দালুস পুনরায় আঞ্চলিক রাজত্বে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জনগণ তখন মরক্কোর মুওয়াহহিদদের কাছে সাহায্য চায়।

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ (৫২৪ হি.) নিজেকে প্রতিশ্রুত মাহদি বলে দাবি করে মরক্কোতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের নাম 'মাহদি' রেখে অনুসারীদের মুওয়াহহিদ তথা একত্ববাদী বলে আখ্যায়িত করেন। এরপর ৫২৮ হিজরিতে তাদের সর্দার আবদুল মুমিন ইবনু আলি বারবারির নেতৃত্বে আফ্রিকা বিজিত হয়। উমাইয়া যুগের পর মরক্কোতে মাহদিকেই সর্বপ্রথম 'আমিরুল মুমিনীন' বলে অভিহিত করা হয়।

এরপর মুওয়াহহিদ রাজারা আন্দালুসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৫৪০ হিজরিতে (১১৪৫ ঈ.) তাদের উদ্ধার করে। আন্দালুসকে দ্বিতীয়বারের মতো মরক্কোর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আন্দালুসের আরও কিছু জায়গা মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে যায়। যার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা ছিল সারকাসতা। এটা ৫১২ হিজরির (১১১৮ ঈ.) কথা।

স্প্যানিশ খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের ওপর ঘন ঘন হামলা করে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে ৬০৯ হিজরির (১২১২ ঈ.) আল-ইকাব যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের হাতে মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ইবনু হুদ এবং ইবনুল আহমারের নেতৃত্বে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে গণযুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু তারা কর্ডোভাকে খ্রিষ্টানদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। অবশেষে ৬৩৩ হিজরিতে (১২৩৬ ঈ.) কর্ডোভা মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ৬৩৫ হিজরিতে ইবনু হুদের মৃত্যু হলে তার অনুসরণ করে ইবনুল আহমার আন্দালুসে মুওয়াহহিদদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন।[৭৭৫]

❁ আল-আহমার/আন-নাসর বংশের রাজত্ব

আল-আহমার বংশের প্রথম রাজা ছিলেন আমিরুল মুসলিমীন আবু আবদিল্লাহ

---

[৭৭৪] যুহরুল ইসলাম : ৩/৩৭

[৭৭৫] আল-মু'জিব ফী তালখীসি আখবারিল মাগরিব, পৃ. ২৪৫; যুহরুল ইসলাম : ৩/৩৮

মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-খাযরাজি। তিনিই ছিলেন নাসরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি শক্তভাবে এর ভিত স্থাপন করে যাবতীয় বিষয় সুবিন্যস্ত করেছিলেন। যেসব স্প্যানিশ খ্রিষ্টান সৈন্য ৬৪৩ হিজরিতে গ্রানাডা ঘেরাও করে রেখেছিল, তাদের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তোষামোদ এবং রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে তাদের হাত থেকে মুসলিমদের রক্ষা করেন। ৬৭১ হিজরিতে (১২৭২ ঈ.) তার মৃত্যুর পর আন্দালুসের সীমানা এক শতাব্দীর মধ্যেই ৩০ হাজার বর্গ কিলোমিটারের নিচে নেমে আসে। আন্দালুসের ক্ষমতা কেবল গ্রানাডা এবং পার্শ্ববর্তী অংশের মাঝেই টিকে থাকে। গ্রানাডা তখন পরিণত হয় আন্দালুসে বসবাসরত মুসলিমদের আশ্রয়কেন্দ্রে।[৭৭৬]

ইবনুল আহমার মৃত্যুবরণ করলে তার ছেলে আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ দায়িত্ব গ্রহণের পর কাস্টিলের খ্রিষ্টানরা তৎপর হয়ে ওঠে। তারা গ্রানাডা দখলের তোড়জোড় শুরু করে। মারিনি সাম্রাজ্যের অধীনে পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের পরও গ্রানাডা ত্যাগ করে তারা আবু আবদিল্লাহর সাথে সন্ধিচুক্তি করে। সুলতান আবু ইউসুফ আল-মানসুর ৬৭৪ হিজরিতে (১২৭৫ ঈ.) আন্দালুসে এসে খ্রিষ্টানদের পরাজিত করেছিলেন। এরকম ঘটনা চার বার ঘটেছিল। অবশেষে জাযিরাতুল খাদ্বরাতে তার মৃত্যু হয়। গ্রানাডার অভিজ্ঞ সমরবিদরা বনু মারিনের প্রবীণ ব্যক্তির নেতৃত্বে স্বেচ্ছায় দেশত্যাগীদের যাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। তারপর সুলতান আবু ইয়াকুব আল-মারিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সুলতান আবু আবদিল্লাহর পাশে দাঁড়ান। পরে ৭০১ হিজরিতে (১৩০২ ঈ.) সুলতান আবু আবদিল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। ৭১৩ হিজরিতে (১৩১৪ ঈ.) আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈলের কাছে ক্ষমতা চলে যায়, যিনি ইবনুল আহমারের বংশীয় ছিলেন না। তিনি তার সাম্রাজ্যের ভিত মজবুত করেন।

এভাবেই ক্ষমতার পালাবদল চলতে থাকে। ৭৪০ হিজরিতে (১৩৪০ ঈ.) খ্রিষ্টানরা আন্দালুস এবং মরক্কোর বাহিনীকে পরাজিত করে। মরক্কোর বাহিনীর সহায়তা আন্দালুসে এসেই শেষ হয়ে যায়। খ্রিষ্টানদের বারংবার আক্রমণ চালায় এবং তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি গ্রানাডায় অস্থিরতা বাড়তে থাকে। সেখানকার মুসলিমরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ খ্রিষ্টানদের সাহায্য নেওয়ার ফলে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি হয়। খ্রিষ্টান রাজা আল-আহমার বংশের অন্য রাজাদের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠালেও তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ৮৯৫ হিজরিতে (১৪৯০ ঈ.) তারা গ্রানাডা ঘেরাও করে। কিন্তু জিততে পারেনি। এরপর ১২/৬/৮৯৬ হিজরিতে (২৩/৪/১৪৯১ ঈ.) তারা পুনরায় গ্রানাডা ঘেরাও করে। এবার সান্তা ফে নগরী তৈরি করে অবরোধ শক্তিশালী করতে থাকে। ২১/১/৮৯৭ হিজরিতে

[৭৭৬] যুহরুল ইসলাম : ৩/৪০

(২৫/১১/১৪৯১ ঈ.) আত্মসমর্পণের চুক্তিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা সমাপ্ত হয়। অবশেষে এক কালো দিনে ইসলামের নগরী হস্তান্তরের মাধ্যমে আন্দালুসে ইসলামি শাসনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটে। ক্যালেন্ডারের পাতায় সেই দিনটি ছিল ২/১/১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ।

এরপর স্প্যানিশরা তাদের ভেতরে থাকা ঘৃণ্য বিদ্বেষ উগড়ে দেয়। মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য নিপীড়ন চালাতে থাকে, যা ছিল চুক্তির খেলাফ। এসব আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে হয় যে, মুসলিমদের নির্মূল করার জন্য খ্রিষ্টানরা এমনভাবে উঠেপড়ে লেগেছিল—যার কোনো নজির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এতকিছুর পরও আন্দালুসে আরব রক্তের ছিটেফোঁটা থেকেই যায়। ঈমানের প্রদীপ গোপনে মিটমিট করে জ্বলতে থাকে। ফলে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেখানে নতুন করে ইসলামের আলো দেখা যেতে শুরু করে।[৭৭৭]

মরক্কো এবং উত্তর আফ্রিকা

আমরা ইতিমধ্যেই মরক্কো এবং উত্তর আফ্রিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করেছি। এখানে আরেকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করব। কিছু সাম্রাজ্য বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের আনুগত্য থেকে বের হয়ে স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য বা সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে। যাদের মাঝে প্রথম ছিল ইবাদ্বি খারিজিদের প্রতিষ্ঠিত রুস্তমী সাম্রাজ্য। আব্বাসি খলিফা আল-মানসুরের সময়ে প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্যটি ১৩০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ২০২ হিজরিতে এর সমাপ্তি ঘটে। এ ছাড়াও মুরাবিত, মুওয়াহহিদ, বনু মারিন এবং হাফসিয় সালতানাতের মতো আগলাবি এবং ইদরিসি রাজবংশও ছিল।

মরক্কোর সিজিলমাসায় ২৯৬ হিজরিতে চালু হওয়া ফাতিমি সাম্রাজ্য ক্রমান্বয়ে পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়। এরা ছিল আব্বাসি সাম্রাজ্যের গলার কাঁটা। এদের রাজারা মৌলিকভাবে ইসমাঈলি শিয়া। শামের সালামিয়াতে ছিল এদের আদি নিবাস। ক্রমান্বয়ে মরক্কোতে এদের কার্যক্রম বিস্তৃত হয়। এরপর ২৯৭ হিজরিতে আবু উবাইদিল্লাহ আল-মাহদি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে আমিরুল মুমিনীন নাম গ্রহণ করে। রাজত্বের অপর দাবিদার আবু আবদিল্লাহ আশ-শিয়ায়ি তার হাতে নিহত

---

[৭৭৭] এ বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ হচ্ছে ডক্টর আলি আল-মুনতাসির আল-কাত্তানি লিখিত 'আস-সহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল উনদুলুসিল ইয়াওমা : জুযূরুহা ওয়া মাসাররুহা।' ঐতিহাসিক শেষদিককার ঘটনাগুলো আমরা উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা (পৃ. ২৯, ৩২ এবং ৩৭) থেকে নিয়েছি। উসতায আহমাদ আমিন বলেছেন, 'স্প্যানিশদের শরীরে এখন পর্যন্ত আরব রক্ত আছে।' — যুহরুল ইসলাম : ৩/২০

গ্রানাডা পতনের আগের মানচিত্র এবং গ্রানাডা পতনের পর পশ্চিম আরবের মানচিত্র দেখতে পারেন। মরক্কোর উপকূলসমূহে স্প্যানিশদের হামলাগুলো সম্পর্কে জানতে আতলাসুত তারীখিল আরাবি, পৃ. ৫৪ এবং যুহরুল ইসলাম : ৩/৪১ দেখুন।

হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদরের দুলালি ফাতিমা رضي الله عنها-এর সাথে সম্পৃক্ত করে নিজেদের ফাতিমি দাবি করলেও তারা আসলে উবাইদি। এই নামকরণ হয়েছে আবু উবাইদিল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে।

ক্রমে গোটা উত্তর আফ্রিকায় তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। আবু আবদিল্লাহ রাজনীতি গুছিয়ে নিয়ে নিজের সাম্রাজ্যকে সুসংহত করে। মিশর জয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে দুআ চাইতে থাকে। অবশেষে ৩৫৮ হিজরিতে তার সেনাপতি জাওহার সিকলির হাতে মিশর বিজিত হয়। তখন রাজধানী চলে যায় কায়রোতে। উপাধি গ্রহণের ক্ষেত্রে ফাতিমিদের অনেক বাড়াবাড়ি ছিল। ৩৬২ হিজরিতে তাদের পক্ষে হারামাইনে বক্তব্যও দেওয়া হয়েছিল। এমনকি ৩৯৬ হিজরিতে আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ নিজেও হারামাইনে বক্তব্য দিয়েছেন। শাম অঞ্চল দখল করে নেওয়ায় তাদের রাজত্বের পরিধি ইরাক অবধি বিস্তৃত হয়ে যায়।

খলিফা আল-হাকিমের সপক্ষে বনু আকিলের আমির ৪০১ হিজরিতে মুসেলে, আনবারে, মাদায়েনে এবং কুফাতে বক্তব্য দিয়েছেন। আবুল হারিস আরসালান ইবনু আবদিল্লাহ আল-বাসাসিরি বাগদাদস্থ আল-মানসুর জামে মসজিদে তাদের সপক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। উত্তর আফ্রিকাতে তাদের ক্ষমতা খর্ব হতে থাকে। অবশেষে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নিরলস প্রচেষ্টা এবং উবাইদিদের সর্বশেষ খলিফা আল-আদ্বিদের মৃত্যুর মাধ্যমে ফাতিমি যুগের অবসান ঘটে।[৭৭৮]

আল্লাহ তাআলার দয়ায় মরক্কো এবং উত্তর আফ্রিকাতে এখনো আরবি ভাষার প্রচলন আছে এবং মুসলিমরা সেখানে অবস্থান করছে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে বিচার বিভাগের সম্পর্ক

পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি আন্দালুস ও মরক্কোর বিচার-সংক্রান্ত দিকগুলোতে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব ফেলেনি। বিশেষত আন্দালুসের বিচারব্যবস্থা ছিল অনেকটাই স্থিতিশীল। প্রত্যেক শাসক ও সরকারের কাছে বিচার বিভাগ অনেক গুরুত্ব রাখত।

ধর্মীয় বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে জনসাধারণের কাছে বিচারব্যবস্থার অত্যন্ত কদর ছিল। আন্দালুস এবং মরক্কোর বিচারব্যবস্থা ছিল পূর্বাঞ্চলের[৭৭৯] বিচারব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী। আন্দালুসের বিচারব্যবস্থা প্রশাসনিক ও গঠনমূলক—উভয় দিক থেকেই সরল নীতি বজায় রেখে চলত। প্রশাসক, আমির-উমারা, খলিফা, শাসক এবং রাজার পরিবর্তনের কারণে আন্দালুসের বিচারব্যবস্থা খুব কমই প্রভাবিত হয়েছিল। কারণ বিচার বিভাগ

[৭৭৮] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/৪৭০

[৭৭৯] পূর্বাঞ্চল বলে মিশর-সহ অন্য আরব দেশগুলো উদ্দেশ্য।

ছিল সরাসরি সত্য, ন্যায় এবং ইসলামের প্রতিনিধি। যার অবস্থান ছিল শাসক, প্রভাবশালী ব্যক্তি, নেতা এবং বিচারকদের ঊর্ধ্বে।

বিচারক ছিলেন শরীয়ত, ইসলাম এবং ন্যায়বিচারের প্রতিনিধি। তিনি আন্দালুসে সর্বোচ্চ পদ এবং সম্মানের অধিকারী হতেন। শাসকদের মানসিকতা এবং অভিরুচির ভিন্নতা সত্ত্বেও তিনি আন্তরিকভাবে তাদের সম্বোধন করে কথা বলতেন। শাসকরাও বিচারকের নির্দেশনা অনুসরণ করতেন। আন্দালুসের বিচারকদের আলোচনায় আমরা বিষয়টি দেখতে পাব। শাসকবর্গ বিচারকের পরামর্শ কামনা করতেন। তার সঙ্গ লাভের প্রত্যাশায় থাকতেন। সমাজ, জনগণ এবং ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে ইসলামি বিচার বিভাগ এবং বিচারকরা মর্যাদার স্থান তৈরি করে নিয়েছিল। আন্দালুসে তো খলিফার পরপরই দ্বিতীয় স্থানটি ছিল বিচারকের। কখনো-বা খলিফা এবং উজিরের পরেই তৃতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির অবস্থানে থাকতেন বিচারক।

মুহাম্মাদ কুর্দ আলি উমাইয়াদের বিন্যাস অনুযায়ী আন্দালুসের বিচার বিভাগের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, 'আন্দালুসের মুসলিমরা বিচারব্যবস্থাকে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের জন্য সর্বোচ্চ প্রকল্প হিসেবে নির্ধারণ করেছিল। ... বিচারক ছাড়াও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মীদের জন্য শরীয়ত এবং সরকারের অনুশাসন সম্পর্কে জানা আবশ্যক ছিল।'[৭৮০]

আবু মুহাম্মাদ আল-খুশানি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার দ্বীন এবং দুনিয়া সংক্রান্ত নেতৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরবর্তী স্থানের অধিকারী হচ্ছেন বিচারক। যিনি হতেন প্রশাসকদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী। কেননা রায় কার্যকর এবং শরীয়তের বিধিবিধান সুদৃঢ় করা বিচারকের কর্তব্য।'[৭৮১]

আন্দালুসের বিচারব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে *'আল-ই'লাম বি নাওয়াযিলিল আহকাম'* নামক দুর্লভ একটি কিতাবের বরাত দিয়ে আবুল হাসান আন-নুবাহি বলেন, 'বিচারের প্রকল্প শ্রেষ্ঠতম প্রকল্পগুলোর অন্যতম। এটা সর্বাধিক গুরুত্ববহ প্রকল্প। বিশেষ করে যদি এর সাথে মিলিত হয় নামাজ। বিধিবিধানের যাবতীয় দায়িত্ব যদি বিচারকের ওপরই ন্যস্ত থাকে এবং সব ধরনের বিচারক্ষেত্র যদি তিনিই দেখাশোনা করে থাকেন।'[৭৮২]

উসতায আহমাদ আমিন বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—'আন্দালুসের মুসলিমদের রাষ্ট্র পরিচালনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প ছিল। যেগুলোকে বর্তমানে আমরা "প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা" বলে থাকি। আন্দালুসের মুসলিমদের কাছে বিচার-

---

[৭৮০] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৬৭

[৭৮১] কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২

[৭৮২] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৭

সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিল সবচেয়ে বড় পদ। কারণ এটা ছিল দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত। বিচারকের ক্ষমতা ছিল সবচেয়ে বড়। কেননা বিচারক নিজের বক্তব্য শোনানোর জন্য খলিফা অথবা প্রশাসককে হাজির করতে পারতেন। সাধারণ বিচারকের ওপরে থাকত আরেকজন বড় বিচারক। যাকে "কাযিউল জামাআহ" তথা প্রধান বিচারপতি বলা হতো। শাসকের অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার কেবল প্রধান বিচারপতিই সংরক্ষণ করতেন।'[৭৮৩]

কিন্তু আন্দালুসে ইসলামি বিচারব্যবস্থার একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্প্যানিশ খ্রিষ্টানদের জয় এবং মুসলিমদের জীবনে ইসলামি অনুশাসনের বিলুপ্তি। তখনই মুসলিম বিচারক তার পায়ের নিচের মাটি হারিয়ে ফেলেছিল। এর কিছুদিন পরই স্প্যানিশ খ্রিষ্টানরা আনুষ্ঠানিকভাবে শরীয়তসম্মত বিচারব্যবস্থা বাতিল করার আদেশ জারি করে। হিজরি ৫ম শতাব্দীতে খ্রিষ্টানদের হাতে আন্দালুস পতনের পরও কাস্টিলের মতো কিছু এলাকায় শারঈ বিচারব্যবস্থা চালু ছিল। যেসব মুসলিমরা হিজরত করে চলে যায়নি, তারা তখনো শারঈ বিচারব্যবস্থা অনুপাতে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতেন। কিন্তু ১৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রানি ইসাবেলা সমস্ত শারঈ আদালত বাতিলের নির্দেশনা জারি করে।[৭৮৪]

অপরদিকে শাসকদের ব্যাপক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার পরও ইসলামি জ্ঞানচর্চা, নির্মাণশিল্প, সভ্যতা বিনির্মাণ-সহ অন্যান্য বিষয়ে কোনো ধরনের প্রভাব পড়েনি। বরং পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা উৎকর্ষের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। আন্দালুস ছিল বাগদাদ, কায়রো এবং দামিস্কের দুর্বার প্রতিযোগী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক অঙ্গনেই আন্দালুস এসব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উসতায আহমাদ আমিন বলেন, 'রাজনৈতিক ব্যাপক অস্থিরতার মাঝেও আন্দালুসের মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং সভ্যতায় যেমন উৎকর্ষের সাক্ষর রেখে চলছিল, তা দেখে ইতিহাস-পড়ুয়াদের বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।'[৭৮৫]

তিনি আরও বলেন, 'আন্দালুসে মুসলিমদের রাজত্ব যখন ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে গেল, তখনো প্রত্যেক অঞ্চলের রাজারা নিজেদের আলিমদের নিয়ে গর্ব করতেন। আলিমদের তারা কাছাকাছি রাখতেন। তাদের বিশ্বাস ছিল, আলিমগণই তাদের সবচেয়ে বড় প্রচারমাধ্যম। ... এমনকি আন্দালুসের সর্বশেষ মুসলিম শাসকগোষ্ঠী আল-আহমার রাজবংশের সময়েও জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য এবং সভ্যতার ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছিল।'[৭৮৬]

---

[৭৮৩] যুহরুল ইসলাম : ৩/১৮

[৭৮৪] আস-সহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ বিল আন্দালুসিল ইয়াওম, পৃ. ৩৪, ৪৫

[৭৮৫] যুহরুল ইসলাম : ৩/১৭

[৭৮৬] যুহরুল ইসলাম : ৩/৪০। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অধিকাংশ সময় বিষয়টি এমনই ছিল। এ কারণেই

এ কারণেই আন্দালুসের মাটিতে মুসলিমরা গতিশীল এবং উন্নত একটি সভ্যতা রেখে গিয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ছিল তাদের সরব পদচারণা। তাদের মাঝে অনেক বড় বড় আলিম, জ্ঞানী, বিদ্বান এবং তারকাতুল্য ব্যক্তিরা জন্ম নিয়েছিলেন। যাদের নিয়ে কত শত গ্রন্থ আর বই-পুস্তক রচিত হয়েছে!

বিচারব্যবস্থার তুলনামূলক অবস্থান

আন্দালুসের বিচারব্যবস্থা পৃথকভাবে আলোচনা করার অর্থ এই নয় যে, তা অন্যান্য ইসলামি খিলাফতের চেয়ে ভিন্নতর ছিল। কেবল ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক নানান কারণে আন্দালুসের বিচারব্যবস্থার কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। পূর্বে এ আলোচনা গত হয়েছে।

আন্দালুস এবং মরক্কোর তৎকালীন বিচারব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ আক্ষরিক অর্থেই ইসলামি বলা যায়। অন্যান্য অঞ্চলের বিচারব্যবস্থার সাথে অধিকাংশ বিষয়েই এর মিল ছিল। আন্দালুসের বিচারব্যবস্থা ছিল দামিস্কের উমাইয়া, বাগদাদের আব্বাসি এবং কায়রোর ফাতিমি বিচারব্যবস্থার অনুগামী। যা পরবর্তী সময়ে কর্ডোভা, ইশবিলিয়া, গ্রানাডা, ফেজ, কায়রুওয়ান, মারাকিশ এবং অন্য অঞ্চলগুলো মিলে ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আমরা এখানে এসব বিচারব্যবস্থার সাথে আন্দালুসের বিচারব্যবস্থার পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করব। এর পাশাপাশি উভয় বিচারব্যবস্থার ভিন্নতার কয়েকটি দিকও তুলে ধরব।

☑ ১. উভয় ভূখণ্ডে চলা বিচারব্যবস্থা ছিল এক ও অভিন্ন। উভয় স্থানেই চলত শারঈ বিচারব্যবস্থা। এক উৎস থেকেই তা উৎসারিত। যার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল এক। আর তা হচ্ছে ইসলামের প্রচার-প্রসার। এ লক্ষ্য সকল যুগের ইসলামি খিলাফতেই বিদ্যমান ছিল। এটাই হচ্ছে বিচারব্যবস্থা দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রধান কারণ। যার ওপর ভিত্তি করে এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি বিচারব্যবস্থার অভিন্ন এবং সর্বজনস্বীকৃত মূল উৎস ছিল চারটি। সেগুলো হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস।

☑ ২. পূর্ব এবং পশ্চিমের পারস্পরিক আদান-প্রদানের বিরাট প্রভাব ছিল। আন্দালুস এবং মরক্কোর বিদ্বানরা কায়রো, দামিস্ক, বাগদাদ এবং হিজাজে আসা-যাওয়া করতেন। এসব দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝরনাধারা থেকে পরিতৃপ্ত

আবদুর রহমান আদ-দাখিল, আবদুর রহমান আন-নাসির এবং দ্বিতীয় আবদুর রহমানের মতো শক্ত-সমর্থ লোক শাসনক্ষমতা হাতে পেলে আল-ওয়ালিদ ইবনু আবদিল মালিকের মতো রাজত্বের ঔজ্জ্বল্য স্থাপন এবং আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। দেখুন : আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/৪৬৮ এবং যুহরুল ইসলাম : ৩/১৭, ৩/২২, ৩/৪২, ৩/৪৮

হতেন তারা। উপকৃত হতেন জ্ঞানী-গুণীদের পদচারণা থেকে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাদির মাধ্যমেও সমৃদ্ধ হতেন। এরপর জ্ঞান-গরিমা অর্জন করে ফিরে আসতেন স্বদেশে। অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্বানরাও মরক্কো এবং আন্দালুসে ছুটে যেতেন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আবার পশ্চিম থেকে পূর্বে জ্ঞানীদের বিচরণ কখনো থেমে থাকেনি। তৎকালীন ইসলামি বিশ্বের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত অবধি মুসলিমদের কাছে একটি গ্রামের মতোই ছিল। বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য তা ছিল একই মাতৃভূমির মতো। যেখানে তারা তাদের ইচ্ছেমতো ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে চষে বেড়াতে পারতেন।[৭৮৭] যেখানেই যেতেন, উষ্ণ অভিনন্দন পেতেন। তাদেরকে সম্মান জানিয়ে নানাধরনের উপহারসামগ্রী দেওয়া হতো। কারণ তখন শাসন ছিল ইসলামের, আর জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মানুষের মুখের ভাষা ছিল আরবি। উসতায আহমাদ আমিন বলেছেন, 'বিদ্বান এবং পর্যটকদের জন্য তৎকালীন ইসলামি সাম্রাজ্য ছিল দাবাবোর্ডের মতো। কোনো রকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই তারা যেখানে ইচ্ছে যেতে পারতেন।'[৭৮৮]

☑ ৩. প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিচারব্যবস্থার প্রতি ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক গুরুত্ব ছিল। ইসলামি বিশ্বের সযত্ন তত্ত্বাবধানেই ইসলামি বিচারব্যবস্থা সর্বোচ্চ অবস্থানে উঠে গিয়েছিল। অধিকাংশ খলিফা, প্রশাসক এবং আমির-উমারাগণ বিচারকদের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। বিচারকদের তারা সম্মান করতেন। মর্যাদায় কমতি হতে দিতেন না। যে-কোনো কাজে তাদের আগে বাড়িয়ে দিতেন। সবসময় তাদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন। তাদের প্রতি অগাধ আস্থা, বিশ্বাস এবং নিশ্চয়তা থাকায় বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বের পাশাপাশি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ, পদ এবং দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হতো। খলিফা এবং প্রশাসকগণ যোগ্যতা, সততা এবং ইলমের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বিচারক নির্বাচনের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতেন। সেইসাথে প্রশাসন থেকে বিচারব্যবস্থা স্বাধীন রাখার ব্যাপারেও তারা ছিলেন আন্তরিক।

☑ ৪. প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে সর্বত্রই ইসলামি বিচারকরা নিজেদের অবস্থান, কর্মপদ্ধতি, জীবনাচার, চরিত্র এবং সুখ্যাতির ক্ষেত্রে অভিন্ন ছিলেন। এক কথায় সকল ক্ষেত্রেই তারা ছিলেন অভিভাবক সমতুল্য। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, হক বাস্তবায়ন ও মিথ্যাকে বর্জন করার ক্ষেত্রে বিচারকদের অবস্থান ছিল প্রবাদতুল্য। প্রশাসক বা যার পক্ষ থেকেই অন্যায় সংঘটিত হোক না কেন, এ ব্যাপারে তারা কোনো পরোয়া করতেন না। এর অসংখ্য নজির রয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের বিচারব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও আন্দালুস এবং

---

[৭৮৭] যুহরুল ইসলাম : ৩/২৮

[৭৮৮] যুহরুল ইসলাম : ৩/৩৬-৩৭

মাগরিবের বিচারকদের ক্ষেত্রে এসব গুণ ছিল অনন্য। অন্যদের তুলনায় তারা ছিলেন অধিক সত্যনিষ্ঠ। বিচারের রায় বাস্তবায়নে তারাই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলেন।

৫. প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে শাসক, সরকার-প্রধান এবং রাজনীতির ব্যাপারে সকল আলিমের অবস্থান ছিল অভিন্ন। এ কারণে উভয় জায়গাতেই আলিমদের অনেকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন। প্রশাসক এবং আমিরদের ব্যাপারেও তাদের অবস্থান আলিমদের মতোই ছিল। অধিকাংশ বিচারকই শাসকদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। রাজনৈতিক পরামর্শে অংশগ্রহণ থেকেও বিরত থাকতেন। প্রশাসক এবং আমিরদের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতেন। তাদের সামনে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ থেকে পিছু হটতেন না। ইসলাম, দ্বীন এবং ন্যায়ের শাসন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা ভীত হতেন না কখনোই।

অন্যান্য অঞ্চলের সাথে মরক্কো এবং আন্দালুসের বিচারব্যবস্থায় ভিন্নতা দেখা দেওয়ার মৌলিক কারণ ছিল দুটি।

প্রথমত : নির্ভরযোগ্য ফিকহি মাযহাব। সে যুগে প্রাচ্যে সব ফিকহি মাযহাব ছড়িয়ে পড়েছিল। আর ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব থেকে বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক বিচারকের বিচার এবং বিচারের রায় তার মাযহাব অনুসারেই হতো। সে হিসেবে প্রাচ্যের বিচারকগণ হানাফি, মালিকি, শাফিয়ি, হাম্বলি, আওযায়ি, যাহিরি, শিয়া ইমামিয়্যাহ, শিয়া যায়িদিয়্যাহ এবং শিয়া ফাতিমি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পক্ষান্তরে মরক্কো এবং আন্দালুসে মালিকি মাযহাবের ছিল একচ্ছত্র প্রভাব। অবশ্য আওযায়ি, যাহিরি, খারিজি, ইবাদ্বিয়া ও শিয়া ফাতিমি মাযহাব নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতে পাওয়া যেত। তবে এগুলো ছিল নিতান্তই সাময়িক এবং নির্দিষ্ট জায়গার মাঝেই সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত : বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ও গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা। আন্দালুস এবং মরক্কোয় বিচারব্যবস্থার এমন কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছিল, যেগুলো অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা থেকে ভিন্ন ছিল। যেমন : ১. কাযিউল জামাআহ তথা প্রধান বিচারপতি এবং তার যোগ্যতা। ২. অন্যায় ও দুর্নীতির বিচার; হিসবাহর বিচার এবং সেগুলোর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। ৩. বিচার বিভাগের উপদেষ্টামণ্ডলী। ৪. বিচার বিভাগের অধীনে অনেকগুলো উপবিভাগ স্থাপন করা। এগুলোর একটি হলো পুনঃনিরীক্ষণ ট্রাইবুন্যাল। সামনে এগুলো সবিস্তারে আলোচনা করব। এ ছাড়া বিচারের প্রয়োগ আর বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা ছিল।

আন্দালুস এবং মরক্কোর বিচারব্যবস্থার আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করার এগুলোও

অন্যতম কারণ।

বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

আন্দালুস এবং মরক্কোর প্রশাসনিক বিচারের ব্যবস্থাপনা অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বাঞ্চলের ব্যবস্থাপনার মতো ছিল। নববি যুগ ও রাশিদুন যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথেও তা সম্পর্ক রাখত। কিন্তু স্থানীয় পরিস্থিতি, রাষ্ট্রের অগ্রগতি এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল—যা প্রাচ্যের ব্যবস্থা থেকে খানিকটা ভিন্ন। তবে এই পরিবর্তন ছিল গঠনমূলক, পরিভাষা-সংক্রান্ত এবং শাব্দিক। কখনো কখনো তা মৌলিক এবং গঠনমূলকও হতো। এজন্য আমরা আন্দালুস এবং মরক্কোর বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার কিছু দিক উল্লেখ করব। এ ছাড়া ফকিহদের বিভিন্ন উক্তিও আমরা উল্লেখ করব। কোনটা কোনটা পূর্বাঞ্চলের বিপরীত, সেটাও জানিয়ে দেবো।

❁ বিচার-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

সে-সময় বিচার-সংক্রান্ত অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। বিচার বিভাগ পরিচালনা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার রক্ষা, অপরাধ দমন এবং শরীয়তের বিধানাবলি বাস্তবায়ন করা ছিল এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ। আবুল হাসান আন-নুবাহি বিচার-সংক্রান্ত এসব প্রতিষ্ঠানকে 'খুত্তাহ' অর্থাৎ বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বলে উল্লেখ করেছেন। আন-নুবাহি লিখেন, 'বিচারক আবুল আসবাগ ইবনু সাহল বলেছেন, প্রশাসকদের ছয়টি খুত্তাহ ছিল। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

☑ ক) বিচার বিভাগ: এ বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর ছিল প্রধান বিচারপতির বিচার।

☑ খ) মধ্যম স্তরের পুলিশ বিভাগ,

☑ গ) অধস্তন পুলিশ বিভাগ,

☑ ঘ) দুর্নীতি দমন বিভাগ,

☑ ঙ) বিচারের রায় পুনঃনিরীক্ষণ বিভাগ,

☑ চ) শহর পরিদর্শন এবং

☑ ছ) বাজার নিয়ন্ত্রণ।

প্রকল্পগুলো কর্ডোভার একজন লেখক তার রচনায় এভাবেই উল্লেখ করেছেন—বিচারব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন, পুনঃনিরীক্ষণ, নগর পরিদর্শন এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ।[৭৮৯]

---

[৭৮৯] তারীখু কুযাতিল আন্দালুস, পৃ. ৫

প্রতিটি প্রকল্প নিয়ে আমরা পৃথকভাবে সবিস্তারে আলোচনা করব। এগুলোর সাথে আরও কিছু বিচার-সংক্রান্ত বিভাগ ছিল। সেগুলো হচ্ছে: (ক) সামরিক আদালতের বিচারক, (খ) নিম্ন আদালতের বিচারক, (গ) উচ্চ আদালতের বিচারক এবং (ঘ) খ্রিষ্টানদের বিচারক।

উল্লেখ্য যে, বিচার-সংক্রান্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারেই নতুন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—ব্যাপারটা এমন নয়। বরং বিচার-সংক্রান্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলো আন্দালুসের পুরোটা ইতিহাস জুড়েই পাওয়া গেছে। এগুলোর কোনোটার সাথে পূর্বাঞ্চলের বিচারব্যবস্থার কিছু কিছু মিল রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কোনোটা অন্য প্রতিষ্ঠানের অধীনে ছিল। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান ছিল এমন, যা কেবল আন্দালুসেই স্থাপিত হয়েছিল। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

▪ কাযিউল জামাআহ

পূর্বাঞ্চলের 'কাযিউল কুযাত' তথা প্রধান বিচারপতির সাথে এই পদের অনেকটাই মিল আছে। তবে এই নামটি কেবল আন্দালুস এবং মরক্কোর লোকেরাই ব্যবহার করত। এটা ছিল বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ পদ। রাষ্ট্রে এর থেকে উচ্চ পর্যায়ের কোনো পদ ছিল না। যেমন আবুল হাসান আন-নুবাহির বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কাযিউল জামাআহ ছিল বিচার বিভাগের সবচেয়ে বড় পদ।' তবে আন্দালুস এবং মরক্কো মুসলিমদের হাতে বিজিত হওয়ার সময় এই নামটির প্রচলন ছিল না। সে-সময় আফ্রিকা এবং আন্দালুসের বড় বড় শহরগুলোতে কেবল বিচারককে নিয়োগ দেওয়ার চল ছিল। আন্দালুসে উমাইয়ারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় এই নামটির প্রচলন করা হয়। আন্দালুসের শহরস্থ বিচারককে 'সেনাবাহিনীর বিচারক' বলা হতো। যাদের এই নাম দেওয়া হয়েছিল, ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াজিদ ছিলেন তাদের অন্যতম। তার আগে এই নাম দেওয়া হয়েছিল কর্ডোভাস্থ সেনাবাহিনীর বিচারক মুহাম্মাদ ইবনু বাশিরকে। আর এটা আন্দালুসে আবদুর রহমান আদ-দাখিল আসার আগের কথা। পরবর্তীকালে আবদুর রহমান এসে সেখানকার নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরও ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াজিদ আন্দালুসের বিচারক ছিলেন। আবদুর রহমান তাকে আর অপসারণ করেননি।

আবদুর রহমানের কাজকে ইয়াহইয়া আরও সহজ করে দিয়েছিলেন। আব্বাসিদের সমর্থিত আন্দালুসের প্রশাসক ইউসুফ আল-ফিহরি আবদুর রহমান আদ-দাখিলের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেননি। একপর্যায়ে আবদুর রহমান আদ-দাখিল তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তখন তিনি বিচারক ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াজিদকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করার দাবি জানান। তিনি হাজির হলে আবদুর রহমান তার নামের আগে 'কাযিউল জামাআহ' শব্দটি জুড়ে দিয়ে চুক্তিপত্র রচনা

করেন।[৭৯০]

আবুল হাসান আন-নুবাহি বলেছেন, قضاء (বিচার) শব্দকে الْجَمَاعَة (জামাআত) শব্দের সাথে ব্যবহার করার রীতি আন্দালুসেই চালু করা হয়েছিল। যার প্রচলন দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। الْجَمَاعَة তথা দল দ্বারা যে বিচারকদের জামাত উদ্দেশ্য—এটা তো সুস্পষ্ট। কারণ সে যুগে সুলতানের উপস্থিতিতে মামলা-মোকদ্দমা বিচারকদের দ্বারাই সম্পন্ন হতো। আর পূর্বাঞ্চলের শহরগুলোতে খিলাফতের বিচারককে 'কাযিউল কুযাত' বলা হতো। ... বর্তমানে বিচারককে যে 'কাযিউল জামাআহ' বলা হয়—এ পদ্ধতিটি অভিনব। অতীতে এটার কোনো প্রচলন ছিল না।[৭৯১]

উত্তর আফ্রিকার মারাকিশেও 'কাযিউল জামাআহ' ছিল। কখনো কখনো তাকে 'কাযিউল হাদরাহ'-ও বলা হতো। উত্তর আফ্রিকায় তিউনিসিয়া এবং কায়রুওয়ানের মতো যেসব ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলোর প্রতিটি শহরেই 'কাযিউল জামাআহ' পরিভাষাটি ছড়িয়ে পড়েছিল। মুরাবিতরা আন্দালুসে প্রবেশ করে সেটাকে পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিম—এই তিন ভাগে ভাগ করে। তারা এসব এলাকার প্রতিটি অঞ্চলেই একজন করে 'কাযিউল জামাআহ' নিয়োগ দিয়েছিলেন। সারাকুসতার মতো বড় বড় শহরেও একজন করে 'কাযিউল জামাআহ' নিয়োগ দেওয়া হতো।[৭৯২]

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর দিকে বাগদাদের মতো আন্দালুসেও কাযিউল জামাআহকে 'কাযিউল কুযাত' নামে আখ্যায়িত করা হয়। হিজরি ৪০৫ সালে সর্বপ্রথম এই উপাধি দেওয়া হয় আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আবদিল্লাহ যাকওয়ানকে। স্বচ্ছতা, পবিত্রতা, ইলম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাবগাম্ভীর্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং বিচক্ষণতায় তিনি ছিলেন অনন্য। এরপর কাযিউল কুযাত ছিলেন আবু বকর ইয়াহইয়া ইবনু আবদির রহমান ইবনি ওয়াফিদ আল-লাখমি। এদের পর পুনরায় 'কাযিউল জামাআহ' নাম ব্যবহার শুরু হয়।[৭৯৩]

আন্দালুসে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রশাসকের পক্ষ থেকেই 'কাযিউল জামাআহ' নিয়োগ দেওয়া হতো। এরপর থেকে 'কাযিউল জামাআহ' নিয়োগ দেওয়ার অধিকার কেবল খলিফার জন্যই সংরক্ষিত হতে থাকে। জ্ঞানগত ও প্রশাসনিক যোগ্যতার বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে খলিফা খুঁজে খুঁজে বিচারক পদে নিয়োগ দিতেন।

---

[৭৯০] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৯৯; দিরাসাতুন ফী তারীখিল আন্দালুস, পৃ. ২৭ এবং ৯৭; কুদাতু কুরতুবাহ, পৃ. ১৪

[৭৯১] তারীখুল কাদা, পৃ. ৯৯; তারীখু কুদাতিল আন্দালুস, পৃ. ২১

[৭৯২] তারীখুল মাগরিবি ওয়াল আন্দালুসি ফী আহদিল মুরাবিতিন, পৃ. ২৮৭; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৪৫

[৭৯৩] তারীখু কুদাতিল আন্দালুস, পৃ. ২১; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৪৪

আন্দালুসস্থ 'কাযিউল জামাআহ'-এর দায়িত্ব পূর্বাঞ্চলের 'কাযিউল কুযাত'-এর থেকে কিছুটা ভিন্ন হতো। বিচারকার্য পরিচালনা, মামলা-মোকদ্দমা দেখাশোনা এবং রাজধানীর সকল বিবাদ শরীয়ত অনুসারে মীমাংসা করা ছিল কাযিউল জামাআহর মৌলিক দায়িত্ব। এসব দায়িত্ব পরিচালনা করার কারণেই কাযিউল জামাআহ এত মর্যাদা লাভ করতেন। কারণ এগুলো সকল জনপদ এবং শহরের বিচারকদের জন্য অবশ্যপালনীয় রাষ্ট্রীয় ফরমান হিসেবে বিবেচিত হতো। উত্তর আফ্রিকার বিচারকরা এগুলোকে পূর্বসূরিদের বিচারের মূলনীতির মতো নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। এসবের ওপর ভিত্তি করেই তারা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। নিজেদের বক্তব্য এবং বিচারের ফয়সালার ক্ষেত্রে তারা সেগুলো রেফারেন্স হিসেবে পেশ করতেন। তারা বলতেন—'এর ওপরই কর্ডোভার বিচারকার্য চলে।' অর্থাৎ সেখানকার কাযিউল জামাআহ থেকে এই রায় প্রকাশ পেয়েছে।[৭১৪]

কাযিউল জামাআহর সাথে উত্তম আচরণ এবং তাকে সম্মান প্রদর্শন করা ছিল অন্যান্য অঞ্চলের বিচারকদের জন্য আবশ্যক। প্রশাসক এবং খলিফা নিজেও কাযিউল জামাআহর প্রতি অনেকটাই নির্ভরশীল থাকতেন। বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে তার সাথে পরামর্শ করতেন। কখনো-বা বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব তার কাছেই ন্যস্ত করা হতো।

রাষ্ট্রের পলিসি-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে খলিফা পরামর্শ করতেন কাযিউল জামাআহর সাথে। রাজধানীর জামে মসজিদে ইমামতির দায়িত্বও তার কাঁধেই থাকত। খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে সেনাপতির মতো আরও বড় বড় এবং কঠিন সব দায়িত্ব তার কাছে অর্পণ করা হতো। আবার খলিফা রাজধানীর বাইরে গেলে তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন।[৭১৫]

আন্দালুস এবং মরক্কোতে বিচারকদের বিরাট একটা অংশ কাযিউল জামাআহর পদ গ্রহণ করেছিলেন। এদের নাম সরকারি গ্যাজেটে এবং তাদের উদ্দেশ্যে খলিফার পক্ষ থেকে প্রদত্ত বক্তব্যে পাওয়া যায়।[৭১৬]

▪ বড় বড় শহরের বিচারক

আন্দালুসে রাজধানী ছাড়াও বড় বড় শহরগুলোতে বিচারক নিয়োগ দেওয়ার প্রচলন ছিল। এই বিচারক নিয়োগের জন্য কিছু শর্ত এবং পরিধি থাকত। আবুল হাসান আন-নুবাহি এসব তাদেরকে 'নগর জজ' বলে অভিহিত করেছেন।[৭১৭]

---

[৭১৪] কুযাতুবাতু ফিল আসরিল ইসলামি, পৃ. ৩০৫-৩০৬

[৭১৫] কুযাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২৯

[৭১৬] তারীখু কুযাতিল আন্দালুস, পৃ. ২১ এবং ২৮; কুযাতু কুরতুবাহ, পৃ. ১৪

[৭১৭] তারীখু কুযাতিল আন্দালুস, পৃ. ৫; আল-ইসলামু ওয়াল হাদারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৬৭

▪ বিশেষ সহকারী

প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং ছোট ছোট শহরগুলোতে একজন বিচারক কাযিউল জামাআহর প্রতিনিধিত্ব করতেন। যাকে 'বিশেষ সহকারী' বলা হতো। এই পরিভাষাটি ছিল নিতান্তই আন্দালুসী। মুহাম্মাদ কুর্দ আলি বলেন, 'বিচারক বড় বড় শহরগুলোতে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। আর সহকারী জজরা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন ছোট ছোট শহরগুলোতে। প্রধান বিচারপতি তথা বিচারকার্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীলকে কাযিউল জামাআহ বলা হতো।'[৭৯৮] পক্ষান্তরে বিশেষ সহকারী ছিলেন সালিশি আদালতের দায়িত্বশীল। একটি ছোট গ্রামেই যার পরিধি সীমাবদ্ধ থাকত।[৭৯৯]

▪ অভিজাত শ্রেণির বিচারক

মুরাবিত প্রশাসক ইউসুফ ইবনু তাশফিনের সময়ে চালু হওয়া এই পদটি ছিল একেবারেই আধুনিক। একজন বিশেষ বিচারক হতেন এই পদের দায়িত্বশীল। অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যকার মামলা-মোকদ্দমা এবং বিরোধ মীমাংসা করা ছিল তার দায়িত্ব। এখানে অভিজাত শ্রেণি বলে 'লামতুন' গোত্র উদ্দেশ্য। মুরাবিতগণ এদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। শাসক-পরিবার এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি এই বিচারকই করতেন। মন্ত্রী আবু বকর ইবনু রহিম এই পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইশবিলিয়ার অভিজাত শ্রেণির বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আবু বকর ইবনু রহিমের উদ্দেশ্যে ইবনু খানকাহ অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছিলেন। ক্যালেন্ডারের পাতায় তখন চলছিল ৫১৫ হিজরি।[৮০০]

▪ খ্রিষ্টানদের বিচারক

একে 'অনারবদের বিচারক'-ও বলা হতো। বিচারব্যবস্থার এই প্রকল্পটি ছিল অমুসলিমদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা কেবল আন্দালুসেই প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টানদেরকে তাদের নিজেদের বিচারক নির্বাচন করা এবং মুসলিমদের সামনেই তাদের বিচারকার্য পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।[৮০১]

▪ বাজার নিয়ন্ত্রক বা হিসবাহ

এই প্রকল্পের দায়িত্বশীলকে বাজার নিয়ন্ত্রক বা হিসবাহর দায়িত্বশীল বলা হতো।[৮০২] আন্দালুসের এই প্রকল্পের বিবরণ দিতে গিয়ে উসতায আহমাদ আমিন

---

[৭৯৮] আল-ইসলামু ওয়াল হাদারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৬৭
[৭৯৯] তারীখুল মাগরিবি ওয়াল আন্দালুসি ফী আহদিল মুরাবিতিন, পৃ. ২৯১
[৮০০] তারীখুল মাগরিবি ওয়াল আন্দালুসি ফী আহদিল মুরাবিতিন, পৃ. ১৮৯
[৮০১] তারীখুল মাগরিবি ওয়াল আন্দালুসি ফী আহদিল মুরাবিতিন, পৃ. ২৯২
[৮০২] তারীখু কুযাতিল আন্দালুস, পৃ. ৫

বলেন, 'বিচারের দায়িত্বের পাশাপাশি হিসবাহর দায়িত্বও থাকত। এই প্রকল্পের দায়িত্বশীল থাকতেন একজন বিচক্ষণ আলিম, সমাজে যার বিশেষ অবস্থান আছে। বাহনে চড়ে কয়েকজন সাথি নিয়ে তিনি বাজার ঘুরে ঘুরে দেখতেন। তার সাথে ওজন করার মতো নিক্তি থাকত। দোকানে থাকা রুটি তিনি মেপে মেপে দেখতেন। যাচাই করতেন পণ্যের দর-দাম। পণ্যের ওপর লেবেল লাগানো থাকলে সেটা চেক করে দেখতেন। অনেক সময় যাচাইয়ের জন্য বিক্রেতার কাছে গোপনে কাউকে পাঠাতেন। বিক্রেতাকে কোনো ধরনের প্রতারণা করতে দেখলে তাকে বেত্রাঘাত করে অসম্মান করা হতো। এরপরও বিরত না হলে তাকে উচ্ছেদ করা হতো শহর থেকে।[৮০৩]

অন্যান্য ইসলামি দেশে হিসবাহর দায়িত্বপালনকারীগণ যা করতেন, আন্দালুসের বাজার নিয়ন্ত্রকও একই কাজ করতেন। ইবনু আবদুনের মতে, হিসবাহ বিচার বিভাগেরই একটি শাখা। আর হিসবাহর পরিচালক হচ্ছেন বিচারক, মন্ত্রী এবং খিলাফতের সহযোগী। কেননা বিচারকের অনেক কাজই হিসবাহর দায়িত্বশীল পালন করে থাকেন। তাকে বিজ্ঞ হতে হয়। আবদুস সালাম ইবনু সাঈদ সাহনুন ছিলেন হিসবাহর দায়িত্ব পালনকারী সর্বপ্রথম বিচারক।

প্রত্যেক শহরের হিসবাহর দায়িত্বশীলকে মুহতাসিব বা বাজার নিয়ন্ত্রক বলা হতো। কেননা তার অধিকাংশ কাজ হতো ব্যবসায়ীদের তদারকি করা। জ্ঞান এবং বিচক্ষণতায় সর্বজনস্বীকৃত হওয়া ছিল মুহতাসিব নির্বাচিত হওয়ার শর্ত। বিচারকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় অনেক সময় বিচারকদের মধ্য থেকেও মুহতাসিব নির্বাচন করা হতো। মুহতাসিবদের নানাধরনের নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং বিভিন্ন আইনকানুন সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হতো।[৮০৪]

মুহাম্মাদ কুর্দ আলি আন্দালুসের হিসবাহ অধিদপ্তরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'হিসবাহ বিভাগ ছিল বিচার বিভাগের মতোই। বিভিন্ন শহর, শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থাপনা, সমাজ এবং সমাজের উপকারী বা অপকারী জিনিস—অনেক বিষয়ই ছিল হিসবাহর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানের পরিভাষায় হিসবাহ ছিল শহরের সালিশি কার্যক্রম, পুলিশ এবং চিকিৎসা বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের মতোই। ... হিসবাহ বিভাগ মূলত বিচার বিভাগ এবং দুর্নীতি দমন বিভাগ—এই দুটির সমন্বিত রূপ। এই বিভাগে শরীয়তের মেজাজ এবং রাষ্ট্রীয় কঠোরতা—উভয়টিই ছিল। ব্যাপক জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে প্রথম যুগের খলিফারা নিজেরাই হিসবাহ পরিচালনা করতেন। দ্বীনের ব্যাপারে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, সত্যের পতাকাবাহী, মার্জিত চরিত্রের অধিকারী, সুউচ্চ মনোবল-সম্পন্ন, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতায় সুপরিচিত,

---

[৮০৩] যুহরুল ইসলাম : ৩/১৮
[৮০৪] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৬৭; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৬১৬

সহনশীল, ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের সমাধানে সক্ষম এবং গণমানুষের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই হিসবাহ পরিচালনা করতেন। কোনো ধরনের লোভ তাকে আকৃষ্ট করতে পারত না, আর চাটুকারিতার দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হতেন না। আল্লাহর আইনের ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তিনি করতেন না। তার প্রতি এমন এক সমীহ কাজ করত যে, কেউ তার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করার সাহস পেত না। সত্যিকারের অপরাধীরা তার সামনে এসে ভীত হয়ে পড়ত।'[৮০৫]

■ পুলিশ

আন্দালুসে এটা ছিল স্বতন্ত্র একটি বিভাগ। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে এ বিভাগটি হিসবাহরই একটি অংশ ছিল। বাজার নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তরই পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তীকালে আন্দালুসের আমির দ্বিতীয় আবদুর রহমান বাজার নিয়ন্ত্রণ বিভাগকে পুলিশ বিভাগ থেকে পৃথক করে দেন। এ কারণেই আন-নুবাহি এবং ইবনু খালদুন পুলিশ বিভাগকে বিচার সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে গণ্য করে সেটার বর্ণনা দিয়েছেন। পুলিশ বিভাগ আবার ছিল দুই ভাগে বিভক্ত—(ক) ঊর্ধ্বতন পুলিশ বিভাগ এবং (খ) অধস্তন পুলিশ বিভাগ।[৮০৬]

আদতে পুলিশ বিভাগ ছিল বিচার সংশ্লিষ্ট একটি বিভাগ। বিচার বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম সাধারণ বিচার বিভাগ, হিসবাহ এবং দুর্নীতি দমন বিভাগের সাথে বিভক্ত ছিল। আর পুলিশি বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন এখতিয়ার। আন্দালুসের তৎকালীন পুলিশি বিভাগ ছিল বর্তমানে বাস্তবায়ন বিভাগের পর্যায়ে। যেখানে বিচারকদের প্রদত্ত চূড়ান্ত রায় বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।

এ জন্যই মুহাম্মাদ কুর্দ আলি বলেছেন, 'পুলিশ-প্রধান কখনো কখনো বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি ও দণ্ড বাস্তবায়ন করতেন। অপরাধী খলিফার কাছের ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেও প্রধান বিচারপতির মতো শাসকের অনুমতি ছাড়াই অপরাধীকে হত্যা করার অধিকার তিনি সংরক্ষণ করতেন। অপরাধী মদ্যপ এবং ব্যভিচারী হলে তাকেও শাস্তি দেওয়া হতো। শরীয়তের অনেক বিষয়ই তার মাধ্যমে পরিচালিত হতো। পুলিশ-প্রধান আন্দালুসে নগর রক্ষক বা নৈশ প্রহরী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।[৮০৭]

---

[৮০৫] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৬৭ এবং ২৬৮

[৮০৬] তারীখু কুযাতিল আন্দালুস, পৃ. ৫; ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২২২

[৮০৭] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ২/২৬৭; ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২২২

■ অন্যায় ও দুর্নীতি দমন বিভাগের দায়িত্বশীল

দুর্নীতির বিচার বিভাগ আন্দালুসে 'খুত্তাতুল মাযালিম' নামে পরিচিত ছিল। আন্দালুসে উমাইয়া শাসনের সময় যা ছিল নিতান্তই নতুন বিভাগ। তবে এই বিভাগের কার্যক্রম এবং দায়িত্ব—এগুলো হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে খিলাফতের যুগে সুস্পষ্ট হয়।

এই বিভাগটি তৎকালীন আন্দালুসে এতটাই উন্নতি সাধন করেছিল যে, পূর্বাঞ্চলে উমাইয়া এবং আব্বাসি যুগেও ততটা হয়নি। কাযিউল জামাআহর পরবর্তী অবস্থানটিই ছিল এই বিভাগ পরিচালকের। তবে অন্যান্য বিচারকরা যে বিচারকার্য পরিচালনা করতে অপারগ ছিল, সেটা তিনি পরিচালনা করতে পারতেন। বিশেষত প্রশাসক বা খলিফা যখন তাকে দায়িত্ব দিতেন। তার দায়িত্ব ছিল (সাধারণ) বিচারকের দায়িত্বের চেয়েও ব্যাপক, অধিক প্রভাবক এবং বেশি কঠিন। সরাসরি খলিফার পক্ষ হতে তাকে নিয়োগ দেওয়া হতো। কোনো বাধা ছাড়াই তিনি নির্দেশ জারি করতে পারতেন। ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, তদন্ত এবং বিচার কার্যকর করবেন তার প্রমাণ পেশের অধিকার তিনি সংরক্ষণ করতেন।

আন্দালুসে এই বিভাগ পরিচালকদের মাঝে কয়েকজন ছিলেন : আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি হুদাইর, আবদুর রহমান ইবনু কুতাইশ, আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ এবং মুনযির ইবনু সাঈদ। শেষোক্তজন ছিলেন আবদুর রহমান আন-নাসিরের বিচারক।[৮০৮]

মুরাবিতদের শাসনামলে আন্দালুসের এই বিভাগটি ছিল ভাবী উত্তরাধিকারী শাসকের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। তাদের শাসনামলের শেষে এই বিভাগের দায়িত্ব মন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়েছিল। তখন আলি ইবনু ইউসুফ ইসহাক ইবনি নাবতানকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর এ বিভাগের দায়িত্ব তার কাছে অর্পণ করা হয়েছিল।[৮০৯]

■ সামরিক বিচারক

এই বিভাগটি পূর্বাঞ্চলের সামরিক বিচার বিভাগের মতোই ছিল। সামরিক বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে আন্দালুস-সহ অন্যান্য অঞ্চলের এই বিভাগটি ছিল একটি বিশেষ বিভাগ। অনেক সময় খোদ সেনাপতিই এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন। আসাদ ইবনু ফুরাতের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে আবুল হাসান আন-নুবাহি এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আসাদ ছিলেন সিসিলিতে যুদ্ধরত বাহিনীর সেনাপতি। সৈন্যদের বিচারকার্যও তিনি পরিচালনা করতেন। আর মরক্কোতে

---

[৮০৮] ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২২২; মুনযিরের জীবনী জানতে তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৭৬-৭৭ দেখুন।

[৮০৯] তারীখুল মাগরিবি ওয়াল আন্দালুস ফী আহদিল মুরাবিতিন, পৃ. ২৯০; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৫৭৭

সামরিক বিচারকার্য পরিচালনা করতেন আবদুর রহিম ইবনু ইসমাঈল।[৮১০]

▪ পুনঃনিরীক্ষণ বিভাগ

আন্দালুসের বিচার বিভাগীয় সর্বশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল পুনঃনিরীক্ষণ বিভাগ। যা ছিল আদালতের সর্বোচ্চ স্তর। এই বিভাগটি ছিল কেবল আন্দালুসের বিচার বিভাগেরই বৈশিষ্ট্য। ইসলামি পূর্বাঞ্চলে এই বিভাগ সম্পর্কে জানা যায় না। বিচারকদের বিচারকার্য দেখাশোনা এবং শাসকরা সংশয় রাখেন এমন বিচারকার্যের রায় প্রত্যাহার করে সেটার ফয়সালা পুনরায় করা ছিল এই বিভাগীয় বিচারকের পরিধিভুক্ত। তিনি ছিলেন শাসক এবং বিচারকদের কার্যক্রমের ব্যাপারে তদন্ত বিভাগের দায়িত্বশীল পর্যায়ের। ছোট ছোট এবং প্রত্যন্ত গ্রামে থাকা সাধারণ মানুষের খোঁজখবর রাখতেন। বিচারকদের সম্পর্কে তথ্য নিতেন।

এই পদের দায়িত্ব যারা পালন করেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু তামলিখ তামিমি। খলিফা আল-মুসতানসিরের শাসনামলে তিনি এই পদ গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া আরও ছিলেন মুনযির ইবনু সাঈদের ছেলে আবদুল মালিক, আবদুল্লাহ ইবনু হারসামা, আহমাদ ইবনু আবদিল্লাহ এবং ইউনুস ইবনু মুহাম্মাদ।

এই বিভাগের দায়িত্ব যারা পালন করেছিলেন, তাদের 'সাহিবুর রদ' তথা পুনঃনিরীক্ষক বলা হতো। কারণ বিচারের যাবতীয় ফয়সালা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য তাদের কাছে পাঠানো হতো। কাযিউল জামাআহর পরবর্তী অবস্থানটিই ছিল এই পদের অধিকারীর।[৮১১]

এগুলো ছিল আন্দালুসের বিচার-সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। সাধারণ বিচার বিভাগের অধীনে আরও কিছু প্রকল্পের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলো আমরা বিচার বিভাগের পরিধি সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করব।

আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারকগণ

আমরা দেখেছি, আন্দালুস আর মরক্কোর বিচার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এক দিক থেকে পূর্বাঞ্চলের বিচার-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ থাকলেও আরেক দিক থেকে সংগতিপূর্ণ ছিল না। আন্দালুসে বিচার সংশ্লিষ্ট এমন কিছু অভিনব বিভাগ এককভাবে ছিল, যেগুলোর কোনো দৃষ্টান্ত পূর্বাঞ্চলে পাওয়া যায় না। তবে আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারক এবং পূর্বাঞ্চলের বিচারকদের অবস্থা ছিল এক আর অভিন্ন। যেমনটা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। নীতি এবং আদর্শের

[৮১০] তারীখু কুযাতিল আন্দালুস, পৃ. ৫৪; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৫৯; তারীখুল মাগরিবি ওয়াল আন্দালুস ফী আহদিল মুরাবিতিন, পৃ. ২৯২

[৮১১] তারীখু কুযাতিল আন্দালুস, পৃ. ৫

ক্ষেত্রে তাদের বিচারকার্য, রায় ও ফয়সালা, তাদের চারিত্রিক আর সার্বিক পরিস্থিতি এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় যাবতীয় বিষয়ে কোনো ধরনের ভিন্নতা ছিল না। তবে শাখাগত এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছুটা ভিন্নতা থাকতে পারে। বিচারের পন্থা এবং পদ্ধতির মতো কিছুটা ভিন্নতা থাকতে পারে পরিভাষা ব্যবহার এবং শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে। আন্দালুস ও মরক্কোর কিছু বিধান নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি।

❁ বিচারক নিয়োগ এবং নিয়োগের শর্তাবলি

আন্দালুসের বিচারকরা ছিলেন কেন্দ্রীয় মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অন্যান্য ইসলামি রাষ্ট্রের মতো সেখানেও বিচারকদের মর্যাদা ছিল চোখে পড়ার মতো। ইসলামি আইনে স্বীকৃত যাবতীয় শর্ত তাদের কাজের মধ্যে পরিপূর্ণ ছিল। শরীয়তের বিধানাবলি এবং বিচারকার্যের গুণাবলির কথা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এ বিধানের মাধ্যমে তারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করবে এবং এরই ওপর ভিত্তি করে ন্যায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে। রক্ষা পাবে মানুষের অধিকার এবং প্রয়োগ হবে আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড। বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির শর্তসমূহের মতো শরীয়তের আরও অনেক নীতি বিচারকদের মধ্যে পরিপূর্ণ ছিল। যেমন: চারিত্রিক স্বচ্ছতা, অবিচলতা, সত্যনিষ্ঠা, আমানতদারিতা, বীরত্ব আর সাহসিকতা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে অধ্যবসায়। কেননা তাদের প্রদত্ত ফতোয়া এবং রায় দূর করত সমাজে প্রচলিত যাবতীয় সংশয়। সমস্ত মোকদ্দমার নিরসন করত। সমাধা করত সব বিবাদ। বিচারকদের আরও যেসব বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলো হচ্ছে: পক্ষপাত করা থেকে দূরে থাকা, গোঁড়ামি না করা, কুপ্রবৃত্তি এবং ব্যক্তিগত লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণে রাখা, ব্যক্তিগত স্বার্থ না দেখা, আবেগপ্রবণ না হওয়া এবং রাজনৈতিক তৎপরতা আর আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখা।

আন্দালুসের বিচারক সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করা হতো। অধিকাংশ সময় বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো সংশ্লিষ্ট শহর বা অঞ্চল থেকে। যাতে বিচারক সেই শহরের মানুষের স্বভাব-চরিত্র এবং অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত থাকেন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চল থেকে তাদের পরিচিত ব্যক্তি হওয়ার সুবিধা হচ্ছে, লোকেরা বিচারকের ওপর আস্থা রাখতে পারবে এবং তার জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সবাই অবগত থাকবে। তাহলে বিচারকের বিচার এবং ফয়সালায় সবাই আশ্বস্ত থাকবে।

আন্দালুস এবং মরক্কোতে বিচারক নিয়োগের প্রধান অধিকার থাকত প্রশাসকের। তারপর খিলাফত না থাকলে আমিরের থাকত বিচারক নিয়োগের অধিকার। পক্ষান্তরে খিলাফত প্রতিষ্ঠা হলে খলিফাই সবচেয়ে বেশি অধিকার

রাখতেন। খলিফা শহরের লোকদের প্রস্তাবনা অনুসারে বিচারক নিয়োগ দিতেন। বিচারককে সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ এবং খ্যাতিমান কোনো ব্যক্তি হতে হতো। পূর্ব থেকে রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি কিংবা আরব বংশোদ্ভূত হওয়ার কোনো শর্ত ছিল না। যেমন উত্তর আফ্রিকার বার্বার জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ইবনি আকসাম বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আবার সিরিয়ান এবং মিশরীয় বংশোদ্ভূত—এমন অনেকেই বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন, যারা আন্দালুসকে স্থায়ী নিবাস বানিয়েছিলেন।[৮১২]

আমির বা খলিফা কোথাও বিচারক নিয়োগ দেওয়ার আগে আলিম, মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দাদের সাথে পরামর্শ করে নিতেন। ১৮০ হিজরিতে আমির মুরতাযা ছিলেন সেখানকার শাসক। ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আল-আন্দালুসি (২৩৪ হি.) ছিলেন তখনকার বিচারক। তাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল খলিফা হারুনুর রাশিদের সাথে বিচারপতি আবু ইউসুফের মতো। আন্দালুসের সকল প্রান্তে, যাবতীয় অঞ্চলে তার পরামর্শ এবং মতামত ছাড়া বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো না। শাসক এবং আপামর জনসাধারণের কাছে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল। বিচারকার্য থেকেও ঊর্ধ্বে ছিল তার অবস্থান। তিনিই আন্দালুসে মালিকি মাযহাবের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। উত্তর আফ্রিকার তানজাহ বা টাঙিয়ের থেকে আগত ইয়াহইয়া ছিলেন মূলত বার্বার জাতিগোষ্ঠীর লোক। কর্ডোভাতে পড়াশোনা করেছেন। যুবক বয়সে আরবে সফর করেছেন। ইমাম মালিক থেকে আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থের হাদিস শ্রবণ করেছেন। মক্কা এবং মিশরের আলিমদের থেকেও ইলম আহরণ করেছেন। তারপর দেশে ফিরে এলে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাকে প্রস্তাব দেওয়া হলেও তিনি বিরত থাকেন। কারণ তার মর্যাদা ছিল বিচারকের মর্যাদারও ঊর্ধ্বে। বিচার বিভাগের ব্যাপারে তার বিমুখতা, দায়িত্ব গ্রহণ থেকে তার বিরত থাকা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং বিচক্ষণতার কারণে অন্যান্য বিচারকদের তুলনায় আমিরদের কাছে তার মর্যাদা ছিল সবার শীর্ষে।[৮১৩]

আমির বা খলিফা অনেক সময় প্রশাসক, মন্ত্রী বা আঞ্চলিক শাসককে বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব দিতেন। মাঝে মাঝে কাযিউল জামাআহর কাছে দায়িত্ব অর্পণ করতেন। তবে এমন ঘটনা ছিল নিতান্তই বিরল। এ কারণেই রাষ্ট্রের যেসব বিভাগের অধীনে বিচারকার্যের দায়িত্ব ছিল—সেগুলো এবং বিচারক নিয়োগের অধিকারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীলদের কথা প্রসঙ্গে ইবনু ফারহুন বলেছেন, 'রাষ্ট্রের যেসব বিভাগের অধীনে বিচারের দায়িত্ব থাকত, সেগুলো ছিল কয়েক ধরনের। প্রথমত :

---

[৮১২] তারীখুল মাগরিবি ওয়াল আন্দালুসি ফী আহদিল মুরাবিতিন, পৃ. ২৮৪; হাসান ইবরাহীম সংকলিত তারীখুল ইসলাম : ২/৩১৩। আরও দেখুন কুদ্বাতু কুরতুবাহ।

[৮১৩] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৭; মারজিউল উসূলিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪০৩; তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ১৪; কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৫

আল-ইমামাতুল কুবরা তথা বড় নেতৃত্ব। বিচারের যোগ্যতা এই প্রকারেরই একটি অংশ। তদ্রূপ সাধারণ রাজনীতির যোগ্যতাও এর একটি অংশবিশেষ। দ্বিতীয়ত: মন্ত্রণালয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো وزير التفويض বা দপ্তরবিহীন মন্ত্রী; وزير التنفيذ তথা কার্যকর মন্ত্রী নয়। তৃতীয়ত: প্রশাসন ...।'[৮১৪]

বিচারক নিয়োগ দেওয়ার আগে যাচাই এবং নির্বাচন করার পর দায়িত্ব পালন করতে পাঠানোর আগে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ছিল কর্ডোভা বা অন্যান্য অঞ্চলের কাযিউল জামাআহর দায়িত্ব।[৮১৫]

এরপর খলিফা বা আমির বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে একটি নির্দেশনা জারি করতেন। যা-তে বিচারকের জায়গা এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেওয়া থাকত। আন্দালুসের তৎকালীন শাসক উকবাহ ইবনুল হাজ্জাজ আস-সালুলি এমন করেছিলেন। উকবাহ ছিলেন বাহাদুর মুজাহিদ ও শক্তিশালী যোদ্ধা। প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন ও বুজুর্গ, বিজ্ঞ ফকিহ মাহদি ইবনু মুসলিম পরিচিত ছিলেন বিধায় উকবাহ তাকে কর্ডোভায় নিজের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেন। মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আদেশ দিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় ফরমান লিখে দেন। যা-তে লেখা ছিল, 'এটা উকবাহ ইবনুল হাজ্জাজের নির্দেশনা। যা তিনি লিখেছেন মাহদি ইবনু মুসলিমের প্রতি, তিনি বিচারের দায়িত্বে নিয়োগের সময়। মাহদিকে উকবাহ ওসিয়ত করছেন: তিনি যেন আল্লাহকে ভয় করেন, তাঁর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেন এবং প্রকাশ্যে-গোপনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলেন। মাহদিকে উকবাহ আরও আদেশ করছেন, তিনি যেন আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহকে পথ চলার রাহবার হিসেবে গ্রহণ করেন। কারণ এটা এমন আলোর মশাল, যার মাধ্যমে তিনি চলতি পথে আলো লাভ করবেন। এ এমন এক প্রদীপ, যা থেকে আলো নিয়ে তিনি সকল গোমরাহি থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন। ... মাহদির জেনে রাখা দরকার, দেশ ও দশের স্বার্থে মহান বিচারকার্যের দায়িত্ব দিয়ে উকবাহ তাকে পরীক্ষায় ফেলেননি; বরং এ দায়িত্ব তাকে দেওয়ার কারণ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে থাকা বিচারের বিশেষ মর্যাদা। বিচারের মাঝে রয়েছে দ্বীনের বিধিবিধান, মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, যথাযথ স্থানে যথাযথ ব্যক্তির ওপর শাস্তিদণ্ড প্রয়োগ, সঠিক হকদারকে তার অধিকার প্রদান করা। ... সুতরাং মাহদি যেন নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করেন। ... মাহদির প্রতি উকবাহর আদেশ থাকল, তিনি যেন বাদী-বিবাদীর মাঝে সমতা রক্ষা করেন, তার সহকর্মী, উপদেষ্টামণ্ডলী এবং তার ইহকালীন ও পরকালীন সহযোগীরা যেন আগের সহযোগীদের চেয়েও বড় জ্ঞানী, বড় ফকিহ, অধিক দ্বীনদার আর বেশি আমানতদার হয়। তার রক্ষী এবং সহকারীরা যেন হয়

[৮১৪] তাবসিরাতুল হুক্কাম: ১/১৪-১৫ (পরিবর্তিত এবং সংক্ষেপিত)
[৮১৫] কুযাতু কুরতুবাহ

স্বচ্ছ ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। ...'[৮১৬]

বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি

বেশি উপযুক্ত, শ্রেষ্ঠ, আল্লাহভীরু, বুজুর্গ এবং অধিক বিজ্ঞ ফকিহ ব্যক্তিকে বিচারকার্যের দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে খলিফা এবং প্রশাসকরা সচেষ্ট থাকতেন। কিন্তু নানান কারণে এসব ব্যক্তিদের অনেকেই দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। যেসব কারণে তারা বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন, সেসবের মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল বিচারের দায়িত্বের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন এবং সতর্কবাণী, দুনিয়া ও আখিরাতের বিশাল জবাবদিহিতা, হক বাস্তবায়ন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং সকলের ওপর আল্লাহর আইন প্রয়োগ করা। এ ছাড়াও আখিরাতে আল্লাহর সামনে এ ব্যাপারে জবাবদিহির ভয়ও তাদের ছিল।

আন্দালুসের আলিম এবং ফকিহদের অবস্থান ছিল উমাইয়া এবং আব্বাসি আলিমদের অবস্থানের মতোই। বরং আন্দালুস ও মরক্কোর আলিমদের আল্লাহভীতি এবং দুনিয়াবিমুখতা ছিল পূর্বাঞ্চলের আলিমদের তুলনায় বেশি। কারণ আন্দালুস ও মরক্কো ভৌগোলিক দিক থেকে এবং জনসংখ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। এ কারণেই মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস আল-খুশানি (৩৬১ হি.) তার গ্রন্থ 'কুদ্বাতু কুরতুবাহ' এবং আবুল হাসান আন-নুবাহি (৭৯৩ হি.) তার 'তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে এমন সব ব্যক্তির আলোচনা করেছেন, যাদেরকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা অসম্মতি জানিয়ে বিরত থেকেছেন।[৮১৭]

এর বিভিন্ন কারণ উপস্থাপন করে আল-খুশানি বলেন, 'গুরুত্বের দিক থেকে এমন খলিফার পরই একজন বিচারকের স্থান, যাকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের দায়িত্ব দান করার পাশাপাশি দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত করেছেন। কারণ একজন বিচারক যেসব দায়িত্ব পালন করেন সেগুলো হচ্ছে: বিচারের রায় বাস্তবায়ন এবং জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু আর চরিত্রের হেফাজত নিশ্চিতকরণ। পাশাপাশি এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত যত ধরনের উপকার এবং অপকার রয়েছে—সবগুলোর দায়িত্বও বিচারকের। এ দায়িত্বের পরিণামে আল্লাহর কাছেও ভয়াবহ অবস্থান আর কঠিন ভয় আছে। এই দায়িত্ব এতটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং গুরুত্ববহ হওয়ার কারণেই বুদ্ধিমান মানুষ এবং জ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকে তো বিচারকার্যের মর্যাদার প্রতি আগ্রহী হয়ে, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা করার পাশাপাশি তাঁর ব্যাপক ক্ষমার ওপর ভরসা

---

[৮১৬] কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৯; তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৪২

[৮১৭] কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৩; তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ১১

করে দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়েছেন। আবার কিছু লোক আখিরাতের ভয়ে এবং নিজেদের আর অধীনস্থদের পক্ষ থেকে ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির আশঙ্কায় দায়িত্ব গ্রহণ থেকে পলায়ন করেছেন।'[৮১৮]

আল-খুশানি আরও বলেন, 'আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভার বাসিন্দাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমন ছিলেন, যাদেরকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তারা সে ডাকে সাড়া দেননি। তারা এ আহ্বান উপেক্ষা করার কারণ ছিল, দায়িত্বের পেছনে অপেক্ষমাণ পরিণামের ব্যাপারে নিজেদের শঙ্কা। তাদের আলোচনা, খলিফাদের কাছে তাদের অবস্থান এবং তাদের যে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ডাকা হতো—সে ব্যাপারে তাদের কী শঙ্কা ছিল, সেটাও তো পাঠক অবশ্যই পড়েছেন। বইয়ের শুরুতেই এ ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আমি সব আলোচনা করেছি।'[৮১৯]

এ ধরনের ব্যক্তিদের শীর্ষে ছিলেন ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ইবনি কাসির আল-আন্দালুসি। বিচারক ইয়াহইয়া ইবনু ইয়া'মারের মৃত্যুর পর প্রায় ছয় মাস যাবৎ লোকদের কোনো বিচারক ছিল না। আন্দালুসের আমির আবদুর রহমান তখন বিচার বিভাগ নিয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন। লোকেরা উদ্বেগ প্রকাশ করলে তিনি বললেন, 'ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করছি বলেই আমি তাড়াহুড়া করে বিচারক নিয়োগ দিতে পারছি না। যাকে আমার পছন্দ হয়, তিনি ছাড়া যোগ্য কাউকে আমি পাচ্ছি না। আবার সেই যোগ্য ব্যক্তিটিও আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না।' তখন কেউ কেউ আমিরকে পরামর্শ দিলো, তিনি যেন যোগ্য ব্যক্তিটিকে দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করেন। এরপর ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়াকে উপস্থিত করে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য জোর করা হলে তিনি অসম্মতি জানান। তখন কাকে নিয়োগ দেওয়া যায়—এ ব্যাপারে তার কাছে পরামর্শ চাওয়া হলে তিনি তাতেও অপারগতা প্রকাশ করেন। অবশেষে প্রচণ্ড চাপে পড়ে তিনি ইবরাহীম ইবনু আব্বাসকে নিয়োগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। আন্দালুসে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়ার পরামর্শ ছাড়া বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো না।[৮২০]

এরপর আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া আন্দালুসের আমির হলেন। তিনি ছিলেন আন্দালুসের মাটিতে উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা। কর্ডোভার বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে তিনি সভাসদদের সাথে আলাপ করেন। তার ছেলে হিশাম এবং রক্ষী ইবনু মুগিস পরামর্শ দেন মুসআব ইবনু উমরানকে বিচারক নিয়োগ করতে। তাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দানের ব্যাপারে সবাই একমত হলে আমিরেরও তা

---

[৮১৮] কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২

[৮১৯] কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২-৩

[৮২০] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ১৪; কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৪-৫

মনঃপূত হয়। তখন তিনি পত্র পাঠিয়ে মুসআবকে ডেকে পাঠান। তিনি আগমন করলে ছেলে হিশাম, রক্ষী ইবনু মুগিস এবং বিশেষ সভাসদদের উপস্থিতিতে তাকে সামনে আনেন। এরপর বিচারের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মুসআবকে প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধক অনেক অজুহাত এবং সমস্যার কথা তুলে ধরেন তিনি। মুসআবের পেশকৃত এসব অজুহাত আমির না মেনে চাপ প্রয়োগ করলেন। কিন্তু মুসআব ছিলেন নিজের অবস্থানে অনড়। বারংবার পীড়াপীড়ি করেও তাকে মানাতে না পেরে আমির ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। অবশেষে দীর্ঘক্ষণ মাথা নিচু করে রেখে গোঁফে তা দিতে লাগলেন। এরপর মাথা তুলে মুসআবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি যেতে পারেন। আপনার অজুহাত আমি মেনে নিলাম। আপনার ব্যাপারে যারা পরামর্শ দিয়েছিল, তাদেরও আমি ক্ষমা করে দিলাম।'[৮২১]

পরবর্তীকালে হিশাম কর্ডোভার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য যিয়াদ ইবনু আবদিল্লাহকে প্রস্তাব দেন। হিশামের জোরাজুরি দেখে যিয়াদ কর্ডোভা থেকে পালিয়ে যান। তখন হিশাম ইবনু আবদির রহমান বললেন, 'যিয়াদের মতো মানুষই হয় না। মানুষ যদি যিয়াদের মতো হতো, তাহলে দুনিয়ার প্রতি দুনিয়াদারদের মোহ আর লিপ্সা থেকে আমি বেঁচে যেতাম।' এরপর তিনি নিজের ঘরে ফিরে যান। মন্ত্রীদের কাছে প্রস্তাবটি তুলে ধরে তাদের ধমকি দিলে তারা হিশামকে জটিলতা থেকে বাঁচাতে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।[৮২২]

ফকিহদের মধ্যে আরও যাদেরকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি বার ছিলেন তাদের অন্যতম। কোনো এক ঘটনার প্রেক্ষিতে আমির মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমানের কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে আমির তাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তখন তার সহচর হাশিম ইবনু আবদিল আজিজকে তার কাছে পাঠানো হয়। ইবরাহীম তখনো সম্মত হলেন না। আমির তখন হাশিমকে দিয়ে ইবরাহীমের উদ্দেশ্যে একটি অনুরোধ লিখে পাঠান। যা-তে লেখা ছিল : 'আপনি যদি বিচার বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তাহলে অন্তত আমাদের মজলিসে উপস্থিত হোন। আমাদের কাছে আসা-যাওয়া করুন। যাতে আমাদের নানান বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আমরা পরামর্শ করতে পারি। আপনার থেকে আমরা যেন জনগণের কথা জানতে পারি।'

পত্রের বার্তা শুনে ইবরাহীম বললেন, 'আবু খালিদ! আমির যদি এভাবে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, তাহলে আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি কিন্তু তার

---

[৮২১] তারীখু কুযাতিল আন্দালুস, পৃ. ১২; কুযাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৩

[৮২২] তারীখু কুযাতিল আন্দালুস, পৃ. ১২; কুযাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৩-৪

শহর থেকে পালিয়ে যাব। তার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক!' আমির তখন ইবরাহীমকে আর ঘাঁটালেন না।[৮২৩]

আমির মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান জিয়ানের গ্রামাঞ্চলে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আবান ইবনু ঈসা ইবনি দিনারের কাছে প্রস্তাব পেশ করলে আবান তা গ্রহণে জোরদার অসম্মতি প্রকাশ করেন। আমির তখন আবানকে বাধ্য করার আদেশ জারি করেন। একদল পুলিশকে নির্দেশ দিলে তারা আবানকে জিয়ানস্থ বিচারের স্থানে উপস্থিত করে বসিয়ে দেয়। অপরদিকে সাধারণ মানুষও বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আবানকে ঘিরে ধরে। ইবনু ঈসা তখন একদিন বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে রাতের আঁধারে পালিয়ে গেলেন। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, 'বিচারক পালিয়ে গেছে।' বিষয়টি আমিরের কানে গেলে তিনি মন্তব্য করলেন, 'এই হচ্ছে সৎ লোক, যে নিজের দ্বীন নিয়ে পালিয়েছে। সে কোথায় আছে খোঁজ নাও। যে কাজে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল, সেটা থেকে তাকে নিরাপত্তা দাও।'[৮২৪]

আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনেকেই অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। তাদের প্রত্যেকেরই চমৎকার ঘটনা রয়েছে। তাদের আলোচনা অবিস্মরণীয়। প্রত্যেকেরই অবস্থান সম্মানজনক এবং আগ্রহ সত্যনিষ্ঠ।[৮২৫]

তবে আন্দালুসে আলিমদের আরেকটি শ্রেণি ছিল, যারা বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালেও আমির এবং বিচারকদের পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হাতিম ইবনু মুহাম্মাদ আত-তামিমি ছিলেন যাদের অন্যতম। ইবনুত তরাবলুসি আল-কুরতুবি নামে তিনি পরিচিত। আরও ছিলেন ঈসা ইবনু মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ ইবনু আত্তাব। শেষোক্তজন ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান। আন্দালুসে ফতোয়া প্রদান তাকে কেন্দ্র করেই চলত।[৮২৬]

বিচারকদের বেতন-ভাতা

মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের নিয়োজিত রাখা এবং বিচারের দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারকরা বেতন-ভাতা গ্রহণ করতেন। পূর্বাঞ্চলের মতো সেখানেও একই রীতি ছিল। তবে আন্দালুসে বিচারকদের বেতন-ভাতা ছিল অনেক বেশি। জীবনযাত্রার মান ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত। যা সেখানকার সামাজিক অবস্থান, অগ্রগতি এবং সভ্যতার সাথে সংগতিপূর্ণ।

পূর্বাঞ্চলে বিচারকদের বড় এক সংখ্যা ছিল, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের

---

[৮২৩] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ১৩; কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৬

[৮২৪] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ১২-১৩; কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৭

[৮২৫] বাড়তি জানতে তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস এবং কুদ্বাতু কুরতুবাহ দেখতে পারেন।

[৮২৬] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩৩৩

আশা এবং ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন আর সম্পদের প্রতি অনীহা থাকায় যারা বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে কোনো ধরনের বেতন-ভাতা গ্রহণ করতেন না। আন্দালুসেও তাদের মতো বিচারক পাওয়া যেত। তাদের কেউ কেউ জীবিকা নির্বাহের জন্য বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাধারণ অন্যান্য কাজ করতেন। আবার অনেকে সংশয়ের আশঙ্কায় এবং সম্পদ থেকে স্বচ্ছ থাকার জন্য প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় এতটুকু পরিমাণ সামান্য জীবিকা গ্রহণ করে দুনিয়াবিরাগী জীবন কাটিয়ে দিতেন।

মালিকি মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ বিচারক আবদুস সালাম ইবনু সাঈদ ইবনি হাবিব আত-তানুখি ছিলেন তাদেরই অন্যতম। তার উপাধি ছিল সাহনুন। ২৩৪ হিজরিতে আফ্রিকাস্থ কায়রুওয়ানের বিচারক ছিলেন তিনি। ২৪০ হিজরিতে মৃত্যু পর্যন্ত বিচারকার্যের দায়িত্বরত ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য তিনি আমিরকে দুটি শর্ত দিয়েছিলেন। একটি শর্ত ছিল এমন : 'আমি যা চাই, আমাকে তা করতে দিতে হবে। আমার আগ্রহের বিষয়ে আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে; কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা যাবে না। আমি যেন এ কথা বলতে পারি, আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং সহযোগীদের বিচারের মাধ্যমে আমার দায়িত্ব পালন শুরু করব। কারণ দীর্ঘদিন থেকে তাদের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি অনেক জুলুম করা হয়েছে। তারা অনেক সম্পদ আত্মসাৎ করেছে।' তখন আমির বললেন, 'ঠিক আছে। তাদের দিয়ে আপনার বিচারকার্যের সূচনা করুন। আমার মাথার সিঁথির ক্ষেত্রেও আপনি ন্যায় প্রয়োগ করুন।' এসব ক্ষেত্রে একজন মানুষ নিজের ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করে। তা সত্ত্বেও সাহনুনের সাথে আমির সম্মানজনক আচরণ করেছিলেন।

আবদুর রহমান আয-যাহিদ তার উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রে লিখেছিলেন, 'আপনাকে আমি ওসিয়ত করছি, মানা না-মানার বিষয়টি একান্তই আপনার। আপনি ভালো করেই জানেন, এই উম্মতের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করেছেন। পার্থিব বিষয়ে মানুষকে শাসন করা আপনার দায়িত্ব। অপরাধী সম্মানিত ব্যক্তি হোক কিংবা নিচু শ্রেণির লোক, আপনার সামনে তাকে নত হতেই হবে। শত্রু এবং বন্ধু—সবাই যেন আপনার কাছে সমান হয়। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকেরই ইনসাফ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'

উত্তরে বিচারক সাহনুন মণিমুক্তা সমৃদ্ধ একটি পত্র লিখেছিলেন। যার প্রতিটি কথাই ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ। যা জ্ঞান এবং আল্লাহভীতির পরিচয় দিচ্ছিল। তার লেখা থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে, তিনি এক উত্তম পথের পথিক। বিচারকদের মধ্য থেকে তিনিই সর্বপ্রথম হিসবাহ পরিচালনা এবং অন্যায় প্রতিহত করেছেন। আমানতের সম্পদ বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষদের কাছে রাখার নীতি তিনিই চালু করেন। এর আগে আমানতের সম্পদ থাকত বিচারকের ঘরে। তার কর্তৃত্বে মানুষ সত্য

শরীয়ত লাভ করত। আফ্রিকার বিচারকার্য পরিচালনায় তার মতো কেউ আগে দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। তার আচরণে ও উচ্চারণে ফুটে উঠত প্রজ্ঞার ছাপ।[৮২৭]

সাহনুন ছিলেন সত্যিকারের দুনিয়াবিমুখ। আন-নুবাহি বলেন, 'সাহনুন দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় বিচারের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে শাসকের থেকে নিজের জন্য কিছুই গ্রহণ করেননি।'[৮২৮]

আবুল কাসিম হামাস ইবনু মারওয়ান আল-হামাদানি ছিলেন সাহনুনের সহচর। দুনিয়াবিরাগী এই বিজ্ঞ ফকিহ আফ্রিকার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তার দুনিয়াবিমুখতা এবং বিনয়ের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি নিজেই খাল খনন করতেন। বাড়ির সামনে তিনি লাকড়ি কাটছেন—এমতাবস্থায় মানুষ তার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে আসত। বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইত। তিনি মোটা কাপড় পরিধান করতেন। বিচারকার্যের দায়িত্ব পালনকালে শহরের মধ্যে কখনো বাহনে চড়েননি। পরিশ্রম করে কামাইকৃত সম্পদ থেকেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে কোনো ধরনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি।[৮২৯]

এমনই আরেকজন বিচারক ছিলেন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩৬৭ হি.)। তিনি কর্ডোভার কাযিউল জামাআহ ছিলেন। ৩৫৬ হিজরিতে তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ৩৫৮ হিজরিতে কর্ডোভায় নামাজের ইমামতির দায়িত্বও পালন করেন। তার শ্রেষ্ঠত্ব, ইলম, বুদ্ধিমত্তা, সুনিপুণ পরিচালনা এবং উত্তম আচরণের কথা ছিল মানুষের মুখে মুখে। কর্ডোভার নদী থেকে শিকার করা মাছ বিক্রি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।[৮৩০]

বিচারকদের তৃতীয় আরেকটি শ্রেণি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে বেতন-ভাতা নিতেন বটে। কিন্তু যেদিন কাজ করতেন না, সেদিনের বেতন মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফিরিয়ে দিতেন।

নাসর ইবনু যারিফ আল-ইয়াহসুবি ছিলেন এই শ্রেণির বিচারকদের অন্যতম। আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া যাকে কোনো এক সময় কর্ডোভার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। প্রশংসিত চরিত্রের অধিকারী নাসর ছিলেন একজন সজ্জন ব্যক্তি। তার সম্পর্কে আবুল হাসান আন-নুবাহি বলেছেন, 'এই বিচারকের আল্লাহভীতি এবং দুনিয়াবিমুখতা এমন ছিল যে, কোনোদিন বিচারকার্য

[৮২৭] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ২৯; মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪০৪
[৮২৮] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৩০
[৮২৯] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৩২
[৮৩০] আল-মু'জিব ফী তালখীসি আখবারিল মাগরিব, পৃ. ৭৩; কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ১২০; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২১৬

পরিচালনা না করলে সেদিনের বেতন তিনি গ্রহণ করতেন না।'[৮৩১]

ইবনুল হারিস আল-খুশানি বর্ণনা করেছেন, 'উমর ইবনু শারাহিলকে আমির আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাকে বরখাস্ত করে সাবেক বিচারক মুআবিয়া ইবনু সালিহ আল-হাদরামিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। মুআবিয়া ছিলেন মূলত হিমসের অধিবাসী। তারা দুজন অনেকদিন ধরে পালাক্রমে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। এক বছর মুআবিয়া দায়িত্ব পালন করতেন তো আরেক বছর উমর করতেন। এভাবেই কয়েক বছর কেটে যায়।' ইবনুল হারিস আরও বলেছেন, 'অন্য কোনো কাজের জন্য কোনো এক দিন বিচারকার্য পরিচালনা করতে না পারলে তাদের দুজনের কেউই সেদিনের বেতন গ্রহণ করতেন না।'[৮৩২]

সুলাইমান ইবনুল আসওয়াদ আল-গাফিকি ছিলেন অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত একজন সৎ বিচারক। নিজের প্রদত্ত বিচারের রায়ে কঠোরভাবে অবিচল থাকতেন। তিনি ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোক ছিলেন। আল-খুশানি বলেছেন, সুলাইমানকে মারিদা অঞ্চলের বিচারের দায়িত্ব থেকে যখন অব্যাহতি দেওয়া হয়, তখন তিনি কর্ডোভার প্রাসাদের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে মারিদার আমির মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমানের কাছে লিখলেন, 'আমার বেতন থেকে উদ্বৃত্ত কিছু অর্থ আমার হাতে আছে। এগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেওয়া আমার কর্তব্য। এগুলো জুমুআর দিন এবং যেসব দিনে আমি বিচারকার্য ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলাম বা যে-সময়গুলোতে আমি বিচারকার্যের দায়িত্ব পালন করিনি, সেসব সময়ের বেতন থেকে আমার হিসাব করে পৃথক করে রাখা অর্থ।' তখন আমিরের পক্ষ থেকে জবাব পাঠানো হলো, 'এগুলো আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' কিন্তু সুলাইমান সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে অবশেষে আমির এই অর্থ বুঝে নিয়েছিলেন।

একবার আমির মুহাম্মাদের জনৈক সহযোগী একজন ইহুদির ওপর জুলুম করে আমিরের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বিচারক সুলাইমান তখন আমিরকে ধমকি দিয়েছিলেন। এ ঘটনা দুটির কারণেই আমির মুহাম্মাদ যখন পিতার স্থলাভিষিক্ত হন, তখন বিচারক সুলাইমানকে কর্ডোভার কাযিউল জামাআহ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।[৮৩৩]

মুহাম্মাদ ইবনু বাশির আল-মুআফিরি ছিলেন সেসব বিচারকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা হজের সময় ইমাম মালিক ইবনু আনাস -এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

---

[৮৩১] তারীখু কুদাতিল আন্দালুস, পৃ. ৪৪ এবং ১৯৩; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২১৬
[৮৩২] কুদাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২২; তারীখু কুদাতিল আন্দালুস, পৃ. ৪৩
[৮৩৩] কুদাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৭০; তারীখু কুদাতিল আন্দালুস, পৃ. ৫৬

এরপর তিনি আন্দালুসে ফিরে আসার পর হাকাম ইবনু হিশাম তাকে বিচারকার্য পরিচালনায় নিয়োগ দিতে চাইলেন। তিনি কিছু শর্তসাপেক্ষে দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। একটা শর্ত ছিল এমন : তাকে প্রয়োজন পরিমাণ ভাতা দিতে হবে।

তিনি ছিলেন প্রথম সারির বিচারকদের অন্তর্ভুক্ত। বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠিন অবস্থান গ্রহণ করতেন। শরীয়তের বিধানাবলি পালনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী।[৮৩৪]

মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াবকা বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তার সমস্ত উপদেষ্টা এবং বিশেষ সহকারীদের একত্র করে এবং তাদেরকে নিজের যাবতীয় সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মালিকানাধীন সবকিছুর তথ্য জানিয়ে দিলেন। যাতে দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণের পর এসব নিয়ে কেউ তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা না করে।[৮৩৫]

বিচারকদের বেশ-ভূষা

আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারকরা সাধারণ জনগণ থেকে ভিন্ন নির্দিষ্ট কোনো পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন না। তবে বিচারকার্য চলাকালীন তারা নির্ধারিত এক ধরনের পোশাক পরতেন। এ ক্ষেত্রে একেক বিচারকের বিশেষ পোশাক একেক ধরনের হতো। তবে ইমাম আবু ইউসুফ ﷺ সর্বসাধারণ থেকে বিচারকদের পৃথক রাখার সুবিধার্থে বাগদাদ এবং পূর্বাঞ্চলের আলিম, ফকিহ এবং বিচারকদের পোশাক এক ধরনের হওয়ার নীতি প্রচলন করেছিলেন। পক্ষান্তরে আন্দালুসে প্রত্যেক বিচারককে ইচ্ছামাফিক পোশাক পরিধানের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এ কারণেই আন্দালুসের বিচারকদের বেশ-ভূষার ব্যাপারে নানাধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

আবদুর রহমান ইবনু আহমাদ প্রত্যেক সোম এবং বৃহস্পতিবারে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বসতেন। এ দুদিন তিনি কালো পোশাক পরিধান করতেন। আর অন্যান্য দিন পরতেন সাদা পোশাক।

সাঈদ ইবনু সুলাইমান আল-গাফিকি সম্পর্কে ইবনুল হারিস আল-খুশানি বলেন, 'তিনি কর্ডোভায় আগমন করলে আমির মুহাম্মাদ তাকে বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি মসজিদে বসে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তখন তার পরনে থাকত পশমের সাদা জুব্বা। তার মাথায় থাকত "আকরুফ" নামে পরিচিত সাদা টুপি এবং গায়ে থাকত একই জাতীয় সাদা রঙের বিশেষ কপ।'[৮৩৬]

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া সম্পর্কে বিচারক ইয়াদ্ব বলেন, 'তিনি জুমুআর দিন

---

[৮৩৪] তারীখু কুদাতিল আন্দালুস, পৃ. ৪৭-৪৮
[৮৩৫] তারীখু কুদাতিল আন্দালুস, পৃ. ৭৭
[৮৩৬] কুযাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৬২

পাগড়ি পরিধান করে পায়ে হেঁটে মসজিদে যেতেন।[৮৩৭]

ইবনু ফাতিন ছিল একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি। বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর তার বেশ-ভূষা পালটে গেল। মন্ত্রীদের পোশাক ছেড়ে ফকিহদের সবুজ পোশাক পরতে লাগলেন। এই পোশাকের রং হালকা সবুজ অথবা গাঢ় সবুজ হতো।[৮৩৮]

তবে ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ বিচারকদের বেশ-ভূষার বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতেন। অভিজাত শ্রেণির এবং ফকিহগণের পোশাকের মাঝামাঝি ধরনের পোশাক পরিধান করতেন তিনি। যা থেকে আন্দালুসের প্রচলিত পোশাক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।[৮৩৯]

ড. আহমাদ ফিকরি বর্ণনা করেছেন, আন্দালুসের বিচারকরা সবুজ রঙের বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করতেন।[৮৪০] কিন্তু আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারকদের সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলিতে এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

উসতায আহমাদ আমিন বলেন, 'আন্দালুসের এই সভ্যতায় মানুষের বেশ-ভূষাতে পাগড়ির ব্যবহার খুব কমই দেখা যেত। তবে তাদের শাইখ, আলিম এবং বিচারকদের মাঝে পাগড়ির ব্যবহার চোখে পড়ত।' ... আন্দালুসবাসীর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। বিচারক অথবা মুফতিকে আপনি খালি মাথায় দেখতে পাবেন। আর পাগড়ির ব্যবহার তো ছিল না বললেই চলে।[৮৪১]

উসতাযের এই বক্তব্যটি সাধারণ গবেষণা মাত্র। আন্দালুসের বিচারকদের জীবনীতে এ কথার সমর্থনে কোনো বর্ণনা আমরা খুঁজে পাইনি।

আন্দালুসের কোনো কোনো বিচারক দায়িত্ব গ্রহণের আগে পরিধেয় পোশাক পরিবর্তন করতেন না। আর এটাই গ্রহণযোগ্য এবং অধিকাংশের মতামত। খালফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি ফাতহূনের জীবনীতে এসেছে, তিনি পোশাক পরিবর্তন করেননি।[৮৪২]

অনেকে নির্ধারিত পোশাক বাধ্য থাকতেন না। মুহাম্মাদ ইবনু বাশির আল-মুআফিরির জীবনীতে আল-খুশানি লিখেন, 'তিনি আমাদের জুমুআর নামাজ পড়াতেন। তার মাথায় থাকত একটি পশমি টুপি।' ... 'জুমুআর দিনে তিনি একটি হলুদ আলখাল্লা গায়ে দিয়ে এলেন। তার পায়ে ছিল চটি জুতা। মাথায়

[৮৩৭] তারতীবুল মাদারিক : ১/৫৩৭

[৮৩৮] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৩৭

[৮৩৯] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৩৭

[৮৪০] কুরতুবাহ ফিল আহদিল ইসলামি, পৃ. ৩০৬

[৮৪১] বুহুসুন ইসলামি : ৩/৪ এবং ৮

[৮৪২] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৩৮

চুল একটু এলোমেলো হয়ে ছিল। এরপর এই পোশাকেই দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন তিনি। একজন অপরিচিত আগন্তুক এই বিশেষ পোশাক, এলোমেলো মাথার চুল, হলুদ হয়ে যাওয়া চাদর, চোখে লাগানো সুরমা, মিসওয়াক এবং হাতে লেগে থাকা মেহেদির দিকে তাকিয়ে তাকে বিচারক বলে চিনতে পারল না। লোকটি তাকে বাঁশিওয়ালা বলে ভ্রম করছিল। অবশেষে চিনতে পারার পর তার মাঝে সে ন্যায়পরায়ণতা আর ইনসাফ দেখতে পেল।[৮৪৩]

❁ বিচারকদের সহায়ক

পূর্বাঞ্চলের মতো আন্দালুস ও মরক্কোতে বিচারকদের কাজে সহায়তা করার জন্য সহায়ক ছিল। সহায়করা হলেন বিচারকের কাতিব বা মুনশি। যিনি বিচারকের পাশে বসতেন। বিভিন্ন মামলা, দলিল-প্রমাণ এবং স্বীকারোক্তি লেখার কাজে তিনি বিচারককে সহযোগিতা করতেন। তিনি যা লিখতেন, সেটা সাক্ষীদের পড়ে শোনানোর পর লেখার নিচে বিচারক নিজে স্বাক্ষর করে দিতেন।

অনারবি ভাষা অনুবাদ করার জন্য বিচারক নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন কোনো দোভাষী নির্বাচন করতেন। আন্দালুসে পরিপূর্ণভাবে আরবি ভাষার প্রচার হওয়ার পূর্বে এটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাশাপাশি আন্দালুসের যেসব অঞ্চলে স্থানীয় ভাষার প্রচলন ছিল, সেসব অঞ্চলেও বিচারকরা দোভাষীর সহায়তা গ্রহণ করতেন।

বিচারকের দরজায় একজন রক্ষী থাকতেন। যার দায়িত্ব ছিল মানুষকে ধারাবাহিকভাবে প্রবেশের ব্যবস্থা করা। প্রবেশের ক্ষেত্রে বাদী-বিবাদীদের ধারাবাহিকতার ব্যবস্থাপনা রক্ষা করার পাশাপাশি হট্টগোল এবং বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি।[৮৪৪]

আন্দালুস ও মরক্কো এবং পূর্বাঞ্চলের দেশগুলো এসব বিষয়ে ছিল বরাবর। ফকিহ আর আলিমদের থেকে সহযোগিতা গ্রহণের ব্যাপারেও এসব দেশের অবস্থান ছিল অভিন্ন। তবে একটি ব্যাপারে আন্দালুসের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং পরিষ্কার ভিন্নতা ছিল। আন্দালুসে প্রচলিত স্বতন্ত্র শূরা পদ্ধতি ছিল একটি মৌলিক বিষয় এবং উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আমির এবং বিচারকদের কাছে যা 'মাজলিসুশ শূরা' তথা উপদেষ্টা পরিষদ নামে পরিচিতি লাভ করে। আন্দালুস-সংক্রান্ত সামনের আলোচনায় আমরা এর বিশদ বর্ণনা দেওয়ার আশা রাখি।

আন্দালুসে বিচারকের সহায়কদের মাঝে যাচাইকারীদের এক শ্রেণির প্রসিদ্ধ সহায়ক ছিল। গঠনমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থার আলোচনায় 'ফয়সালার ব্যাপারে সাক্ষী' শিরোনামের অধীনে একটি বিশেষ অনুচ্ছেদে তাদের আলোচনা আমরা

---

[৮৪৩] কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২৮ এবং ৩২

[৮৪৪] কুরতুবাতু ফিল আসরিল ইসলামি, পৃ. ৩০৬

করব।

❁ বিচারক অপসারণ

আন্দালুসে বিচারক অপসারণের বিষয়টি কম এবং সীমিত পর্যায়ে ছিল। অধিকাংশ সময় বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রবীণ হওয়ার পাশাপাশি ইলম, তাকওয়া ও পরহেজগারির ক্ষেত্রে খ্যাতিমান কোনো ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিই আমরণ বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। বেশির ভাগ বিচারকদের জীবনীতে এমনটাই পাওয়া যায়।

আমির আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়ার যুগে দুজন বিচারককে পালাক্রমে অপসারণ করার বিষয় দেখা গিয়েছিল। তখন মুআবিয়া ইবনু সালিহের পাশাপাশি উমর ইবনু শারাহিল পালাক্রমে কর্ডোভায় বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এক বছর মুআবিয়া দায়িত্ব পালন করতেন তো আরেক বছর উমর পালন করতেন। হিসাব রাখার সুবিধার্থে বছর শেষ হলে পালা পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি আমিরকে জানিয়ে দিতে হতো।[৮৪৫]

ইমাম মালিকের মাযহাব অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা না করার কারণেও অনেক সময় বিচারক অপসারণ করা হতো। আমির আবদুর রহমান আল-আওসাতের যুগে ১১জন বিচারক একের পর এক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রখ্যাত আলিম ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ছিলেন আমিরের কাছে অগ্রগণ্য এবং মর্যাদাবান ব্যক্তি। তিনিই আমিরকে বিচারক নিয়োগ এবং অপসারণের ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন। কোনো বিচারকের পক্ষ থেকে মালিকি মাযহাব প্রয়োগ না করার বিষয়টি আঁচ করতে পারলেই তাকে অপসারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতেন তিনি। এ ব্যাপারে তার কঠোরতা ছিল সর্বজনবিদিত। ২৩৪ হিজরিতে তার মৃত্যুর পর বলা হলো, বিচারকরা তার তৎপরতা থেকে রেহাই পেয়েছে।[৮৪৬]

অনেক সময় আকস্মিক কিছু কারণেও বিচারকদের অপসারণ করা হতো। এর আবার কিছু সময় পর তাকে পুনরায় নিয়োগ দিয়ে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করা হতো। যেমনটা ঘটেছিল আমর ইবনু আবদুল্লাহ ইবনি লাইসের সাথে। 'মাওয়ালি' তথা মুক্ত ক্রীতদাসদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 'কাযিউল জামাআহ' হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সহনশীল, আত্মসংযমী এবং গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাকে অপসারণ করার কিছুকাল পর পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়। এরকম আরেকজন ছিলেন সুলাইমান ইবনু আসওয়াদ আল-গাফিকি। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তিনি করতেন না। কোনো ব্যাপক ফিতনার কারণে আমির

---

[৮৪৫] কুযাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২১-২২

[৮৪৬] কুরতুবাতু ফিল আসরিল ইসলামি, পৃ. ৩১৮

প্রথমে তাকে অপসারণ করলেও পরবর্তীকালে পুনরায় বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ প্রদান করেন।[৮৪৭]

❁ বিচারের জায়গা

বিচারের জায়গা বলে এমন জায়গা উদ্দেশ্য, বিচারক যেখানে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বসতেন। যাকে 'মাজলিসুল কাদ্বা' বা বিচারের এজলাসও বলা হয়। পূর্বাঞ্চলের বিচারের এজলাস এবং আন্দালুসের বিচারের এজলাসের মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারের এজলাস মসজিদেই হওয়ার নিয়ম ছিল। কোনো কোনো বিচারক মসজিদের এক প্রান্তে অথবা মসজিদে থাকা কোনো বিশেষ কামরাতে বিচার করতেন। আবার কেউ কেউ বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিজের বাড়িতে বসতেন। তৃতীয় শতাব্দীতে কর্ডোভায় বিচারের উপদেষ্টা পরিষদের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন থেকে সেই কার্যালয় বিচারের এজলাস হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। অধিকাংশ বড় বড় আলিম এই কার্যালয়ে বসতেন। বিচারক যাতে প্রয়োজনে তাদের শরণাপন্ন হতে পারেন। ফয়সালার ক্ষেত্রে যেন তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন।

অনেক বিচারকের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে ইবনুল হারিস আল-খুশানি এবং আবুল হাসান আন-নুবাহি উল্লেখ করেন, বিচারকরা মসজিদে কিংবা জামে মসজিদে বসতেন। সাঈদ ইবনু সুলাইমান আল-গাফিকি সম্পর্কে আল-খুশানি বলেছেন, 'সাঈদ ইবনু সুলাইমান বিচারকার্য পরিচালনা করতেন জামে মসজিদে। তিনি হেঁটেই সেখানে আসতেন।' সাঈদ সম্পর্কে আল-খুশানি আরও বলেছেন, 'তিনি কর্ডোভায় আগমন করলে আমির তাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তিনি মসজিদে বসতেন। তখন তার পরনে থাকত সাদা পশমি জুব্বা।'[৮৪৮]

যাফির আল-কাসিমি বলেন, 'পরকাল এবং বিচারের পরিণাম সংক্রান্ত চমৎকার উপদেশ এবং আবশ্যকীয়ভাবে ইনসাফ আঁকড়ে ধরার বিষয়টি মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল-আনসারির জীবনীতে আমি পড়েছি। ... তাতে এ-ও আছে, বিচারক আবু আবদিল্লাহ মালাগার ভেতরেই উল্লেখিত মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বসতেন। মসজিদের বিপরীতেই ছিল একটি কবর, যা বিচারক অতিরিক্তরূপে খনন করেছিলেন। পরবর্তীকালে নিজের জন্য খননকৃত এই কবরেই তিনি সমাহিত হয়েছেন।' এটা ৫০০ হিজরির কথা। যা ইবনু বাশকুওয়াল তাঁর গ্রন্থ 'আস-সিলাহ'-এ উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেছেন।[৮৪৯]

---

[৮৪৭] কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৬৭, ৭২, ৭৩, ৮১, ৮২ এবং ৮৩

[৮৪৮] কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৬২ এবং ৬৪

[৮৪৯] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪৮১; তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ১০০

মুহাম্মাদ ইবনু বাশিরের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে আল-খুশানি বলেছেন, 'আবু উসমান মসজিদের সামনে থাকা একটি ঝুলন্ত ছাউনিতে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তার বাড়িও ছিল মসজিদের সামনের রাস্তাতে।'[৮৫০]

বিচারক সাহনুন জামে মসজিদের মাঝে নির্মিত একটি ঘরে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। ঘরটি তিনি নিজেই তৈরি করে নিয়েছিলেন। দুর্নীতি-সংক্রান্ত বিচারকার্যের পরিচালক হাবিবের এজলাস ছিল জামে মসজিদের অপর একটি ঘরে। যা সাহনুনের ঘরটির কাছেই ছিল।[৮৫১] মসজিদের সম্মান রক্ষা এবং মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনার ব্যাপারে যেসব নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হতো, সেগুলো দূর করার মাঝে এভাবেই সমন্বয় করা হতো।[৮৫২]

ইবনু ফারহুন বলেছেন, 'সাহনুন জামে মসজিদে একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে বসতেন। যাতে এই এজলাস লোকদের এবং কথাবার্তা আর হইচইয়ের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। ... বিশ্বস্ত বিচারক যে-কোনো জায়গাতেই বসে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন।'[৮৫৩]

❁ বিচারের সময়

আন্দালুসে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য সুনির্ধারিত এবং বাধ্যতামূলক কোনো সময় ছিল না। কেননা বিচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন তথা বিবাদ মীমাংসা করার মাধ্যমে হক প্রতিষ্ঠা করা। তা যে-কোনো সময়েই হতে পারে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিচারকরা যথোপযুক্ত সময় গ্রহণ করতেন। যদিও সময় এবং দেশ হিসেবে তাতে ভিন্নতা থাকত। এ ব্যাপারে থাকা মূলনীতি সম্পর্কে ইবনু ফারহুন বলেছেন, 'বিচারকের উচিত বিচারকার্য পরিচালনায় বসার জন্য এমন একটা সময় নির্ধারণ করা, যখন মানুষের কাজকর্মে কোনো ধরনের ব্যাঘাত ঘটাবে না।'[৮৫৪]

কর্ডোভার বিচারক মুহাম্মাদ ইবনু বাশিরের জীবনীতে ইবনুল হারিস আল-খুশানি লিখেন, 'বিচারকার্য পরিচালনা এবং মামলা শুনানির জন্য তিনি সকাল থেকে যুহরের এক ঘণ্টা আগ পর্যন্ত বসতেন। এরপর যুহরের নামাজের পর থেকে আসরের নামাজের আগ পর্যন্ত বসতেন। এ সময় তার মূল কাজ হতো দলিল-প্রমাণ শোনা। এ সময় ভিন্ন কোনো সময় তিনি দলিল-প্রমাণ শুনতেন না।'[৮৫৫]

---

[৮৫০] কুদ্দাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৩০

[৮৫১] তারতীবুল মাদারিক : ১/৬০৮

[৮৫২] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪৮৩

[৮৫৩] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/২৭

[৮৫৪] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/২৭। আল-মাওয়ারদির আদাবুল কাদ্বি : ২/২৪৪ দেখা যেতে পারে।

[৮৫৫] কুদ্দাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৩০

আবদুর রহমান ইবনু আহমাদ প্রত্যেক সোম এবং বৃহস্পতিবারে বিচারকার্য পরিচালনা করতে বসতেন। সম্ভবত তার ধারণা ছিল, শহরের মামলা-মোকদ্দমা এবং বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য দুদিনই যথেষ্ট।

ইবনু আবদিল হাকামের সূত্রে ইবনু ফারহুন বর্ণনা করেছেন, 'দুই ঈদে বা ঈদের কাছাকাছি দিনে, যেমন: আরাফার দিন, তারবিয়ার দিন, হাজিদের যাত্রা করার দিন, হাজিদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন এবং নববর্ষের দিন বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বসতে হতো না। তদ্রূপ অতি বৃষ্টির কারণে রাস্তায় কাদা জমে গেলে সেদিনও বিচারকার্য স্থগিত থাকত। পরবর্তী আলিমদের কেউ কেউ জুমুআর দিনেও বিচারকার্য পরিচালনার জন্য না বসার কথা বলেছেন।'[৮৫৬] এগুলো ছিল সমাজে প্রচলিত ছুটির দিন। এ কারণেই ফকিহগণ বলেছেন, বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিচারক সাধ্যানুসারে দিনে দুই বেলায় বসবেন।[৮৫৭]

আন্দালুসে কর্ডোভার বিচারক মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াবকা সম্পর্কে আন-নুবাহি বলেছেন, 'তিনি রমজান মাসে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন না। এ সময়টা আমল এবং ইবাদতের জন্য নিজেকে অবসর রাখতেন। আমৃত্যু এ পদ্ধতি তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন।'[৮৫৮] আন-নুবাহির বক্তব্য উল্লেখের পর আল-কাসিমি লিখেন, 'আন-নুবাহির বক্তব্যে "আমল" শব্দটা আছে। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি ইবাদত এবং বিচারকার্য সংক্রান্ত অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন। সুতরাং রমজানের এই দিনগুলো বিচারকার্যের ছুটির মতোই ছিল।'[৮৫৯]

আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়ার ছেলে হিশাম যখন মুসআব ইবনু উমরানের কাছে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তাব পেশ করেন, তখন মুসআব অসম্মতি জানালেন। হিশাম তখন পীড়াপীড়ি করতে থাকেন এবং একপর্যায়ে তাকে হুমকিও দেন। মুসআব তখন এই শর্তে দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, জুমুআর দিন-সহ দুদিন তথা শনি এবং রবিবার তাকে নিজের জায়গা-জমি দেখাশোনা করার অনুমতি দিতে হবে। বাকি দিনগুলোতে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। হিশাম এ শর্ত মেনে নিয়েছিলেন।

আমির আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া বিচারকার্য পরিচালনায় পালাবদলের পদ্ধতি চালু করেছিলেন। অর্থাৎ দুজন বিচারক পালাবদল করে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। দুজনের প্রত্যেকের কাজের মেয়াদ হবে এক বছর। সে হিসেবে উমর ইবনু শারাহিল কর্ডোভায় মুআবিয়া ইবনু সালিহের সাথে পালাবদল করে বিচারকার্য

---

[৮৫৬] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/২৮
[৮৫৭] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/২৮; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১২৭
[৮৫৮] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৭৮
[৮৫৯] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪৮৬

পরিচালনা করেছিলেন। এক বছর মুআবিয়া দায়িত্ব পালন করতেন, আরেক বছর করতেন উমর।[৮৬০]

বর্তমানে প্রচলিত 'দ্রুত বিচার বিভাগ' ছিল পূর্বোল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের বাইরে। এ ক্ষেত্রে বিচারকের দায়িত্ব ছিল বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন করা। তা যে সময়ই হোক না কেন। ইবনু ফারহুন বলেছেন, 'এসব ছুটির দিন এবং সময় থেকে ভিন্ন ছিল সেসব বিচার, যেগুলো ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এসব বিচারকার্য হালকাভাবে দেখে দ্রুত সম্পন্ন করা হতো।'[৮৬১]

এ ব্যাপারে আল-মাওয়ারদি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আদাবুল কাদ্বি'-তে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এভাবে, 'এক দিনে যদি এমন কোনো মোকদ্দমা বারংবার আসে—যা বিলম্ব করা ঠিক নয়, তাহলে বিচারক সেটাকে মুলতুবি না রেখে তার প্রতি মনোযোগ দেবেন।'[৮৬২]

আল-মাওয়ারদি আরও লিখেছেন, 'এই মোকদ্দমা ছাড়া সেদিন যদি এমন আরও বিশেষ মোকদ্দমা আসে—যা বিলম্ব করার কারণে ক্ষতি হয়, তাহলে বিলম্ব করা উচিত নয়।'[৮৬৩]

এসব তথ্য থেকে এটা বুঝে আসে যে, বিচার-সংক্রান্ত আধুনিক আইনকানুন এবং নীতিমালা প্রণীত হওয়ার আগেই ইসলামি ফিকহ এবং ইসলামের বিচারব্যবস্থা ভবিষ্যতের দিকে কতটা অগ্রসর ছিল।[৮৬৪]

বিচারের গঠনমূলক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

আন্দালুস-মাগরিবের বিচারব্যবস্থার সাথে পূর্বাঞ্চলের বিচারব্যবস্থার মিল আমরা পূর্বের আলোচনাতে প্রত্যক্ষ করেছি। তবে আন্দালুস ও মরক্কোতে এমন কিছু বিশেষ বিষয় ছিল, যেগুলো পূর্বাঞ্চলে ছিল না। সামান্য কিছু পার্থক্য ছাড়া গঠনমূলক দিক থেকে আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারব্যবস্থা পূর্বাঞ্চলের বিচারব্যবস্থার মতোই ছিল। তবে পার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দুগুলো ছিল বিস্তৃত। বিশেষত পার্থক্য হয়েছিল দুটি মৌলিক বিষয়ে। একটি হলো মালিকি মাযহাব অনুসরণ করা এবং অপরটি হলো উপদেষ্টা পরিষদ পদ্ধতি চালু করা। এ দুটি বিষয় ছাড়া পার্থক্যের অন্য দিকগুলো ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। যেমন বিচারকের বিভিন্ন পরিধি, বিচারকার্য পরিচালনার বিভিন্ন পদ্ধতি, বিচারকার্যের পাশাপাশি বিচারকদের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

---

[৮৬০] কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২১ এবং ২২
[৮৬১] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/২৮
[৮৬২] আদাবুল কাদ্বি : ১/১৯৬
[৮৬৩] আদাবুল কাদ্বি : ২/২৪৪
[৮৬৪] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৪৮৭

এখন আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

বিচারের উৎস

পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মতোই আফ্রিকা (তিউনিসিয়া), মরক্কো এবং আন্দালুসে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। হিজরি প্রথম শতকের পূর্ণ সময় এবং দ্বিতীয় শতকের কিছু সময় অবধি আলিম এবং বিচারকগণ ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করতেন। এই দুই শতকে পূর্বাঞ্চলের ফতোয়া এবং বিচারব্যবস্থার সাথে আন্দালুস ও মরক্কোর ছিল গভীর সম্পর্ক। এই শতক দুটিতে মুফতি এবং বিচারকরা সরাসরি কুরআন, রাসূলের সুন্নাহ এবং আলিমদের ঐকমত্যের পাশাপাশি কিয়াসের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এ ছাড়া সাহাবিদের বক্তব্য এবং উরফের (প্রচলিত প্রথা) মতো অন্যান্য উৎসও সামনে থাকত।

মুসআব ইবনু উমরানের জীবনীতে আন-নুবাহি লিখেছেন, 'মুসআব বিচারকার্য পরিচালনা করতেন ইমাম আওযায়ির বর্ণনা অনুসারে। তিনি নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। যে মতটাকে সঠিক বলে মনে করতেন, সে অনুসারেই রায় প্রদান করতেন। তিনি ছিলেন নামকরা ব্যক্তি।'[৮৬৫]

মুজতাহিদ বিচারক সম্পর্কে ইবনু ফারহুন সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'বিচার হবে আল্লাহর কিতাব অনুসারে। তাতে সমাধান খুঁজে না পেলে রাসূলের এমন সুন্নাহ দেখতে হবে, যার সাথে বাস্তব আমলের সম্পর্ক রয়েছে। এমন সুন্নাহ পাওয়া না গেলে সাহাবিদের ইজমা খুঁজতে হবে। ... এরপর দেখতে হবে তাবিয়িদের ইজমা এবং প্রত্যেক যুগের আলিমগণের ইজমা আছে কি না। ... উপস্থাপিত মোকদ্দমাতে কোনো ঐকমত্য না পাওয়া গেলে আলিমদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে মূলনীতি অনুযায়ী কিয়াস এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে বিচার করতে হবে।'[৮৬৬]

আমরা নিয়মও এভাবেই দেখেছি। প্রথমে কুরআন, তারপর সুন্নাহ, এরপর ইজমা এবং সবশেষে কিয়াস। ইবনু ফারহুন আরও বলেছেন, 'বিচারকের মাঝে যদি ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকে, তাহলে সে পরামর্শ মোতাবেক কাজ করবে এবং মাযহাব মেনে চলবে।'[৮৬৭]

রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ এবং সাহাবিদের বক্তব্য অনুসরণ করার ব্যাপারে আন্দালুস ও মরক্কোতে ব্যাপক ঝোঁক ছিল। তখন সবেমাত্র পূর্বাঞ্চল থেকে ফিকহি মাযহাবের প্রচলন শুরু হয়েছে। আন্দালুস ও মরক্কোতে হানাফি মাযহাব এসেছিল আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনু ফাররুখের হাত ধরে। বিচারক আসাদ ইবনু

[৮৬৫] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৪৭
[৮৬৬] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/৪৪
[৮৬৭] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/৪৫

ফুরাতের হাত ধরে তা আফ্রিকায় আসে। তিউনিসিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী হানাফি মাযহাব মেনে চললেও আন্দালুসের অধিবাসীরা আমল করত ইমাম আওযায়ির মাযহাব অনুসারে। মাযহাবটি আন্দালুসে এসেছিল আফ্রিকা এবং আন্দালুস বিজয়ী সৈনিকদের হাত ধরে। ফাতিমি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মিশর এবং উত্তর আফ্রিকায় যেমন শিয়াদের ফাতিমি মাযহাব প্রভাব বিস্তার করেছিল, ঠিক তেমন করে।[৮৬৮]

মরক্কো ও আন্দালুসের একটি দল মিশর এবং হিজাজে সফর করেছিল। হজ এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে। সে-সময় তারা ফিকহ, ইলম এবং হাদিসের জ্ঞান লাভ করে ইমাম মালিক ﷺ-এর কাছে। এরপর মালিকের ছাত্র এবং সহচরদের কাছে। এ জ্ঞান নিয়ে তারা আন্দালুস ও মরক্কোতে ফিরে এসে সে অনুযায়ী আমল শুরু করে। শুরু হয় মালিকি মাযহাব অনুসারে ফতোয়া প্রদান এবং বিচারকার্য পরিচালনার কাজ। একসময় মালিকি মাযহাব উত্তর আফ্রিকা এবং আন্দালুসের একমাত্র মাযহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে যাবতীয় আমল এবং বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে তা সরকারি মাযহাবে পরিণত হয়। ব্যাপারটি অবশ্য বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

❁ মালিকি মাযহাবের প্রসার

আফ্রিকা এবং আন্দালুসের আলিমরা পূর্বাঞ্চল এবং সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়া নূরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছিলেন। যাদের টার্গেট ছিল মিশর, হিজাজ এবং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে শরীয়তের জ্ঞান আহরণ করা। তাদের আকর্ষণ এতটাই প্রবল ছিল যে, কোনো ফকিহ বা আলিমের পূর্বাঞ্চলে সফর না করাটা দূষণীয় বলে মনে করা হতো।

আন্দালুসে সর্বপ্রথম মালিকি মাযহাব চালু করেছিলেন যিয়াদ ইবনু আবদির রহমান, যিনি বাস্তর নামে পরিচিত ছিলেন।[৮৬৯] এরপর ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আল-আন্দালুসি তরুণ বয়সে পূর্বাঞ্চল সফর করেন। ইমাম মালিক থেকে মুওয়াত্তার সনদ গ্রহণ করেন তিনি। মক্কা এবং মিশরের আলিমদের থেকেও ইলম গ্রহণ করে অবশেষে আন্দালুসে ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। ইমাম মালিক ﷺ-এর মাযহাব প্রচারে তার অবদানই সবচেয়ে বেশি। ইয়াহইয়া ছিলেন আন্দালুসে ইলমের পুরোধা। তিনি আমির হিশাম ইবনু আবদির রহমানের সময়কার মানুষ ছিলেন। আর হিশাম ইবনু আবদির রহমান ইমাম মালিককে অনেক সম্মান করতেন। ফলে মালিকি মাযহাব আরও বেশি প্রসার লাভ করে। ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আমির এবং সুলতানদের কাছে উঁচু মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠেন।

---

[৮৬৮] যুহরুল ইসলাম : ৩/২৯; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৪৮ এবং ৫৭

[৮৬৯] গ্রন্থকার এখানে 'বাস্তর' বললেও আমাদের খোঁজমতে 'শাবতুন' পাওয়া গেছে। সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৯/৩১২ — অনুবাদক

এরপর হাকাম আল-মুরতাযা ইবনু হিশাম আন্দালুসের ক্ষমতায় এসে 'আল-মানসূর' উপাধি গ্রহণ করেন। এটা ১৮০ হিজরির কথা। সে-সময় তিনি আন্দালুসের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ আলিমদের মধ্য থেকে একজনকে নিজের জন্য বিশিষ্ট করে নেন। সেই বিশিষ্টজনটি ছিলেন ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া। যাবতীয় বিষয়ে ইয়াহইয়ার সাথে পরামর্শ করতেন হিশাম। তার পরামর্শ ব্যতীত আন্দালুসের কোনো প্রান্তেই বিচারক নিয়োগ দিতেন না। প্রতিটি বিচারকই ছিল ইয়াহইয়ার বাছাইকৃত এবং তার তত্ত্বাবধানে নিয়োগকৃত। ফলে মালিকি মাযহাব প্রাধান্য দিয়েই বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো। সাধারণ মানুষ এবং বিচারব্যবস্থা ইমাম আওযায়ির অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও বিচারক নিয়োগ চলত মালিকি মাযহাব অনুসারে। কোনো বিচারক মালিকি মাযহাবের বিপরীত ফয়সালা করলেই ইয়াহইয়া তার বরখাস্তের জন্য আবেদন করতেন। এভাবে ইয়াহইয়ার পরামর্শে তৎকালীন আমির আবদুর রহমান আল-আওসাত ১১জন বিচারককে পদচ্যুত করেন।[৮৭০]

ইয়াহইয়ার পর আসেন মালিকি মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ আবদুল মালিক ইবনু হাবিব আল-কুরতুবি। ২০৮ হিজরিতে মিশর এবং মদীনা মুনাওয়ারায় সফর করে তিনি প্রভূত ইলম হাসিল করেন। এরপর ২১৬ হিজরিতে ফিরে আসেন আন্দালুসে। তৎকালীন আমির আবদুর রহমান ইবনুল হাকাম পরামর্শ এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কের জন্য তাকে মুফতিদের বোর্ডে নিয়োগ প্রদান করেন। ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়ার পরে তিনিই ছিলেন আন্দালুসে মালিকি মাযহাবের পুরোধা। মালিকি মাযহাবের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি *'আল-ওয়াদ্বিহাহ'* গ্রন্থ রচনা করেন। ক্রমেই আন্দালুসের অধিবাসীরা এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এভাবেই আন্দালুসে ছড়িয়ে পড়ে মালিকি মাযহাব।

অপরদিকে আফ্রিকার তিউনিসিয়াতে ছিলেন মালিকি মাযহাবের বিখ্যাত আলিম সাহনুন। তার পুরো নাম ছিল আবদুস সালাম ইবনু সাঈদ আত-তানুখি। তিনি মূলত সিরিয়ার হিমসের লোক। তার বাবা হিমসের সেনাবাহিনীর সাথে তাকে মরক্কোতে নিয়ে এসেছিলেন। সাহনুন মরক্কোতে পড়াশোনা করার পর ১৮৮ হিজরিতে সফর করেন পূর্বাঞ্চলে। মিশরে ইমাম মালিকের ছাত্র ইবনুল কাসিম, ওয়াহাব এবং আশহাবের কাছে তিনি ফিকহ শিক্ষা করেন। এরপর সরাসরি ইমাম মালিক থেকে ইলম গ্রহণের জন্য মদীনায় গমন করেন। কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছার আগেই মালিক ﵀-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এরপর ১৯১ হিজরিতে সাহনুন ফিরে আসেন আফ্রিকায়। আফ্রিকার তিউনিসিয়াতে তিনিই ছিলেন মালিকি মাযহাবের পুরোধা। আসাদ ইবনুল ফুরাতের পর তিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ

---

[৮৭০] নুফহুত তীব / যুহরুল ইসলাম : ৩/২৩; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৪৮; কুযাতুবাতু ফিল আসরিল ইসলামি, পৃ. ৩১৮; মাবাহিউল উসূলিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩০৩

এবং মালিকি মাযহাব প্রচার করেন। যার কারণে বিচারব্যবস্থা মালিকি মাযহাবের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বর্ণিত আছে, একবার সাহনুন জনৈক ব্যক্তিকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। লোকটি ইরাকি তথা হানাফিদের থেকে ইলম শিখেছিলেন বিধায় সাহনুন তাকে মদীনাবাসীদের মতাদর্শ তথা মালিকি মাযহাব অনুসারে বিচার পরিচালনার শর্তারোপ করেছিলেন। সাহনুন বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় ২৪০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সে-সময় তার বয়স ছিল ৭৪ বছর।[৮৭১]

সাহনুন এবং মালিকি মাযহাবের অন্যান্য আলিমরা মনে করতেন, মরক্কোতে মালিকি মাযহাব পরিপূর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ায় আফ্রিকাতে এখন ভিন্ন কোনো মাযহাবের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা মানুষকে মালিকি মাযহাবের ওপরই সীমাবদ্ধ করে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা পারেননি। ৪০৬ হিজরিতে তিউনিসিয়াতে প্রশাসক হয়েছিলেন মুইয ইবনু বাদিস আল-মানসুরি আস-সানহাজি। মিশর এবং মরক্কোর ফাতিমি মতাবলম্বী শাসকরাও তাকে স্বপদে বহাল রেখে 'শারাফুদ্দৌলা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তার শাসনামলে রাজ্যের সর্বত্র নিরাপত্তা বিরাজ করত। তিনি আলিমদের কাছাকাছি রাখতেন। এ ছাড়া অনেক মসজিদও তার হাত ধরে নির্মিত হয়েছিল। শিয়াদের ফাতিমি মাযহাব তখন প্রচলিত। তার বক্তব্য ছিল ফাতিমিদের উদ্দেশ্য করে। কিন্তু ৪৪০ হিজরিতে তিনি সেটা বদল করে আব্বাসিদের টার্গেট বানিয়ে দেন। আফ্রিকার মানুষকে তিনি মালিকি মাযহাব অনুসারে চলতে বাধ্য করেন। আগে সেখানে হানাফি মাযহাবের প্রচলন ছিল। কিন্তু তিনি মরক্কোর সকল অধিবাসীকে মালিকি মাযহাব অনুসরণ করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করেন। এভাবে মরক্কো থেকে হানাফি মাযহাব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু মালিকি মাযহাব মেনে চলা আবশ্যক হওয়ায় একসময় আন্দালুস এবং আফ্রিকার যাবতীয় মানুষ এর অনুসারী হয়ে পড়ে। তখন বিচারকার্য পরিচালনা এবং ফতোয়া প্রদানের জন্য সর্বত্র কেবল মালিকি মাযহাব অনুসারীকে নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়। আপামর জনসাধারণও এই নীতি অনুসরণ করতে থাকে। একপর্যায়ে মালিকি মাযহাব রাষ্ট্রীয় মাযহাব হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এখন পর্যন্ত সেখানে তা বহাল রয়েছে। অবশ্য আফ্রিকা যখন উসমানি সালতানাতভুক্ত ছিল, তখন কিছুকালের জন্য মালিকি মাযহাব অনুসারে আমল বন্ধ ছিল।[৮৭২]

এভাবে বিচারব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য মাযহাব হিসেবে মালিকি মাযহাবই আমলযোগ্য উৎস হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কোনো একটি নির্দিষ্ট মাযহাব

---

[৮৭১] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/৪৬; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৫ এবং ১৮৭; তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ২৮; মারজিউস উসূলিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪০৪

[৮৭২] আল-আ'লাম : ৮/১৮৬; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৪৯ এবং ১৮৮; যুহরুল ইসলাম, পৃ. ১২৯; আল-মু'জিব ফি তালখীসি আখবারিল মাগরিব, পৃ. ২৭৩

মেনে চলা জায়েজ হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ দিতে গিয়ে ইবনু ফারহুন লিখেছেন, 'কর্ডোভার প্রশাসকরা কাউকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিলে এই শর্ত লিখে দিতেন যে, ইমাম মালিকের সূত্রে ইবনুল কাসিমের বর্ণনা পরিত্যাগ করা চলবে না। তবে কোনো ব্যাপারে তাঁর বর্ণনা না পাওয়া গেলে সেটা ভিন্ন কথা।'[৮৭৩]

মালিকি মাযহাবকে বিচারব্যবস্থার উৎস হিসেবে অনুমোদন দেওয়ার জোরদার সমর্থন করে তিনি লিখেন, 'এটা ইজতিহাদের পরবর্তী যুগ এবং নির্দিষ্ট একটি মাযহাবকে অনুসরণের বিষয়টি এখন প্রচলিত। মালিকি মাযহাবের আলিমরা বলেছেন, মানুষ তাদের কাছে কোনো মোকদ্দমা নিয়ে এজন্যই আসে, যাতে তারা এই মাযহাব অনুসারে ফয়সালা করে দেন।'[৮৭৪]

তা ছাড়া আন্দালুস এবং উত্তর আফ্রিকার বিচারকরা কাযিউল জামাআহ-এর ইজতিহাদ এবং রায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। যাকে পূর্ববর্তী বিচারকার্যের মতো রেফারেন্স মনে করা হতো। বিচারকরা সামাজিক প্রচলন এবং নিয়ম-কানুনের মতো সেসব মেনে চলতেন।[৮৭৫]

ওপর্যুক্ত আলোচনার অর্থ এটা নয় যে, আন্দালুস এবং উত্তর আফ্রিকাতে অন্যান্য মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বরং পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত যাহিরি মাযহাবের সাথে এর শক্তিশালী বিরোধ চলতে থাকে। সে-সময় (৪৫৬ হিজরিতে) ইবনু হাযাম যাহিরি কঠিনভাবে মালিকি মাযহাবের বিরোধিতা শুরু করেন। একপর্যায়ে ৫৫০ হিজরির কাছাকাছি সময়ে আমির আবদুল মুমিন যাহিরি চিন্তাচেতনা গ্রহণ করে নেন। তিনি সমস্ত মানুষকে যাহিরি মতাদর্শের ওপর একত্র করতে চাইলে মালিকি মাযহাবের আলিম এবং ফকিহরা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তারা আমিরকে এই সংকল্প থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেন। এভাবেই চলতে থাকে ফিকহি মতবিরোধ। এরপর মুওয়াহহিদরা আন্দালুসে প্রবেশ করলে পুনরায় ইজতিহাদের ধারা চালু হয়। নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব অনুসারে আমল করতে তারা নিষেধ করে। অবশেষে বনু মারিন ক্ষমতায় আসলে তাদের এই প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায়। মালিকি মাযহাবের ফিকহি গ্রন্থগুলো তারা পুনরায় চালু করেন।[৮৭৬]

মরক্কোর আমির ইউসুফ ইবনু আবদিল মুমিনের সহিহুল বুখারি মুখস্থ ছিল। ফকিহদের মাঝে ব্যাপক মতানৈক্য এবং গোঁড়ামি দেখে তিনি সমস্ত মাযহাব বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে ফরমান জারি করেন। শুধু তা-ই নয়, মালিকি মাযহাবের সকল গ্রন্থ তিনি পুড়িয়ে ফেলার আদেশও দিয়েছিলেন। ফকিহদের জন্য বাধ্যতামূলক

[৮৭৩] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/৪৫
[৮৭৪] তাবসিরাতুল হুক্কাম : ১/৪৬
[৮৭৫] কুযাতুবাতু ফিল আসরিল ইসলামি, পৃ. ৩০৫
[৮৭৬] তারীখুল কাযা, পৃ ৫১; যুহরুল ইসলাম : ৩/৬৬; আল-মু'জিব, পৃ. ৩০৬

ছিল কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাহ অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করা। কোনো ব্যক্তি-বিশেষের অনুসরণও নিষেধ ছিল সে-সময়। বিচারকের রায় দিতে হতো কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস অনুযায়ী। তবে এ নির্দেশনা স্থায়ী হয়নি। আমির ইউসুফের মৃত্যুর পর লোকেরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।[৮৭৭]

মুনযির ইবনু সাঈদ (৩৫৫ হি.) -এর জীবনীতে আছে যে, দাউদ যাহিরির ফিকহের দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। দাউদের মতাদর্শিক গ্রন্থগুলো একত্রিত করা, তার বক্তব্য দিয়ে দলিল প্রদান করা ছিল তার অভ্যাস। তবে সেগুলো ছিল একান্তই ব্যক্তিগত। বিচারকার্য মালিকি মাযহাব অনুসারেই পরিচালিত হতো।[৮৭৮]

আবদুল মুমিনের নাতি ইয়াকুব দায়িত্ব গ্রহণের পর মানুষকে ইবনু হাযামের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চাইলে তৎকালীন ফকিহরা তার বিরোধিতা শুরু করেন। আবু ইয়াহইয়া ইবনুল মাওয়াক ছিলেন এসব ফকিহদের অন্যতম। তৎকালীন আলিমদের মাঝে হাদিস এবং ফিকহশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন তিনি। আমিরের ঘটনা শুনতে পেয়ে তিনি লাগাতার কয়েকদিন নিজের ঘরে অবস্থান করে ইবনু হাযামের বিপক্ষে উত্থাপিত মাসআলাগুলো সংকলন করেন। তিনি সবসময় আমিরের বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। এবার টানা কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকলে আমির এর কারণ জানতে চাইলেন। উত্তরে ইবনুল মাওয়াক বললেন, 'আমি তো আপনাদের কাজেই ছিলাম। শুনতে পেলাম, আপনারা মানুষকে ইবনু হাযামের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত করার চিন্তাভাবনা করছেন। অথচ তাতে এমন এমন বিষয় রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' এই বলে তিনি একটা নোটখাতা বের করলে আমির সেটা উলটেপালটে দেখলেন। তারপর বললেন, 'এমন বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মাদিকে অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি।' এরপর তিনি ইবনুল মাওয়াকের প্রশংসা করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।[৮৭৯]

মারাকিশি বর্ণনা করেছেন, মুরাবিতদের আমির আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইউসুফ কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়ে মালিকি মাযহাবের গ্রন্থগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ জারি করেছিলেন।[৮৮০]

আন্দালুস ও মরক্কোতে মালিকি মাযহাবের প্রচার-প্রসার এবং গ্রহণযোগ্যতার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনু খালদুন বলেন, 'মরক্কো এবং আন্দালুসের বাসিন্দারা ইমাম মালিকের মাযহাব বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদের মধ্যে মালিকি মাযহাব

---

[৮৭৭] তারীখুল কাদা, পৃ. ৮৫; যুহরুল ইসলাম : ৩/৬৬; আল-মু'জিব, পৃ ৩০৮-৩১১ এবং ৩১৬

[৮৭৮] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৭৪

[৮৭৯] তারীখুল কাদা, পৃ. ৫৬

[৮৮০] আল-মু'জিব ফী তালখীসি আখবারিল মাগরিব, পৃ. ৩৩৬ এবং ৩৫৪

পাওয়া গেলেও আন্দালুস এবং মরক্কোর লোকেরা খুব কম ক্ষেত্রেই মালিকি মাযহাব ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ করত। এর অন্যতম কারণ ছিল—এখানকার বাসিন্দারা প্রায়ই হিজাজে সফর করত। আর সে-সময় মদীনা ছিল ইলমের প্রাণকেন্দ্র। ইলম তো মদীনা থেকেই ইরাকে গিয়েছিল। আন্দালুস থেকে হিজাজ গমনের পথে ইরাক না পড়ায় তাদের দারসগ্রহণ কেবল মদীনার আলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। সে-সময় তাদের উসতায বলতে ছিলেন ইমাম মালিক, তাঁর শাইখগণ এবং তাঁর ছাত্রবৃন্দ। এজন্য মরক্কো ও আন্দালুস-সহ যাদের পথ মদীনার দিকে ছিল, তারা কেবল ইমাম মালিকের কাছেই যাতায়াত করত।

আরেকটি কারণ হলো, আন্দালুস ও মরক্কোর অধিবাসীদের মাঝে গ্রামীণ জীবনের বেশ প্রভাব ছিল। ইরাকের বাসিন্দাদের মতো শহুরে জীবনে তারা অভ্যস্ত ছিল না। ফলে হিজাজের প্রতিই তারা বেশি আকৃষ্ট হয়। এ কারণেই মালিকি মাযহাব তাদের কাছে প্রথম যুগের মতো সরল রয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সভ্যতার সংস্করণ এবং পরিমার্জনের কোনো ছোঁয়া তাতে লাগেনি। যেমনটা অপরাপর মাযহাবের ক্ষেত্রে হয়েছিল।'[৮৮১]

আন্দালুস ও মরক্কোর বাসিন্দাদের ওপর মালিকি মাযহাব প্রভাব বিস্তার করার আরও অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে একটি হলো মদীনার ক্বারি নাফে-এর ক্বিরাত অনুসরণ করা। নাফে ছিলেন প্রসিদ্ধ সাতজন ক্বারির অন্যতম। কথিত আছে, ইমাম মালিক বলেছিলেন, 'মদীনাবাসীদের ক্বিরাত হলো সুন্নতি পদ্ধতি।' তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সেটা কি নাফে-এর পঠনপদ্ধতি? মালিক ﷺ তখন হাঁ-বাচক উত্তর দিয়েছিলেন। মরক্কো ও আন্দালুসের লোকেরা কুরআনের হরকত এবং নোকতার ক্ষেত্রেও মদীনার রীতি অনুসরণ করত।[৮৮২]

আন্দালুসের লোকেরা আকীদার ব্যাপারেও ইমাম মালিকের অনুসরণ করত। যিম্মি তথা ইসলামি দেশে কর দিয়ে বসবাসরত কাফিরদের ব্যাপারেও আন্দালুসের ফকিহগণ মালিক ﷺ-এর সাথে সহমত পোষণ করতেন।[৮৮৩]

আন্দালুস ও মরক্কোতে মালিকি মাযহাব এককভাবে প্রভাব বিস্তারের কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেটা হলো আলিমদের ঐক্য, তাদের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব এবং বিচারের রায়ের ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত না থাকা। এর ফলে শাসক এবং জনগণের দৃষ্টিতে বিচারকদের অবস্থান, সম্মান ও মর্যাদা বেড়ে

---

[৮৮১] ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৪৪৯

[৮৮২] নাফের জীবনী এবং ইমাম মালিকের বক্তব্য জানতে দেখুন, গায়াতুন নিহায়া ফী তবাকাতিল কুররা : ২/৩৩০; মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৫২। আমির আবদুর রহমান আদ-দাখিলের সময় আবু মুহাম্মাদ আল-আন্দালুসি গাযি ইবনু কায়স (১৯৯ হি.) আন্দালুসে সর্বপ্রথম নাফের পঠনপদ্ধতি চালু করেছিলেন। গাযির জীবনী জানতে দেখুন, গায়াতুন নিহায়া : ২/২।

[৮৮৩] দিরাসাতুন ফী তারীখিল আন্দালুস ওয়া হাদ্বারাতিহা, পৃ. ১৬৩

গিয়েছিল।

আল-মাকদিসির সূত্রে শাইখ মাহমুদ আরনুস বর্ণনা করেছেন, 'স্পেনের লোকেরা কুরআন এবং ইমাম মালিকের *মুওয়াত্তা* ছাড়া কিছুই বুঝত না। হানাফি অথবা শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারীদের দেখলে স্পেন থেকে তাড়িয়ে দিত। মুতাযিলা, শিয়া বা অন্য কোনো মতাদর্শের ব্যক্তি যে সেখানে বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হতো—তা তো বলাই বাহুল্য। কেননা অধিকাংশ সময় তারা এমন ব্যক্তিদের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি তৈরি করত।'[৮৮৪]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀-এর শিষ্য বাকি ইবনু মাখলাদ পূর্বাঞ্চলে সফরের সময় বাগদাদের অনেক আলিমদের থেকে ইলম অর্জন করেছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব মেনে চলতেন না। আন্দালুসে তিনিও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।[৮৮৫]

❁ বিচার-সংক্রান্ত পরিধি

ইতিপূর্বে 'বিচারের সময়' নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা বিচারের সময়গত পরিধি নিয়ে আলোচনা করেছি। আর বিচারের স্থানগত পরিধি নির্দিষ্ট শহর, গ্রাম বা সরকারি নিয়োগপত্রে উল্লেখিত নির্ধারিত প্রদেশের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত। বাকি আছে কেবল পরিধির ধরন সংক্রান্ত আলোচনা। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আফ্রিকা এবং আন্দালুসেও এটার অনেক প্রশংসনীয় বিস্তৃতি ছিল। নৈপুণ্য, বিন্যাস এবং বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এই পরিধি অনেক সময় পূর্বাঞ্চলকেও ছাড়িয়ে যেত।

■ বিচারকার্যের বিন্যাস

বিচারকার্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে বিন্যস্ত করার মাধ্যমে পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিচারব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। বিচার সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল : (ক) সাধারণ বিচার বিভাগ, (খ) হিসবাহ বিভাগ এবং (গ) সামরিক বিচার বিভাগ।

আন্দালুসে এসব বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানকে বলা হতো 'খুত্তাহ'। কিংবা প্রতিটি বিভাগ তার পরিচালকের নামে পরিচিতি লাভ করত। সুতরাং খুত্তাতুল কাদা, খুত্তাতুল মাযালিম এবং খুত্তাতুল হিসবাহ বা খুত্তাতুস সুক বলার মতো সাহিবুল মাযালিম, সাহিবুল হিসবাহও বলা হতো। আন্দালুসে এই প্রধান খুত্তাহ তথা বিভাগ তিনটির সাথে আরও কিছু বিভাগ ছিল। যেমন : (ক) বিচারের রায় পুনঃনিরীক্ষণ বিভাগ, (খ) অভিজাত শ্রেণির বিচার বিভাগ, (গ) পুলিশ বিভাগ এবং (ঘ) খ্রিষ্টান

---

[৮৮৪] তারীখুল কাদা, পৃ. ৬১

[৮৮৫] বাকি ইবনু মাখলাদের জীবনী জানতে দেখুন, আল-মু'জিব ফী আখবারিল মাগরিব, পৃ. ৪৯ এবং বুগইয়াতুল মুলতামিস ফী তারীখি রিজালি আহলিল আন্দালুস, পৃ. ২২৯

এবং অনারবদের বিচার বিভাগ। এগুলোর আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

আমরা প্রথমে আলোচনা করব সাধারণ বিচার বিভাগ নিয়ে। রাজধানী বা প্রধান শহরে যার পরিচালনায় থাকতেন কাযিউল জামাআহ। তারপর পর্যায়ক্রমে বড় শহরের বিচারক, তারপর ছোট ছোট শহর এবং গ্রামের বিচারকের কথা আসবে। যাকে 'মুসাদ্দাদে খাস' তথা ছোটখাটো বিচারক বলা হতো। এ কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পুনঃনিরীক্ষণ, অভিজাত শ্রেণির বিচার এবং খ্রিষ্টান বা অনারবদের বিচার—এই বিভাগ তিনটি ছিল সাধারণ বিচার বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত।

▪ সাধারণ বিচার বিভাগের পরিধি

আন্দালুসের সাধারণ বিচার বিভাগের পরিধি হুবহু পূর্বাঞ্চলের মতোই ছিল। আন-নুবাহি বলেছেন, 'বিচারকের অতীত এবং বর্তমানের পরিধির সীমা একই রকম ছিল। এর মাঝে কোনো ধরনের ব্যত্যয় ঘটত না। বিচারক ছাড়া শাসকরাও এর মাঝে রদবদল করতেন না। আলি ইবনু ইয়াহইয়া তার গ্রন্থে বিচারকের কর্মপরিধি বর্ণনা করেছেন এভাবে :

☑ ১. বাদী-বিবাদীর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করা। সেটা পারস্পরিক বৈধ সমঝোতার মাধ্যমেও হতে পারে, আবার কোনো আয়াতের নির্দেশনা মানার জন্য তাদেরকে চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমেও হতে পারে।

☑ ২. অধিকারপ্রার্থীকে তার হক পূর্ণরূপে আদায় করে দেওয়া। স্বীকারোক্তি বা দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে অধিকার পৌঁছে দেওয়া।

☑ ৩. মানসিক বিকারগ্রস্ত ও বোকা লোকদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাদের অভিভাবক ঠিক করে দেওয়া। দেউলিয়া ব্যক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আরোপ করা।

☑ ৪. ওয়াকফকৃত সম্পত্তি এবং সেগুলোর মুতাওয়াল্লীদের খোঁজখবর রাখা।

☑ ৫. কোনো ব্যক্তি শরীয়ত অনুমোদিত শর্তসাপেক্ষে ওসিয়ত করে গেলে সেটা বাস্তবায়ন করা। নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামে ওসিয়ত করে গেলে সে সম্পত্তি তার হাতে অর্পণ করা। অনির্ধারিত ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত করে গেলে তার অধিকার সাব্যস্ত হবে কি না, সে ব্যাপারে ইজতিহাদ করা। এই সম্পত্তির কোনো ওয়ারিশ পাওয়া গেলে সে এগুলোর দেখাশোনা করবে। অন্যথায় এ দায়িত্ব ন্যস্ত হবে বিচারকের ওপর।

☑ ৬. অভিভাবক না থাকলে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর সাথে ইয়াতিমের বিবাহ দেওয়া। বিবাহের পরও তাদের খোঁজখবর রাখা।

☑ ৭. দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা। বিষয়টি আল্লাহর হক-সংক্রান্ত হলে স্বীকারোক্তি বা দলিলের মাধ্যমে বিচারক নিজেই সেটা প্রয়োগ করবেন। পক্ষান্তরে সেটা যদি বান্দার হক হয়, তাহলে অধিকারপ্রার্থীর দাবি অনুযায়ী সেটা প্রয়োগ করা হবে।

☑ ৮. জনস্বার্থ দেখভাল করা। রাস্তাঘাট-সহ সর্বত্র যাবতীয় অন্যায় প্রতিরোধ করা। ঘর থেকে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড দূর করা।

☑ ৯. সাক্ষীদের যাচাই-বাছাই করা। আমানতের মাল গ্রহীতাদের খোঁজখবর রাখা। এ কাজে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা।

☑ ১০. শক্তিশালী এবং দুর্বলের মাঝে বিচারের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা। অভিজাত এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণির মানুষের মাঝে ইনসাফ করা।

এরপর আন-নুবাহি লিখেন, 'অধিকাংশ আলিমের মতে, দণ্ডবিধি প্রয়োগ এবং যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করা বিচারকের দায়িত্ব। যেমন: মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, অন্যায় প্রতিহত করা এবং জনস্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখা। তবে সেনাবাহিনী প্রস্তুত এবং কর আদায় করার অধিকার আমির কিংবা খলিফার জন্য সংরক্ষিত।'[৮৮৬]

ইবনু খালদুন আল-মুকাদ্দিমাহ গ্রন্থের ৩১তম পরিচ্ছেদে দ্বীনের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। এগুলোর প্রথমটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তারপর হচ্ছে নামাজের ইমামতি। তিনি লিখেন, 'বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব হচ্ছে খিলাফতের অধীনে পরিচালিত দায়িত্বসমূহের একটি।'[৮৮৭] এরপর তিনি বিচারকের কর্মপরিধি বর্ণনা করেছেন। যেমনটা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। বাগদাদে আল-মাওয়ারদি আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ গ্রন্থে যেসব আলোচনা করেছেন, আবুল হাসান আন-নুবাহি এবং ইবনু খালদুনের বক্তব্য মনে হয় সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে।[৮৮৮]

▪ সাধারণ বিচার বিভাগের কর্মপরিধির বিন্যাস

সাধারণ বিচার বিভাগে যেসকল দায়িত্ব ও কর্মপরিধি রয়েছে, সেগুলো দু'ধরনের হতে পারে। হয়তো তাতে বিচারক পরিপূর্ণ কতৃত্বের অধিকারী হবেন। তার কর্মপরিধি হবে সার্বজনীন। নয়তো তাকে কোন অংশের দায়িত্ব দেওয়া হবে। অথবা বিচারকার্যের দায়িত্বের পাশাপাশি কিছু সংখ্যক নির্ধারিত পরিধির দায়িত্ব থাকবে।

সাধারণ বিচারক: তিনি হচ্ছেন শরয়ী কাযী। আমরা ইতিপূর্বে শরীয়তের

[৮৮৬] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৫-৬

[৮৮৭] ইবনু খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ২১৮-২২১

[৮৮৮] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ৭০

বিধিবিধান সংশ্লিষ্ট যেসব বিচারাচার নিয়ে আলোচনা করেছি সেসব ক্ষেত্রে বিচারকের সার্বজনীন পরিধি থাকবে। মূলত সাধারণ বিচারকের এই বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক শরয়ি বিচারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অধিকাংশ শরয়ি বিচারকের ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্য কার্যত প্রয়োগ হবে। বিশেষত কাযীউল জামাআহ, বড় বড় শহরের বিচারক এবং বাকি অন্যান্য বিচারকের মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

আর বিচারকের কর্মপরিধি যদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় বা নির্দিষ্ট কোনো অংশের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয় অথবা যদি নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে অন্য এক বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে অন্যান্য ব্যাপারে তাকে দেখাশোনা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয় তাহলে এই বৈশিষ্ট্য আর থাকবে না। এ কারণেই আন্দালুসে বিচারের এমন কিছু নির্ধারিত বা সীমিত কর্মপরিধির কথা জানা যায় যেগুলো উমাইয়া এবং আব্বাসী যুগে পূর্বাঞ্চলে ছিল না। কিন্তু সার্বজনীন কর্মপরিধিই মৌলিক আর কেন্দ্রীয় পরিধি হিসেবে থেকে যায়। অপরাপর পরিধি ছিল এর ব্যতিক্রম। সাধারণ বিচারক তথা শরয়ী কাযীর দায়িত্ব হলো, হদ (শাস্তিদণ্ড), কিসাস (বদলা), তাযির (শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয় এমন শাস্তি, যা নির্ধারণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের), পরিবারনীতি এবং সবধরনের লেনদেন এবং যাবতীয় অধিকারের ব্যাপারে ফয়সালা করা। যেগুলোর বিবরণ পূর্বে গিয়েছে।

উসতায আহমাদ আমিন বলেন, 'আন্দালুসের মুসলিমদের কাছে বিচার-সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিল সবচেয়ে বড় পদ। কারণ এটা ছিল দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত। বিচারকের ক্ষমতা ছিল সবচেয়ে বিস্তৃত। কেননা বিচারক নিজের বক্তব্য শোনানোর জন্য খলিফা অথবা প্রশাসককে উপস্থিত করতে পারতেন। সাধারণ বিচারকের ওপরে থাকত আরেকজন বড় বিচারক। যাকে "কাযিউল জামাআহ" তথা প্রধান বিচারপতি বলা হতো। শাসকের অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধিকার কেবল তিনিই সংরক্ষণ করতেন। মদ্যপান এবং ব্যভিচারের কারণে তিনি শাস্তি দিতেন।'[৮৮৯] আমরা এগুলো 'তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস' গ্রন্থ থেকে ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছি। আবুল হাসান আন-নুবাহি সেগুলো নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন।

গ্রাম্য সালিশের বিচারক: এটি ছিল বিচার-সংক্রান্ত একটি শাখা। বিচারের ব্যাপারে এই দপ্তরের পরিচালকের অভিজ্ঞতা থাকত একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। বড় বিচারকরা তাকে মফস্বল বা কোনো পাড়া-মহল্লায় সালিশ পরিচালনার দায়িত্ব দিতেন।

ছোটখাটো বিষয়ের বিচারক: বিচার বিভাগের সর্বনিম্ন পর্যায়ের কার্যাবলি পরিচালনা করতেন। ছোটখাটো কোনো গ্রাম তার আওতাধীন থাকত।

সামরিক বিচারক: স্বাভাবিকভাবে তার দায়িত্ব ছিল পূর্বে উল্লেখিত গণ্ডির ভেতর

[৮৮৯] যুহরুল ইসলাম : ৩/১৮

বিচারকার্য পরিচালনা করা। তবে বেশির ভাগ সময় সৈনিক এবং অফিসারদের মধ্যকার বিভিন্ন বিরোধ নিরসনের দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। আবদুর রহিম ইবনু ইসমাঈল মরক্কোর 'সালা' শহরে এই দায়িত্ব পরিচালনা করতেন। আরও ছিলেন আসাদ ইবনুল ফুরাত। যিনি একাধারে বিজ্ঞ ফকিহ, সেনাপতি এবং সামরিক বিচারক। ২১৩ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৮৯০]

নিকাহ বিচার বিভাগ: বিবাহ সংঘটিত হওয়া এবং বিবাহের সাথে শাখাগত বিভিন্ন বিষয় এর আওতাধীন ছিল। বিবাহ, তালাক ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত যে বিচারক বর্তমানকালে প্রচলিত আছে, সে যুগে তাকেই বিবাহের বিচারক বলা হতো। আন্দালুসে এ কাজের দায়িত্ব স্পেশাল জজের ওপর অর্পণ করা হতো। অনেক জজ এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যায়দুন আল-মাখযুমি ছিলেন তাদের অন্যতম। তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে *'আত-তাকমিলাহ'* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে আল-কাসিমি বর্ণনা করেন, 'যায়দুন আল-মাখযুমিকে প্রধান বিচারপতি আবুল কাসিম ইবনু হামদাইন নিকাহ-সংক্রান্ত দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু কায়সারের জীবনীতেও এমনটা এসেছে। মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মুরাদির জীবনীতে আছে, তিনি মারাকিশের অধিবাসী ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ সেখানে নিকাহ-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মুখাল্লাদ ইবনু ইয়াজিদের জীবনীতে আছে, তিনি নিজ শহরে দীর্ঘদিন বিয়েশাদি-সংক্রান্ত জজের দায়িত্ব পালন করেছেন।'[৮৯১] পূর্বাঞ্চলে সুনির্দিষ্টভাবে এই পরিধি কোনো জজের দায়িত্বে ছিল না। তবে ইয়াতিম বা অসহায়ের বিবাহের ব্যবস্থা করা ছিল সাধারণ বিচারকের পরিধির আওতাভুক্ত।

উত্তরাধিকার সম্পত্তির দায়িত্ব: এই বিভাগ শরীয়তের আইন অনুসারে উত্তরাধিকার সম্পত্তি (ইলমুল ফারায়েয) বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আনসারির জীবনী উদ্ধৃত করে আল-কাসিমি লিখেন—'তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আন্দালুসের ভ্যালেন্সিয়া শহরে উত্তরাধিকার সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় বিচারের দায়িত্ব পালন করেছেন।' আহমাদ ইবনু আবদিল আজিজ আল-আযদির জীবনীতে আছে, 'তাকে একাধিক বার আরবোলার বিচার-ফয়সালার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিচার উপদেষ্টার পাশাপাশি উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের অতিরিক্ত দায়িত্বও তিনি পালন করেন।' কারী তারিক ইবনু মূসা আল-মুআফিরির জীবনীতে আছে, 'তিনি হিসবাহ এবং মিরাস বণ্টনের দায়িত্ব একসাথে পালন করেছেন।'[৮৯২] এই বিভাগটি পূর্বাঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে চালু ছিল না। সেখানে এটি

[৮৯০] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৫৩-৫৪; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৫৯

[৮৯১] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬; আত-তাকমিলাহ : ১/৩৩৫ এবং ৪৩৮

[৮৯২] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৬৭ এবং ২৬৮; আত-তাকমিলাহ : ১/৬৮, ৭২, ২৪৪

সাধারণ বিচারকের আওতাধীন দপ্তর হিসেবে পরিচালিত হতো। এই দায়িত্ব এখন শারঈ বিচারকের সাথে সম্পৃক্ত। সাধারণত শারঈ বিচারব্যবস্থায় এই বিভাগের জন্য একজন স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। যার দায়িত্ব থাকে হিসবাহ ও ফারায়েয। যার কারণে তাকে 'আল-ফারযি'-ও বলা হয়।

❁ বিচারকদের অতিরিক্ত দায়িত্ব

আন্দালুসের বিচারকদের দায়িত্ব কেবল আইন-সংক্রান্ত দিকের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ছিল পূর্বাঞ্চলের বিচারকদের মতোই। বিচারের পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও তাদের পালন করতে হতো। তাদের মর্যাদা উঁচু হওয়ার কারণে শাসক এবং জনগণ—উভয়েই তাদের ওপর আস্থা রাখত। তাই গুরুতর, কঠিন ও জটিল বিষয়াদির দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হতে থাকে। কারণ তাদের একনিষ্ঠতার প্রতি সকলের আস্থা ছিল। তারা নিপুণভাবে নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতেন। তাদের রাষ্ট্রীয় আমানতদারিতার ব্যাপারে শাসক-প্রশাসক কিংবা সাধারণ মানুষ—কারোরই কোনো অভিযোগ ছিল না।

আন্দালুসে বিচারকরা অতিরিক্ত যেসব দায়িত্ব পালন করতেন, সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

■ বিচারপতি এবং ইমামতি

আন্দালুস ও মরক্কোর অধিকাংশ বিচারক দায়িত্বপ্রাপ্ত অঞ্চলে নামাজের ইমামতি করতেন। এ ক্ষেত্রে রাজধানী এবং কর্ডোভা জামে মসজিদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব ছিল খলিফা, প্রশাসক এবং আমির-উমারাদের নামাজে ইমামতি করা।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশির আল-মুআফিরির জীবনীতে ইবনুল হারিস আল-খুশানি লিখেন—'মুসআব ইবনু উমরান মৃত্যুবরণ করলে কর্ডোভার বিচারপতির দায়িত্ব কাকে দেওয়া যায়, এ নিয়ে আব্বাস ইবনু আবদুল মালিকের সাথে পরামর্শ করলেন হাকাম। আব্বাস তখন বললেন, মুসআব তো মুহাম্মাদ ইবনু বাশিরের কথা বলে গিয়েছিলেন। মুসআবের জীবনের শেষ দিকে মুহাম্মাদ ছিলেন তার সহযোগী। হাকাম তখন মুহাম্মাদ ইবনু বাশিরকে কর্ডোভায় আসতে বললেন। তিনি এলে, তাকে কাযিউল জামাআহ এবং নামাজের ইমাম নিযুক্ত করলেন।'[৮৯৩]

আবুল হাসান আন-নুবাহি বলেছেন, 'পরবর্তী ফকিহদের মধ্যে ইলম এবং দ্বীনের ব্যাপারে আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আইয়াশ আল-আনসারি ছিলেন অন্যতম। আমাদের মালাগা শহরের অন্যতম প্রধান শাইখ তিনি। বুদ্ধিমত্তা,

---

[৮৯৩] কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২৮-২৯, ঈষৎ পরিবর্তিত

জ্ঞানগরিমা, আভিজাত্য, আল্লাহভীতি এবং দুনিয়াবিমুখতায় তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তি। আমিরুল মুসলিমীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনু ইসমাঈল তাকে মালাগা শহরের প্রধান বিচারপতি এবং আলহামরা মসজিদের খুতবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ... তার সবচেয়ে বেশি মিল ছিল মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি যিয়াদের সাথে। উমাইয়া প্রশাসক আবদুল্লাহ মূসাকে কর্ডোভার বিচারক এবং নামাজের ইমাম বানিয়েছিলেন।'[৮৯৪]

বিচারপতি ও ইমামতির দায়িত্ব পালনকারী মুহাম্মাদ ইবনু হাসানের জীবনীতে আন-নুবাহি লিখেছেন, 'হিজরির সপ্তম শতকের একজন ছিলেন মুহাম্মাদ ... আল-আনসারি আল-মালাগি। ইলম, ইনসাফ, দ্বীনদারি এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের মাঝে তিনি ছিলেন অনন্য। মুহাম্মাদ সফর করেছেন পূর্বাঞ্চলে। সেখানকার শীর্ষস্থানীয় আলিমদের থেকে হাদিসের জ্ঞান আহরণ করেছেন। আন্দালুসে ফিরে আসার পর তাকে শহরের পশ্চিম দুর্গগুলোতে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারপর লোকদের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে মালাগার জামে মসজিদের ইমামতি এবং জুমুআর খুতবা প্রদানের দায়িত্বও অর্পণ করা হয় তার ওপর।'[৮৯৫]

▪ বিচারকার্য এবং মন্ত্রীত্ব

আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি যাকওয়ানকে আন্দালুসের প্রধান বিচারপতি বলা হতো। তার সম্পর্কে আবুল হাসান আন-নুবাহি বলেন, 'জ্ঞান-গরিমা, স্বচ্ছতা, ইনসাফ এবং দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন সেরা বিচারক। আমির আল-মানসুর ইবনু আবি আমিরের নেতৃত্বে পরিচালিত কোনো যুদ্ধ থেকেই তিনি পিছিয়ে থাকেননি। পরবর্তীকালে আমির আবদুর রহমান তাকে প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি মন্ত্রীত্বের দায়িত্বও অর্পণ করেন। বনু আমির সাম্রাজ্যের পতন হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি উভয় দায়িত্ব পালন করে গেছেন।[৮৯৬]

তদ্রূপ আবদুর রহমান ইবনু ফুতাইসও একাধারে নামাজের ইমামতি, দুর্নীতির বিচার এবং মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন।

▪ বিচার ও যাকাত তহবিলের দায়িত্ব

কাযি ইয়ায সূত্রে আন-নুবাহি বর্ণনা করেছেন, আহমাদ ইবনু বাকি ৩১৪ হিজরিতে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ

---

[৮৯৪] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ২০-২১

[৮৯৫] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ১১৫। আন-নুবাহি এমন অনেক বিচারকের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা বিচারকার্য পরিচালনার পাশাপাশি নামাজের ইমামতিও করতেন। তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস গ্রন্থের ৮৬ নং পৃষ্ঠায় আবদুর রহমান ইবনু ফুতাইসের কথা আছে। আবার তারতীবুল মাদারিক : ২/৪২৪-এও এমন বিচারকদের কথা আছে।

[৮৯৬] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৮৪, ৮৬ এবং ৮৭

এবং প্রাজ্ঞ বিচারক। তিনি একইসাথে যাকাতের তহবিল বণ্টন ও নামাজের ইমামতির দায়িত্বে ছিলেন। তারপর কাযিউল জামাআহর দায়িত্বও পালন করেন।[৮৯৭]

▪ বিচারক এবং উপদেষ্টা

বিচারালয়ে উপদেষ্টা পরিষদ কেবল আন্দালুসেই ছিল। হিজরি তৃতীয় শতকে কর্ডোভায় বিচারকদের পরামর্শের জন্য যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক বিচারপতিই এই পরিষদের সদস্য ছিলেন। বিচারকদের উপদেষ্টা পরিষদ শিরোনামে আমরা এটা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করব।

▪ সাধারণ বিচার এবং দুর্নীতির বিচার

এ বিভাগটি ছিল সাধারণ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বয়ে গঠিত। এটা ছিল সবচেয়ে জটিল এবং সর্বোচ্চ বিভাগ। আবুল মুতাররিফ আবদুর রহমান ইবনু ফাতিসের জীবনীতে আন-নুবাহি লিখেন, 'খলিফা আল-মানসুরের যুগে দুর্নীতি দমন কমিশনের বিচার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবি আমির। তার রায়ের কোনো নড়চড় হতো না। সিদ্ধান্তগুলো অবশ্যই বাস্তবায়িত হতো। জালিমদের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ছিল খুবই দুর্দান্ত। মতামত প্রদানের লক্ষ্যে তিনি মন্ত্রীদের বৈঠকে অংশগ্রহণ করতেন। মন্ত্রীত্ব এবং নামাজের ইমামতির পাশাপাশি তিনি কর্ডোভার বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। আন্দালুসে এমন বিচারক খুবই কম ছিলেন, যিনি একাধারে এতগুলো দায়িত্ব সামলেছেন।

▪ বিচারকার্য ও নেতৃত্ব

কোনো কোনো বিচারক সেনাপতির দায়িত্বও পালন করতেন। যেমনটা আসাদ ইবনুল ফুরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সামরিক বিচারক হওয়ার পাশাপাশি তিনি খোদ সেনাপতিও ছিলেন।

আমিরের কেউ রাজধানীর বাইরে গেলে রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয় পরিচালনার জন্য বিচারককে স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। এভাবে বিচারকদের অনেকেই খলিফা বা আমিরের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

অনেক বিচারপতি খলিফা, আমির এবং শাসকদের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। আর শাসকরা তাদের উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ ছাড়া কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না।

▪ সাধারণ বিচার এবং হিসবাহ

আফ্রিকার বিচারক আবদুস সালাম ইবনু সাঈদের ব্যাপারে আবুল হাসান আন-

[৮৯৭] তারীখু কুযাতিল আন্দালুস, পৃ. ৬৩ এবং ৬৫

নুবাহি লিখেন, 'বিচারকদের মাঝে তিনিই সর্বপ্রথম হিসবাহ বিভাগ পরিচালনা করেছেন। তিনি অন্যায় প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছেন। জামে মসজিদ থেকে বিদআতের আড্ডাগুলো সরিয়ে দিয়েছেন। প্রবৃত্তির অনুসারীদের মসজিদ থেকে বিতাড়িত করেছেন। আমানতের সম্পদ বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষের কাছে রাখার নীতি প্রচলন করেছেন। এর আগে আমানতের সম্পদ থাকত বিচারকদের জিম্মায়।'[৮৯৮]

▪ লেখালেখি এবং বিচারকার্য

আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইবনু রবির ব্যাপারে আন-নুবাহি লিখেছেন, 'বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পূর্বসূরিদের ন্যায়। সীমালঙ্ঘন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। একজন বিজ্ঞ লেখক হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন স্বভাবজাত কবি। বিভিন্ন গোত্রকে (জিহাদের জন্য) সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি সুলতানের পক্ষ থেকে এমন এক বই লিখেছিলেন, যা মনোবলকে শাণিত করে এবং ঘুমন্তকে বিবেককে করে জাগ্রত। তিনি আমৃত্যু এ পদে বহাল ছিলেন।'[৮৯৯]

▪ বিচারপতি এবং সীমান্তরক্ষী

মুনযির ইবনু সাঈদ সম্পর্কে যাফির আল-কাসিমি লিখেন, সরকারি কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি সীমান্তেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। ফিরিঙ্গি দেশগুলো থেকে মরক্কোতে যাতায়াতকারীরা তার নজরদারিতে থাকত। এটা ৩৩০ হিজরির কথা। সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমানে যাকে 'বর্ডার গার্ড সিস্টেম' বলা হয়। আর সরকারি কর্মকর্তাদের মনিটর করার জন্য বর্তমানে তদন্ত কমিশন চালু রয়েছে। ফিরিঙ্গি দেশগুলো থেকে যাতায়াতকারীদের নজরদারিতে রাখার অর্থ হলো, আগন্তুকদের পরিচয় জেনে রাখা এবং তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা।

৩৫৫ হিজরি অবধি এসকল দায়িত্ব পালন করে মুনযির ইবনু সাঈদ ইন্তেকাল করেন।

❁ মোকদ্দমার পদ্ধতি

মামলা-মোকদ্দমার কিছু পদ্ধতি পর্যালোচনা করে আমরা এই আলোচনার ইতি টানব। এসব পদ্ধতির কিছু ছিল প্রশাসনিক, কিছু সিস্টেমেটিক। এজন্য এই আলোচনাগুলো প্রশাসনিক এবং গঠনমূলক ব্যবস্থাপনার পরে করা হয়েছে। এসব পদ্ধতির কোনো কোনোটা সে-সময় পূর্বাঞ্চলেও জারি ছিল। আর কিছু পদ্ধতি ছিল

[৮৯৮] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ২৯; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩০২
[৮৯৯] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ১২৫; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩০২

একেবারে অত্যাধুনিক, যা মূলত আন্দালুসের একক আবিষ্কার।

■ ডেটা সংরক্ষণ

এজলাসের বিবরণ এবং বিচারকের কাছে উত্থাপিত আলোচনা-পর্যালোচনাগুলোর আদ্যোপান্ত নথিভুক্ত রাখার প্রচলন ছিল। এমনটা তখন পূর্বাঞ্চলেও ছিল না। সেখানে বিচারের ডেটা নথিভুক্ত করার বিষয়টি পর্যায়ক্রমে যুক্ত করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে আন্দালুসে লেখালেখির ব্যাপক প্রচলন ছিল। সর্বত্রই তখন জ্ঞানের ছড়াছড়ি। সেখানকার উজ্জ্বল সভ্যতার মাঝে লিপিবদ্ধ ছিল বাহ্যিক জীবন-পদ্ধতির রূপরেখা।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশির আল-মুআফিরির জীবনীতে আন-নুবাহি লিখেন, মুহাম্মাদ ইবনু বাশিরই সর্বপ্রথম আমির হাকামের বিচার করে তার সমস্ত বিবরণ লিখে রেখেছিলেন। মোকদ্দমাটি ছিল জাঁতাকল-সংক্রান্ত। বাদীর কাছে থাকা দলিল-প্রমাণ মুহাম্মাদ ইবনু বাশির আমলে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে আমিরের কাছে দলিল না থাকায় তিনি বাদীর যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করতে পারেননি। বিচারপতি মুহাম্মাদ এই মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে এ ব্যাপারে সাক্ষী রেখে দেন। এরপর সময় পেরিয়ে গেলে জাঁতাকলটি আইনমাফিক বিক্রি করেন। এ ঘটনার পর থেকে হাকাম বলতেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু বাশিরের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সঠিকভাবে আমাদের বিচার করেছেন। আমাদের হাতে থাকা সন্দেহজনক বস্তুকে তিনি সংশোধন করে দিয়েছেন।'

■ রায়ের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা

এটা ছিল আন্দালুসে প্রচলিত একটি বিশেষ নীতি। পূর্বাঞ্চলে এটি ততটা পরিচিতি লাভ করেনি। পদ্ধতিটি ছিল এমন—বিচারক শহর, অঞ্চল বা জনপদ থেকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিদের নির্বাচন করতেন। যাতে বিভিন্ন ঘটনা এবং ব্যক্তির ব্যাপারে তারা সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এদেরকে 'আল-উদুল' তথা নির্ভরযোগ্য সাক্ষী বলা হতো। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে নামটা গ্রহণ করা হয়েছিল :

وَّاَشْهِدُوْا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

> তোমরা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষী রাখো।[১০০]

আস-সিলাহ গ্রন্থ থেকে যাফির আল-কাসিমি এমন কয়েকজন সাক্ষীর কথা আলোচনা করেছেন। সুলাইমান ইবনু ইয়াহইয়ার ব্যাপারে এসেছে, 'তিনি ছিলেন কর্ডোভার নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের অন্যতম।' আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহর

[১০০] সূরা তলাক, ৬৫ : ২

জীবনীতে আছে, 'তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ, জ্ঞানী এবং চরিত্রবান। সর্বদা শ্রেষ্ঠত্ব ও সততায় তিনি ছিলেন অনন্য। সাক্ষ্যদানে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তার নির্ভরযোগ্যতার কথা লোকমুখে প্রচলিত ছিল। তিনি মসজিদে মসজিদে মানুষকে নসিহত করতেন। জনসাধারণ তাকে সমীহ করত। কর্ডোভার জামে মসজিদে তিনি ইমামতির দায়িত্বও পালন করেছেন।'

বিচারকরা নিজে থেকেই আস্থাভাজন সাক্ষীদের নির্বাচন করতেন। বিচারপতি, ফকিহ এবং মুফতিরা অনেক সময় শাস্তিস্বরূপ কারও কারও সাক্ষ্য রহিত করে দিতেন। এ ব্যাপারে সম্মিলিত ফতোয়া প্রদান করতেন অনেক সময়। আমিরের রীতি ছিল—বিচারকের চুক্তিনামা এবং নিয়োগপত্র তিনি লিখিত আকারে প্রদান করতেন। পাশাপাশি সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।[৯০১]

▪ বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষদের কাছে আমানতের মাল

বিচারকদের কাছে অনেক আমানতের মাল গচ্ছিত থাকত। অনেক সময় দেখা যেত, কিছু কিছু সম্পদের মালিক পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কিছু সম্পদের মালিক পাওয়া গেলেও নাবালক বা বেআইনি ব্যক্তি হওয়ার কারণে তাদের কাছে সোপর্দ করা যেত না। উপযুক্ত ওয়ারিশের জন্য এসব সম্পদ সংরক্ষণ করে রাখা শরীয়তের স্পষ্ট দাবি। নষ্ট হওয়ার ভয় থাকলে এগুলো বিনিয়োগ করার অনুমতিও শরীয়ত দিয়েছে। আন্দালুস, মরক্কো এবং পূর্বাঞ্চলের বিচারকরা এসব সম্পদ নিজেদের কাছে কিংবা বিচার বিভাগে সংরক্ষণ করে রাখতেন। ইতিপূর্বে তার আলোচনা গত হয়েছে।

আমানতের সম্পদ পরিমাণে অনেক বেশি হয়ে গেলে তা সংরক্ষণ কিংবা বিনিয়োগ করাটা বিচারকদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় এ সম্পদের কারণে বিচারক তার মূল দায়িত্ব পালন করতে হিমশিম খেতেন। তাই আন্দালুস, মরক্কো এবং মিশরের বিচারকরা নির্ভরযোগ্য, আস্থাবান এবং বিশ্বস্ত কয়েকজন কোষাধ্যক্ষের কাছে আমানতের সম্পদ গচ্ছিত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আফ্রিকার বিচারক আবদুস সালাম ইবনু সাঈদ সাহনুন সর্বপ্রথম আমানতের সম্পদ বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষদের কাছে গচ্ছিত রাখেন। পরবর্তী বিচারকরাও তার পন্থা অবলম্বন করেন। আন-নুবাহি তার জীবনীতে লিখেছেন, 'বিচারকদের মাঝে তিনিই সর্বপ্রথম হিসবাহ বিভাগ পরিচালনা করেছেন। তিনি অন্যায় প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছেন। জামে মসজিদ থেকে বিদআতের আখড়াগুলো সরিয়ে দিয়েছেন।

---

[৯০১] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩৬১। মুনযির ইবনু সাঈদকে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী গ্রহণের বিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়ার ঘটনা জানতে তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৭৩-৭৪ দেখুন।

প্রবৃত্তির অনুসারীদের মসজিদ থেকে বিতাড়িত করেছেন। আমানতের সম্পদ বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষের কাছে রাখার নীতি প্রচলন করেছেন। এর আগে আমানতের সম্পদ থাকত বিচারকদের জিম্মায়।'[১০২] ঈসা ইবনু মিসকিন বলেছেন, 'তাই মানুষ তার নেতৃত্বে শরীয়তের সঠিক পথের দিশা পেয়েছিল। তার মতো দায়িত্ব আফ্রিকায় আর কেউ পালন করেননি।'[১০৩]

▪ সাক্ষী এবং শপথের মাধ্যমে বিচার

সাক্ষ্য এবং শপথ হচ্ছে প্রমাণ সাব্যস্তকরণের অন্যতম মাধ্যম। এটা ইমাম মালিক এবং তাঁর মাযহাবের অনুসারী আলিমদের অভিমত। শাফিয়ি এবং হাম্বলি মাযহাবের অনুসারীরাও এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে হানাফি আলিমগণ একজন সাক্ষী এবং শপথের মাধ্যমে বিচার করার মতটি গ্রহণ করেননি। আন্দালুসের বিচারকরা এই ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের বক্তব্য গ্রহণ করেননি। তারা একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং বিচারপ্রার্থীর শপথের মাধ্যমে ফয়সালা করার অনুমোদন দেননি।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশির আল-মুআফিরির জীবনীতে আবুল হাসান আন-নুবাহি উল্লেখ করেছেন, 'ওয়াকফের সম্পত্তি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে লিখিত বিষয়ে সাক্ষ্যের অনুমোদন তিনি দিতেন না। সাক্ষীর সাথে বিচারপ্রার্থীর শপথের মাধ্যমে বিচার করা তার কাছে অনুমোদিত ছিল না।' এরপর আন-নুবাহি আরও লিখেন, 'একজন সাক্ষী এবং শপথের মাধ্যমে বিচার করাকে ইবনু বাশির সেই চারটি মাসআলার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আন্দালুসের বাসিন্দারা যেগুলোর ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের অনুসরণ থেকে বিরত ছিল। মাসআলাগুলো হচ্ছে:

- ☑ (ক) মিশ্র সম্পদ তথা যৌথ সম্পদের ব্যাপারে তারা ফয়সালা করতেন না।
- ☑ (খ) কেবল একজন সাক্ষী এবং বিচারপ্রার্থীর শপথের মাধ্যমেই বিচার করতেন না।
- ☑ (গ) ইমাম লাইস ইবনু সাদের মত অনুসারে তারা উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়ার অনুমোদন দিতেন।
- ☑ (ঘ) ইমাম আওযায়ির মাযহাব অনুসারে তারা মসজিদে গাছ রোপণের বৈধতা দিতেন।[১০৪]

---

[১০২] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ২৯; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩০২

[১০৩] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ২৯

[১০৪] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৪৯-৫১

❁ বিচার বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা

আন্দালুসে এমন কিছু বিশেষ রাজনৈতিক সময় গিয়েছিল, যখন বিচার বিভাগ কর্মহীন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। তেমনই একটি সময় ছিল বিচারক ইয়াহইয়া ইবনু মা'নের ইন্তেকালের পর। তখন প্রায় ছয় মাসের মতো মানুষের মাঝে কোনো বিচারক ছিল না। এতে মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। আমির আবদুর রহমান তখন বিশেষভাবে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়াকে নিয়োগ দিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ইয়াহইয়া অসম্মতি জানালে আবদুর রহমান তাকে অন্য কারও নাম প্রস্তাব করতে বাধ্য করেন। ইয়াহইয়া তখন ইবরাহীম ইবনু আব্বাসের নাম প্রস্তাব করেন। ইবরাহীমকে দায়িত্ব দিয়ে তখন ইয়াহইয়া থেকে হাত গুটিয়ে নেন আমির।[৯০৫]

এমনই আরেকটা শাসক সুলাইমান ইবনুল হাকামের শাসনামলে। তার শাসনামলের দীর্ঘ সময় কর্ডোভার বিচার বিভাগ নিষ্ক্রিয় করে রাখা ছিল। সুলাইমানের দাবি ছিল, বিচারকার্য পরিচালনার উপযুক্ত কাউকে তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে প্রশাসক আহমাদ ইবনু যাকওয়ান তার কথা মানতে নারাজ ছিলেন। ফলে সুলাইমান বিচার বিভাগের নামটাই তিন বছর তিন মাস যাবৎ নিষ্ক্রিয় করে রাখেন।

৪০৪ হিজরির মুহাররম মাসে সুলাইমান মারা যাওয়ার পর আলি ইবনু হামুদ আল-ফাতিমি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বিচার বিভাগ পুনরায় চালু করেন। দায়িত্ব প্রদান করেন ফকিহ আবদুর রহমান ইবনু বিশরকে। যিনি আলির উপদেষ্টাও ছিলেন। তিনি ছিলেন আন্দালুসের খলিফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত সর্বশেষ বিচারক। এটা ৪০৭ হিজরির কথা। আলি ইবনু হামুদ তখন আন্দালুসে মারওয়ান বংশের শাসক সুলাইমান ইবনু হাকামের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজধানী কর্ডোভা দখল করে নিয়েছিলেন।[৯০৬]

❁ বিচার বিভাগের উপদেষ্টা পরিষদ

শূরা পদ্ধতি হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর স্বীকৃত একটি ব্যবস্থাপনা। উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং সমস্যার সমাধানে শূরা ছিল একটি সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা। শূরার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ফকিহ, আলিম এবং মুফতিদের সাথে সমন্বয় করে বিচারকার্য পরিচালনা করা। আমাদের আলিমগণ তো ফকিহদেরকেই বিচারকের একমাত্র সহযোগী বলে অভিহিত করেছেন। ফকিহদের সাথে পরামর্শ করা, বিচারপতির সাথে বা পাশে তাদের বসতে দেওয়া, অথবা ফকিহদের সাথে পরামর্শের জন্য মামলা এবং বিচারের রায় পিছিয়ে দেওয়া আলিমরা আবশ্যক বলেছেন। পূর্বাঞ্চলে বিচারকদের

---

[৯০৫] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ১৪-১৫

[৯০৬] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৮৯

মধ্যে শূরার প্রচলন ছিল। তবে আন্দালুসে এটি ছিল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের, প্রশাসনিক ও আবশ্যকীয় ব্যবস্থাপনা। আমির এবং খলিফাদের শূরা বা উপদেষ্টা পরিষদ সাধারণ বিষয় হলেও বিচারকদের জন্য সেটা ছিল একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনা।[৯০৭]

আলি ইবনু ইউসুফ ইবনি তাশফিন বিচারক নিয়োগ দেওয়ার সময় বলে দিতেন—চারজন ফকিহের উপস্থিতি ছাড়া কোনো বিষয়ে যেন চূড়ান্ত ফয়সালা না দেওয়া হয়। আর নির্দেশনা অনুযায়ী বাদী-বিবাদীর বক্তব্য শোনার পর পরামর্শের জন্য বিচারক তার সহযোগী এবং উপদেষ্টাদের নিয়ে বসতেন।[৯০৮]

শাইখ মাহমুদ আরনুস বলেন, 'আন্দালুসে উমাইয়া সালতানাত শূরার ফয়সালা অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করা আবশ্যক করে দিয়েছিল। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে কর্ডোভায় শীর্ষস্থানীয় আলিমদের সদস্য করে শূরা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত রায়ের জন্য বিচারকরা শূরা সদস্যদের দ্বারস্থ হতেন। এই সদস্যরা কিছু কিছু মাসআলায় ইমাম মালিকের সাথে দ্বিমত পোষণ করে ইবনুল কাসিমের মত গ্রহণ করেছেন। অবশ্য শূরা বোর্ডের কার্যক্রমের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেনি। প্রখ্যাত ইতিহাস গবেষক উসতায রফিক বেক আযাম এমনটাই বলেছেন।'[৯০৯]

উসতায আহমাদ আমিন আন্দালুসে বিচারের উপদেষ্টা পরিষদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছেন। এ সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা উল্লেখ করার পাশাপাশি বিচারকদের ইতিহাস, ঘটনাবলি, উপদেষ্টা পরিষদ, ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা এবং বিভিন্ন উপাধির কথাও তুলে এনেছেন।[৯১০]

ওপর্যুক্ত বক্তব্য খণ্ডন করে উসতায যাফির আল-কাসিমি বলেন, 'আহমাদ আমিন তো এক আজগুবি শূরা বোর্ডের কথা বলেছেন। তার কল্পনা ছাড়া অন্য কোথাও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য তৎকালীন সময়ে বিচার বিভাগে কিছু গতানুগতিক উপদেষ্টা থাকত। আর পূর্ব-পশ্চিমের সব জায়গাতেই তা পরিচিত ছিল।'[৯১১]

আমার মনে হয়, ওপর্যুক্ত মতবিরোধটি নিতান্তই কাঠামোগত এবং পারিভাষিক। আন্দালুসের মাজলিসে শূরার সরকারি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব কি আধুনিক যুগের মতো ছিল কি না, মতবিরোধ মূলত এটা নিয়ে। বাস্তবতা হলো, আন্দালুসের বিচার বিভাগ নিয়ে গবেষণা করলে এটা দৃশ্যমান হয় যে—শূরা বোর্ড,

---

[৯০৭] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩২৭

[৯০৮] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৩৭; আল-মু'জিব ফী তালখীসি আখবারিল মাগরিব, পৃ. ২৩৫

[৯০৯] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৩১

[৯১০] যুহরুল ইসলাম : ৩/২৩, ৩/৪৯, ৩/৫০, ৩/৬৭

[৯১১] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩৪০

পরামর্শ বিভাগ, মন্ত্রণালয়, মাজলিসে শূরা, শূরার আমির, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রবীণ শূরা সদস্যদের অনেক বিষয় নিয়ে ইতিহাসে বারবার আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়, আন্দালুসে শূরা বোর্ডের অনেক গুরুত্ব ছিল। আর এটা ছিল পূর্বাঞ্চলের বিচার বিভাগ থেকেও অগ্রগামী। কিন্তু এই মাজলিসে শূরা আধুনিক যুগের সুশৃঙ্খল উপদেষ্টা পরিষদের মতো ছিল না।

ড. হামদি আবদুল মুনইম মুহাম্মাদ হুসাইন উপদেষ্টা পরিষদের নাম 'খুত্তাতুশ শূরা' বলেছেন। এই নামটি আন্দালুসেই প্রবর্তিত হয়। ফকিহদের মধ্য থেকেও শূরা থাকতেন একজন। বিচারকের কাছে উত্থাপিত মামলাগুলোর চূড়ান্ত রায়ের ক্ষেত্রে তিনি উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করতেন।[৯১২]

মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াবকারের জীবনীতে আবুল হাসান আন-নুবাহি লিখেন, 'তিনি ছিলেন আন্দালুসের শীর্ষস্থানীয় ফকিহ। ইলম এবং তাকওয়ার জন্য তাকে ইবনুল কাসিম নামে ডাকা হতো। বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি শূরা সদস্যদের ডেকে পাঠান। তাকে অভিবাদন জানানোর জন্য সবাই উপস্থিত হয়। তখন তিনি দাসকে আদেশ করলে একটি স্বর্ণমুদ্রার বাক্স খোলা হয়। এরপর সকলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার খারাপ পরিণাম কী, সেটা তো আপনারা জানেন-ই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, মানুষ আমার কোনো গোপন বিষয় নিয়ে সন্দেহ করবে। দেখুন, এই হচ্ছে আমার অর্জিত সম্পদ। এগুলোতে স্বর্ণ-রুপা ও মূল্যবান সম্পদ রয়েছে। আর আমার ব্যবসায়িক সম্পদ সম্পর্কে তো আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং এই পরিমাণ সম্পদ আমার থেকে প্রকাশ পেলে তো কোনো সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে আমি তিরস্কৃতও হব না। কিন্তু এর চেয়ে বেশি হয়ে গেলে আমাকে শাস্তি পেতে হবে। হারামের সংমিশ্রণ থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।" উপস্থিত সকলেই তখন তার জন্য দুআ করেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াবকার ছিলেন আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং ইলমের অধিকারী। মুজতাহিদ এবং আল্লাহভীরু। তিনি বেশি বেশি নামাজ আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এমনকি প্রতি রাতে এক খতম কুরআন পড়তেন বলেও জানা যায়।'[৯১৩]

ইয়াহইয়া ইবনু ওয়াফিদ আল-লাখমি সম্পর্কে আন-নুবাহি লিখেন, 'হিজরি ৪০১ সালে তিনি বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্বাধীন। আমেরিদের যুগে তিনি মজলিসে শূরার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি আয-যাহরা মসজিদে কিছুকাল ইমামতিও করেন। বিচার বিভাগ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিলেন।'[৯১৪]

---

[৯১২] তারীখুল মাগরিবি ওয়াল আন্দালুসি ফী আহ্‌দিল মুরাবিতিন, পৃ. ২৯১

[৯১৩] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৭৭; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩৩২

[৯১৪] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৮৮

আবুল আসবাগ ঈসা ইবনু সাহলও ছিলেন গ্রানাডার বিচারপতি। তিনি ছিলেন প্রথম সারির আলিম ও ফকিহ। বিচারকার্যের অনেক রায় ছিল তার মুখস্থ। অনেক মাসআলা-মাসায়েল জানতেন তিনি। নিত্যনতুন ঘটনাপ্রবাহের সমাধানে ছিলেন পারদর্শী। বিচারকার্য পরিচালনায় ছিলেন দূরদর্শী। এ সম্পর্কিত অনেক উপকারী কিতাব তিনি রচনা করেছেন, বিচারকরা যার ওপর এখনো নির্ভরশীল। টলেডোর বিচারক আবু যায়দ আল-হাশশা এবং কর্ডোভার বিচারক আবু বকর ইবনু মানযুরের পক্ষ থেকে পত্র লেখার কাজও তিনি করেছিলেন। এরপর কর্ডোভার শূরার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে মিশরের 'আল-উদওয়া' শহরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তাকে গ্রানাডার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৪৮৬ হিজরিতে বিচারের দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পর ইন্তেকাল করেন তিনি।[৯১৫]

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ ছিলেন কর্ডোভার কাযিউল জামাআহ। তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় আলিম এবং ফকিহ। হাদিসবিশারদ, শূরা পরিষদের প্রধান এবং বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক হিসেবেও খ্যাতি ছিল তার। ফতোয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। বিচক্ষণতা এবং দ্বীনদারিতার কারণে তার ফতোয়া ছিল সকলের কাছে সমাদৃত। মানুষ তার প্রতি আস্থা রাখত।[৯১৬]

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনুল আরাবি আল-মুআফিরির ব্যাপারে আবুল হাসান আন-নুবাহি বলেন, '৪৮৫ হিজরিতে তিনি পূর্বাঞ্চল ও শামে সফর করেন। ৪৮৯ হিজরিতে হজের মৌসুমে যান হিজাজে। পরপর দুবার তিনি বাগদাদে গমন করেন। মিশরে এবং ইস্কান্দারিয়াতে একটি দলের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। ৪৯৩ হিজরিতে আন্দালুসে ফিরে আসার পর তার বাবার মৃত্যু হয়। তারপর নিজ শহর ইশবিলিয়াতেই তিনি বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি শূরার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হাদিস এবং ফিকহ নিয়ে পড়াশোনা করার পর কিছু সময় বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। অত্যন্ত সুচারুভাবে বিচার পরিচালনা করতেন তিনি। সত্য বলতে কখনো দ্বিধা করতেন না। জালিমের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। আর ইয়াতিম ও অসহায়দের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কোমলপ্রাণ। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। এজন্য তার বিভিন্ন গ্রন্থ এবং সম্পদের ওপর হামলা করা হয়েছিল। তাকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি চরম ধৈর্যের পরিচয় দেন। এরপর তাকে বিচারপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলে তিনি ইলমের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ

---

[৯১৫] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৯৬-৯৭

[৯১৬] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ১০২

করেন।[৯১৭]

অনেক ফকিহ সরাসরি বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালেও শূরার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। যেমন হাতিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান আত-তামিমি। ইবনুত তরাবলুসি নামে তিনি অধিক সমাদৃত। আরেকজন ছিলেন ঈসা ইবনু মুহাম্মাদ। তিনি পরপর দুবার বিচারকের পদ গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াবকা তাকে উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অনেক মানুষকে উপকৃত করেছেন। কর্ডোভার জামে মসজিদে তিনি ফতোয়া প্রদান করতেন।

এই তালিকায় আরও ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আত্তাব। তিনি ছিলেন শূরার প্রবীণ সদস্য। সে যুগে ফতোয়ার ভিত্তি তার ওপরই ছিল। কর্ডোভার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাকে বেশ কয়েকবার ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। এমনই আরেকজন ছিলেন আহমাদ ইবনু তাহির আল-আনসারি। তিনি ছিলেন দানিয়া শহরের উপদেষ্টা। সেখানেই ফতোয়া প্রদান করতেন। তাকে বিচারকের পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনিও নাকচ করে দেন।[৯১৮]

কখনো দেখা যেত, বিচারক নিজেই উপদেষ্টা পরিষদে কাউকে নিয়োগ দিতেন। ৩৯৫ হিজরিতে বিচারক আবদুর রহমান ইবনু ফুতাইস উমাইয়া বংশের মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম এবং আবু বকর আত-তুজিবিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।[৯১৯] কখনো কখনো এক শহরের বিচারক অন্য শহরের উপদেষ্টা হিসেবে থাকতেন। যেমন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ আন্দালুসের ফারিশ শহরে বিচারকার্য পরিচালনার পাশাপাশি কর্ডোভার উপদেষ্টাও ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আত-তামিমি প্রথমে বিজানাতে, পরে ইশবিলিয়াতে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন কর্ডোভার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য।[৯২০]

উসতায আল-কাসিমির মতে আন্দালুসে অনেক সময় শূরা এবং ফতোয়া একই অর্থে ব্যবহৃত হতো। তবে আমার কাছে মনে হয়, এ দুটি পদ ভিন্ন ভিন্ন ছিল।[৯২১]

আলিমরা অনেক সময় শূরার দায়িত্ব গ্রহণেও অপারগতা প্রকাশ করতেন। এ থেকে বুঝে আসে, শূরা ছিল একটি বিশেষ পদ এবং প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপনা। একটি নির্ধারিত পরিষদ এবং স্বতন্ত্র একটি দায়িত্ব ছিল এই শূরা সিস্টেম।

---

[৯১৭] তারীখু কুযাতিল আন্দালুস, পৃ. ১০৫-১০৭, ঈষৎ পরিবর্তিত
[৯১৮] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩৩৩
[৯১৯] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৩৪
[৯২০] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩৩৫
[৯২১] প্রাগুক্ত

শূরার দায়িত্ব থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-মুআফিরি। ফিকহশাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য রাখতেন। সমস্যার সমাধানে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। কর্ডোভার শূরা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ডাকা হলেও তিনি সাড়া দেননি।[১২২]

ইউনুস ইবনু আবদিল্লাহর জীবনীতে এসেছে, তাকে সর্বপ্রথম বাদাজোয শহর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে সরিয়ে আয-যাহরা মসজিদে খতিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি তিনি পান শূরার দায়িত্ব। এরপর তিনি খুত্তাতুর রদ তথা বিচারের রায় পুনঃনিরীক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব পান। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব, বিচারকার্য পরিচালনা, নামাজের ইমামতি এবং কর্ডোভার জামে মসজিদে জুমুআর খুতবার দায়িত্ব একসাথে পালন করতে থাকেন। এরপর যাবতীয় দায়িত্ব হতে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখন তিনি ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। ৪১৯ হিজরিতে শাসক মুতামিদ বিল্লাহ হিশাম ইবনু মুহাম্মাদ আল-মারওয়ানি তাকে কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি বানানোর পাশাপাশি নামাজের ইমামতি এবং খতিবের দায়িত্ব প্রদান করেন। সে-সময় তিনি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। বিচারকের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ৪২৯ হিজরিতে এই আলিম ইন্তেকাল করেন।[১২৩]

উসতায আল-কাসিমি উপদেষ্টা পরিষদে থাকা আলিমদের জীবনী অধ্যয়ন করে তাদের উপাধিগুলো একত্র করেছেন। সেগুলো হচ্ছে: প্রধান মুফতি, কর্ডোভার গ্র্যান্ড মুফতি, মুফতিদের সভাপতি, উপদেষ্টা পরিষদের মুখপাত্র, প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা কমিটির প্রধান, সমকালীন উপদেষ্টা পরিষদের মুরুব্বি এবং প্রবীণ ব্যক্তি।

এসব আলোচনা থেকে বুঝে আসে যে, আন্দালুসে উপদেষ্টা পরিষদ ছিল একটি উচ্চতর বিভাগ। যা সাধারণ মানুষের মাঝে পরিচিত এবং সমাদৃত ছিল। তৎকালীন সমস্ত দেশে তার ব্যাপক প্রচলনের কথা জানা যায়। ইতিবাচক এবং উত্তম বিষয় এই উপদেষ্টা পরিষদ শরীয়তের দাবি হওয়ার পাশাপাশি বিবেক সমর্থিত। আর বাস্তবতার আলোকেও তা স্বীকৃত। বিশেষভাবে বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং সাধারণভাবে সকল কাজের ক্ষেত্রে শূরাগণ উত্তম ফলাফল বাস্তবায়ন করতেন।

আন্দালুস এবং মরক্কোর প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি। হারিয়ে যাওয়া স্বর্গ আন্দালুস এবং প্রিয় মরক্কো—যা এখনো তার সন্তানদের নিয়ে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—এর বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ছোট চিত্র তুলে ধরার চেষ্টাটুকুই কেবল আমরা এখানে করেছি।

---

[১২২] প্রাগুক্ত

[১২৩] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৩৩৬; তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৯৫-৯৬

আন্দালুস এবং মরক্কোর বিচারকবৃন্দ

বিচারকরা সর্বত্রই সম্মানের স্থানে আসীন ছিলেন। আপামর জনগণ, প্রশাসক, আমির, খলিফা—সবাই তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত এবং সম্মানের নজরে দেখত। সত্য, ন্যায় এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে বিচারকরা সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হতেন। ইনসাফ কায়েম, মোকদ্দমার ফয়সালা এবং সত্যের পক্ষে অনড় অবস্থানের কারণে তারা ছিলেন কিংবদন্তি সমতুল্য। আমির, খলিফা, বিচারকের সহকারী বা আত্মীয়—আল্লাহর বিধান পালনে তারা কারও ক্ষেত্রেই আপস করতেন না।

অনেক সময় বিচারকরা রায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করতেন যে, আমির বা প্রশাসকের তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে। খলিফা এবং আমিররাই মূলত বিচারকদের এই অধিকার প্রদান করতেন। এমন সাহসিকতার কারণে তারা বাহবাও কুড়াতেন। তারা সাহস প্রদর্শন করবেন—এমনটাই তাদের থেকে কাম্য ছিল।

এই সুন্দর পদ্ধতিটি অন্যান্য স্থানের তুলনায় আন্দালুস এবং মরক্কোতে ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী এবং অধিক স্বীকৃত। বিশেষত ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সর্বত্রই ভালো-খারাপ মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মরক্কো এবং আন্দালুসে বিচারকদের সুনাম এবং মর্যাদা অধিক সময় ধরে বহাল ছিল। আন্দালুসে এই চিত্র মুসলিমদের শাসন বিলুপ্ত হওয়া অবধি বলবৎ ছিল। কিন্তু মরক্কোতে তা ছিল আরও বেশি সময় দীর্ঘ।

আন্দালুস এবং মরক্কোর যাবতীয় বিচারকের কথা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে বিচারকদের জীবন ও কর্ম নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে—এতটুকুই বলে দেওয়া সংগত হবে।

যেমন: মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস আল-খুশানি (৩১১ হি.) লিখিত *কুদ্বাতু কুরতুবাহ*, আবুল হাসান আন-নুবাহি (৭৯৩ হি.) লিখিত *তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস* ইত্যাদি। আন্দালুস এবং মরক্কোর ইতিহাস-সংক্রান্ত বইয়ে অনেক বিচারকের জীবনচরিত আছে। ঠিক তেমনি আন্দালুস ও আফ্রিকান আলিমদের জীবনী-সংক্রান্ত বইয়ে এবং মালিকি মাযহাবের ফকিহ ও আলিমদের স্তরগত আলোচনার বইতেও সেসব বাদ যায়নি।[৯২৪]

[৯২৪] আবুল আরব আল-কায়রুওয়ানির তবাকাতু উলামাই ইফরিকিয়্যা ওয়া তিউনিস, কাযী ইয়াযের তারতীবুল মাদারিক, বিচারক ইবনু ফারহুনের আদ-দীবাজুল মুযাহহাব, আহমাদ বাবা আত-তানবাকতি লিখিত নায়লুল ইবতিহাজ, আবদুল ওয়াহিদ আল-মারাকিশির আল-মু'জিব ফী তালখীসি আখবারিল মাগরিব, আমির শাকিব আরসালানের আল-হুলালুস সুনদুসিয়্যাহ, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ মাখলুফের শাজারাতুন নূরিয যাকিয়্যাহ এবং ইবনু খাল্লিকানের ওয়াফায়াতুল আইয়ান দেখুন। এ ছাড়াও বুগইয়াতুল মুলতামিস, ফিহরিসাতুল ইশবীলি এবং বারনামিজু ইবনি জাবির দেখতে পারেন।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ বিচারক

আমরা এখানে আন্দালুস এবং মরক্কোর কয়েকজন বিজ্ঞ বিচারকের কথা আলোচনা করব। কেবল মনে করিয়ে দেওয়াই এখানে তাদের জীবনচরিত আলোচনার উদ্দেশ্য। কারণ স্মরণ করিয়ে দিলে মুমিনদের উপকার হয়।[১২৫] তাহলে উত্তরসূরিরা তথা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা পূর্বসূরিদের জীবনচরিত সম্পর্কে জানতে পারবে।

▪ ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াজিদ আত-তুজিবি

আন্দালুসের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য সেখানে বাইরের কোনো দেশ থেকে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। কারও কারও মতে, উমর ইবনু আবদিল আজিজ তাকে বিচারকার্য পরিচালনায় নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি সে পদে বহাল থাকা অবস্থায় আমির আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া আন্দালুসে প্রবেশ করেন। তিনি ইয়াহইয়াকে অপসারণ করেননি। আমির আবদুর রহমান এবং আব্বাসি আমির ইউসুফ আল-ফিহরির মাঝে অনুষ্ঠিত সন্ধিচুক্তির বৈঠকে তিনি কেবল উপস্থিতই ছিলেন না, বরং চুক্তিপত্রও তিনিই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। চুক্তিপত্রের শেষে তার নামের আগে 'কাযিউল জামাআহ' উপাধি লেখা হয়েছিল। যা পরবর্তী সময়ে আন্দালুসের রাজধানীর বিচারকের ক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু হয়।[১২৬]

▪ আবদুস সালাম ইবনু সাঈদ

আফ্রিকার বিচারপতি ও মালিকি মাযহাবের ফকিহ ছিলেন তিনি। তার উপাধি ছিল সাহনুন। আদি নিবাস শামের হিমস নগরী। জন্ম ১৬০ হিজরিতে কায়রুওয়ান শহরে। তার পিতা সাঈদ ইবনু হাবিব হিমসের সেনাবাহিনীর সাথে মরক্কোতে এসেছিলেন। সাঈদ ছিলেন মালিকি মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

বিচারপতি আবদুস সালাম দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। সত্য উচ্চারণে শাসককে ভয় করতেন না কখনো। ১৮৮ হিজরিতে তিনি প্রাচ্যের দেশগুলো ভ্রমণ করেন। এ সফর ছিল নিরেট জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। ২৩৪ হিজরিতে কায়রুওয়ানের বিচারকের পদ অলংকৃত করার পর থেকে মৃত্যু অবধি (২৪০ হি.) সে পদে বহাল ছিলেন। হিসবাহর দায়িত্বশীলদের বিচারক হিসেবে তিনিই প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অন্যায়, বিদআত ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন ভীষণ সোচ্চার। উচ্চ মর্যাদা, উন্নত চরিত্র, আত্মমর্যাদা, বিনয় এবং নম্রতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের সময়ই তিনি বেতন গ্রহণ না করার শর্তারোপ করেছিলেন। তার সহচর ও ছাত্রদের মাঝে আল্লাহ তাআলা এ পরিমাণ বরকত দান

---

[১২৫] যেমনটা সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৫-এ এসেছে।

[১২৬] কুদাতু কুরতুবাহ, পৃ. ১৪

করেন যে, তারা বিভিন্ন দেশের ইমাম হয়ে গিয়েছিলেন।

বিশুদ্ধ এবং অলংকারপূর্ণ ভাষায় তিনি বক্তব্য রাখতেন। শ্রোতার মনে তা ভীষণ রেখাপাত করত। আগলাবি রাজবংশের পঞ্চম আমির মুহাম্মাদ ইবনুল আগলাবের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন, 'জনাব, আল্লাহ তাআলা আপনাকে দাপটের নিষ্ঠুরতা এবং অহংকারের বড়াই থেকে রক্ষা করুন। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে কল্যাণের বুঝ এবং সে অনুসারে আমলের তাওফিক দান করেন। আপনি সবকিছুর ওপর সত্যকে প্রাধান্য দেবেন।'

রায় মেনে নেওয়ার জন্য বাদী-বিবাদীকে প্রহার করার বিরুদ্ধে আবদুস সালাম ছিলেন সোচ্চার। তিনি মানুষকে তাগাদা দিতেন শরীয়ত-বহির্ভূত কসম না করার জন্য।[৯২৭]

▪ মুসআব ইবনু উমরান

আমির আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়ার সময় তিনি বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হিশাম ইবনু আবদির রহমান তাকে মনোনীত করলে প্রথমদিকে তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু হিশাম নাছোড়বান্দা হয়ে জোরপূর্বক দায়িত্ব চাপিয়ে দেন।

মুসআব ইবনু উমরান সপ্তাহে দুদিন নিজের সম্পত্তির দেখভাল করবেন বলে হিশামকে শর্তারোপ করেছিলেন। তিনি দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা অবস্থাতেই হিশাম মৃত্যুবরণ করেন। এরপর হাকাম ইবনু হিশাম আমির হলে তিনিও মুসআবকে স্বপদে বহাল রাখেন। হাকামের কঠোরতা ছিল সর্বজনবিদিত। মুসআবের সাথেও তিনি একই আচরণ করতেন। তবুও তার কাজের অনুমোদন দিতেন এবং তিনি কোনো রায় দিলে সেটা কার্যকর করতেন।

আব্বাস ইবনু আবদিল মালিক আল-মারওয়ানি একবার জায়ানের এক ব্যক্তির জমি দখল করে। মজলুম লোকটির ছেলেরা কর্ডোভায় এসে বিচারক মুসআবের কাছে মামলা দায়ের করে। অভিযোগ প্রমাণিত হয়। মুসআব তখন আব্বাসের বিপক্ষে রায় দিয়ে তাকে কর্ডোভায় ডেকে পাঠান।

আব্বাস ওই সময় হিশামের শরণাপন্ন হয়। আমিরকে অপরাধীর পক্ষ নিতে দেখে বিচারপতি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'জুলুমের শিকার হওয়া লোকেরা অনেক দূর থেকে এসেছে। অনেক কষ্ট হওয়ার পরও তারা নিজেদের দাবির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছে।' এরপর তিনি রায় কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'এখন আমির

---

[৯২৭] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ২৮; আদ-দীবাজুল মুযাহহাব, পৃ. ১৬০; তারতীবুল মাদারিক : ১/৫৮৫; ওয়াফায়াতুল আইয়ান : ২/৩৫২; তবাকাতুল ফুকাহা, পৃ. ১৫৬; তবাকাতু উলামা ইফরিকিয়্যা ওয়া তিউনিস, পৃ. ১৮৪; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৮৭; মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪০৪

যা মনে চায় করতে পারেন।'

কাছের লোকেরা তাকে আমিরের সাথে লাগালাগি না করার পরামর্শ দেয়। তখন আমিরের দূতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'আমিরের কাছে গিয়ে বলবে, আমার দায়িত্বে থাকা রায় বাস্তবায়নের নির্দেশ আমি নিজে দিয়েছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি অবশ্যই ন্যায়বিচার করেছি। এখন আমিরের ক্ষমতা থাকলে তা প্রতিহত করে দেখাক।'

খবর পেয়ে আমির প্রথমে ক্ষিপ্ত হলেও পরে সঠিক বিষয় উপলব্ধি করতে পারেন। বিচারকের রায়ের প্রশংসাও করেন তিনি। এরপর আব্বাসকে ডেকে বললেন, 'যার বিরুদ্ধে বিচারকের কলম চলে, সে বড় দুর্ভাগা। তার রায় তুমি মেনে নাও। সে আমাদের সমপর্যায়ের এবং তোমার চেয়ে উত্তম।'

কোনো রায় দেওয়ার আগে একাধিক আলিমের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া ছিল মুসআবের অভ্যাস। তার নিবাস ছিল শামে। আবদুর রহমান আদ-দাখিলের সময় তিনি আন্দালুসে গিয়েছিলেন। ইমাম আওযায়ির সূত্রে হাদিস বর্ণনা করতেন। নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের গণ্ডিতে তিনি আবদ্ধ থাকতেন না। যে মত তার কাছে সঠিক বলে বিবেচিত হতো, সে অনুযায়ী রায় প্রদান করতেন।[৯২৮]

▪ মুহাম্মাদ ইবনু বাশির

হজে যাওয়ার সময় তিনি ইমাম মালিক ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এরপর আন্দালুসে ফিরে এলে হাকাম ইবনু হিশাম তাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতে চান। তখন তিনি বেশ কয়েকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন। যেমন : আমির থেকে শুরু করে বাজারের পাহারাদার, প্রত্যেককেই তার দেওয়া রায় বাস্তবায়ন করতে হবে। নিজের অক্ষমতা বুঝতে পারলে তিনি নিজে থেকেই পদত্যাগ করবেন। এতে কোনো ধরনের ওজর-আপত্তি চলবে না। সন্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ ভাতা প্রদান করতে হবে।

তিনি ছিলেন প্রথম সারির বিচারক। প্রবল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। চমৎকার জীবনশৈলী ধারণ করতেন। মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কোনো বিষয় বোধগম্য না হলে মিশরের আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম, আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব এবং তাদের সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের কাছে চিঠি লিখে মতামত জানতে চাইতেন।

একবার বিচারপতি ইবনু বাশিরের কাছে একটি মোকদ্দমা এল। যা-তে খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসিরের চাচা সাঈদ আল-খাইরের সংশ্লিষ্টতা ছিল। রীতি অনুসারে সাঈদ তার দাবির সপক্ষে যেসব সাক্ষীদের কথা উল্লেখ করলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন স্বয়ং খলিফা। বিচারক এটা দেখে সাঈদের উকিলকে বললেন,

---

[৯২৮] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৪৫-৪৭; কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২৪

'এই সাক্ষ্য আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য কোনো ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী থাকলে নিয়ে আসুন।'

বিচারককে বরখাস্ত করার জন্য সাঈদ তখন খলিফাকে ফুঁসলাতে লাগল। খলিফা বললেন, 'বিচারক খুব ভালো মানুষ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে তিনি কারও পরোয়া করেন না। তার সতর্ক দৃষ্টির কোনো রকম বিরোধিতা আমি করতে পারব না। তাকে ডিঙিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ইবনু বাশিরের কাছে খলিফার সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'সাক্ষ্য গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করাটা দরকার ছিল। অবশ্য খলিফার সাক্ষ্য গ্রহণ করলে কেউ আমার বিরোধিতা করার সাহস পেত না। কিন্তু আমি অক্ষমতা প্রকাশ না করলে প্রতিপক্ষের হক বিঘ্নিত হতো।'

বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মুহাম্মাদ ইবনু বাশিরের সর্বশেষ শর্ত ছিল—দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমির তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন। আত্মীয়-স্বজন—যে-ই হোক না কেন, প্রত্যেকের ব্যাপারেই ইনসাফ কায়েম করতে দেবেন। তিনি জামাআত এবং নামাজ-সংক্রান্ত বিচার পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেন।

আল-খুশানি বলেছেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু বাশির ছিলেন আন্দালুসের বিচারকদের মধ্যমণি এবং বিশিষ্টজন। প্রবল আত্মমর্যাদাবান, দৃঢ় প্রত্যয়ী, সত্যের পক্ষে অনুগত এবং ন্যায়ের প্রশ্নে আপসহীন। না সম্মানিত ব্যক্তি তার কাছে বিশেষ সুবিধা পেত, আর না ক্ষমতাবানদের তিনি তোষামোদ করে চলতেন। চাকরিজীবী বা খলিফার আশ্রিত কেউই তার কাছে বাড়তি গুরুত্ব পেত না। দ্বীন পালনে কেউ তার নাগাল পেতে চাইলে তাকে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ[১৯৯] থেকেও দূরে দেখতে পেত।'

দ্বিতীয় হিশাম ও মানসুর ইবনু আবি আমিরের সময়ও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।[২০০]

▪ আবদুর রহমান ইবনু তারিফ

তার স্বভাব-চরিত্র, সততা, দৃঢ়তা এবং তাকওয়ার কথা জানতে পেরে আমির আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া তাকে কর্ডোভার প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি চমৎকারভাবে দায়িত্ব পালন করেন। একবার জনৈক ব্যক্তি বিচারকের গিবত করে আমিরের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। আমির তখন আবদুর রহমানকে সেই ব্যক্তিটির বিচার করতে নিষেধ করেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার দিকে না তাকিয়ে তিনি ফকিহ এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের একত্র করেন। তারপর

---

[১৯৯] সবচেয়ে দূরবর্তী নক্ষত্র। বিচারক মুহাম্মাদ ইবনু বাশির এতোটাই পরহেজগার ছিলেন যে, তৎকালীন সময় আল্লাহভীরুতার দিক দিয়ে কেউ তাঁর ধারেকাছেও ছিল না। —সম্পাদক

[২০০] তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৪৭; কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২৮; আল-মু'জিব, ৭৩; বুগইয়াতুল মুলতামিস, পৃ. ৫১

পরামর্শ-মাফিক লোকটিকে রায় শুনিয়ে দেন। আমিরের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বিচারককে তলব করে বলেন, 'আপনি কার দেওয়া অধিকারের ভিত্তিতে বিচার করলেন? আমি তো আপনাকে নিষেধ করেছিলাম।'

বিচারপতি ইবনু তারিফ নির্ভয়ে জবাব দিলেন, 'যিনি আপনাকে এই পদে বসিয়েছেন, তিনিই আমাকে এই কাজ করার অধিকার দিয়েছেন। তিনি না থাকলে আপনি এখানে বসতে পারতেন না।' এমন নির্ভীক জবাব শুনে থ খেয়ে গেলেন আমির। তিনি জানতে চাইলেন, বিচারক কার কথা বলছেন। বিচারক বললেন, 'রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূলের কথা বলছি। তাঁর সাথে আপনার আত্মীয়তা না থাকলে এই পদে আপনি বসতে পারতেন না। কাছের-দূরের সবার মাঝে ইনসাফ করার জন্যই তিনি সত্য-সহকারে প্রেরিত হয়েছেন।'[৯৩১]

■ আমর ইবনু আবদিল্লাহ

আন্দালুসের প্রধান বিচারপতিদের মাঝে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি সাবেক দাস ছিলেন। আরবরা বিষয়টি মেনে নিতে না পেরে সমালোচনা শুরু করেছিল। তখন আমির মুহাম্মাদ বলেন, 'তার মাঝে এমন কিছু গুণ আমি দেখেছি, যা অন্য কারও মাঝে নেই।'

বিচারপতি আমর সুন্দরভাবে ফয়সালা করতেন। তার কার্যপদ্ধতি ছিল বেশ চমৎকার। দীর্ঘ সময় নীরব থাকতেন। কোনো রকম তাড়াহুড়া করতেন না। মানুষের মাঝে তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল প্রবল। তার আচরণ ছিল মার্জিত। তিনি এজলাসে বসলে বাদী-বিবাদী তার কাছাকাছি ঘেঁষতে পারত না। অন্য কেউ তার ঘনিষ্ঠ হওয়াটাও ছিল অসম্ভব। বাহনে আরোহণের সময় কাউকে সাথে নিতেন না। তিনি যেদিকে যেতেন, সবাই পথ ছেড়ে দিত। তার সহনশীলতা এবং গাম্ভীর্যতা ছিল উল্লেখ করার মতো। ক্রোধের সময় এবং অপছন্দনীয় কিছু দেখলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে ছিলেন পারদর্শী।

একবার মসজিদে হট্টগোল সৃষ্টি হয়েছিল। বিচারকের বিরুদ্ধে মানুষ গোলমাল শুরু করে দিয়েছিল। একজনের বিরুদ্ধে তিনি রায় দিলে সে পালিয়ে গিয়ে আমিরের দফতরে আশ্রয় নেয়। তখন তিনি শান্তভাবে এজলাস থেকে উঠে আমিরের দূতকে তলব করেন। তাকে বলেন, 'আমিরকে গিয়ে বলবে : আপনার কাজটা ঠিক হয়নি। আপনি অন্যায় করেছেন। এক লোকের ব্যাপারে আমি ফয়সালা দিয়েছি, আর আপনি কিনা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন! আপনি তো ইনসাফ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছেন। এখন আপনার দায়িত্ব হলো তাকে আমার হাতে সোপর্দ করা।

[৯৩১] কুদ্বাতু কুরতুবাহ, পৃ. ২৩; তারীখু কুদ্বাতিল আন্দালুস, পৃ. ৪৪

অন্যথায় আমি লোক পাঠাব, যারা আপনার ঘরের দরজায় পেরেক এঁটে দেবে।'[৯৩২]

▪ মুনযির ইবনু সাঈদ আল-বালুতি

তার জন্ম ২৭৩ হিজরিতে। একবার কর্ডোভার প্রাসাদে রোম সম্রাটের দূতের সামনে তিনি অলংকারপূর্ণ ভাষায় অনবদ্য বক্তব্য পেশ করেছিলেন। খ্যাতনামা বক্তারাও তার ভুল ধরতে পারেনি। এই অপূর্ব বক্তব্য শুনে খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির তাক লেগে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে খলিফা তাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। একপর্যায়ে তাকে প্রধান বিচারপতি এবং নামাজের ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেন। এটা ৩৩৯ হিজরির কথা।

মুনযির কোনো ধরনের ভীতি বা সংকোচ ছাড়াই খলিফার সাথে কথা বলতেন। অন্যান্য লোকদের পক্ষে এটা সম্ভব হতো না। একবার খলিফা বেশ কিছু জমি অধিগ্রহণ করে আয-যাহরা নগরী নির্মাণ করেন। সেখানকার আলিশান প্রাসাদের ছাদ ছিল স্বর্ণ এবং রুপার তৈরি। নির্মাণকাজ শেষে একটি গণজমায়েতের ব্যবস্থা করলে মুনযির ইবনু সাঈদ সেখানে অনেকগুলো আয়াত তিলাওয়াত করেন। যার মধ্যে এটিও ছিল :

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ
لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾

> সমস্ত মানুষ একই মতাবলম্বী (অর্থাৎ কাফির) হয়ে যাবে এই আশঙ্কা না থাকলে, যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের ঘরের ছাদ এবং সিঁড়ি রুপা দিয়ে তৈরি করে দিতাম, যার ওপর তারা চড়ত।[৯৩৩]

ওই মুহূর্তে খলিফা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেও মুনযিরের জ্ঞান এবং দ্বীনদারিতার প্রতি লক্ষ রেখে তিনি কথা বাড়ালেন না। বরং ছাদের স্বর্ণ এবং রুপা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। মুনযির ওই মজলিসে আরও তিলাওয়াত করেছিলেন :

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ
وَّبَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾

---

[৯৩২] কুদাতু কুরতুবাহ, পৃ. ৬৭

[৯৩৩] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩৩

তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ? এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকব? যখন তোমরা আঘাত করো তখন নিষ্ঠুরের মতো আঘাত করে থাকো। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ভয় করো তাঁকে, যিনি এমন সব বস্তু দ্বারা তোমাদের শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন, যা তোমাদের জানা আছে। যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ জন্তু এবং সন্তানসন্ততি দ্বারা। (সাথে রয়েছে) উদ্যানরাজি এবং ঝরনা। তোমাদের ব্যাপারে আমি এক গুরুতর দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।[১৩৪]

এরপর খলিফার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এখন তাদের মতো বলতে যাবেন না—

سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾

তুমি উপদেশ দাও অথবা না দাও, উভয়টিই আমাদের জন্যে সমান।[১৩৫]

আরেকবার খলিফা প্রাসাদ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি ঘর কিনে নেওয়ার ইচ্ছা করলেন। ঘটনাক্রমে জমিটি ছিল কয়েকজন ইয়াতিমের মালিকানাধীন, যারা মুনযির ইবনু সাঈদের তত্ত্বাবধানে ছিল। খলিফার অভিপ্রায়ের কথা শুনে তিনি বললেন, 'কেবল তিনটি শর্ত পূরণ হলেই ইয়াতিমের সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়। এক. যখন তা বিক্রি করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। দুই. যদি তা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তিন. ইয়াতিমরা ভবিষ্যতে লাভবান হতে পারবে—এমন কোনো মূল্য যদি পাওয়া যায়। এখানে তো শর্ত তিনটির কোনোটিই উপস্থিত নেই।'

খলিফা তখন বিচারকের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রকৃত মূল্য থেকে অনেক চড়া দামে জায়গাটি কিনে নেন।

আত্মমর্যাদায় মুনযির ছিলেন সেরা। রায় প্রদানে ছিলেন অনমনীয়। ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যায় ও জুলুম দমনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভীক। আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে কারও কথার পরোয়া করতেন না। তিনি বিচারকের পদে থাকাবস্থাতেই খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী খলিফা হাকাম ইবনু আবদির রহমানও তাকে বিচার পরিচালনা, জুমুআর খুতবা এবং নামাজ পড়ানোর কাজে নিয়োজিত রাখেন। অবশেষে ৩৫৫ হিজরিতে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

বাহ্যিক কথার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিলেও তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন মালিকি মাযহাব অনুসারে। একাধিক বার দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিলেও তাকে স্বপদে

[১৩৪] সূরা শুআরা, ২৬ : ১২৮-১৩৫
[১৩৫] সূরা শুআরা, ২৬ : ১৩৬

বহাল রাখা হয়েছিল।[১০৬]

আলিম বিচারক

এখন আমরা আন্দালুস ও মরক্কোর কয়েকজন বিচারকের কথা আলোচনা করব। বিচারক হওয়ার পাশাপাশি তারা বড় ফকিহ, আলিম এবং লেখক ছিলেন। আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারব্যবস্থা কত ব্যাপক এবং সেখানকার বিচারকগণ কতটা সম্মানিত ছিলেন, এ আলোচনা থেকে তা সহজেই বুঝে আসবে।

■ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনি মুহাম্মাদ ইবনি রুশদ

তার উপনাম ছিল আবুল ওয়ালিদ। তিনি ছিলেন কর্ডোভার অধিবাসী। মরক্কো ও আন্দালুসের মাঝে মালিকি ফিকহের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত। চার বছর কর্ডোভার প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালনের পর স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণ করেন। চমৎকারভাবে দায়িত্ব পালন করায় তার সম্মান ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। জামে মসজিদে নামাজ পড়ানোও ছিল তার দায়িত্ব। সাধারণ মানুষ ফতোয়া জানতে এবং সমস্যার সমাধানে তার দ্বারস্থ হতো। আমিরদের কাছে তিনি বরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ফিকহ এবং ফিকহের মূলনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। অনেক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তার জন্ম ৪৫৫ হিজরিতে কর্ডোভায়। আর ৫২০ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।[১০৭]

■ ইয়ায ইবনু মূসা

উপনাম আবুল ফাদল। মালিকি মাযহাবের অনুসারী এই ফকিহ বিচারক হওয়ার পাশাপাশি মুফাসসির এবং মুহাদ্দিসও ছিলেন। কাযি ইয়ায নামেই তিনি পরিচিত।

৪৭৬ হিজরিতে মরক্কোর সাবতাহ নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সমকালীন মুহাদ্দিসদের মধ্যে তিনি ছিলেন সেরা। আরবি ভাষা, আরবদের বংশপরম্পরা এবং ইতিহাস সম্পর্কে তার জানাশোনা ছিল প্রবল। তাফসির সম্পর্কে তিনি যেমন জ্ঞান রাখতেন, তেমনি মালিকি মাযহাবের ভিতও ছিল শক্তিশালী। মৌলিক বিধিবিধানের বিশেষজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন উঁচু মাপের কবি। তার বক্তব্যও ছিল অলংকারসমৃদ্ধ। দীর্ঘদিন সাবতাহ নগরীতে বিচারকার্য পরিচালনার পর গ্রানাডার দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে চলে যান মারাকিশে। ৫৪৪

---

[১০৬] কুযাতু কুরতুবাহ, পৃ. ১২০; তারীখু কুদাতিল আন্দালুস, পৃ. ৭৭-৭৫; আল-মু'জিব, পৃ. ৫৫ এবং ৪৫৮; যুহরুল ইসলাম : ৩/২৫; তারীখুল কাদা, পৃ. ১২২

[১০৭] আদ-দিবাজুল মুযাহহাব, পৃ. ২৭৮; শাজারাতুন নূর, পৃ. ১২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, পৃ. ৪০; শাযারাতুয যাহাব : ৪/৬২; তারীখু কুদাতিল আন্দালুস, পৃ. ৯৮

হিজরিতে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

■ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি মুহাম্মাদ

উপনাম আবু বকর। তবে ইবনুল আরাবি নামটিই অধিক সমাদৃত। তিনি আন্দালুসের বাসিন্দা। একাধারে মুফাসসির, বিচারক এবং হাফিজুল হাদিস। জন্ম ৪৬৭ হিজরিতে, ইশবিলিয়ায়। ছিলেন মালিকি মাযহাবের অন্যতম ইমাম। তাকলিদ অপেক্ষা ইজতিহাদই বেশি করেছিলেন। মিশর, শাম অঞ্চল, ইরাক এবং হিজাজের বড় বড় আলিমদের থেকে ইলম আহরণ করেন। অবশেষে ৪৯৩ হিজরিতে প্রত্যাবর্তন করেন স্বদেশে।

ইশবিলিয়ার বিচারপতির দায়িত্ব পালনকালে কৌশলের সাথে ইনসাফ কায়েম এবং জুলুম দমন করেছিলেন। তার প্রদত্ত রায়ে দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখা যেত। বিচার-ফয়সালা এবং মোকদ্দমা নিরীক্ষণে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ। পরবর্তী সময়ে অবশ্য বিচারকার্য বাদ দিয়ে লেখালেখি এবং ইলম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। চল্লিশ বছর যাবৎ ফতোয়া প্রদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

৫৪৩ হিজরিতে মারাকিশ যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। 'ফেজ' নামক স্থানে সমাহিত করা হয় তাকে। তিনি অনেক উপকারী গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।[১০৮]

■ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ

উপনাম আবুল ওয়ালিদ। ইবনু রুশদ আল-হাফিদ নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। ছিলেন মালিকি মাযহাবের ফকিহ। একাধারে চিকিৎসক, দার্শনিক এবং প্রাজ্ঞ বিচারক হিসেবেও খ্যাতি ছিল তার। ৫২০ হিজরিতে কর্ডোভাতে তার জন্ম। প্রখর মস্তিষ্ক এবং তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী এই আলিমকে কর্ডোভার প্রধান বিচারপতির ভার দেওয়া হয়েছিল।

ফিকহ ও ফতোয়া জানতে মানুষ ছুটে আসত তার কাছে। চিকিৎসাবিদ্যায়ও তিনি অনেক সুনাম অর্জন করেছিলেন। শাসক তাকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। কিন্তু হিংসুকদের পাল্লায় পড়ে বাদশাহ তাকে মারাকিশে নির্বাসন প্রদান করেন। ৫৯৫ হিজরিতে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য

এই অধ্যায়ের আলোচনা প্রায় শেষের দিকে। এখন আমরা আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

☑ ১. আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারব্যবস্থার ইতিহাস প্রায় আটশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী

[১০৮] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৭৯

ছিল। এই সময়ের মধ্যেই মুসলিমরা আন্দালুস বিজয় করে, এবং ধীরে ধীরে তাদের পতন হয়। মরক্কোও এর কাছাকাছি সময়েই বিজিত হয়েছিল। আল্লাহর রহমতে এখনো সেখানে ইসলাম টিকে আছে। আল্লাহর কাছে আমাদের দুআ, তিনি যেন দ্বীনকে সেখানে চিরস্থায়ী করে দেন। তাঁর কাছে আরও প্রার্থনা, হারানো স্বর্গ আন্দালুস যেন সঠিক বিশ্বাসের দিকে ফিরে আসে। সেখানে যেন দ্বিতীয়বারের মতো ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি হয়। গোটা পৃথিবীতে ইসলাম বিকশিত হওয়ার মাধ্যমে মুসলিমরা যেন পুনরায় দ্বীন, শরীয়ত এবং কুরআনের দিকে ফিরে আসে।

☑ ২. বেশ কিছু কারণে আমরা আন্দালুস ও মরক্কোর কথা পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। এদের আলোচনা একসাথে করার কারণ হলো, এই অঞ্চল দুটো ছিল আব্বাসি খিলাফত থেকে পৃথক। আবার উভয় দেশেই পরিপূর্ণরূপে মালিকি মাযহাবের বিস্তার ঘটেছিল। আন্দালুসের সাথে উত্তর আফ্রিকার মুসলিমদের বন্ধন মজবুত হওয়ার পাশাপাশি অঞ্চল দুটির মাঝে সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক এবং আদর্শিক মিল ছিল। স্থানগত নৈকট্য তাদের সম্পৃক্ততা আরও জোরদার করে দেয়। আন্দালুস জয়ের পর অধিকাংশ সময়ই তা আফ্রিকার সাথে একক প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত হতো। পরবর্তী সময়ে আন্দালুসের শাসন উত্তর আফ্রিকার কিছু কিছু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আবার মরক্কোর মুসলিমরা মুরাবিত এবং মুওয়াহহিদদের শাসনামলে আন্দালুসকে উদ্ধার করে উত্তর আফ্রিকার সাথে শাসন করতে থাকে।

☑ ৩. আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারব্যবস্থা সর্বজনীন ইসলামি বিচারব্যবস্থার অংশবিশেষ। সর্বজনীন বিচারব্যবস্থার সাথে সেখানকার আঞ্চলিক বিচারব্যবস্থার শুধু যে মিল ছিল, তা কিন্তু নয়। বরং সূচনা, ভিত্তিমূল এবং মৌলিকতার দিক থেকে তা ছিল একই রকম। আন্দালুস এবং মরক্কোর বিচারব্যবস্থা মূলত পূর্বাঞ্চলের বিচারব্যবস্থারই প্রতিচ্ছবি। পূর্ব এবং পশ্চিমের জ্ঞানীদের মধ্যকার বন্ধন ছিল অত্যন্ত মজবুত। জ্ঞানান্বেষণের জন্য আন্দালুস ও মরক্কো থেকে পূর্বে যাওয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ঠিক তেমনি ওদিক থেকেও এখানে আসার রেওয়াজ ছিল। বিদ্বানরা পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে গোটা ইসলামি বিশ্ব চষে বেড়াতেন। সাম্রাজ্য, শাসন এবং রাজনীতির ভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি হতো না।

☑ ৪. আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা একটা বড় মাত্রা পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের বিচারব্যবস্থার মতোই ছিল। তবে প্রশাসনিক পর্যায়ে কার্যত ভিন্নতা আসলেও সর্বজনীন ইসলামি বিচারব্যবস্থার মৌলিকত্বে তার প্রভাব পড়েনি।

☑ ৫. আন্দালুস এবং মরক্কোর খলিফা বা আমিরই ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান কর্তা। কর্ডোভা বা অন্যান্য প্রধান নগরীতে তিনি বিচারক নিয়োগ দিতেন। বিচারককে নিজের কাছাকাছি রাখা, তাকে সম্মান দেওয়া এবং রাজ্যের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করা-সহ তার বেশির ভাগ নির্দেশনা মেনে চলতেন। রাজধানীস্থ জামে মসজিদে নামাজ পড়ানো এবং খুতবা দেওয়া ছিল প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব। এ ছাড়াও তিনি ওয়াজ-নসিহত এবং ধর্মীয় নির্দেশনা প্রদান করতেন। ফলাফলে দেখা গেছে, রায় প্রদান এবং বিচারকার্য পরিচালনার ব্যাপারে বিচারকরা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতেন। বিচার-সংক্রান্ত খলিফা, আমির এবং প্রশাসকরা তাদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন না। আর বিচারকরাও কেবল শরীয়তের অনুসরণ করতেন। খলিফা, আমির এবং প্রশাসকরাও বিচারকার্য পরিচালনা করতেন না। তবে পদ শূন্য থাকলে বিচারক নিয়োগ দেওয়ার আগ পর্যন্তই কেবল তারা দায়িত্ব পালন করতেন।

☑ ৬. খলিফা, আমির এবং প্রাদেশিক শাসকরা বেশির ভাগ সময় সাধারণভাবে আলিমদের সাথে এবং বিশেষভাবে প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে তবেই বিচারক নিয়োগ দিতেন। দেশবাসীর মতামতও এ ক্ষেত্রে স্থান করে নিত। শুধু তা-ই নয়, যাকে নিয়োগ দেওয়া হবে তার জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত প্রসিদ্ধিও যাচাই করা হতো। সাধারণত বড় আলিম, ফকিহ, তাকওয়াবান এবং সৎ ব্যক্তি নির্বাচনের মাধ্যমেই নিয়োগ দান সম্পন্ন হতো।

☑ ৭. আলিম, ফকিহ এবং মুফতিগণ আন্দালুস এবং মরক্কোতে উন্নত অবস্থান আর উঁচু মর্যাদা ধারণ করতেন। বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাদের উন্নতি আর সুখ্যাতি হতো আরও গৌরবময়, ইতিহাস হতো আরও সমুজ্জ্বল এবং ব্যক্তিত্ব আরও শক্তিশালী হতো। প্রশাসক এবং জনগণের কাছে বিচারকের ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং প্রশংসনীয় চরিত্র প্রকাশ পেত। খলিফা এবং বিশেষভাবে আমিরগণ আলিমদের সম্মান এবং বিচারকদের তাজিম করতেন। তাদের ধার্যকৃত শর্ত মেনে নেওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রদত্ত নির্দেশনা পালন করতেন। সুতরাং এই চিত্রটি পূর্বাঞ্চলে উমাইয়া এবং আব্বাসি যুগের সাদৃশ্যপূর্ণ চিত্রের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। যদিও সেখানকার আলিমদের ঐক্য এবং তাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

☑ ৮. আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারকগণ ছিলেন ইসলামি বিচারব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতার অনুসরণ, কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং শরীয়তের বিধানাবলি পালনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা ছিলেন নির্ভীক। আল্লাহর ব্যাপারে কারও তিরস্কারের পরোয়া তাদের ছিল না। বিচারকরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে খলিফা, আমির, প্রশাসক,

তাদের সহযোগী এবং আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে সাহসিকতার পরিচয় দেওয়ার অনেক ঘটনা আছে। বিচারক এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি খলিফা এবং আমিরদের সম্মানজনক আচরণ এ কাজে তাদের সহযোগিতা করেছে। ঘনিষ্ঠ লোক, জুলুমবাজ মানুষ এবং প্রশাসকের সহযোগীদের বিপক্ষে প্রদত্ত বিচারের রায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা সত্য এবং ন্যায়কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিলেন।

☑ ৯. বড় বড় আলিম এবং ফকিহদের অনেকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হননি। কেউ কেউ তো দায়িত্ব গ্রহণ করে কয়েকদিন পরে আবার নিজেই সরে গিয়েছেন। কিংবা পরিণতির আশঙ্কা করে নিজের দ্বীন নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছেন। তবে যারা দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হননি, তাদের অনেকেই বিচারব্যবস্থার উপদেষ্টা হিসেবে থেকেছেন। মোকদ্দমা কঠিন হলে এবং বাদী-বিবাদীর বিরোধের ক্ষেত্রে বিচারককে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন তারা।

☑ ১০. আন্দালুস এবং মরক্কোর বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পূর্বাঞ্চলের অবস্থার সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা এগিয়ে গিয়েছিল। এগুলোর কিছু আবার এমন ছিল, যা পূর্বাঞ্চলের বিচারব্যবস্থার সাথে কোনো সাদৃশ্যই রাখত না। যেমন আন্দালুস ও মরক্কোর কাযিউল জামাআহ বা প্রধান বিচারপতির কর্মপরিধি অনেক বড় ছিল। যা ছিল ইরাক, শাম অঞ্চল, মিশর এবং পারস্যের কাযিউল কুযাত তথা প্রধান বিচারপতির সমকক্ষ। আবার খুত্তাতুর রদ তথা রায় পুনঃনিরীক্ষণ প্রকল্প, রায় বাস্তবায়নের জন্য পুলিশবাহিনী, অভিজাত শ্রেণির বিচার বিভাগ এবং খ্রিষ্টানদের জন্য স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আন্দালুস ও মরক্কোর ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

☑ ১১. আন্দালুসের বিচারব্যবস্থার গঠনমূলক দিকটি ছিল পূর্বাঞ্চলের অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিচারের সর্বজনীন উৎস ছিল অভিন্ন। কলহ বিবাদের ফয়সালা সাধারণ বিচার বিভাগের অধীনেই পরিচালিত হতো। আর নিয়মিত বিচারব্যবস্থার পরিধি বিচারকদের কাছে সময়গত, স্থানগত এবং গঠনমূলক পরিধি হিসেবে বিন্যস্ত থাকত। বিচারব্যবস্থা, জীবনধারা এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশে একই রকম পদ্ধতি চালু ছিল। যেমন নথিভুক্তিকরণ, সাক্ষী যাচাই বা নির্ভরযোগ্য সাক্ষী নির্বাচন, ফয়সালার ব্যাপারে সাক্ষী রাখা, বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষের কাছে আমানতের সম্পদ গচ্ছিত রাখা এবং বিচারকের নানারকমের সহায়ক রাখার পদ্ধতি। তবে এসব ক্ষেত্রেও আন্দালুসে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। হিজরি দ্বিতীয় শতকে আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারকদের কাছে ইজতিহাদই মৌলিক বিষয় হলেও পরবর্তীকালে সেখানে পরিপূর্ণরূপে মালিকি মাযহাবের অনুসরণ প্রচলিত হয়।

☑ ১২. ব্যাপক আকারে এবং বিশেষ আকৃতিতে মালিকি মাযহাব ছড়িয়ে পড়া ছিল আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ মাযহাবই পরবর্তীকালে সেখানকার একমাত্র মাযহাব হয়ে যায়। অন্যান্য মাযহাবগুলোর বিশেষ কোনো ভূমিকা না থাকায় সবগুলোই বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইলম চর্চা, পাঠদান, ফিকহ এবং ফতোয়ার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয় এই মাযহাব। এমনকি আন্দালুস এবং উত্তর আফ্রিকার বিচারকগণ এই মাযহাব অনুসারেই রায় দিতে থাকেন। ফলাফলে তা একটি প্রশংসিত বিষয়ে এবং পূর্বাঞ্চলের তুলনায় বিশেষত্বে রূপ নেয়। এ মাযহাবই একমাত্র বিচার-সংক্রান্ত কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় সেখানে রায়ের ক্ষেত্রে অন্য কোনো মাযহাবের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হতো না। পক্ষান্তরে পূর্বাঞ্চলের বিষয়টি ছিল ভিন্ন। সেখানে একইসাথে একাধিক মাযহাবের প্রচলন থাকায় অনেক সময় দুঃখজনক ঘটনা ঘটে এবং বিচারব্যবস্থা একীভূত করার জন্য সংস্কারের আওয়াজ উঠে।

☑ ১৩. আন্দালুস ও মরক্কোতে স্বতন্ত্রভাবে বিচারব্যবস্থার উপদেষ্টা পরিষদ তৈরি হয়। যা বিশুদ্ধ ইসলামি শরীয়তের অধীনে পরিচালিত হতো। বিচারকরাও উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। উপদেষ্টাদের জন্য বিশেষ স্থানও নির্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক শহর বা প্রদেশের বড় বড় ফকিহ এবং আলিমদের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠন করা হতো। উপদেষ্টা পরিষদের এমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা পূর্বাঞ্চলের কোথাও চালু ছিল না।

☑ ১৪. আন্দালুস এবং মরক্কোর বিচারকগণ বিচারকার্য পরিচালনার পাশাপাশি আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। একসময় এসব কাজ রাজধানীস্থ প্রধান বিচারপতির আবশ্যক কাজ হয়ে যায়। যেমন জামে মসজিদে নামাজ পড়ানো, খুতবা প্রদান, প্রশাসক এবং আমিরকে পরামর্শ প্রদান, কখনো কখনো মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন, সদাকার সম্পদ বিলি-বণ্টন, অন্য স্থানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন, অন্যায় ও দুর্নীতির বিচার, হিসবাহর দায়িত্ব পালন, সেনাবাহিনীর পরিচালনা, খলিফার স্থলবর্তী হওয়া এবং সীমান্তে নজরদারি করা।

☑ ১৫. বিচারকার্যের পরিধির জন্য গঠনমূলক সূক্ষ্ম বণ্টন ছিল আন্দালুস ও মরক্কোর বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। যার ফলশ্রুতিতে শহরাঞ্চলে বিধানের বিচারক, গ্রামে বিশেষ সহকারী, বিবাহ-সংক্রান্ত বিচারব্যবস্থা এবং উত্তরাধিকারের বিচারব্যবস্থা চালু হয়। পূর্বাঞ্চলে যার কোনো প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট সদৃশ পাওয়া যায় না।

০৭

মামলুক জামানার বিচারব্যবস্থা

মামলুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মিশর এবং শাম অঞ্চলে। ক্রমান্বয়ে তাদের ক্ষমতা উত্তর সুদান, পশ্চিম লিবিয়া এবং হিজাজের উপকূল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ তুরস্ক এবং সাইপ্রাসও তাদের অধীনে চলে এসেছিল। ইরাক অবধি ক্ষমতার বিস্তার ঘটিয়ে তারা বাগদাদে নিজেদের প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছিল। হারামাইন শারীফাইনের রক্ষণাবেক্ষণও ছিল তাদের দায়িত্বে। মামলুকদের রাজত্ব প্রায় তিনশ বছরব্যাপী স্থায়ী হয়। ৬৪৮ থেকে ৯২২ হিজরি পর্যন্ত (১২৫০-১৫১৭ খ্রি.)। অধিকাংশ সময় তাদের বিচারব্যবস্থা ছিল আব্বাসি যুগের পরিপূরক। তবে তাতে অনেক বিবর্তন এবং বিরল সব ঘটনা ঘটেছিল।

আমরা প্রথমে মামলুক সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক দিক আলোচনা করব। এরপর বিচারব্যবস্থার প্রশাসনিক এবং গঠনমূলক বিষয়ে নতুন অবস্থাগুলো তুলে ধরব। তারপর মামলুক যুগে মিশর এবং শামের প্রসিদ্ধতম বিচারকদের কথা উল্লেখ করব। সবশেষে থাকবে মামলুক যুগের বিচারব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ এবং বৈশিষ্ট্যের আলোচনা।

মামলুক শাসনামলের ব্যাপারে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

আইয়ুবিরা মিশর এবং শামে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ সম্পন্ন করেছিল। মিশরে ফাতিমি সাম্রাজ্য খতম করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের সাথে একীভূত হওয়া, শাম এবং মিশরে ক্রুসেডারদের সাথে চরম লড়াইয়ের পর বিশাল জয় লাভ, বাইতুল মাকদিস উদ্ধার, এবং শাম ও মিশরে ঐক্য গড়ে তোলা ছিল তাদের কাজগুলোর মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

নিজেদের ক্ষমতা সুসংহত করা এবং রাজত্ব সংরক্ষণের জন্য আইয়ুবিরা বিভিন্ন

উৎস থেকে মামলুকদের কিনে নিতে লাগল। উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণ দিয়ে ভেতরে-বাইরে সর্বত্র তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করা। অবশেষে আইয়ুবিদের জামানায় মামলুকরা অনেক শক্তিশালী হয়ে যায়।

শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস ব্যবসা অনেক লাভের মুখ দেখতে থাকে। এমনকি ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরাও এ ব্যবসায় নামে। নানান বংশীয় মামলুক দিয়ে মিশর ভরে ওঠে। এদের মাঝে তুর্কি, সারকাশি, মোঙ্গল, ইন্দো-ইউরোপীয়, গ্রিক, স্প্যানিশ এবং আলবেনীয় লোক ছিল। যাদের কেউ কেউ সুলতান আয-যাহির বাইবার্সের দিকে সম্পৃক্ত হয়ে 'যাহিরি মামলুক' বা সুলতান আশরাফ খলিলের দিকে সম্পৃক্ত হয়ে 'আশরাফি মামলুক' উপাধি নিয়েছিল। কিংবা উসমান নামের যে ব্যবসায়ী তাদের নিয়ে এসেছিলেন, তার দিকে সম্পৃক্ত হয়ে 'উসমানি মামলুক' পরিচিতি লাভ করেছিল অনেকে। আবার কেউ তো নিজের মূল্যের দিকে সম্পৃক্ত হয়ে 'আলফি' (হাজারি) নামে পরিচিত ছিল। কারণ তাকে কেনা হয়েছিল এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে।

❁ মামলুক সাম্রাজ্যের সূচনা

মামলুক সাম্রাজ্যের কার্যত সূচনা হয়েছিল সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মৃত্যুর পর। তখন সালাহুদ্দিনের ছেলে, ভাই এবং আত্মীয়রা বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল। আইয়ুবি আমিরদের প্রত্যেকেই নিজেদের পদ রক্ষার্থে কিংবা দল ভারী করতে মামলুকদের পছন্দসই গ্রুপকে বেছে নিতে থাকে। অবশ্য মামলুকদের আমদানি এবং ক্রয়ের পেছনে তাদের উদ্দেশ্যই ছিল প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধে কাজে লাগানো।

হিজরি সপ্তম শতাব্দী মোতাবেক আইয়ুবি সাম্রাজ্যে মামলুকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাদের পক্ষে জনশ্রুতি শোনা যেতে থাকে। দ্বিতীয় আল-মালিকুল আদিলকে সরিয়ে আস-সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুবকে বসাতে সক্ষম হয় তারা। নাজমুদ্দিন তার ওপর মামলুকদের অনুগ্রহ উপলব্ধি করেন। মিশরে তার রাজত্ব শক্তিশালীকরণ এবং সংরক্ষণের কথা চিন্তা করে তিনি অধিক হারে মামলুক ক্রয় করতে থাকেন। নীলনদের মাঝামাঝি 'রাওদ্বাহ' নামক দ্বীপে তাদের বসবাসের সুযোগ করে দেন। ইতিহাসে এরা 'বাহরি মামলুক' নামে পরিচিত।[৯৩৯] যাদের বেশির ভাগই ছিল তুর্কি, মোঙ্গল এবং অন্যান্য জাতিভুক্ত।

মামলুকরা অন্যান্য আরব মুসলিমদের সাথে ক্রুসেডারদের হামলার শিকার হয়েছিল। ৬৪২ হিজরিতে (১২৪৪খ্রি.) তারা ক্রুসেডারদের থেকে দ্বিতীয়বারের মতো বাইতুল মাকদিস জয় করতে সক্ষম হয়। এরপর ৬৪৮ হিজরিতে তারা নবম লুইসের বিরুদ্ধে জয় লাভ করে। সে-বছরই মামলুক আমিরদের হাতে তুরান

---

[৯৩৯] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৫

শাহ নিহত হওয়ার মাধ্যমে আইয়ুবি শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ কাজের অগ্রণী ভূমিকায় ছিল বাইবার্স আল-বুন্দুকদারি, কালাউন আস-সালিহি এবং আকতাই আল-জামদার। মামলুকরা ক্ষমতা দখল করে তুর্কি বংশোদ্ভূত শাজারাতুদ দুরকে নিজেদের সম্রাজ্ঞী নিয়োগ দেয়। ইতিহাসবিদ আল-মাকরিযি তাকে মিশরে মামলুক সাম্রাজ্যের প্রথম শাসক আখ্যায়িত করেছেন। কয়েক মাস পর সম্রাজ্ঞী ক্ষমতা হস্তান্তর করেন সেনাপতি আইবাক আল-আতাবাকের কাছে। এভাবে তিনি সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন।[৯৪০]

প্রসিদ্ধ মামলুক শাসকগণ

আমরা এখানে মামলুক সুলতানদের তালিকা এবং তাদের রেখে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কীর্তির কথা উল্লেখ করব।

☑ ১. প্রথম শাসক ছিলেন সুলতান মুইয আইবাক আল-আতাবাক। তার শাসনকাল শুরু হয় ৬৪৮ হিজরিতে (১২৫০ খ্রি.)। ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিহত হন।

☑ ২. সুলতান আল-মানসুর আলি ইবনু আইবাক। ৬৫৫ হিজরিতে (১২৫৭ খ্রি.) শুরু করা শাসনকার্য দুই বছর স্থায়ী ছিল। তার সময়ে (৬৫৬ হিজরিতে) মোঙ্গলরা বাগদাদ দখলে নেয় এবং সর্বশেষ আব্বাসি খলিফা আল-মুসতাসিম বিল্লাহকে হত্যা করে।

☑ ৩. আল-মুযাফফার কুতুয। ৬৫৭ হিজরির (১২৫৯খ্রি.) শেষদিকে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬৫৮ হিজরিতে সংঘটিত আইনে জালুতের যুদ্ধে তার নেতৃত্বেই বিজয় অর্জিত হয়। মোঙ্গলদের প্রতিহত করে শাম এবং মিশরের বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি শামের ওপর মামলুক সাম্রাজ্যের ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। তার সম্পর্কে জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি বলেছেন, 'কুতুয না কুলীন ছিলেন, আর না কাফির বংশোদ্ভূত ছিলেন।'[৯৪১] ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ৬৫৮ হিজরিতে (১২৬০ খ্রি.) বাইবার্স তাকে হত্যা করেন।

☑ ৪. আল-মালিকুয যাহির বাইবার্স ৬৫৮ হিজরিতে ক্ষমতায় আসেন। আব্বাসি খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করেছেন। তিনি আহমাদ ইবনুয যাহিরকে খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এরপর তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তার উপাধি দিয়েছিলেন আল-মুসতানসির বিল্লাহ। আহমাদ ছিলেন তাতারিদের হাতে নিহত হওয়া আব্বাসি খলিফা আল-মুসতাসিমের চাচা এবং

[৯৪০] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৮

[৯৪১] হুসনুল মুহাদারাহ : ২/৩৮-৩৯। আরও দেখুন তারীখুল মামালিক, পৃ. ২৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৩/২১৬; আল-জাওহারুস সামিন, পৃ. ২৬৪।

খলিফা আল-মুসতানসিরের ভাই। ৬৫৯ হিজরিতে বিচারক, আলিম এবং সাধারণ মানুষ তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। এদের সর্বাগ্রে ছিলেন আল-ইয ইবনু আবদিস সালাম।[৯৪২]

মোঙ্গলদের হাত থেকে বাগদাদ পুনরুদ্ধার করে আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য খলিফা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাতে মোঙ্গলরা জয়ী হয়। খলিফা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 'হিত' নামক স্থানে নিহত হন। বাইবার্স এরপর আবুল আব্বাস আহমাদের হাতে খিলাফতের বাইয়াতের ঘোষণা দিয়ে তার উপাধি দেন আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ। ৬৬২ হিজরিতে (১২৬৩ খ্রি.) তিনি খলিফার অধীনে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। মামলুক যুগের সময়টাতে আব্বাসি খিলাফত কেবল মিশরেই সীমাবদ্ধ ছিল। খলিফা সর্বজনীন বিষয়ের দায়িত্ব সুলতানকে প্রদান করলে তিনি প্রশাসনের যাবতীয় বিষয় নিজের ইচ্ছেমতো পরিচালনা করতেন।[৯৪৩]

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বাইবার্স দীর্ঘ দশ বছর (৬৫৯-৬৬৯ হি.) যুদ্ধ করেছেন। প্রতিবারই তিনি জয়ী হয়েছেন। শামের পবিত্র ভূমি ক্রুসেডারদের দখলদারিত্ব থেকে পবিত্র করেন। মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর্মেনিয়ানরা মোঙ্গলদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। বাইবার্স তাদের বিরুদ্ধেও তৎপর ছিলেন। অবশেষে ৬৬৫ হিজরিতে (১২৬৬ খ্রি.) আর্মেনিয়ার মাটিতেই তারা পরাজিত হয়।

বাইবার্স বিশেষ করে পারসিক মোঙ্গলদের ধাওয়া করেছিলেন। তারা ছিল হালাকু খাঁ'র বাহিনী এবং তার বংশধর। এরই রেশ ধরে তিনি রোমান সেলজুকদের ধাওয়া করতে থাকেন।

৬৭৬ হিজরিতে (১২৭৭ খ্রি.) তিনি দামিস্কে মৃত্যুবরণ করেন। মামলুক সাম্রাজ্যের সুরক্ষার জন্য উদ্যোগ নেওয়ায় তাকে এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয়। ছেলে আল-মালিকুস সাঈদ বারাকাহকে তিনি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনীত করে গিয়েছিলেন।[৯৪৪]

☑ ৫. আল-মালিকুস সাঈদ বারাকাহ ৬৭৬ হিজরিতে (১২৭৭ খ্রি.) দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছু সময় পর আমিররা মিশরের কিল্লায় আটকে রেখে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। এটা ৬৭৮ হিজরির কথা।

☑ ৬. বাইবার্সের দ্বিতীয় পুত্র আমির বাদরুদ্দিন সালামিশ ৬৭৮ হিজরিতে (১২৭৯

[৯৪২] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/৫২-৫৩; তারীখুল মামালিক, পৃ. ৩০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৩/২২২; তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৪৭৭; আল-মাশরিকুল আরাবি, পৃ. ৩

[৯৪৩] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৩২; তারীখুল খুলাফা, ৪৭৮। আতলাসুত তারীখিল আরাবি, পৃ. ৬৫-এ মামলুক সাম্রাজ্যের মানচিত্র দেখুন।

[৯৪৪] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৩৮; হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/৯৫ এবং ১০৫; আল-মাশরিকুল আরাবি, পৃ. ৪

খ্রি.) আল-মালিকুল আমিন উপাধি নিয়ে শাসক নিযুক্ত হন। কালাউন আল-আলফি আতাবাকা তখন ক্ষমতার ভাবী উত্তরাধিকারী এবং সেনাপতি হয়ে ওঠেন।[৯৪৫]

☑ ৭. মাত্র তিন মাস পরেই সালামিশকে পদচ্যুত করে নিজেই ক্ষমতা গ্রহণ করেন (৬৭৮ হি.) আমির সাইফুদ্দিন আল-মানসুর কালাউন। তার বয়স তখনো সাত পার হয়নি। এক শতাব্দীরও বেশি সময় (৬৮৭-৭৮৪ হি.) ক্ষমতা কালাউনের পরিবার এবং বংশধরদের মাঝে থাকে। তখন ছিল উৎকর্ষের স্বর্ণযুগ। শক্তি এবং সম্মানের পাশাপাশি স্থিতি ও শান্তির যুগ। আল-মানসুর ক্ষমতায় ছিলেন ৬৮৯ হিজরি (১২৯০ খ্রি.) পর্যন্ত। রাজস্ব সঞ্চয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল নির্মাণ এবং দুর্গ সংস্কার ছিল তার উজ্জ্বল কীর্তি। ক্রুসেডার এবং মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালিয়ে গেছেন। অনেক মামলুক ক্রয় করে তাদের সমন্বয়ে বিশেষ সামরিক বাহিনী তৈরি করেছেন। এদের থাকার ব্যবস্থা বুরুজ বা দুর্গে করা হয়েছিল বিধায় তাদের 'বুরজি মামলুক' বলা হয়।[৯৪৬] নিজের জীবদ্দশাতেই (৬৭৯ হি.) তিনি তার ছেলে আল-মালিকুস সালিহ আলাউদ্দিনকে সুলতান মনোনীত করেন।

☑ ৮. ৬৮৭ হিজরিতে (১২৮৮ খ্রি.) বাবার জীবদ্দশাতেই আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। এরপর কালাউনও মৃত্যুবরণ করলে ৬৯০ হিজরিতে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হন তার ছেলে আশরাফ খলিল। তিনি ক্রুসেডারদের সর্বশেষ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ 'আক্কা' জয় করেন। শামে থাকা অবশিষ্ট ক্রুসেডারদেরও বিতাড়িত করেন। ৬৯৩ হিজরিতে (১২৯৩ খ্রি.) আমিরদের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়।[৯৪৭]

☑ ৯. ৬৯৩ হিজরিতে আল-মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবনু কালাউনকে সুলতান নিযুক্ত করা হয়। তখন তার বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। এ সুযোগে রাজ্যের যাবতীয় বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা করতে থাকে আমির সানজার আল-বিকায়ি এবং আমির কিতবুগা আল-মানসুরি।[৯৪৮]

☑ ১০. ৬৯৪ হিজরিতে (১২৯৪ খ্রি.) আন-নাসির মুহাম্মাদকে পদচ্যুত করে আমির কিতবুগা ক্ষমতা দখল করেন। মোঙ্গল বংশোদ্ভূত কিতবুগার আগমন ঘটেছিল তাতারিদের হাতে বন্দি হয়ে। ক্ষমতা দখলের পর তিনি 'আল-

---

[৯৪৫] আল-জাওহারুস সামিন, পৃ. ২৮৬ এবং ২৯৩

[৯৪৬] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৪০-৪৫; হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১০৬; আল-জাওহারুস সামিন, পৃ. ২৯৫

[৯৪৭] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৫১; হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১১১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৩/৩১৯; আল-জাওহারুস সামিন, পৃ. ৩১০

[৯৪৮] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৫১; হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১১২; আল-জাওহারুস সামিন, পৃ. ৩১৬

মালিকুল আদিল' উপাধি গ্রহণ করেন।

☑ ১১. কিতবুগাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন আমির হুসামুদ্দিন লাজিন। কিতবুগা পালিয়ে আশ্রয় নেন শামে। ৬৯৬ হিজরিতে (১২৯৬ খ্রি.) তিনি পদত্যাগ করলে হুসামুদ্দিন লাজিন আল-মানসুরি নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা দেন। আমিররা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। 'আস-সুলতানুল মানসুর' উপাধি গ্রহণ করে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ৬৯৮ হিজরিতে (১২৯৮ খ্রি.) দুর্গেই নিহত হন তিনি।[৯৪৯]

☑ ১২. মুহাম্মাদ ইবনু নাসিরকে কারাক থেকে মিশরে ডেকে নিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় বসানো হয়। দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতাগ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ১৪ বছর। ৬৯৮-৭০৮ হিজরি পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। মামলুক সাম্রাজ্য তখন একাধিক বার মোঙ্গলদের হামলার শিকার হলেও শেষ অবধি মামলুকরাই জয়ী হয়। এরপর আন-নাসির মুহাম্মাদ পদত্যাগ করেন।

☑ ১৩. ৭০৮ হিজরিতে (১৩০৮ খ্রি.) আস-সুলতানুল মুযাফফার বাইবার্স আল-জাশানকির ক্ষমতায় আসেন।

☑ ১৪. ৭০৯ হিজরিতে আন-নাসির মুহাম্মাদ তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতা গ্রহণ করেন। একুশ বছর বয়সে ক্ষমতা গ্রহণ করে মোট ৩১ বছর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এটাই ছিল মামলুক সুলতানদের মধ্যে সর্বাধিক দীর্ঘ শাসনামল। এ সময়েই সর্বাধিক উৎকর্ষ সাধিত হয়।[৯৫০] ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিজাজ পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তার লাভ করে। মসজিদ, সেতু-সহ অনেক স্থাপনা নির্মাণ করেন তিনি। আন-নাসির এত অধিক পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন যে, ৭৪১ হিজরিতে তার ইন্তেকালের পর মানুষ তার বংশধরদেরও ক্ষমতায় রাখে। ৭৮৪ হিজরি (১৩৮২ খ্রি.) পর্যন্ত আন-নাসিরের বংশধররা ক্ষমতায় থাকেন।[৯৫১]

☑ ১৫. তারপর ক্ষমতায় আসেন আমির সাইফুদ্দিন আবু বকর ইবনু মুহাম্মাদ। যার উপাধি 'ছিল আল-মালিকুল মানসুর'। পরবর্তী ২০ বছর আন-নাসিরের সাতজন ছেলে এবং তার পরের ২০ বছর চারজন নাতি ক্ষমতায় ছিলেন।[৯৫২]

☑ ১৬. অবশেষে বাহরি মামলুকদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় বুরজি মামলুকরা। তাদের ক্ষমতার গোড়াপত্তন হয়। সারকাশি বা দ্বিতীয় মামলুক

---

[৯৪৯] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৫৪; হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১১২; তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৪৮৩; আল-জাওহারুস সামিন, পৃ. ৩২৩

[৯৫০] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৬০; হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১১৬

[৯৫১] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/৬৮ এবং ২/১১৬; তারীখুল মামালিক, পৃ. ৬০

[৯৫২] আল-জাওহারুস সামিন, পৃ. ৩৬৭

সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটে।[৯৫৩] এদের প্রথম সুলতান ছিলেন 'আয-যাহির' উপাধি গ্রহণকারী বারকুক। ৭৮৪-৯২২ হিজরি (১৩৮২-১৫১৭ খ্রি.) পর্যন্ত ১৩৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে বহাল থাকা এই সাম্রাজ্যে ৩২ জন সুলতান ক্ষমতায় ছিলেন। এদের মাঝে দশজনের শাসনকাল ছিল সর্বমোট ১০৩ বছর। এরা হচ্ছেন বারকুক, ফারাজ, শাইখ,[৯৫৪] তাতার, বার্সবাই, জাকমাক, ঈনাল, খুশকাদাম, কাতিয়াবাই এবং কানসুহ আল-গাউরি। সাহিত্য এবং জ্ঞানের আসর জমানোর কারণে তাদের কেউ কেউ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কারও কারও পরিচিতি ছিল তাকওয়ার কারণে। মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট নির্মাণ-সহ নানাধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ তারা করেছিলেন।[৯৫৫]

সারকাশি মামলুকদের শক্তি অনেক প্রবল থাকায় তারা তৈমুর লঙের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদ থাকতে পেরেছিল। শাম, মিশর এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৈমুর লঙের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সুলতান বারকুক বাগদাদ উদ্ধারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। অবশেষে ৭৯৬ হিজরিতে (১৩৯৪ খ্রি.) বাগদাদ সারকাশি মামলুক সাম্রাজ্যের অধীনে আসে।[৯৫৬] ৮০২ হিজরিতে (১৩৯৯ খ্রি.) সুলতান বারকুক মৃত্যুবরণ করেন।

☑ ১৭. বারকুকের পর ক্ষমতায় বসানো হয় আন-নাসির ফারাজকে। এরপর পদচ্যুত করা হয় তাকে। শামে তৈমুর লঙকে প্রতিহত করতে তিনি ব্যর্থ হলে সে দামিস্ক-সহ অন্যান্য অঞ্চল দখল করে নেয়। ৮১৫ হিজরিতে (১৪১২ খ্রি.) ফারাজ নিহত হন। আর তৈমুর লঙ মারা যায় ৮০৮ হিজরিতে।

☑ ১৮. ৮১৫ হিজরিতে (১৪১২ খ্রি.) ক্ষমতা গ্রহণ করেন আব্বাসি খলিফা আল-মুসতাইন বিল্লাহ। কিন্তু পাঁচ মাস পরেই আল-মুআইয়াদ তার থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন। ৮২৪ হিজরিতে আল-মুআইয়াদের মৃত্যু হয়। এরপর তাতারের তত্ত্বাবধানে মুআইয়াদ-পুত্র আহমাদকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তারপর তাতার অল্প কিছু সময় শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাতারের পর তার ছেলে পুত্র মুহাম্মাদ কয়েক মাস ক্ষমতায় থাকেন।[৯৫৭]

☑ ১৯. আস-সুলতানুল আশরাফ বার্সবাই ৮২৫ হিজরিতে (১৪২২ খ্রি.) ক্ষমতায়

[৯৫৩] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৬৭; আল-জাওহারুস সামিন, পৃ. ৪৫৭

[৯৫৪] শাইখ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। শাইখুল ইসলাম আল-বুলকিনির সূত্রে তিনি সহিহুল বুখারির ইজাযাহ পেয়েছিলেন। হাফিজ ইবনু হাজার রহ. তার আল-মুজামুল মুফাহরাস গ্রন্থে শাইখের জীবনী সংকলন করেছেন। ৮২৪ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়। দেখুন, হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১২০।

[৯৫৫] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৭২; হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১২০

[৯৫৬] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৯৮

[৯৫৭] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১০১-১০২

আসেন। ১৬ বছর শাসন করেন তিনি। সাইপ্রাস দ্বীপ তার শাসনামলেই বিজিত হয়। মামলুক সাম্রাজ্যের পতন হওয়ার আগ পর্যন্ত সেটা তাদের দখলেই ছিল। তবে বার্সবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিপথগামী ছিলেন। তার শাসনামল ছিল ৮৪১ হিজরি পর্যন্ত।[৯৫৮]

☑ ২০. আয-যাহির জাকমাক ক্ষমতায় ছিলেন ৮৪২-৮৫৭ হিজরি পর্যন্ত। তিনি ছিলেন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাকওয়া-পরহেজগারিতে তার খ্যাতি ছিল। মদপান-সহ যাবতীয় নাফরমানির কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি রোডস দ্বীপ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন।

☑ ২১. ৭৫৮ হিজরিতে (১৪৫৩ খ্রি.) আস-সুলতানুল আশরাফ ঈনাল ক্ষমতায় বসেন। ৭৬৫ হিজরি অবধি মোট আট বছর তার শাসনামল বহাল ছিল। এরপর ধারাবাহিক কয়েকজন মামলুক সুলতানের হাতে ক্ষমতার অদল-বদল হয়। যা থেকে রাজ্যের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বুঝে আসে। অবশেষে কাতিয়াবাই ক্ষমতা গ্রহণ করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

☑ ২২. আস-সুলতানুল আশরাফ কাতিয়াবাই ৮৭২-৯০১ হিজরি অবধি মোট ১৯ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুলতান মুহাম্মাদ ইবনু কালাউনের যুগের পর এটাই ছিল সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ শাসনকাল। কাতিয়াবাই প্রমাণ করেছিলেন যে—যুদ্ধের ময়দানে, সাহসিকতার ক্ষেত্রে, প্রজ্ঞায় এবং পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে তিনিই সেরা। সুলতান আশরাফ উসমানি সমর্থিত তুর্কুমান সাম্রাজ্যে হামলা করে তাদের ওপর কর ধার্য করেন। স্থাপনা, রাস্তাঘাট, মসজিদ এবং সেতু নির্মাণ, সেনাবাহিনী প্রস্তুতকরণ, নিদর্শনাবলি সংস্কার এবং স্থাপত্য শিল্পের প্রতি গুরুত্বারোপের জন্য তিনি অনেক সম্পদ সঞ্চয় করেন।

মামলুক সাম্রাজ্যের অবসান

মুহাম্মাদ ইবনু কাতিয়াবাই ক্ষমতায় আসার পর ৯০২ হিজরিতে (১৪৯৭ খ্রি.) কানসুহ খামসুমিআহ নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন। কিন্তু সফল হননি। মুহাম্মাদ ইবনু কাতিয়াবাই ক্ষমতায় থাকা অবস্থাতেই ৯০৪ হিজরিতে তিনি নিহত হন। তার মামা আয-যাহির কানসুহ ক্ষমতা গ্রহণের উদ্যোগ নিলেও পরবর্তীকালে অপসারিত হন। এই অস্থিতিশীল সময়ের মাঝে সুলতানদের দ্রুত পালাবদল ঘটতে থাকে। ৯০৫ হিজরিতে আল-আশরাফ জানবালাত ক্ষমতায় আসলেও পরে তাকে প্রাণ হারাতে হয়। তারপর ৯০৬ হিজরিতে ক্ষমতায় আসেন আল-আদিল তুমানবাই। কিন্তু তিনিও বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। মাত্র কয়েক মাসের মাথায় তাকে ক্ষমতা এবং প্রাণ—দুটোই দিতে হয়। এরপর ক্ষমতা আসে কানসুহ আল-

[৯৫৮] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১০৯

গাউরির কাছে। এটা ৯০৬ হিজরির কথা। আল-গাউরি নিজেকে শক্তিমান এবং প্রভাবশালী প্রমাণ করতে সক্ষম হন। ফলে দেশে নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। কিন্তু অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ক্ষেত্রে তিনি সঠিক নীতির পরিচয় দিতে পারেননি।

মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণের পাশাপাশি হজের পথের প্রতি যত্নবান হয়ে কূপ এবং খাল খননের ব্যবস্থা করেছেন আল-গাউরি। পুরোনো দুর্গগুলো মেরামত করা-সহ আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর প্রতিরোধব্যবস্থা মজবুত করেন। সাহিত্য মজলিসের আয়োজনও তিনি করেছিলেন।[৯৫৯]

হিজরি নবম শতাব্দীতে তুর্কি উসমানি শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। ৮৫৭ হিজরিতে (১৪৫৩ খ্রি.) তারা কনস্টান্টিনোপলও জয় করে ফেলে। শুরু হয় মামলুক এবং উসমানিদের সংঘর্ষ। মুখোমুখি হয় উসমানি সুলতান প্রথম সালিম এবং সুলতান কানসুহর বাহিনী। ৯২২ হিজরিতে (১৫১৬ খ্রি.) উসমানিদের ওপর হামলা করতে কানসুহ আল-গাউরি আলেপ্পো অভিমুখে রওয়ানা হন। মারজদাবিক যুদ্ধে সালিমের জয় হয়। কানসুহ আল-গাউরি মৃত্যুবরণ করেন।

আল-গাউরি যুদ্ধে গমনের সময় তুমানবাইকে কায়রোর দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। আল-গাউরির মৃত্যু এবং তার বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে ৯২২ হিজরিতে তুমানবাইকে সুলতান মনোনীত করা হয়। সৈন্যসংখ্যা কম হওয়ার পরও উসমানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধে নামেন তিনি। ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে রিদানিয়াতে উসমানিদের কাছে মামলুকরা পরাজিত হয়। এই সালেই উসমানিরা মিশর দখল করে নেয়। এরপর তুমানবাইকে ফাঁসিতে ঝুলায়। তিনিই ছিলেন মিশর এবং শামের সর্বশেষ মামলুক সুলতান। তার মাধ্যমেই মামলুক সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। ক্ষমতা দখল করে নেয় উসমানিরা।[৯৬০]

মামলুক সাম্রাজ্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

এখানে ইতিহাস থেকে জানতে পারা মামলুক সাম্রাজ্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

☑ ১. মামলুক শব্দটি ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ পরিভাষা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস, যুদ্ধবন্দি হওয়ার কারণে কিংবা ইসলামি খিলাফতে আমদানিকারক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তাকে চড়া মূল্যে ক্রয় করে

[৯৫৯] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১০৯

[৯৬০] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১১৪-১২২। মিশরের আব্বাসি খলিফাদের নাম জানতে তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৪৭৭ দ্রষ্টব্য।

নেওয়া হয়েছে। ফলে সে দাসত্বের বন্ধনে আটকা পড়েছে।[৯৬১]

☑ ২. মামলুকরা ছিল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ। অনেক সময় তাদের বংশপরিচয় অজানা থাকত। তবে তাদের মাঝে কল্যাণ থাকত। সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিয়ে তাদেরকে কাজে লাগানো, ব্যবস্থাপনার সংরক্ষণ এবং শাসনের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাদের আমদানি করা হতো। একসময় তারা শক্তিশালী ক্ষমতার কারণে শাসনকার্য দখলে নিয়ে ফেলে।

☑ ৩. মামলুক শাসনামল ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমত: বাহরি মামলুক শাসনামল। এ শাসনামলের মামলুকদের অধিকাংশই ছিল তুর্কি বংশোদ্ভূত। নিজের মধ্যে থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জোরেই আইয়ুবিদের পর তারা ক্ষমতা পরিচালনা করে। ৬৪৮-৭৮৪ হিজরি অবধি প্রায় দেড় যুগ তারা মিশর এবং শাম অঞ্চল শাসন করেছিল। সেখানে থাকা যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং মোঙ্গল আর ক্রুসেডারদের মতো বাইরের শক্তির মোকাবিলাও তারা করেছিল। দ্বিতীয়ত: সারকাশি বা বুরজি মামলুক শাসনামল। ৭৮৪-৯২২ হিজরি পর্যন্ত এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে তারা শাম অঞ্চল, মিশর এবং এর আশেপাশের অঞ্চল শাসন করেছিল। অবশেষে ১৫১৬-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে উসমানিরা মিশর এবং শাম অঞ্চল দখল করে নেয়। স্থান দুটিতে মামলুক শাসনামল ছিল আড়াই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে।[৯৬২]

☑ ৪. মামলুকদের ইতিহাসে বিশেষত তাদের শাসনামলের শেষাংশের সুস্পষ্ট উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ব্যবস্থাপনার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, কলহ-বিবাদ, ফিতনা এবং আঞ্চলিক মামলুকদের মাঝে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মামলুকদের মাঝে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব লাভের রীতি প্রচলিত ছিল না। তা সত্ত্বেও দেখা যেত, তাদের অধিকাংশ সুলতানই নিজের ছেলেকে উত্তরাধিকারী করার বাইয়াত নিতেন। অনেক সময় সন্তান ছোট হওয়ার কারণে দায়িত্ব পালন করতে পারত না। বড় বড় আমিররা তখন ক্ষমতা দখল করে রাজ্য পরিচালনা করত। এমনটা প্রায়ই ঘটত।

☑ ৫. মামলুক সাম্রাজ্যের এবং সুলতানদের মাঝে ছিল নানারকম বৈপরীত্য। তাদের কেউ কেউ ইসলাম, মুসলিম এবং দেশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে বিশৃঙ্খলা করতে সচেষ্ট ছিল। আবার অনেকেই মনেপ্রাণে ইসলাম কবুল করেছিল। তাদের ইসলাম ছিল যথার্থ। সততা এবং বিশ্বস্ততার সাথে তারা ইসলামের দাওয়াতে নিয়োজিত ছিল। জ্ঞানার্জন এবং প্রচার-প্রসারে

[৯৬১] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১
[৯৬২] তারীখুল মামালিক, পৃ. ৬৭

তাদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন অগ্রগামী।

☑ ৬. সকল ক্ষেত্রে মামলুক সুলতানরাই প্রকৃত ক্ষমতা সংরক্ষণ করতেন। আব্বাসি খলিফারা ছিলেন কেবল নামকা-ওয়াস্তে। মামলুক আমিররা ক্ষমতার ভাগাভাগি এবং পালাবদল নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সুলতান অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে আমিররা অনেক সময় তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতেন। সুলতানকে হত্যা করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতেও আমিরদের দ্বিধা ছিল না। ফলে অনেক সময় দেখা গেছে, কোনো কোনো সুলতানের ক্ষমতা দুই মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি।

☑ ৭. মামলুক সাম্রাজ্যে অনেকগুলো বিশেষ পদ এবং স্বতন্ত্র প্রশাসনিক পদবি চালু করা হয়েছিল। যেমন 'নায়েবুস সালতানাহ' বলে একটা পদবি ছিল, যার অধিকারীকে সুলতানের প্রতিনিধির সমপর্যায়ের বলে ধরা হয়। 'আল-আইমান'-এর কাজ ছিল রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনায় সুলতানকে সহযোগিতা করা। এ ছাড়াও সিদ্ধান্ত প্রকাশ, উপাধি প্রদান, জায়গীর বণ্টন এবং বড় বড় পদে নিয়োগ দানে তিনি সুলতানের পাশে থাকতেন। মামলুক সাম্রাজ্যের সাধারণ সেনাপতিকে 'আল-আতাবাক' বলা হতো। রাজ্যের ওপর তিনি একচেটিয়া অধিকার রাখতেন। সুলতান বা সুলতানের নায়েবের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা এবং অর্থনৈতিক দিকটির প্রতি লক্ষ রাখা ছিল উজির বা মন্ত্রীর দায়িত্ব। মামলুক সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশাসকদের বড় ভূমিকা ছিল। এ যুগের রাজ্যপালের দায়িত্ব পালনের জন্য তারা আমির নির্বাচন করে দিতেন। এদের মাঝে সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাখতেন কায়রোর প্রশাসক। রাষ্ট্রের জনহিতকর কাজ পরিচালনার জন্য কিছু দপ্তর ছিল। যেমন সামরিক বাহিনীর দপ্তর, রচনার দপ্তর, ওয়াকফ দপ্তর, সম্পদ নজরদারির দপ্তর এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের দপ্তর।[৯৬৩]

মামলুক শাসনামলে বিচার বিভাগের অবস্থা এবং ব্যবস্থাপনা কেমন ছিল, তা নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

ইসলামি বিচারব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল আব্বাসি যুগের মতোই। বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগের মতো থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাতে সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছিল। এখানে আমরা কেবল মামলুক শাসনামলে নতুন চালু হওয়া বিষয়গুলোই আলোচনা করব।

---

[৯৬৩] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১৩০-১৩৪

❁ ফিকহি মাযহাব অনুসারে চারজন বিচারক

মিশর এবং শামে সুলতানের সহায়ক প্রধান বিচারপতি ছিলেন শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারী ফকিহ। রাজধানী-সহ অন্যান্য অঞ্চলে সুলতানের প্রতিনিধি এবং বিচারকদের সহযোগিতা, তাদের কার্যক্রম দেখভাল এবং অবস্থা যাচাই করা ছিল প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব।

কিন্তু আয-যাহির বাইবার্স একটি নতুন নিয়মের প্রচলন করেছিলেন। যা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। বিচার-সংক্রান্ত বিষয়টি তিনি এককভাবে শাফিয়ি মাযহাবের বিচারকদের ওপর ছাড়তে চাইলেন না। এ চিন্তা থেকেই তিনি শাফিয়ি বিচারপতির সাথে অন্য তিন মাযহাবের অনুসারীকে নিয়োগ দিলেন। উক্ত তিনজন ছিলেন যথাক্রমে হানাফি, মালিকি এবং হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী। এটা ৬৬৩ হিজরির (১২৬০ খ্রি.) কথা। কেউ কেউ অবশ্য ৬৬০ হিজরির কথাও বলেছেন।

এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে একটি কারণ ছিল। তখন মিশরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন তাজুদ্দিন ইবনু বিনতিল আ'আয। শরীয়তের বিধানাবলি পালনের ক্ষেত্রে তিনি যত্নবান ছিলেন। আমিরদের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। বড় বড় আমিরদের সাক্ষ্যও তার কাছে গ্রহণযোগ্য হতো না। সুলতান আয-যাহিরের আমির জামালুদ্দিন ইদগুরি একবার প্রধান বিচারপতির সাথে হঠকারিতামূলক আচরণ করেন। তার সম্পর্কে সুলতানের কান ভারী করে তাকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে সুলতানের সাথে কথা বলার সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাতে জামালুদ্দিন সুযোগ পেয়ে যান। মাদইয়ান থেকে একটি মোকদ্দমা এসেছিল। বিচারপতি কোনো কারণবশত সেটি মুলতুবি রাখতে চাইছিলেন। ফলে সুলতান বিরক্তি বোধ করলেন। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমির তখন চার মাযহাব থেকে চারজন বিচারপতি নিয়োগ দেওয়ার কথা বললেন। সুলতানও সে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। তবে শাফিয়ি মাযহাবের বিচারক হিসেবে তিনি বহাল রেখেছিলেন তাজুদ্দিনকেই।

কথিত আছে, তাজুদ্দিন ছিলেন সর্বশেষ ন্যায়পরায়ণ বিচারক। তিনি যে ইনসাফ করতেন—এ ব্যাপারে কেউ কখনো দ্বিমত করেনি। একইসাথে তিনি এতগুলো পদ সামলেছেন, যেমনটা আর কেউ করেনি। তার পদের সংখ্যা ছিল ১৫টি। বিচারকার্য, ওয়াকফের তত্ত্বাবধান, মন্ত্রীত্ব, শাফিয়ি মাযহাব অনুসারে পাঠদান, খুতবা, হিসবাহ এবং জামে মসজিদ-সহ অন্যত্র নামাজ পড়ানো ছিল উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব।[৯৬৪]

অন্যান্য বিচারকদের মধ্যে শাইখ শিহাবুদ্দিন আবু হাফস উমর ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি সালিহ আস-সুবকি ছিলেন মালিকি মাযহাবের বিচারপতি। হানাফি মাযহাবের

---

[৯৬৪] তারীখুল কাদা ফিল ইসলাম, পৃ. ১০৫; তারীখুল মামালিক, পৃ. ১৩৫; তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা : ৮/৩১৮ এবং ৩১৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৩/৩২২

বিচারপতি ছিলেন বাদরুদ্দিন ইবনু সুলাইমান এবং হাম্বলি মাযহাবের বিচারপতি ছিলেন শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনুশ শাইখ ইমাদুদ্দিন ইবরাহীম আল-কুদসি। এই বিচারপতিদের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব মাযহাব অনুসারে কায়রো এবং ফুসতাত নগরীতে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। নিজেদের প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া, সাক্ষীদের নিয়ে বসার পাশাপাশি বিচারের রায়ও বাস্তবায়ন করতেন।[৯৬৫]

শাফিয়ি বিচারক নিজের বিচারকার্জে ব্যস্ত থাকেন। ইয়াতিমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, মিশরের উঁচু-নিচু ভূমিতে প্রতিনিধি নিয়োগ, ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ইত্যাদি ছিল তার বাড়তি দায়িত্ব। অন্য কোনো বিচারককে এসব দায়িত্ব সামলাতে হতো না।[৯৬৬]

দামিস্ক এবং শামের বিষয়টিও ছিল একই রকম। শামে শাফিয়ি মাযহাব বিস্তার লাভের আগে বিচারকার্য পরিচালনা, বনু উমাইয়া মসজিদে খুতবা দেওয়া ও নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব আওযায়ি মাযহাবের অনুসারীরাই করতেন। আবু যুরআহ মুহাম্মাদ ইবনু উসমান আদ-দিমাশকি প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ অবধি শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারীই কেবল বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এর পরেও অবশ্য শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারীরাই অধিকাংশ সময় বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। শামে শাফিয়ি মাযহাব প্রসারের সময় এবং তার পরবর্তী যুগেও বনু উমাইয়া মসজিদের দায়িত্ব শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।[৯৬৭]

আল-কালকাশান্দি বলেছেন, দামিস্কেও প্রধান বিচারপতির পদ ছিল। সেখানেও চার মাযহাবের চারজন বিচারপতি ছিলেন। এদের মাঝে শাফিয়ি মাযহাবের বিচারক সর্বোচ্চ মর্যাদা রাখতেন। মিরাসের সম্পত্তি, ওয়াকফ-সহ আরও অনেক ব্যাপারে তিনিই মুখপাত্রের ভূমিকা রাখতেন। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়ার অধিকার তার জন্য সংরক্ষিত ছিল। তার পরবর্তী স্তরেই ছিলেন হানাফি মাযহাবের বিচারক। তারপর যথাক্রমে মালিকি এবং হাম্বলি মাযহাবের। মিশরের পরই দামিস্কে চারজন বিচারকের পদ্ধতি চালু হয়। তবে মিশরের মতো চারজন বিচারককে সেখানে একইসাথে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। বরং সেটা ধাপে ধাপে হয়েছে।[৯৬৮]

মিশরের চারজন বিচারক নিয়োগের পদ্ধতিটি ৯২৮ হিজরি অর্থাৎ উসমানিদের মিশর জয়ের পর অবধি চালু ছিল। ৯২৮ হিজরির রজব মাসে উসমানি সুলতান সুলাইমান মিশরে চারজন বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি বাতিল করে ফরমান জারি

---

[৯৬৫] তারীখুল কাদা ফিল ইসলাম, পৃ. ১০৬

[৯৬৬] তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা : ৮/৩১৮; তারীখুল কাদা, পৃ. ১০৬; হুসনুল মুহাদারাহ : ২/১৬৬

[৯৬৭] তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা : ৮/৩১৯-৩২০। আরও দেখুন, হুসনুল মুহাদারাহ : ২/১৬৫-১৬৬

[৯৬৮] তারীখুল কাদা, পৃ. ১০৭; তারীখুল মামালিক, পৃ. ১৩৫; সুবহুল আ'শা : ৪/৩৫

করেন। সে স্থানে সামরিক তুর্কি বিচারক সাইয়িদ শিবলি চার মাযহাব অনুসারে রায় প্রদানের দায়িত্ব নেন।[৯৬৯]

❁ সামরিক বিচারক

আব্বাসি এবং আইয়ুবি যুগে মিশরে সামরিক বিচারক থাকলেও মামলুক শাসনামলে তা স্থায়ী এবং বিকশিত হয়েছিল। আল-কালকাশান্দি বলেছেন, 'সামরিক বাহিনীর বিচার ছিল দ্বিতীয় ধর্মীয় দায়িত্ব। মহান ও প্রাচীন এই দায়িত্বটি মিশরে সুলতান সালাহুদ্দিন ইবনু ইউসুফের সময় চালু ছিল। মিশরে এ সংক্রান্ত দায়িত্বশীলরা অন্যান্য বিচারকের সাথে 'দারুল আদল' নামক দফতরে উপস্থিত থাকতেন। সুলতান সফর করলে তারাও সঙ্গে থাকতেন। তারা শাফিয়ি, হানাফি এবং মালিকি—এই তিন মাযহাব অনুসরণ করতেন। এদের কেউ হাম্বলি মাযহাব অনুসরণ করতেন না। দারুল আদলেও চারজন বিচারকের পরিবর্তে তারা তিনজনই বসতেন।'[৯৭০]

আল-কালকাশান্দি অন্যত্র হাম্বলি মাযহাবের বিচারক থাকার ব্যাপারেও ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'প্রত্যেক মাযহাব থেকে সর্বমোট চারজন সামরিক বিচারক হওয়ার রীতি চলে আসছে।'[৯৭১]

আবু ইউসুফের যুগে সামরিক বিচারকদের 'কুদাতু আমিরিল মুমিনীন' তথা আমিরুল মুমিনীনের বিচারক বলা হতো।

সামরিক বাহিনীর বিচারকদের পরিধি কেবল ফৌজিদের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকত। সিভিলিয়ানদের বিচারকার্য পরিচালনা করার এখতিয়ার তাদের ছিল না। তবে সামরিক বাহিনী এবং নাগরিকদের মাঝে বিবাদ সংঘটিত হলে সে ক্ষেত্রে তারা ফয়সালা করে দিতেন। *লিসানুল হুক্কাম* গ্রন্থের লেখক ইবনুশ শিহনাহ জামিউল ফাতাওয়ার সূত্রে ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন, 'খলিফা যেখানে অবস্থান করতেন, তার সাথে-থাকা বিচারকরা সেখানেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। কারণ তারা নির্দিষ্ট কোনো এলাকার বিচারক ছিলেন না; বরং তারা ছিলেন খলিফার বিচারক। খলিফার সঙ্গ ছাড়া নিজেরা নিজেরা কোথাও বেড়াতে গেলে সেখানে তারা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন না।'[৯৭২]

সামরিক বিচারকের কিছু পরিধি বর্ণনা প্রসঙ্গে আল-কালকাশান্দি বলেছেন, 'সামরিক বাহিনীতে যেসব বিষয় মীমাংসা করে দেওয়ার প্রয়োজন বেশি হয়, সেসব ব্যাপারে সামরিক বিচারকগণ সচেষ্ট থাকতেন। যেমন গনিমতের মাল,

[৯৬৯] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১০৭

[৯৭০] সুবহুল আ'শা : ৪/৩৬। আরও দেখুন, নিযামুল হুকমি, পৃ. ২৬০

[৯৭১] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৯; তারীখুল মামালিক, পৃ. ১৩৫; আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৮

[৯৭২] লিসানুল হুক্কাম, পৃ. ৯। আরও দেখুন, তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৯৯

যৌথ সম্পত্তি, বণ্টন, ত্রুটিযুক্ত পণ্য ফেরত দেওয়া ইত্যাদি। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে গিয়ে যেন যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাজে উদাসীন না হয়ে পড়তে হয়, সেজন্য তারা দ্রুত বিচার-ফয়সালা করে দিতেন।'[১৭৩]

তুর্কিরা শাম অঞ্চল এবং মিশর দখল করে নেওয়ার আগ পর্যন্ত সামরিক বিচারক পদ বহাল ছিল। বিজয়ী বাহিনীর সাথে আগত তুর্কি বিচারকই ছিলেন সামরিক বিচারক।[১৭৪]

❁ বিচারকদের সহযোগী

আগের যুগের মতো মামলুক যুগেও বিচারকের কাজে সহযোগিতার জন্য কয়েকজন কর্মচারী ছিলেন। তবে এ যুগে তাদের বিচার-সংক্রান্ত দায়িত্বগুলো আরও সুস্পষ্ট আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছিল। এই কর্মচারীদের বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হলো।

☑ ১. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী : এদের কাজ ছিল বিচারকার্য চলাকালীন ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখা এবং উপস্থিতি অনুসারে বাদী-বিবাদীর ধারাবাহিকতা ঠিক করা। আদালতের শৃঙ্খলা ঠিক রাখা, বিচারের এজলাসের শিষ্টাচার রক্ষা এবং বিশৃঙ্খলভাবে বিচারকের কাছাকাছি হওয়া থেকে বাধা দেওয়ার জন্য এরা অনেক সময় হাতে লাঠি বা চাবুক রাখতেন।

☑ ২. প্রহরী : এ শ্রেণির কাজ ছিল মানুষকে সুশৃঙ্খলভাবে আদালতে প্রবেশের ব্যবস্থা করা।

☑ ৩. সহায়ক : এদের কাজ ছিল বাদী-বিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করা এবং শুনানি চলাকালীন বিচারকের সম্মানার্থে তার সামনে উপস্থিত থাকা।

☑ ৪. দায়িত্বশীল : ইয়াতিম এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিদের সম্পত্তি দেখাশোনা করা ছিল এদের দায়িত্ব।

☑ ৫. নিষ্ঠাবান : এরা সাক্ষী হিসেবে থাকার উদ্যোগ নিতেন। নথি এবং চুক্তির বক্তব্য লক্ষ করার পাশাপাশি তা শরীয়ত মোতাবেক হচ্ছে কি না—সেটাও খেয়াল রাখতেন।[১৭৫]

❁ অন্যায় ও দুর্নীতির আদালত

বিচারক এবং বাদী-বিবাদীর মধ্যকার অভিযোগ ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করতে সুলতান নিজেই এই আদালতের তত্ত্বাবধান করতেন। স্বয়ং সুলতানের তত্ত্বাবধানে

[১৭৩] সুবহুল আ'শা : ১১/৯৬

[১৭৪] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১০০

[১৭৫] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৬৯; তারীখুল মামালিক, পৃ. ১৩৬

এই আদালত সপ্তাহে দুদিন তথা সোম এবং বৃহস্পতিবারে বসত। সুলতান এ কাজের জন্য ৬৬১ হিজরিতে আয-যাহির বাইবার্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'দারুল আদল' নামক দফতরে বসতেন। পরবর্তীকালে বড় দরবার হলে বসতে শুরু করেন।

এ আদালতে শাফিয়ি ও মালিকি মাযহাবের বিচারক বসতেন সুলতানের ডান দিকে এবং হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবের বিচারক বসতেন বাম দিকে। মালিকি বিচারকের ডান দিকে বসতেন সামরিক বিচারকগণ। তাদের কাছাকাছি থাকতেন দারুল আদল এর মুফতিবৃন্দ। এরপর বাইতুল মাল তথা খিলাফতের কোষাগারের দায়িত্বশীল এবং হিসবাহর পরিচালক বসতেন। আর হাম্বলি মাযহাবের বিচারকের বাম দিকে প্রথমে মন্ত্রী, এর পরের জায়গা ছিল প্রধান মুনশির। সুলতানের পেছনে অবস্থান নিত উঠতি বয়সের মামলুকরা। বয়স্ক আর প্রবীণরা বৃত্তাকারে থাকত সুলতানের কাছাকাছি। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকত যাবতীয় কর্মচারী এবং আমিরগণ। বৃত্তের পেছনেই বিচার-সংক্রান্ত দরকারি কাগজপত্র এগিয়ে দেওয়ার জন্য থাকত দারোয়ান এবং সহকারীরা। এরপর সুলতানের কাছে অভিযোগ পেশ করা হলে সেটি নিয়ে তিনি বিচারকদের সাথে পরামর্শ করতেন। সামরিক বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হলে সামরিক বিচারকদের সাথে আলোচনা করার পর রায় দিতেন। পরবর্তীকালে মামলুক সুলতানরা রাজ্যের রেওয়াজ হিসেবে এভাবে সাজিয়ে হলঘরে সাধারণত খুব কম সময়ই বসতেন। লোকদেরকে প্রথমে বিচারকের কাছে মোকদ্দমা নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হতো। বিচারকরা ইনসাফ না করলে তবেই তারা সুলতানের দ্বারস্থ হতো।[৯৭৬]

❁ হিসবাহর বিচার

মামলুক শাসনামলে হিসবাহর দায়িত্ব এবং বিচার সংক্রান্ত কর্তৃত্ব শক্তিশালী হয়েছিল। অধিকাংশ সময় বিচারকার্য এবং হিসবাহ—উভয়টি এক ব্যক্তিরই নিয়ন্ত্রণে থাকত। সাধারণ শিষ্টাচার, বাজারের নীতি, ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে আমানতদারিতা, রাস্তা আর ঘরের নিয়ম, ওজনের পদ্ধতি এবং দোকান, খাবার, সরাইখানা, গোসলখানা ইত্যাদির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দ্রুত ফয়সালা করে দিতেন।[৯৭৭]

সদরুদ্দিন ইবনু আমিনুদ্দিন আল-আদামির জীবনীতে ইবনু তুলুন লিখেছেন, 'আল-মুআইয়াদের যুগে বিচারকার্য এবং হিসবাহর দায়িত্ব তিনি একাই পালন করেছেন।'[৯৭৮]

মামলুক শাসনামলে হিসবাহ-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ কিতাবাদি প্রকাশিত হয়েছিল।

---

[৯৭৬] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১৩৬-১৩৭; আন-নুযুমুল কাদ্দাহিয়্যাহ, পৃ. ৭১-৭৩

[৯৭৭] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১৩৭

[৯৭৮] কুদ্দাতু দিমাশক, পৃ. ২০৭

যেমন ইবনু তাইমিয়্যাহ রচিত *কিতাবুল হিসবাহ ফিল ইসলাম* এবং ইবনুল ইখওয়াহ রচিত *আল-হিসবাহ*।

বিচারব্যবস্থার অধঃপতন

মামলুক শাসনামলকে অবসন্নতা পেয়ে বসেছিল। তা ছিল শক্তি এবং দুর্বলতার মাঝে দোদুল্যমান। শাসনকার্য পরিচালক সুলতানদের শক্তি, ক্ষমতা এবং যোগ্যতার মাঝে অনেক তারতম্য ছিল। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান উৎকর্ষ এবং স্থবিরতার মাঝে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিল। যার প্রভাব পড়েছিল বিচারব্যবস্থার ওপর। কিছু কিছু স্তর একটু একটু করে ক্ষয় হচ্ছিল। যা অর্থের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়। অনেক সময় বিচারব্যবস্থার পদে মূর্খ এবং ব্যবসায়ীরা বসতে থাকে। অনেক বিচারক তো নিজেদের পদ ধরে রাখার জন্য সুলতানকে ঘুষ দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ শামসুদ্দিন ইবনু তুলুন *তারীখু দিমাশক* গ্রন্থে এসব আলোচনা সুস্পষ্টভাবে করেছেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় এসেছে : 'বিচারব্যবস্থা সেদিন সম্মানের শীর্ষে অবস্থান করছিল, যেদিন এর দায়িত্ব নিয়েছিল আস্থাভাজন এবং বিশ্বস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা। আবার যেদিন বিচারব্যবস্থা অর্থের মাধ্যমে কিনে নেওয়া হচ্ছিল, সেদিন ব্যবসায়ী এবং মূর্খরা এ দায়িত্ব পালন করে। বিচারব্যবস্থা তখন পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। এ গ্রন্থে সেসব বিচারকের কথাও আছে, যারা মামলুক শাসনামলে নিজেদের পদ এবং পূর্বের অবস্থান ধরে রাখতে মিশরের প্রশাসক এবং সুলতানদের ঘুষ দিয়েছিল। মিশরের প্রশাসকরা ঘুষ কেবল পছন্দই করত না, এটা তাদের প্রত্যাশাও ছিল।'[১৭৯]

এরপর ইবনু তুলুন উদাহরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, '২রা যিলকদ, ৮৩৯ হিজরি রোজ শনিবারে শামসুদ্দিন আস-সফাদি নিজের সাথে থাকা সম্পত্তির বিনিময়ে দামিস্কের হানাফি মাযহাবের বিচার বিভাগে বহাল থাকলেন। কিছুটা কম দিলে কাজ হবে—এ আশায় তিনি কায়রোতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও মোটা অঙ্কের (ঘুষ) দিতে হয়।[১৮০]... এরপর তাকে বরখাস্ত করা হলে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আবার পদ ফিরে পান।'[১৮১]

বিচারক কিওয়ামুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আর-রুমি (৭৯৮-৮৫৮ হি.) ছিলেন হানাফি মাযহাবের প্রধান বিচারপতি। তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনু তুলুন লিখেন, 'তিনি ছিলেন ফিকহ ও ফতোয়ার প্রতি মনোযোগী। ঘুষ প্রদান ব্যতীত একাধিকবার দামিস্কে হানাফি বিচারপতি পদে নিয়োগ পাওয়ায় তিনি অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তিনি ছিলেন সচ্ছল এবং উন্নত মানসিকতার অধিকারী শ্রেষ্ঠ

---

[১৭৯] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৭-৮

[১৮০] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২১৮; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ১৫২

[১৮১] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২২২

বিচারক। বুদ্ধিমত্তা, দ্বীনদারি, বিনয় এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। দামিস্কের অন্যতম সদাচারী হিসেবে তাকে গণ্য করা হয়।'[৯৮২]

ইবনুল কুতুব আল-হানাফির জীবনীতে ইবনু তুলুন লিখেছেন, 'তিনি নববর্ষ উপলক্ষ্যে দামিস্কের নায়েবের জন্য অর্থ ব্যয় করলে তাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাকে বরখাস্ত করা হয়।'[৯৮৩]

বিচারকদের অপসারণ এবং তাদের অব্যাহতি

মামলুক শাসনামলে অনেক বিচারককে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ক্ষমতাসীনদের রদবদলের কারণে রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন ঘটত। এটা ছিল ব্যাপক হারে বিচারপতি অপসারণের কারণ। সুলতান বা আমির প্রায়শই আগের বিচারককে বরখাস্ত করতেন। রাজনৈতিক কারণবশত এবং বিচারক বা বিচারকের সহযোগীর সমর্থন পাওয়া যাওয়ার কারণে এক থেকে একাধিক বারও বরখাস্ত করা হতো। তবে বিচারক নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই অধিকাংশ সময় তাকে পদচ্যুত করা হতো। অবশ্য অপবাদের কারণেও অপসারণ করার কথা জানা যায়।

পূর্বে প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দিন আস-সফাদির কথা আলোচনা করা হয়েছে। তার জীবনীতে ইতিহাসবিদ ইবনু তুলুন লিখেছেন, 'আস-সফাদি তরাবলুসের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এরপর তাকে বদলি করা হয় দামিস্কে। পরবর্তীকালে তাকে অপসারণ করা হয়। এরপর এক হাজার দিনারের বিনিময়ে তাকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে আবার অপসারণ করা হয়। এভাবে নিয়োগ এবং অপসারণের ধারা চলতে থাকে। অবশেষে ৮৫২ হিজরিতে দামিস্কে তার মৃত্যু হয়।'[৯৮৪]

আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ ইবনিল খাশশাব আল-হানাফির জীবনীতে ইবনু তুলুন লিখেন, 'এরপর ৮০৯ হিজরিতে শামের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর মাত্র দুদিন পদে ছিলেন। এরপর ইবনুল কিফরির চেষ্টা-তদবিরে তিনি পুনরায় দায়িত্ব ফিরে পান।'[৯৮৫] ইবনু তুলুন আরও কয়েকজন বিচারকের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা পালাক্রমে বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। একজন অপসারিত

[৯৮২] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২২৫

[৯৮৩] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২০৬

[৯৮৪] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২২২। একই রকম অবস্থা হয়েছিল আহমাদ ইবনু আবিল ইয-এর ক্ষেত্রেও। ৭৭৭ হিজরিতে তাকে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলেও পরবর্তীকালে তাকে অপসারণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে আবার নিয়োগ দেওয়ার পর ৭৯১ হিজরিতে সালিহিয়্যাহ নামক স্থানে তিনি নিহত হন। (কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২০২।) ইবনু খাল্লিকান সম্পর্কে জানা যায়, তিনি একাধিক বার অপসারিত হয়েছিলেন। (কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৭৬।)

[৯৮৫] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২০৫। আল-কিফরি ছিলেন বিচারক এবং নায়েব।

হলে অপরজন নিযুক্ত হতেন। পরবর্তী সময়ে আবার প্রথমজন দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন। এভাবেই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলত। যেমন তাকিউদ্দিন আল-কিফরি, মুহিউদ্দিন ইবনুল কিশক এবং বিচারক শামসুদ্দিন আল-ইখনায়ি। এরা বারংবার নিয়োগপ্রাপ্ত এবং বরখাস্ত হয়েছিলেন। ইলমুদ্দিন আল-মালিকি ২৫ বছরের চাকরিজীবনে ১১ বার বিচারপতির দায়িত্ব পেয়েছিলেন। শামসুদ্দিন আন-নাবুলুসির নিয়োগ এবং অপসারণ হয়েছিল কয়েকবার। শামসুদ্দিন ইবনু উবাদাহ আল-হাম্বলি এবং বিচারক ইযযুদ্দিন আল-খতিবের মাঝে দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকত।[১৮৬]

এ তো গেল বিচারক অপসারণের কথা। অনেক সময় ব্যক্তিগত বা সর্বজনীন কোনো কারণে বিচারক নিজেও মোকদ্দমা পরিচালনা থেকে বিরত থাকতেন। হানাফি প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দিন আল-কিফরি সম্পর্কে ইবনু তুলুন লিখেছেন, ৭৬৩ হিজরিতে ছেলে ইউসুফের কারণে তিনি বিচারকার্য থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এরপর ৭৭৬ হিজরিতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পাঠদান ও হাদিস বর্ণনার কাজে নিয়োজিত থাকেন।[১৮৭]

বাদরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু জামাআহর জীবনীতে এসেছে, তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করে আসছিলেন। অবশেষে ৭২২ হিজরিতে বার্ধক্যজনিত কারণে তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। তখন তিনি অব্যাহতি গ্রহণ করতে চাইলে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ৭৩৩ হিজরিতে ৯৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৮৮]

তাকিউদ্দিন আস-সুবকির জীবনীতে এসেছে, শেষ বয়সে তিনি শামের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব থেকে ইস্তফা চেয়ে তার ছেলে তাজুদ্দিনকে দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানান। তার অনুরোধ রক্ষা করা হলে তিনি নিজ দেশ মিশরে ফিরে যান। ৭৫৬ হিজরিতে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।[১৮৯]

প্রধান বিচারপতি জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনু ইবরাহীম ইবনি জুমলাহ (৮৩৭ হি.)-এর জীবনীতে আছে, তিনি নিজেই ইস্তফা দিয়ে ইলম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতেন এবং মানুষের সাথে মেলামেশা কম করতেন। তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী, অকাট্য ফয়সালাদাতা এবং বহুগুণের আধার।[১৯০]

মামলুক শাসনামলে মিশরেও বিচারকদের বরখাস্তকরণ এবং অব্যাহতি প্রদানের এমন ঘটনা আছে।[১৯১] আস-সুয়ুতি বলেন, সুলতান মুহাম্মাদ ইবনু কালাউন তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসলে তিনি বাদরুদ্দিন ইবনু জামাআহর সাথে হানাফি

---

[১৮৬] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ১২৫, ২০৩, ২৪৯, ২৮৭, ২৯০

[১৮৭] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২০০

[১৮৮] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৮১-৮২

[১৮৯] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ১০২

[১৯০] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৯৫

[১৯১] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১৮৪-১৮৫ দ্রষ্টব্য

এবং হাম্বলি বিচারক দুজনকে বরখাস্ত করেন। তবে তার পিতা কালাউনের পক্ষ থেকে ওসিয়ত থাকায় মালিকি বিচারককে তিনি বহাল রেখেছিলেন।[৯৯২]

বিচার বিভাগের গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা

মামলুক শাসনামলে বিচার বিভাগের পরিস্থিতি আব্বাসি যুগের মতোই ছিল। তবে মামলুক শাসনামলে ঘটে যাওয়া কিছু টুকরো বিষয় নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

❁ চার মাযহাব অনুসারে বিচার

চার মাযহাব অনুসারে বিচারক নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কারণে প্রত্যেক বিচারক নিজের পঠিত, নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসারেই বিচারকার্য পরিচালনা করতে বাধ্য হয়ে পড়েন। এ কারণেই দেখা যেত, মামলা-মোকদ্দমার রায় ফিকহি মাযহাব অনুসারেই দেওয়া হতো। যিনি যে মাযহাব অনুসরণ করতেন, মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য তিনি সে মাযহাবের বিচারক নির্বাচন করতেন। মোকদ্দমার রায় বাস্তবায়নও বিচারকের নির্ধারিত মাযহাব অনুসারেই হতো। এক মাযহাবের মোকদ্দমার প্রতি অপর মাযহাবের বিচারক লক্ষ করতেন না।

মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা কম থাকায় এমন ব্যবস্থাপনায় কোনো সমস্যা হয়নি। চার মাযহাবের বিচারকরা নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতেন। তাদের কাছে যেসব সমস্যা আসত, সেগুলো তারা সমাধান করে দিতেন।[৯৯৩] তবে কিছু কিছু মানুষ চার মাযহাব অনুসারে বিচারকার্য পরিচালকদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আয-যাহির বাইবার্সও এ ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে।[৯৯৪]

❁ তাতারিদের আইন

সম্প্রতি একজন লেখক লিখেছেন, মামলুকরা ইসলামি শরীয়তের পাশাপাশি 'ইয়াশা' চালু করেছিল।[৯৯৫] শারঈ বিচারকের সাথে তারা বেসামরিক বিচারকও নিয়োগ দিয়েছিল। যার কর্তব্য ছিল মোকদ্দমার শুরুতেই আমির এবং সৈনিকদের পক্ষ থেকে অন্যায় করা হয়েছে কি না—সেটা জেনে নিয়ে সুলতানকে অবহিত করা। মুহাম্মাদ ইবনু কালাউনের ছেলে আল-মালিকুস সালিহের শাসনামলে আমির সাইফুদ্দিন এই দায়িত্ব পালন করেন। ধর্মীয় এবং ব্যবসা সংক্রান্ত মোকদ্দমাগুলো

---

[৯৯২] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১১৪

[৯৯৩] নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ৫১৭ দ্রষ্টব্য।

[৯৯৪] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১৬৬

[৯৯৫] ইয়াশা হলো সম্রাট চেঙ্গিস খান কর্তৃক তৈরিকৃত একটি গোপনীয় আইনের বিধি।

ইয়াশা অনুসারে মীমাংসা করার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল। ফলে শারঈ বিচারকের দায়িত্ব হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে ধর্ম-সংক্রান্ত, ব্যবসায়িক এবং আইনানুগ যাবতীয় বিষয় চলে যায় এই বেসামরিক বিচারকের নিয়ন্ত্রণে। শেষ পর্যন্ত শারঈ বিচারকের পরিধি কেবল ধর্মীয় বিষয়েই আবদ্ধ হয়ে পড়ে।[৯৯৬]

এহেন পরিস্থিতির কথা সত্য কি না—তা আমাদের জানা নেই। যদি সত্য হয় তবুও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। হাফিজ ইবনু কাসির তার সংকলিত প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াতে* তো নয়ই, বিচারব্যবস্থার ইতিহাসেও এমন কথা কেউ আলোচনা করেননি।

❁ বিচারকদের বাড়তি দায়িত্ব

বিচারকের অবস্থান ছিল সম্মানজনক। বিচারকরা ছিলেন সকলের আস্থার পাত্র এবং শ্রদ্ধাভাজন। এ কারণেই বড় বড় আর গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তাদের দেওয়া হতো। হিসবাহ, অন্যায় আর দুর্নীতির বিচারকার্য পরিচালনা এবং ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দেখাশোনা-সহ অন্যান্য দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত ছিল।

শাফিয়ি প্রধান বিচারপতি ইবনু বিনতিল আ'আয সম্পর্কে হাফিজ ইবনু কাসির লিখেছেন, 'তার হাতে ১৭টি দায়িত্ব অর্পিত ছিল। এগুলোর মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা, খুতবা প্রদান, ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, সর্বোচ্চ শাইখের পদ, রাষ্ট্রীয় কোষাগার দেখাশোনা এবং বয়স্ক শিক্ষা-কার্যক্রম ছিল অন্যতম।'[৯৯৭] অধিকাংশ বিচারকের অবস্থাই ছিল এমন। মিশরের বিচারক বাদরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু জামাআহর জীবনীতে এসেছে, বিচারকার্য পরিচালনার সাথে সর্বোচ্চ শাইখের পদ এবং খতিবের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল তার ওপর। ৬৮৭ হিজরিতে তিনি আল-কুদসের বিচারক ছিলেন। ৬৯০ হিজরিতে তিনি মিশরে ফিরে আসেন। ইবনু তুলুন বলেন, তার মৃত্যুর পর এ দায়িত্বগুলো একটি দলের কাছে অর্পণ করা হয়।[৯৯৮]

তাজুদ্দিন আস-সুবকির জীবনীতে আছে, প্রধান বিচারপতি হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন খতিব। শাফিয়ি মাযহাবের পাঠদান করার পাশাপাশি সময় দিতেন আত-তুলুনি জামে মসজিদেও। বয়স্কদের পাঠদান এবং দারুল আদল-এ ফতোয়া প্রদানের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল তার ওপর। সেইসাথে দামিস্কে বিচারব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত নয়—এমন বিষয়ে পাঠদানও করতেন। এরপর তিনি মিশরে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুলতানের নির্দেশনামতো দামিস্কের মাদরাসাগুলোতে নিজের স্থলবর্তী নিয়োগ প্রদান করেন।[৯৯৯]

---

[৯৯৬] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ ফিদ দুওয়ালিল আরাবিয়্যাহ, পৃ. ৬৯

[৯৯৭] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৩/৩২২

[৯৯৮] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৮০; নিযামুল হুকমি ফিশ শারীআহ, পৃ. ২৮৭

[৯৯৯] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ১০৪

বাহাউদ্দিন আস-সুবকি মুহাম্মাদের জীবনীতে আছে, তিনি বিচারক হওয়ার পাশাপাশি আল-গাযালিয়্যাহ, আল-আদিলিয়্যাহ এবং আন-নাসিরিয়্যাহতে অধ্যাপনা করতেন। দারুল হাদিসের শাইখও ছিলেন তিনি। মৃত্যুর এক মাস আগে তাকে উমাইয়া জামে মসজিদে খতিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[১০০০]

আস-সুয়ুতি বর্ণনা করেন, বিচারপতি বাদরুদ্দিন ইবনু জামাআহর জন্য খলিফা নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, তিনি সুলতানের নিকটবর্তী দুর্গে খুতবা প্রদান করবেন। তাই বাদরুদ্দিন সেখানে খুতবা দিতে থাকেন এবং আল-আজহার জামে মসজিদে তার নায়েব নিয়োগ দেন।[১০০১]

মামলুক জামানার প্রসিদ্ধ বিচারকগণ

মামলুক শাসনামলে মিশর এবং শামে একাধিক বিচারপতি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তারা ছিলেন চার মাযহাবের অনুসারী। বড় বড় বিচারকগণের প্রত্যেকেই ছিলেন নিজস্ব মাযহাবের প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাদের নাম যেমন সবার জানা, তেমনি জ্ঞান এবং বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাদের সুখ্যাতি ছিল বেশ। তবে মামলুক শাসনামলের দ্বিতীয় ভাগে ফিকহের ক্ষেত্রে দুর্বল বা তাকওয়ার ক্ষেত্রে মধ্যম স্তরের ব্যক্তিরা বিচারকার্য পরিচালনায় কোনো রকম বাধার সৃষ্টি করেনি। আব্বাসি এবং আইয়ুবি যুগের কোনো কোনো বিচারক তখনো দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

আমরা এখানে শাম এবং মিশরে দায়িত্ব পালনকারী কয়েকজন বিচারকের কথা আলোচনা করব। এদের অধিকাংশই প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন।

❁ দামিস্কের শাফিয়ি বিচারকগণ[১০০২]

১. আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ : ইবনু খাল্লিকান নামে তিনি পরিচিত। তার উপনাম ছিল শামসুদ্দিন আবুল আব্বাস। প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ৬৫৯ হিজরিতে শামের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে-সময় তিনি কেবল মামলা পরিচালনা এবং রায় দিতেন। পরবর্তী সময়ে ৬৬৪ হিজরিতে তিনজন বিচারপতির সাথে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৬৬৯ হিজরিতে বরখাস্ত করা হয় তাকে। এরপর তিনি সাত বছর মিশরে অবস্থান করেন। তারপর ৬৭৭ হিজরির শুরুতে পুনরায় তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৬৮০ হিজরিতে আবার তিনি বরখাস্ত হন। শেষমেশ ৬৮১ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।[১০০৩]

[১০০০] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ১০৭

[১০০১] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১১১

[১০০২] দামিস্কের শাফিয়ি বিচারকদের তালিকা দেখতে কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৩৩৯-৩৫১ দেখুন।

[১০০৩] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৭৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৩/৩০১; শাযারাতুয যাহাব : ৫/৩৭১

২. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম : বাদরুদ্দিন ইবনু জামাআহ নামে তিনি পরিচিত। ৭০১ হিজরিতে বিচারকাজ শুরু করেন। তিনি একাধারে ছিলেন প্রধান বিচারপতি, বাগ্মী বক্তা এবং শাইখদের শাইখ। ৭০২ হিজরিতে ইবনু দাকীকিল ঈদ মৃত্যুবরণ করলে তাকে মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে আল-মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবনু কালাউন তাকে বরখাস্ত করেন। ৭১১ হিজরিতে তিনি পুনরায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ৭২২ হিজরিতে বার্ধক্যজনিত কারণে তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। তখন তিনি স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণ করেন। ৭৩৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম।[১০০৪]

৩. আলি ইবনু আবদিল কাফি : তাকিউদ্দিন আস-সুবকি নামে তিনি পরিচিত। তার উপাধি ছিল শাইখুল ইসলাম। ইমাম, ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং কারী হওয়ার পাশাপাশি ধর্মতত্ত্ববিদ, ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ এবং সুসাহিত্যিক ছিলেন তিনি। ৭৩৯ হিজরিতে তিনি শামের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলে মুসলিমরা আনন্দিত হয়। শেষ বয়সে এসে শামের বিচারকার্য পরিচালনা থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি নিজ দেশ মিশরে ফিরে যান। ৭৫৬ হিজরিতে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।[১০০৫]

৪. আবদুল ওয়াহহাব ইবনু আলি : তাজুদ্দিন আস-সুবকি নামে তিনি পরিচিত। পিতা তাকিউদ্দিন আস-সুবকির সাথে তিনি দামিস্কে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে দামিস্কের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। এরপর এক মাসের মতো সাসপেন্ড থাকার পর পুনরায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এরপর তার ভাই বাহাউদ্দিন মুহাম্মাদের কারণে পুনরায় পদচ্যুত হয়ে ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে মিশরে গমন করেন। এরপর কায়রোতে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে ৭৭১ হিজরিতে দামিস্কে মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদাতবরণ করেন তিনি।[১০০৬]

৫. আবু বকর ইবনু আহমাদ : উপনাম তাকিউদ্দিন। ইবনু কাদি শুবহাহ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। ছিলেন শাফিয়ি মাযহাবের প্রবীণ ব্যক্তি। ৮৪২ হিজরিতে বিচারপতি হওয়ার পর ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব থেকে সরে যান। পরবর্তীকালে পদচ্যুত হন। ৮৫১ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।[১০০৭]

মামলুক শাসনামলে দামিস্কে মোট ৬০ জন শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারী

[১০০৪] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৮০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৪/১৬৩; আদ-দুরারুল কামিনা : ৩/৩৬৭; শাযারাতুয যাহাব : ৬/১০৫

[১০০৫] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ১০৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৪/৩১৬; আদ-দুরারুল কামিনা : ৩/১৩৪; শাযারাতুয যাহাব : ৬/১৮০

[১০০৬] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ১০৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া :১৪/৩১৬; আদ-দুরারুল কামিনা : ৩/৩৯; শাযারাতুয যাহাব : ৬/২২১

[১০০৭] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ১৬৮

বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন বলে জানা যায়।[১০০৮]

দামিস্কের হানাফি বিচারকগণ

মামলুক শাসনামলে দামিস্কে মোট ৪১ জন হানাফি মাযহাবের বিচারক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : ১. শামসুদ্দিন আবদুল্লাহ আল-আযরায়ি (৬৭৩ হি.), ২. মাজদুদ্দিন ইবনুল আদিম (৬৭৭ হি.), ৩. সদরুদ্দিন সুলাইমান ইবনু আবিল ইয (৬৭৭ হি.) এবং ৪. বাদরুদ্দিন ইবনুল ফুরফুর। ইনি ছিলেন মামলুক জামানার দামিস্কের সর্বশেষ বিচারক। ৯৫০ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

দামিস্কের মালিকি বিচারকগণ

এদের মাঝে যাইনুদ্দিন আয-যাভাভি (৬৭১ হি.), জামালুদ্দিন ইউসুফ আয-যাভাভি (৬৮৩ হি.), জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ আয-যাভাভি (৭১৭ হি.), ফাখরুদ্দিন ইবনু সালামাহ (৭১৮ হি.), শারাফুদ্দিন আল-মালিকি (৭৪৮ হি.), শিহাবুদ্দিন আত-তিলমিসানি (৮৬২ হি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দামিস্কে মালিকি মাযহাবের সর্বশেষ বিচারক ছিলেন খাইরুদ্দিন আল-গাযযি (৯২৮ হি.)। মামলুক শাসনামলে সেখানে মোট ৩১ জন মালিকি মাযহাবের বিচারক ছিলেন।[১০০৯]

দামিস্কের হাম্বলি বিচারকগণ

শামসুদ্দিন ইবনু কুদামাহ (৬৮২ হি.), নাজমুদ্দিন ইবনু কুদামাহ (৬৮৯ হি.), আলাউদ্দিন ইবনুল মানজা (৭৫০ হি.), জামালুদ্দিন আল-মারদাভি (৭৬৩ হি.), শারাফুদ্দিন ইবনু কাদিল জাবাল (৭৭১ হি.), বুরহানুদ্দিন ইবনু মুফলিহ (৮০৩ হি.), সদরুদ্দিন ইবনু মুফলিহ (৮২০ হি.) ছিলেন দামিস্কের উল্লেখযোগ্য হাম্বলি বিচারক। সেখানে সর্বশেষ হাম্বলি বিচারক ছিলেন শারাফুদ্দিন ইবনু মুফলিহ। সুলতান সালিম ইবনু উসমান দামিস্কে এসে তাকে বরখাস্ত করেন। মামলুক শাসনামলে দামিস্কে সর্বমোট ২৭ জন হাম্বলি বিচারক দায়িত্ব পালন করেছেন।[১০১০]

মিশরের বিচারকগণ

মামলুক শাসনামলে শামের অনেক বিচারকই বিচারকার্য পরিচালনার জন্য মিশরে চলে যেতেন। আবার মিশরের অনেক বিচারক চলে যেতেন শামে। কারণ রাজ্য ছিল অভিন্ন। কোনো কোনো বিচারক তো দায়িত্ব গ্রহণের জন্য এ দেশে বা

[১০০৮] কুজ্বাতু দিমাশক, পৃ. ১৭৬
[১০০৯] কুজ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৩৪৭
[১০১০] কুজ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৩৫০

ও দেশে যেতেন কিংবা দুই দেশের কোনো-একটাতে থিতু হয়ে যেতেন। কখনো কখনো বিচারককে নিজের ক্ষমতায় মিশর থেকে সিরিয়ায় বা সিরিয়া থেকে মিশরে চলে যেতে দেখা গেছে। যেমনটা আল-ইয ইবনু আবদিস সালাম এবং আস-সুবকি করেছিলেন।

মিশরে মামলুক শাসনামলের প্রথম বিচারক ছিলেন বাদরুদ্দিন (৬৪৮ হি.)। পরবর্তীকালে সদরুদ্দিন মাওহুব ইবনু উমর আল-জাযারি, ইমাদুদ্দিন আল-হামাভি, পুনরায় বাদরুদ্দিন আস-সিনজারি, তারপর তাজুদ্দিন আবদুল ওয়াহহাব ইবনু বিনতিল আ'আয বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন।[১০১১]

কায়রোর বিচারক এবং মিশর আর উঁচু ভূমির বিচার বিভাগের মাঝে মিশরের বিচারব্যবস্থা বিভক্ত ছিল। অনেক সময় অবশ্য দুটোই একসাথে পরিচালিত হতো। যেমন তাজুদ্দিন ইবনু বিনতিল আ'আয একইসাথে মিশর এবং কায়রোর বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ৬৬১ হিজরিতে তাকে মিশরের বিচারকার্যের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে কেবল কায়রোর বিচার বিভাগের দায়িত্বে রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয়বারের মতো মিশরের দায়িত্ব জুড়ে দেওয়া হয়। যা ৬৬৫ হিজরিতে তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল। তার সময়েই চার মাযহাবের বিচারক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে।[১০১২]

তাজুদ্দিনের পর মিশর এবং উঁচু ভূমির দায়িত্ব পালন করেন মুহিউদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনু শারাফুদ্দিন। আর কায়রো এবং নিম্ন ভূমির দায়িত্ব দেওয়া হয় তাকিউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানকে। পরবর্তীকালে তাজুদ্দিন ইবনু বিনতিল আ'আয-এর ছেলে সদরুদ্দিন উমর দায়িত্ব গ্রহণ করলে অনমনীয়তা এবং অনুসন্ধানমূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তিনি বাবার অনুসরণ করেন।

৬৭৯ হিজরিতে শাফিয়ি বিচারকরা একের পর এক দায়িত্ব পালন করেন। কারও দায়িত্ব ছিল মিশর এবং উঁচু ভূমিতে। আবার কেউ ছিলেন কায়রো এবং নিম্ন ভূমির দায়িত্বে। বাদরুদ্দিন ইবনু জামাআহ ৬৯০ হিজরিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ৬৯৫ হিজরি পর্যন্ত তিনি দায়িত্বরত ছিলেন। এরপর প্রচণ্ড অমত সত্ত্বেও ইবনু দাকীকিল ঈদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি বারংবার স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেওয়ার পরও তাকে পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছিল। সুলতান তাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। নিজের নায়েবদের উদ্দেশ্যে ঘন ঘন উপদেশ সংবলিত লিখতেন তিনি। মিশর জয়ের পর থেকে ইবনু জামাআহর যুগ পর্যন্ত সমস্ত বিচারকের নাম নিয়ে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে আস-সুয়ুতি কবিতাটির সাথে আরও কয়েক লাইন বৃদ্ধি

[১০১১] হুসনুল মুহাদারাহ : ২/১৬৪ দ্রষ্টব্য
[১০১২] হুসনুল মুহাদারাহ : ২/১৬৪

করে নিজের যুগ তথা দশম শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত বিচারকদের নাম জুড়ে দেন।[১০১৩]

এরপর আস-সুয়ুতি মামলুক শাসনামলে মিশরের হানাফি বিচারকদের কথা উল্লেখ করেছেন। ৬৬৩ হিজরিতে আয-যাহির বাইবার্সের সময় যার সূচনা হয়। মিশরে প্রথম হানাফি বিচারক ছিলেন সদরুদ্দিন সুলাইমান ইবনু আবিল ইয। আরও ছিলেন নাজমুদ্দিন আহমাদ ইবনু ইসমাঈল। ৬৭৭ হিজরিতে তাকে দামিস্ক থেকে নিয়ে আসা হয়।[১০১৪]

আয-যাহির বাইবার্সের যুগে ৬৬৩ হিজরিতে মিশরে মালিকি বিচারক ছিলেন শারাফুদ্দিন উমর ইবনুস সুবকি। ৬৬৭ হিজরিতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এরপর অনেকেই দায়িত্ব পালন করেছেন। আবদুর রহমান ইবনু খালদুন ছিলেন তাদের অন্যতম। যিনি বারংবার অপসারিত এবং নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।[১০১৫]

আয-যাহির বাইবার্সের যুগে মিশরে সর্বপ্রথম হাম্বলি মাযহাবের বিচারক ছিলেন শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনুল ইমাদ। ৬৭০ হিজরিতে তিনি পদচ্যুত হন। ৬৭৬ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত কেউ এ দায়িত্ব পালন করেননি। মিশরে কয়েকজন হাম্বলি বিচারক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এদের মাঝে মুওয়াফফাকুদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০১৬]

মিশরের অন্যতম প্রসিদ্ধ বিচারক হচ্ছেন ইবনু দাকীকিল ঈদ। তার প্রকৃত নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহাব আল-কুশাইরি আল-মানফালুতি। তার উপনাম তাকিউদ্দিন। ইসলামি আইনবিদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি একাধারে সুসাহিত্যিক, কবি এবং বিচারক ছিলেন। মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর একাধিক বার স্বেচ্ছায় ইস্তফা প্রদান করেন। তা সত্ত্বেও তাকে পুনরায় দায়িত্ব প্রদান করা হতে থাকে। অবশেষে ৭০২ হিজরিতে কাজীর পদে বহাল থাকা অবস্থায় কায়রোতে তার মৃত্যু হয়।[১০১৭]

❁ ন্যায়পরায়ণ এবং অসৎ বিচারক

মামলুক শাসনামলে মিশর এবং শাম অঞ্চলে থাকা বিচারকদের অধিকাংশই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ আর ন্যায়পরায়ণ। বড় আলিম ও ফকিহ হওয়ায় তাদের মাঝে ছিল ন্যায় এবং স্বচ্ছতার গুণ। অবিচলতার ক্ষেত্রে তারা ছিলেন কিংবদন্তি। শাসক এবং আপামর জনগণ তাদের সম্মান করতেন। সমসাময়িকদের মাঝে তাদের

[১০১৩] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১৬৬

[১০১৪] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১৮৪

[১০১৫] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১৮৮

[১০১৬] হুসনুল মুহাদ্বারাহ : ২/১৯০

[১০১৭] মারজিউস উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২৭০; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৯৩

অবস্থান ছিল অনেক উঁচুতে। ফলে বিচারকার্যের পাশাপাশি অন্য দায়িত্বও তারা পালন করতেন। পাঠদান, ফতোয়া প্রদান এবং খতিবের দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের জীবনীতে এগুলোর উল্লেখ এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় যে, তা বর্ণনা করা কষ্টসাধ্য। তবে তাদের প্রশংসনীয় গুণাবলি, মহৎ কর্ম এবং সুউচ্চ মর্যাদার জন্য কেবল এগুলোই যথেষ্ট নয়। যেমন ঐতিহাসিক ইবনু তুলুন দামিস্কের প্রধান বিচারপতি শিহাবুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু শামসুদ্দিন আহমাদের জীবনীতে লিখেছেন : তিনি অনেক ইলম অর্জন যেমন করেছিলেন তেমনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। আল-কুদসে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। পরবর্তীকালে মিশরের বিচারকার্য পরিচালনা করেন। সেখান থেকে শামের বিচারকার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের এবং বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তিদের সৌন্দর্য তিলক এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্যানুরাগীদের অন্যতম।... ৬৯৩ হিজরিতে দামিস্কের বিচারক পদে থাকা অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কাসিয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে তাকে সমাহিত করা হয়।[১০১৮] মিশর এবং শামের প্রবীণ বিচারকের অবস্থাও এমন ছিল।

তবে মামলুক শাসনামলে অসৎ বিচারকও ছিল। মূর্খতা এবং স্বল্প জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে যারা পদ দখল করেছিল। তাদের নিকৃষ্ট জীবনাচার সমালোচকদের সমালোচনা এবং মন্দ ধারণার সুযোগ করে দেয়। মৃত্যুর পরও তাদের কুকীর্তি আর মন্দ দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। এখানে তাদের সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হবে। যাতে তাদের কুকর্ম আর মন্দ দিকগুলো থেকে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি।

শামের বিচারক ছিলেন কামালুদ্দিন আল-মাআররি। একাধিক বার আলেপ্পোতেও বিচারক ছিলেন তিনি। উমাইয়া জামে মসজিদে খুতবাও দিয়েছেন। তবে শরীয়তের বিধানাবলির কিছুই তার জানা ছিল না। সম্পদের লোভও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। ৭৮৩ হিজরিতে মৃত্যুর পর নিজ বাড়িতেই তাকে সমাহিত করা হয়।[১০১৯]

যাইনুদ্দিন আল-কিফরি একাধিক বার বিচারকের পদে ছিলেন। তবে তার চরিত্র মোটেই প্রশংসনীয় ছিল না। বইয়ের নাম বিকৃত করে বিক্রি করতেন। ফিকহ-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন গণ্ডমূর্খ। ৮০৯ হিজরিতে তিনি মারা যান।[১০২০]

জামালুদ্দিন ইবনুল কুতুব বারংবার বিচারকের পদে বসলেও ইলমের সাথে তার ন্যূনতম সম্পর্কও ছিল না। নিন্দনীয়ভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করে গেছেন। ৮১৪ হিজরিতে বয়স সত্তর পেরুনোর আগেই তার মৃত্যু হয়।[১০২১]

[১০১৮] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৭৯। আরও জানতে আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৩/৩৩৭ এবং শাযারাতুয যাহাব : ৪/৪২৩ দেখুন।

[১০১৯] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ১১১

[১০২০] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২০৫

[১০২১] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২০৬

আলেপ্পো, হামা এবং দামিস্কের বিচারক ইলমুদ্দিন সচ্চরিত্র এবং বিদ্যানুরাগী হলেও তার বোঝার ক্ষমতা এবং বুদ্ধি কিছুটা কম ছিল।[১০২২]

জামালুদ্দিন আল-মাগরিবি হামা এবং তরাবলুসের বিচারক ছিলেন। পরবর্তীকালে দামিস্কের বিচারক হন। যুক্তি ভালো জানলেও তিনি ছিলেন অস্থির প্রকৃতির লোক। সেইসাথে বদ অভ্যাস তো ছিলই।[১০২৩]

প্রধান বিচারপতি সিরাজুদ্দিন আল-হিমসি বিশেষ শ্রেণি এবং সাধারণ মানুষের সাথে মন্দ আচরণ করে কুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। অবশেষে আরেকজন বিচারকের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের রেহাই দেন। বিচারকার্য পরিচালনায় তিনি মোটেই প্রশংসনীয় ছিলেন না। ৮৬১ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।[১০২৪]

সদরুদ্দিন আল-আউমি প্রথমে কেবল দামিস্কের বিচারক ছিলেন। পরবর্তীকালে কায়রোর বিচারকার্যও লাভ করেন। আল-মুআইয়াদের সময় তিনি বিচার বিভাগের পাশাপাশি হিসবাহর দায়িত্বও প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কায়রোতে প্রবেশের সময় তিনি ছিলেন কপর্দকহীন। মৃত্যুর সময় অঢেল সম্পত্তি রেখে গেছেন। তিনি মোটেই চরিত্রবান ছিলেন না।[১০২৫]

প্রধান বিচারপতি নাজমুদ্দিন আল-বাগদাদির জীবনীতে ইবনু তুলুন লিখেছেন, 'তিনি শোষণনীতির প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। এত অধিক পরিমাণে সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন, যা পূর্ববর্তীদের সম্পত্তিরও বেশি হয়ে গিয়েছিল।... এরপর বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন নিয়ে তিনি মিশর অভিমুখে রওয়ানা হন।... কিন্তু মৃত্যু তার চেয়ে দ্রুতগামী ছিল। তার মৃত্যু মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত বলে ধরা হয়।'[১০২৬]

বিচারপতি শিহাবুদ্দিন আল-উমবি ছিলেন তরাবলুসের বিচারক। পরবর্তীকালে দুই বার দামিস্কের বিচারক হয়েছিলেন। তারপর মিশরের বিচারকার্যও পরিচালনা করেন। তার চরিত্র ছিল অতি মন্দ। প্রকাশ্যে ঘুস গ্রহণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিলেন। যা পরে জানা গিয়েছিল। ৮৩৬ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।[১০২৭]

শামসুদ্দিন আন-নাবুলসিকে কয়েকবার বরখাস্ত এবং নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। বিরাট সম্মান এবং বুদ্ধিসুদ্ধি না থাকলে কী হবে, ওয়াকফকৃত অনেক সম্পত্তি তিনি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কথিত আছে, তার সময় ওয়াকফ সম্পত্তি যতটা বিক্রি হয়েছে, ইসলামের ইতিহাসে তেমনটা আর কখনোই হয়নি। মানুষের জন্য এমন

[১০২২] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২৪৯
[১০২৩] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২৫০-২৫১
[১০২৪] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ১৬৫-১৬৭
[১০২৫] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২০৭
[১০২৬] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২২০-২২১
[১০২৭] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২৫৫

সব অপকর্মের দরজা তিনি খুলে দিয়েছেন, যা আর কখনোই বন্ধ হওয়ার নয়। তৈমুর লঙের অন্যায় কাজেও তিনি ছিলেন সহযোগী। মানুষকে কষ্ট দেওয়া এবং সম্পত্তি আত্মসাৎ করার মতো কিছু নিকৃষ্ট বিষয় তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে।[১০২৮]

বিচারক ইযযুদ্দিন আল-বাগদাদি বিচারকার্য পরিচালনায় নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। জবরদখল এবং নীচতায় তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তার কবল থেকে কেউ নিস্তার পায়নি। মোটকথা, তার বুদ্ধি বা দ্বীন কোনোটাই ছিল না। ফিকহের পুঁজি ছিল নিতান্তই সামান্য। তার জীবনটা ছিল অদ্ভুত। তার নীচতা ও হীনতা সম্পর্কে অদ্ভুত সব কথা প্রচলিত আছে। বিচারকার্যকে পুঁজি করে কামাই করা ঘুষের অর্থ তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের পেছনে ব্যয় করতেন।[১০২৯]

এগুলো কয়েকজন অসৎ বিচারকের কিছু উদাহরণ। হাতে-গোনা এমন কয়েকজন ছাড়া মামলুক জামানার সিংহভাগ বিচারকই ছিলেন অবিচলতা, ন্যায়নিষ্ঠা, ইলম এবং আল্লাহভীতির মূর্ত প্রতীক।

❁ বিচারকার্য থেকে বিরত থাকা

খলিফা, শাসক এবং প্রত্যেক মাযহাবের প্রধান বিচারপতিরা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ আলিম, ফকিহ এবং আল্লাহভীরুদের বিচারপতি নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। অনেকে তাদের ডাকে সম্মতিও প্রকাশ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ আল্লাহর ভয়, পরিণামের আশঙ্কা, বুজুর্গি এবং দুনিয়াবিমুখতার কারণে সম্মত হননি। এসব কারণের ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মামলুক শাসনামলে আলিম এবং ফকিহদের অনেকেই বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হননি। তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হচ্ছে।

▪ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি মাহমুদ

উপনাম আবু আবদিল্লাহ। আকমালুদ্দিন আল-বাবারতি নামে তিনি পরিচিত। হানাফি মাযহাবের অনুসারী এই ফকিহ ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ এবং মুফাসসির। আমির শাইখুন তাকে কায়রোস্থ শাইখুনি খানকার মুরুব্বি হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। আমিরের কাছে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন এবং সম্মানের পাত্র হওয়ায় তাকে বারবার মিশরের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু আকমালুদ্দিন তাতে সম্মত হননি। আয-যাহির বারকুক তাকে বিশেষ শ্রদ্ধার নজরে দেখতেন। ৭৮৬ হিজরিতে মিশরে তার ইন্তেকাল হয়। তিনি অনেকগুলো কিতাব

[১০২৮] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২৮৭

[১০২৯] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২৯৭-৩০০

লিখেছেন।[১০৩০]

▪ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনি মুহাম্মাদ

☑ উপনাম আবু আবদিল্লাহ। শাইখ জালালুদ্দিন আল-মাহাল্লি নামেই তিনি পরিচিত। মিশরের অধিবাসী এই শাফিয়ি ফকিহ ছিলেন মুফাসসির। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি অভিজাত শ্রেণি ও জনসাধারণের কাছে তিনি ছিলেন বরণীয় ব্যক্তি। নির্ভয়ে সত্য উচ্চারণ করতেন। শাসক শ্রেণির লোকেরা ভক্তির সাথে তার কাছে উপস্থিত হতো। তার কাছে বিচারকার্য পরিচালনার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি সম্মত হননি। শিক্ষকতা, ফতোয়া প্রদান এবং পড়ানোর প্রতি তিনি অধিক মনোযোগী ছিলেন। সাদামাটা জীবন যাপন করতেন সব সময়। তার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ছিল ব্যবসা। ৮৬৪ হিজরিতে মিশরে মৃত্যুবরণ করেন। উপকারী এবং প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।[১০৩১]

▪ আহমাদ ইবনু আলি ইবনি আবদিল কাদির

উপনাম আবুল আব্বাস আল-হুসাইনি আল-উবাইদি। তাকিউদ্দিন আল-মাকরিযি নামে তিনি পরিচিত। মিশরীয় ইতিহাসবিদ ছিলেন। মূলত বালবাকের বাসিন্দা হলেও তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা কায়রোতে। ৮৪৫ হিজরিতে সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। একাধিক বার সেখানে হিসবাহ, খতিবের দায়িত্ব এবং ইমামতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ৮১০ হিজরিতে বারকুকের ছেলে আন-নাসিরের সাথে দামিস্কে প্রবেশ করেন। তার কাছে সেখানকার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পেশ করা হলে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করে মিশরে ফিরে যান। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১০৩২]

▪ শাইখুল ইসলাম যাকারিয়্যা আল-আনসারি

প্রকৃত নাম যাকারিয়্যা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আহমাদ। যাইনুদ্দিন নামে তিনি পরিচিত। এই শাফিয়ি ফকিহ এবং মুফাসসিরকে সুলতান কাতিয়াবাই আস-সারকাশি প্রধান বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে রাজ্যের উলামা ও প্রবীণ ব্যক্তিদের ক্রমাগত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সম্মত হন। কাজের ক্ষেত্রে তিনি সংযম এবং স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছেন। জুলুমের কারণে সুলতানকে ধমকি দিয়ে পত্র লিখলে তাকে বরখাস্ত করা হয়। এটা ৯০৬

[১০৩০] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩৯৪

[১০৩১] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৬০২

[১০৩২] আল-আ'লাম : ১/১৭২; আল-বাদরুত ত্বালি'উ : ১/৭৯; হুসনুল মুহাযারাহ : ১/৫৫৭

হিজরির কথা। এরপর তিনি ইলমচর্চায় মনোনিবেশ করেন। পরবর্তীকালে পুনরায় বিচারকার্য পরিচালনার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি সেটা উপেক্ষা করে যান। ৯২৬ হিজরিতে কায়রোতে তার ইন্তেকাল হয়। বয়স শত পেরিয়ে গেলেও ইলমচর্চা, অধ্যাপনা এবং কিতাব রচনা থেকে তিনি বিরত থাকেননি।[১০৩৩]

▪ যাইনুদ্দিন আল-আইনি

দামিস্কের দুর্গে তার কাছে হানাফি মাযহাবের বিচারকার্য পরিচালনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। শরীয়তের ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্য রাখা সত্ত্বেও এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হননি।[১০৩৪]

বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য

মামলুক শাসনামলে মিশর এবং শামে বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলোর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

☑ **১. চমৎকার ব্যবস্থাপনা :** সার্বিকভাবে এ যুগের বিচারব্যবস্থা চমৎকার ছিল। বিচারের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নও ছিল সুন্দর। সাইয়িদ মাহমুদ আসিম বলেন, 'সারকথা হচ্ছে, মামলুক শাসনামলে মিশরের বিচারব্যবস্থা ছিল একটি চমৎকার ব্যবস্থাপনা। উত্তম পরিচালনা আর পবিত্র দায়িত্বে তা খ্যাতি ছড়িয়েছিল। বিচারের অবস্থানকে বিচারকরা সম্মান করতেন। যত ওপরের পর্যায়েরই হোক না কেন, কাউকেই তারা বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না।'[১০৩৫]

☑ **২. চার মাযহাব অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা :** একমাত্র মামলুক শাসনামলে একইসাথে চার মাযহাব থেকে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো। সাধারণ বিচার থেকে সামরিক বিচার, সমস্ত বিভাগেই এ পদ্ধতি চালু ছিল। ৬৬৩ হিজরিতে সুলতান আয-যাহির বাইবার্সের হাত ধরে এ পদ্ধতির সূচনা হয়ে মামলুক যুগের দীর্ঘ সময় এ পদ্ধতি চালু ছিল। এরপর উসমানি খিলাফতকালে এ পদ্ধতি বাতিল হয়। বিচারক নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি তখন কেবল হানাফি মাযহাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ বিষয়টি নিয়ে সামনে আলোচনা করা হবে।

☑ **৩. বিচারকার্যের ধারাবাহিকতা এবং সুরক্ষা :** অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশর এবং শামের বিচারব্যবস্থা ছিল আব্বাসি যুগ এবং আইয়ুবি সাম্রাজ্যের বিচারব্যবস্থার প্রসার। এটা প্রশাসনিক এবং গঠনমূলক—উভয় দিক থেকেই ছিল। তবে

[১০৩৩] মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ
[১০৩৪] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ২২৮
[১০৩৫] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ ফিদ দুওয়ালিল আরাবিয়্যাহ, পৃ. ৬৯

একেবারে যে পরিবর্তন হয়নি, তা কিন্তু নয়। সামান্য কিছু পরিবর্তন অবশ্য হয়েছিল।

☑ **৪. রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বরখাস্তকরণ:** মামলুক শাসনামল ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ। বিচারকার্যে ছিল চরম বৈপরীত্য। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল অস্থিতিশীল। আবার বাহির থেকে ছিল শত্রুর ব্যাপক আক্রমণ। ক্রুসেডার, তাতারি এবং মোঙ্গলদের সামাল দিয়েছে এই মামলুক শাসনব্যবস্থা। অবশেষে শাম এবং মিশর ক্রুসেডারদের নাপাক অবস্থান থেকে পবিত্র হয়েছে। তাতারি এবং মোঙ্গলরাও শায়েস্তা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই অস্থিরতার বিশাল প্রভাব পড়েছিল বিচারকদের রদবদল এবং অধিক হারে তাদের বরখাস্তকরণের ওপর।

☑ **৫. দ্বৈত বিচারব্যবস্থা :** মামলুক শাসনামল ছিল দ্বৈত বিচারব্যবস্থায় প্রসিদ্ধ। এ সময় শারঈ বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি বেসামরিক বিচারব্যবস্থাও ছিল। বেসামরিক বিচারক তখন মুসলিমদের ওপর তাতারিদের আইন 'ইয়াশা' চাপিয়ে দেয়। বাতিল করে দেয় মহান শারঈ ব্যবস্থা। তবে এ চাপাচাপি দীর্ঘায়িত হয়নি। বিফল হয়ে যায় ওদের চেষ্টা। মুসলিম বিচারক এবং সাধারণ মানুষ পুনরায় শরীয়তের বিধিনিষেধ মেনে চলতে শুরু করে। আবার বাস্তবায়িত হয় ইসলামি আইনশাস্ত্র।

☑ **৬. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ :** মামলুক যুগে সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহর মতো অনেক শীর্ষস্থানীয় আলিম, আইনবিদ এবং ঐতিহাসিকের জন্ম হয়। প্রকাশিত হয় বিচার-সংক্রান্ত অনেক বইপুস্তক। যেমন ইবনু ফারহুন (৭৯৯ হি.) লিখিত *তাবসিরাতুল হুক্কাম*, আত-তরাবলুসির *মুঈনুল আহকাম* এবং ইবনুশ শাহিনাহর *লিসানুল হুক্কাম*। এ ছাড়াও *সুবহুল আ'শা* এবং *নিহায়াতুল আরাব*-এর মতো অনেক বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি আল্লামা আয-যাহাবির *আদ-দুরারুল কামিনাহ* এবং হাফিজ ইবনু হাজার আল-আসকালানির *ফাতহুল বারি*-র মতো অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

☑ **৭. মামলুকদের শাসনকাল এবং স্থান :** মামলুকদের শাসন প্রথমে মিশর, শাম এবং পার্শ্ববর্তী কিছু জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর ক্রমে তা হিজাজ এবং ইরাকে সম্প্রসারিত হয়। মামলুক শাসন ২৫০ বছরের অধিক কাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

০৮

উসমানি যুগে বিচারব্যবস্থা

ইসলামি খিলাফতের সর্বাধিক দীর্ঘ যুগ হচ্ছে উসমানি খিলাফতের যুগ। বিশেষত মিশর এবং শামে উসমানি খিলাফতের আধিপত্য ছিল। এর প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। 'পূর্ব-আকসা' ছাড়া পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র উসমানি খিলাফতের অধীনে ছিল। বিশেষভাবে ইসলামি বিচারব্যবস্থা আর সামগ্রিকভাবে খিলাফতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং আইনকানুন একটি কঠিন ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছিল। এজন্য আমরা এই অধ্যায়ে প্রথমে উসমানি খিলাফতের ইতিহাস আলোচনা করব। তারপর পর্যায়ক্রমে বিচারকদের বিভিন্ন অবস্থার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পাশাপাশি বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলব। সবশেষে থাকবে উসমানি যুগে বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি নিয়ে আলোচনা।

উসমানিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং পর্যালোচনা

হিজরি সপ্তম শতকের শেষ দিকে উসমানি পরিবারের ক্ষমতার সূচনা ঘটে। হিজরি দশম শতকের প্রথম চতুর্থাংশে তাদের রাষ্ট্র খিলাফতে রূপ নেয়। যা দীর্ঘ চার শতক পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরই আরব রাষ্ট্রগুলো উসমানি খিলাফতের বলয় থেকে পৃথক হয়ে যায়। ১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল উসমানি খিলাফতের বিলুপ্তিকরণের ঘোষণা দেয়। অতএব, আমরা উসমানিদের উৎপত্তি এবং উত্থানের কথা আলোচনা করব। ইতিহাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব তাদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আইনি অবস্থান।

উৎপত্তি এবং উত্থান

হিজরি সপ্তম শতকের শুরুর দিকে ১৩শ খ্রিষ্টাব্দে উসমানি তুর্কি মুসলিমরা

খোরাসান অঞ্চলে বসবাস করত। মোঙ্গলদের প্রচণ্ড চাপে পড়ে তারা বাধ্য হয়ে পশ্চিম দিকে হিজরত করে। শেষমেশ থিতু হয় আনাতোলিয়া উপদ্বীপে। আনাতোলিয়া অভিমুখে যাত্রাকারী তুর্কিদের নেতৃত্বে 'কায়' নামক একটি গোত্র ছিল। যার প্রধান ছিল গুন্দুজ আলব। এই গুন্দুজের পর তার স্থলাভিষিক্ত হয় ছেলে গাজী আরতুগুল। আরতুগুলের পরে তার ছেলে আমির উসমান। হিজরি ৬৯৯ সালে (১৩০০ খ্রি.) উসমান নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৩৬] ইতিহাসের পাতায় এই সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। ৯২৩ হিজরিতে (১৫১৭ খ্রি.) এই সাম্রাজ্য খিলাফতের রূপ নেয়, যা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল।

১৩০৭ খ্রিস্টাব্দে কোনিয়ায় রোম সেলজুক সাম্রাজ্যের পতন হলে তুর্কি গোত্রগুলো আনাতোলিয়া এবং বাইজেন্টাইনে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে তারা ইউরোপীয় উপকূল অতিক্রম করে গ্যালিপলি দখল করে নেয়। ১৪ শতকের শেষ পর্যন্ত তাদের সীমানা বিস্তৃত হতে থাকে।[১০৩৭]

উসমানি তুর্কিরা এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলগুলোতে তৈমুর লঙের কঠিন হামলার শিকার হয়েছিল। ৮০৫ হিজরিতে (১৪০২ খ্রি.) আনকারার লড়াইয়ে তারা ভীষণ মার খায়। সুলতান প্রথম বায়েজিদ এই যুদ্ধে বন্দি হন। পরের বছর বন্দি অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। এরপর উসমানিরা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হন। রাজ্যের সীমানাও তিনি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেন। অবশেষে ৮৫৭ হিজরিতে (১৪৫৩ খ্রি.) কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে বাইজেন্টাইন রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[১০৩৮]

মিশর এবং শামে মামলুকদের সাথে উসমানিদের দুই শতাব্দীতেও কোনো সংঘর্ষ হয়নি। বরং উসমানিদের বিজয় এবং তাদের সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ মামলুকরা খুশির দৃষ্টিতে দেখতেন। এমনকি কনস্টান্টিনোপল বিজিত হলে মামলুক সুলতান ঈনাল গোটা কায়রো শহর সাজানোর আদেশ দিয়েছিলেন। এই বিজয় তারা ইসলাম এবং মুসলিমদের বিজয় বলে গ্রহণ করেছিলেন।[১০৩৯]

কিন্তু উসমানিরা বলকানের কাছে তাদের সামনে অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে

[১০৩৬] উসমানের শাসনামলে উসমানি রাষ্ট্রের সীমানা জানতে আতলাসুত তারীখিল আরাবি, পৃ. ৬৬ দেখুন।

[১০৩৭] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১১৫; আল-মাশরিকুল আরাবি ফিল আহদিল উসমানি, পৃ. ১৮

[১০৩৮] কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের কারণে এই সুলতানকে মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ তথা বিজয়ী মুহাম্মাদ বলা হয়। তার শাসনকাল ছিল ১৪৫১ থেকে ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক মসজিদ এবং দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন তিনি। ছাটজন উসমানি শাসকের নাম ছিল মুহাম্মাদ। এদের মাঝে প্রথম মুহাম্মাদের শাসনকাল ছিল ১৪১৬ থেকে ১৪২১ খ্রিষ্টাব্দ অবধি। তার হাত ধরেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত হয়। ভেনিসের নৌবহর এবং সার্বিয়ার বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সাম্রাজ্যের সীমানা তিনি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার ঘটিয়েছিলেন।

[১০৩৯] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১১৫-১১৭; আল-মাশরিকুল আরাবি, পৃ. ১৮

আনাতোলিয়ার অবশিষ্ট আমিরাতগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়। সেগুলো হচ্ছে কারামান এবং দিলগাদার।

১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দে সেখানকার আমিররা মারা যাওয়ার পর উসমানিরা তখন মামলুক বলয়ের বাইরে থাকা দুজন আমিরকে সমর্থন করে। এভাবে ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নিকট প্রাচ্য তথা আনাতোলিয়াতে শুরু হয় মামলুক এবং উসমানিদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এভাবে প্রতিটা সাম্রাজ্যই অন্য রাষ্ট্রের আমিরদের সমর্থন দিতে শুরু করে। যেমন দ্বিতীয় বায়েজিদ হারামাইন শারীফাইনের সুরক্ষায় মামলুকদের সাথে অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মক্কায় কিছু সংস্কারমূলক কাজ করার প্রস্তাব দিলেও কাতিয়াবাই সেটা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তিনি দিলগাদার প্রশাসনে সমস্যা সৃষ্টি শুরু করেন।[১০৪০]

❁ মামলুকদের ওপর আধিপত্য

উসমানি এবং মামলুকদের মাঝে কার্যত যুদ্ধ শুরু হয় কানসুহ আল-গাউরির শাসনামলে। প্রথম সালিম তখন ইরানের শাহ ইসমাঈল আস-সাফাবির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে জালদিরানের যুদ্ধে সালিম জয় লাভ করে আল-জাযিরা, মুসেল-সহ আশেপাশের এলাকা দখল করে নেন। যেগুলো আইয়ুবিয় যুগ থেকেই মিশর সালতানাতের সাথে যুক্ত ছিল। তারপর ৯২১ হিজরিতে (১৫১৫ খ্রি.) সুলতান প্রথম সালিম মামলুক সমর্থিত ডেলগাডার দখল করে নিলে সুলতান কানসুহ আল-গাউরি উসমানিদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন। ৯২২ হিজরিতে তিনি আলেপ্পোতে একটি অভিযান পরিচালনার উদ্যোগ নেন। কানসুহ নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে আব্বাসি খলিফা-সহ যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। এ সময় আলেপ্পোর নায়েব কানসুহর কাছে বার্তা পাঠিয়ে অধীন থাকার কথা নিশ্চিত করেন। এরপরই সুলতান সালিমের পক্ষ হতে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ বার্তা আসে। যা-তে তিনি সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কানসুহ এটাকে প্রতারণা মনে করেন। অবশেষে এ দুপক্ষই যুদ্ধে নামে। মামলুক বাহিনীর সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধ দেখে সুলতান সালিমও তার বাহিনী পরিচালনায় কঠোর হওয়ার চিন্তা করছিলেন। এ সময় আলেপ্পোর নায়েব বিশ্বাসঘাতকতা করলে মামলুক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। যা দেখে কানসুহ আল-গাউরি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। ৯২২ হিজরিতে (১৫১৬ খ্রি.) মামলুকদের পরাজয় ঘটে।[১০৪১]

❁ উসমানি খিলাফত প্রতিষ্ঠা

উসমানি সালতানাত কোনো ইসলামি খিলাফত ছিল না। কারণ সে-সময়

[১০৪০] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১১৭

[১০৪১] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১১৯; আল-মাশরিকুল আরাবি, পৃ. ৪৪

মামলুকদের মাঝে আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। মারজদাবিকের যুদ্ধে জয়ী হয়ে[১০৪২] সুলতান সালিম শাম এবং মিশরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সংক্ষিপ্ত আলাপ-আলোচনার পর তিনি প্রবেশ করেন দামিস্কে। এরপর মিশর অভিমুখে তার যাত্রা শুরু হয়। কানসুহর নায়েব তুমানবাই পরবর্তী সুলতান হয়ে 'আল-আশরাফ' উপাধি গ্রহণ করেন। কায়রোতে তিনি অবস্থানের কথা ভাবছিলেন। উসমানিদের মোকাবিলার ব্যাপারে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও মামলুক আমিরদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা পেলেন না। বরং তারা বিভিন্ন অজুহাত পেশ করতে থাকে। অগত্যা তুমানবাই নিজেই কিছু সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। রিদানিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি এ যুদ্ধে মামলুকরা পরাজিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য সেনা প্রত্যাহার করে কায়রোতে চলে যায়। তখন নীলনদের তীরে থাকা বেদুইন এবং যাযাবররা বিশ্বাসঘাতকতা করে মামলুকদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসে। তখন উসমানিরা বিজয়ী হয়। একপর্যায়ে তুমানবাইকে বন্দি করে সুলতান সালিম বলেন, 'এখন আমরা মিশরের মালিক হয়েছি।' ৯২৩ হিজরিতে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তুমানবাইকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।[১০৪৩]

সুলতান সালিম (১৫১২-১৫২০ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন নবম উসমানি সুলতান।[১০৪৪] ৯২৩ হিজরিতে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইস্তাম্বুলে ইসলামি খিলাফতের ঘোষণা প্রদান করলে ফলত আব্বাসি খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১০৪৫] উসমানি খিলাফতের সীমানা ইরাক পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলে অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মক্কার শাসক তখন সুলতান সালিমের কাছে হারামের চাবি অর্পণ করে উসমানি সালতানাতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এভাবে হিজাজও উসমানি

[১০৪২] সুলতান কানসুহ আল-গাউরির সাথে থাকা আব্বাসি খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল আবু আবদিল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল মুসতামসিককে সাথে নিয়ে সুলতান সালিম আলেপ্পোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অপরদিকে তুমানবাইয়ের উদ্যোগে বন্দি খলিফার পিতা মিশরে বাইয়াত গ্রহণ করেন। (আল-মাশরিকুল আরাবি, পৃ. ৪৬-৪৭)

[১০৪৩] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১২১; আল-মাশরিকুল আরাবি, পৃ. ৪৬

[১০৪৪] আব্বাসি খলিফাগণ কায়রোতেই ছিলেন। অবশেষে ৯৫৭ হিজরির ১২ই শাবান মোতাবেক ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট সর্বশেষ খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুবের মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন ৫৫তম আব্বাসি খলিফা। (আল-মাশরিকুল আরাবি, পৃ. ৪)

[১০৪৫] উসমানি সুলতানগণ ছিলেন উসমান আল-গাযির সন্তান এবং বংশীয় লোক। নিজেদের পিতার মৃত্যুর পর তারা পর্যায়ক্রমে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। এরা হলেন উসমান আল-গাযি (৭৭৬ হি.), ওরখান ইবনু উসমান (৭৬১ হি.), মুরাদ ইবনু ওরখান (৭৯১ হি.), বায়েজিদ খান ইবনু মুরাদ (৮১৬), মুহাম্মাদ ইবনু বায়েজিদ খান (৮২৫ হি.), মুরাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৮৫৫ হি.), মুহাম্মাদ খান ইবনু মুরাদ খান (৮৮৬ হি.), বায়েজিদ খান ইবনু মুহাম্মাদ খান (৯১৮ হি.), সালিম খান ইবনু বায়েজিদ খান (৯২৬), সুলাইমান আল-কানুনি (৯৭৪ হি.), সালিম ইবনু সুলাইমান (৯৭৪) এবং মুরাদ খান ইবনু সালিম (৯৮২ হি.)। এরপর খলিফাগণ একের পর এক দায়িত্ব পালন করেন। — আল-ইকদুল মানযুম, পৃ. ৩৭৫ (আশ-শাকাইকুন নু'মানিয়্যাহ, পৃ. ৬-২৬৪)

সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যারা ৯৫৪ হিজরিতে ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে আরব বন্দর নগরী এডেনে পৌঁছে গিয়েছিল।

উসমানি খিলাফত উত্তর আফ্রিকায় প্রসারিত হয়ে ৯৬৪ হিজরি তথা ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিলিমসিন অবধি পৌঁছে যায়। ইউরোপের অস্ট্রিয়া অবধি বিস্তৃত হয়ে পূর্ব-আকসা ছাড়া সমস্ত আরব দেশকে অধীন বানিয়ে নেয়। পূর্ব-আকসা এর আগে সাদি সাম্রাজ্যের শাসনাধীন এবং পরবর্তীকালে আলাভিদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। উসমানিরা ইরাক এবং ইরানে সাফাভি শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। মিশর আর শামের অঞ্চলগুলোতে উসমানি খিলাফত চার শতাব্দী (৯২২-১৩৩৭ হি./১৫১৬-১৯১৮খ্রি.) অবধি চলতে থাকে।[১০৪৬]

❁ উসমানি সুলতানদের পরিচয়

ইসলামি খিলাফত ঘোষণার আগেকার উসমানি সুলতানদের কথা আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা উসমানি সুলতান এবং খলিফাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব। সংখ্যায় এরা ছিলেন মোট ৩৭ জন।

☑ ১. প্রথম উসমান (১২৮১-১৩২৪ খ্রি.) বুরসা এবং ইজনিক-এ বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করে উসমানি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনকাল ছিল ৬৯৯-৭২৬ হি./১২৯৯-১৩২৪ খ্রি. পর্যন্ত।

☑ ২. ওরখান (১৩২৪-১৩৬০ খ্রি.)।

☑ ৩. প্রথম মুরাদ (১৩৫৯-১৩৮৯ খ্রি.)। ৭৯১ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

☑ ৪. বায়েজিদ (১৩৮৯-১৪০২ খ্রি.)। ৮১৬ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

☑ ৫. প্রথম মুহাম্মাদ (১৪০৩-১৪২১ খ্রি.)। ৮২৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

☑ ৬. দ্বিতীয় মুরাদ (১৪২১-১৪৫১ খ্রি.) এর মৃত্যু ৮৫৫ হিজরিতে।

☑ ৭. দ্বিতীয় মুহাম্মাদ (১৪৪৬-১৪৮১ খ্রি.)। তার উপাধি ছিল আল-ফাতিহ তথা বিজেতা। সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন। মসজিদ এবং দুর্গ তৈরি করেছেন। ৮৮৬ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

☑ ৮. দ্বিতীয় বায়েজিদ (১৪৮১-১৫১২ খ্রি.)। ৯১৮ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

☑ ৯. প্রথম সালিম (১৫১২-১৫২০ খ্রি.)। ৯২৬ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

☑ ১০. প্রথম সুলাইমান আল-কানুনি (১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.)। ৯৭৪ হিজরিতে

[১০৪৬] তারীখুল মামালিক, পৃ. ১২৪; আল-মাশরিকুল আরাবি, পৃ. ১১ এবং ১৭

তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পশ্চিমারা যাকে 'দ্যা ম্যাগনিফিসেন্ট' বলে। তিনি নিজে ১৩টি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। যার দশটি ছিল ইউরোপে, আর তিনটি ছিল এশিয়াতে। রাষ্ট্র সম্প্রসারিত করেছিলেন। আট বার স্বহস্তে কুরআনের অনুলিপি করেছিলেন। অনেক কাব্যসংকলনও করেন। একাধিক বার ফ্রান্সের সাথে বিশেষাধিকারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন তিনি।

☑ ১১. দ্বিতীয় সালিম (১৫৬৬-১৫৭৪ খ্রি.)। ৯৮২ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

☑ ১২. তৃতীয় মুরাদ (১৫৭৪-১৫৯৫ খ্রি.)।

☑ ১৩. তৃতীয় মুহাম্মাদ (১৫৯৫-১৬০৩ খ্রি.)।

☑ ১৪. প্রথম আহমাদ (১৬০৩-১৬১৭ খ্রি.)।

☑ ১৫. প্রথম মুস্তফা (১৬১৭-১৬২৩ খ্রি.)।

☑ ১৬. দ্বিতীয় উসমান (১৬১৭-১৬২২ খ্রি.)।

☑ ১৭. চতুর্থ মুরাদ (১৬২৩-১৬৪০ খ্রি.)।

☑ ১৮. ইবরাহীম (১৬৪০-১৬৪৮ খ্রি.)।

☑ ১৯. চতুর্থ মুহাম্মাদ (১৬৪৮-১৬৮৭ খ্রি.)।

☑ ২০. দ্বিতীয় সুলাইমান (১৬৮৭-১৬৯১ খ্রি.)।

☑ ২১. দ্বিতীয় আহমাদ (১৬৯১-১৬৯৫ খ্রি.)।

☑ ২২. দ্বিতীয় মুস্তফা (১৬৯৫-১৭০৩ খ্রি.)।

☑ ২৩. তৃতীয় আহমাদ (১৭০৩-১৭৩০ খ্রি.)।

☑ ২৪. প্রথম মাহমুদ (১৭৩০-১৭৫৪ খ্রি.)।

☑ ২৫. তৃতীয় উসমান (১৭৫৪-১৭৫৭ খ্রি.)।

☑ ২৬. তৃতীয় মুস্তফা (১৭৫৭-১৭৭৪ খ্রি.)।

☑ ২৭. প্রথম আবদুল হামিদ (১৭৭৪-১৭৮৯ খ্রি.)।

☑ ২৮. তৃতীয় সালিম (১৭৮৯-১৮০৭ খ্রি.)।

☑ ২৯. চতুর্থ মুস্তফা (১৮০৭-১৮০৮ খ্রি.)।

☑ ৩০. দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৮-১৮৩৯ খ্রি.)।

☑ ৩১. প্রথম আবদুল মাজিদ (১৮৩৯-১৮৬১ খ্রি.)।

☑ ৩২. আবদুল আজিজ (১৮৬১-১৮৭৬ খ্রি.)।

☑ ৩৩. পঞ্চম মুরাদ (১৮৭৬ খ্রি.)।

☑ ৩৪. দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি.)।

☑ ৩৫. পঞ্চম মুহাম্মাদ (১৯০৯-১৯১৮ খ্রি.)।

☑ ৩৬. ষষ্ঠ মুহাম্মাদ (১৯১৮-১৯২২ খ্রি.)।

☑ ৩৭. দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ (১৯২২-১৯২৪ খ্রি.)।

উসমানি শাসনের নিয়ম অনুসারে বড় ছেলেই সাধারণত পিতার স্থলাভিষিক্ত হতো। কিন্তু একবার দেখা গেল, বড় ছেলের বয়স অনেক কম। তখন উসমান-পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ পরবর্তী সুলতান হওয়ার ব্যাপারে ফরমান জারি করা হলো।[১০৪৭]

উসমানি শাসককে 'আল-খানকার' তথা মহান সুলতান বা মহত্তম শাসক বলা হতো। তবে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ পর্যন্ত উসমানি সুলতানদের কেউই কার্যত খলিফার উপাধি ব্যবহার করেননি।[১০৪৮]

❁ খিলাফতের রাজনৈতিক এবং আইনি পরিস্থিতি

১৬শ শতাব্দীতে ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠার সময় উসমানিদের অবস্থান ছিল শক্তির শীর্ষে। পৃথিবীর সর্বাধিক বিস্তৃত ভূখণ্ডগুলোতে তাদের শাসন বিস্তার লাভ করেছিল। অধিকাংশ আরব দেশেই তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১০৪৯]

১৭শ শতাব্দীতে সামরিক এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণবশত উসমানি সালতানাতে দুর্বলতার চিহ্ন দেখা দিতে শুরু করে। তাদের বিপক্ষে রাষ্ট্রদ্রোহ এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জের বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা হয়। ক্রমে উসমানিদের দুর্বলতা বিরাট আকার ধারণ করতে থাকে। অবশেষে ১৮শ শতাব্দীতে এই দুর্বলতা পতনের রূপ নেয়। নানাধরনের স্থানীয় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন আন্দোলন। যার সর্বশেষ পর্যায়ে ছিল মিশর এবং শামে নেপোলিয়নের হামলা। এরপর মুহাম্মাদ আলি পাশার শাসনামলে মিশরে অনেকটা জাতিগত স্বাধীনতা।[১০৫০]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উসমানি সালতানাতে বিভিন্ন সংগঠনের সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু হয়। সেইসাথে ইউরোপীয়দের সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ দেখা দিতে থাকে। প্রচলন ঘটে নানাবিধ ভিনদেশি সুবিধার। আইন এবং ব্যবস্থাপনা ভিন্ন হতে থাকলে বিচার বিভাগ, প্রশাসন এবং শিক্ষা-সহ

[১০৪৭] আল-মাশরিকুল আরাবি, পৃ. ৩০-৩১

[১০৪৮] আল-মাশরিকুল আরাবি, পৃ. ৩০

[১০৪৯] খ্রিষ্টাব্দ ১৬শ শতকের শেষ দিকে উসমানি যুগের মানচিত্র এবং উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পরিধির সীমা জানতে আতলাসুত তারীখিল আরাবি, পৃ. ৬৭-৬৯ দেখুন।

[১০৫০] মুহাম্মাদ আলি পাশা (১৭৬৯-১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন মিশরে খেদিভ এবং মামলুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। কায়রোর দুর্গে মামলুক নেতাদের হত্যা করে মিশর এবং সুদানে তার ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলে তার এবং তার বংশধরের জন্য মসনদের অধিকার মেনে নেওয়া হয়। (আল-মুনজিদ, পৃ. ৪৮৩)

অন্যান্য বিভাগে বিঘ্ন ঘটতে থাকে।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়।

প্রথমত : বিচার এবং আইনগত দিক থেকে উসমানি সালতানাতের ব্যবস্থাপনার উভয় স্তরের মাঝে পার্থক্য করা দরকার।

☑ (১) উসমানি খিলাফত প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় তথা সুলতান আবদুল হামিদের যুগ অর্থাৎ ১২৫৫ হিজরিতে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের আগ অবধি। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন শতাব্দী কাল অবধি আইন ছিল ইসলামি, বিচারব্যবস্থা চলত দ্বীন-ইসলাম এবং শরীয়ত অনুসারে। অবশেষে পশ্চিমাদের সামনে উসমানিদের শক্তি খর্ব হয়ে যায়।

☑ (২) ১৯ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে এর সূচনা। এ সময় 'কুলখানার ফরমান' জারি করা হয়। ১২৫৫ হিজরিতে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কার আন্দোলন প্রকাশ পায়। তারপর ১২৭৪ হিজরিতে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে জারি করা হয় 'হুমায়ুনলিপি'। অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানি রাষ্ট্রের বলয় থেকে আরব রাষ্ট্রগুলো বের হয়ে যায়।

এরপর ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক ইসলামি খিলাফত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেয়। উসমানি খিলাফতের এ স্তরে একই রাষ্ট্রে তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন আইন। বিচারব্যবস্থায় দেখা দেয় দ্বৈত নীতি। বিদেশি আইনকানুন এবং ব্যবস্থাপনা অনুপ্রবেশ করে। পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদেশি আদালত এবং সাধারণ বিচারালয়। অবশেষে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে কামাল আতাতুর্ক শারঈ আদালত বাতিল ঘোষণা করে সেটার যাবতীয় কার্যক্রম বিচারিক আদালতের সাথে সংযুক্ত করে দেয়।[১০৫১]

দ্বিতীয়ত : রাজনৈতিক দিক থেকে উভয় যুগের ব্যবস্থাপনার মাঝে পার্থক্য করা উচিত।

☑ (১) উসমানি যুগ হলো খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুলতান আবদুল হামিদের পতনের আগ পর্যন্ত। এ সময় রাজনৈতিক দিক থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ইসলাম-সম্মত ছিল।

☑ (২) আধুনিক তুর্কির দুই দল—জোটদল এবং প্রগতিবাদী দল—ক্ষমতা গ্রহণের পর তুর্কি শাসনব্যবস্থা জাতীয়তাবাদী তথা তুরানি হয়ে গিয়েছিল। ইসলামি শাসন আর বাকি থাকেনি।

[১০৫১] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১০৭; তারীখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ, পৃ. ২৯৮; আল-মাদখালুল ফিকহিল আম : ১/১৬৯

বিদেশিদের সুযোগ-সুবিধা

উসমানি খিলাফতের সময়কার বিদেশি সুযোগ-সুবিধাগুলো ছিল উসমানি কর্তৃপক্ষ, সাধারণ শারঈ শাসন এবং বিশেষত বিচার বিভাগের জন্য পিঠে ছুরিকাঘাতের মতো। এসব সুযোগ-সুবিধা ছিল নিকৃষ্ট দরজা। যার মাধ্যমে পশ্চিমা উপনিবেশ আর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো উসমানি সালতানাতের তৃণমূলে প্রবেশ করেছিল। এভাবেই উসমানি সালতানাতের নাগরিক এবং প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে উপনিবেশ আর পশ্চিমা প্রভাব ঢুকে পড়ে। যার শুরুটা ছিল রাষ্ট্রে থাকা বিদেশি জনগণ, অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য বিচারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের প্রদত্ত অধিকারের মাধ্যমে। যার ভিত্তি ছিল কিছু রাষ্ট্র এবং সংগঠনকে উসমানি সুলতানদের পক্ষ থেকে বাণিজ্যিক আর রাজনৈতিক স্বার্থে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।[১০৫২]

এসব বিদেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পরিণতি ছিল ভয়াবহ। এর ফলে রাষ্ট্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। রাষ্ট্রকে তার ভূমির ব্যাপারে কর্তৃত্ব হ্রাস করে দিয়েছে। এই সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে ভিনদেশিরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে। রাষ্ট্রের মর্যাদা, অধিকার, ব্যবস্থাপনা এবং আইনকানুন নিয়ে তারা তামাশায় মেতে উঠেছে। যা ছিল নাগরিকের মর্যাদার পরিপন্থি এবং ইসলামি রাষ্ট্রের কাঁধে কলঙ্কের দাগ। আল্লাহর আইন এবং ইসলামি রাষ্ট্রগুলোয় শারঈ বিচারব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত আঘাত।

এসব সুযোগ-সুবিধার পরিণতি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ৯৪১ হিজরিতে ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের সাথে সুলতান সুলাইমান আল-কানুনির কৃত চুক্তির মাধ্যমে। এটাই ছিল সর্বপ্রথম চুক্তি, যা-তে উসমানি সালতানাতের 'ছাড়নীতি' প্রকাশ পেয়েছিল। অথচ উসমানি সালতানাত সে-সময় প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শক্তির শীর্ষে অবস্থান করছিল। এই চুক্তিতে ফিরিঙ্গি রাজার সামনে উসমানি সালতানাত আনুগত্য এবং বিনয় প্রকাশ করে। এই চুক্তিপত্রের কয়েকটি পয়েন্ট ছিল এমন :

☑ ১. আইন অনুসারে ফ্রান্সের জনগণের মাঝে রাষ্ট্রদূতের পরিধির অধীনে ঘটে যাওয়া যাবতীয় দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা শুনানি, বিচারকার্য পরিচালনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেবল ফরাসি রাষ্ট্রদূতের জন্যই সংরক্ষিত

[১০৫২] উসমানি যুগের আধ্যাত্মিক ধর্মীয় সংগঠনের অধিকার প্রদানের মাধ্যমেই সুযোগ-সুবিধার প্রচলন শুরু হয়। যা পরবর্তীকালে বিদেশি সুযোগ-সুবিধা অবধি গড়ায়। হুমায়ুনলিপিতে সুলতান আবদুল মাজিদ লিখেছিলেন, 'আমার মহান পূর্বপুরুষগণ যেসব আধ্যাত্মিক সুযোগ-সুবিধা এবং সহায়তা খ্রিষ্টান ও অমুসলিমদেরকে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলো যথারীতি বহাল এবং সংরক্ষিত থাকবে।' (তানযীমুল আহওয়ালিশ শাখসিয়্যাহ লিগায়রিল মুসলিমিন, পৃ. ৫৩)

থাকবে। কোনো শাসক, শারঈ বিচারক কিংবা অন্য যে-কোনো সরকারি কর্মকর্তা এ ব্যাপারে তাকে বাধা দিতে পারবে না।

☑ ২. উসমানি সালতানাতের কোনো শারঈ বিচারক কিংবা অন্য যে-কোনো সরকারি কর্মকর্তার কোনো অবস্থাতেই ফরাসি ব্যবসায়ী এবং ফরাসি জনগণের মধ্যে সৃষ্ট সকল বিরোধের মীমাংসা বা বিচার করার অধিকার থাকবে না। এমনকি তারা যদি ফয়সালা করে দেওয়ার দাবি জানায় তবুও না। তথাপি এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেউ কোনো ফয়সালা করে ফেললেও সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে। তা বাস্তবায়ন হবে না। তবে হ্যাঁ, রাষ্ট্রদূত বা রাষ্ট্রদূতের মুখপাত্র উক্ত ফয়সালা সমর্থন করলে তবে সেটা বাস্তবায়ন করা যাবে। (অনুচ্ছেদ ৩)

☑ ৩. ফরাসি বণিক এবং প্রজাদের বিরুদ্ধে তুর্কি কর সংগ্রহকারী বা রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের জনগণের অভিযোগের ভিত্তিতে শারঈ বিচারক বা উসমানি সরকারের অপরাপর কর্মকর্তাদের জন্য কোনো ফৌজদারি মামলার শুনানি করা বা রায় দেওয়া বৈধ নয়। বরং যে বিচারক বা কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে, তার কর্তব্য হবে অভিযুক্তকে সরকারি বাসভবনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো। (অনুচ্ছেদ ৫)

☑ ৪. উসমানি রাষ্ট্রে নিয়োজিত ফরাসি ব্যবসায়ীদের ধর্মীয় বিষয়ে বিচারের মুখোমুখি করা যাবে না। এ ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্যও করা যাবে না।

☑ ৫. ভিনদেশিকে গ্রেফতার করা, তার বাড়িতে প্রবেশ করা, তার কাছে বিচারের কাগজপত্র পৌঁছে দেওয়া, তাকে বিচারের মুখোমুখি করা বা তার বিরুদ্ধে রায় কার্যকর করা যাবে না। অবশ্য এটা যদি তার দেশের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে হয়, তাহলে ঠিক আছে।

☑ ৬. সুলতান সুলাইমান এই চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্সের রাজাকে উসমানি সালতানাতে ফরাসি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন। বিচারকার্য পরিচালনা করার সময় একজন ফরাসি প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার অনুমতিও তিনি প্রদান করছেন।

বিদেশিদের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা মূলত শুরু হয়েছিল ৮৫৭ হিজরিতে ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ যখন কনস্টান্টিনোপল জয় করেন, তখন থেকে। তাদের সাথে মুসলিমদের অনন্য বৈশিষ্ট্য উদারতার আচরণ করতে চাওয়াই ছিল সুলতানের উদ্দেশ্য। উদারতাবশতই উসমানি সালতানাতের যে-কোনো অংশে ভিনদেশিদের বসবাসের সুবিধা করে দেওয়া-সহ আরও বেশ কিছু শিথিল আচরণ তাদের সাথে করেছিলেন। যাতে উসমানি সাম্রাজ্যে বসবাস করতে তারা আগ্রহ বোধ করে। অন্যান্য স্থানের তুলনায় উসমানি সালতানাতভুক্ত স্থানে বসবাস

করাকেই যেন তারা প্রাধান্য দেয়।

তাদের প্রতি তিনি এতটুকু নম্রতা দেখিয়েছিলেন যে, খ্রিষ্টান ধর্মযাজক এবং তাদের প্রধান ব্যক্তিরা নিজেদের সম্প্রদায়ের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। রোমান গির্জাপ্রধানকে তাদের লেনদেন এবং শাস্তির বিচার করার কর্তৃত্ব তিনি দিয়ে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে আর্মেনিয়ান প্রধান বিশপ এবং ইহুদি সন্ন্যাসীদেরও তিনি এমন সুবিধা প্রদান করেছিলেন।[১০৫৩]

পরবর্তী খলিফা বায়েজিদও মুহাম্মাদকে অনুসরণ করেন। অতিরিক্ত হিসেবে রাশিয়ার সাথে বিভিন্ন চুক্তিও তিনি এর সাথে যুক্ত করেন। রাশিয়ান বণিকদের তিনি অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। তার পরে সুলতান সালিম এবং তার পর সুলতান সুলাইমান ক্ষমতায় আসেন। যিনি বিজয়ের মহান ধারা আরও আগে বাড়িয়ে নিয়ে যান। উসমানি রাষ্ট্র তখন সামরিক শক্তির শীর্ষে পৌঁছে যায়। তবে অমুসলিমদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি সীমালঙ্ঘন করেন। যার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৯৪১ হিজরিতে ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের সাথে কৃত চুক্তিটি। যার বিবরণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।[১০৫৪]

পরে সবচেয়ে বড় সুবিধা দেওয়া হয় চতুর্থ মুহাম্মাদ খানের শাসনামলে। ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সকে নতুন করে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেন। চুক্তিতে একটি নতুন ধারা সংযুক্ত করেন, যা ফ্রান্সকে উসমানি রাজ্যে বসবাসকারী ক্যাথলিকদের রক্ষক বানিয়ে দেয়। এই সুবিধা ইতিহাসে 'সবচেয়ে বড় সুবিধা' হিসেবে প্রসিদ্ধ। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে সুবিধাগুলো পুনরায় নবায়ন করা হয়। ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনও অনুরূপ সুবিধা পায়। তারপর ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোও এই সুবিধা লাভ করে। পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাও ১৮৩০ সালে এমন সুবিধা পেয়েছিল। ক্রমান্বয়ে জার্মানিও একসময় তা লাভ করে। বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় বিদেশিদের বিচারের কী কী সুবিধা ছিল, সেটা আমরা সামনে উল্লেখ করব।[১০৫৫]

বিদেশি সুযোগ-সুবিধাগুলোর প্রভাব ছিল খুবই খারাপ। এগুলো বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে এনেছিল। তাই ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে উসমানি সালতানাত যাবতীয় বিদেশি সুবিধা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়। খলিফা ষষ্ঠ মুহাম্মাদের সিদ্ধান্তে সে বছরেরই ১৮ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩৩০ হিজরিতে তা নিশ্চিত করা হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলো প্রাথমিকভাবে এই সিদ্ধান্ত মেনে না নিলেও ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে

[১০৫৩] তানযীমুল আহওয়ালিশ শাখসিয়্যাহ লিগায়রিল মুসলিমিন, পৃ. ৪২

[১০৫৪] তারীখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাতিল আলিয়্যাহ, পৃ. ৯৩; আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৭৯

[১০৫৫] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৭৯

সংঘটিত লোজান চুক্তিতে তারা এর স্বীকৃতি দেয়। ফলে উসমানি সালতানাত এবং বাকি আরব দেশগুলো সুবিধার শৃঙ্খল এবং খারাপ প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে আগস্ট মিশরেও ব্রিটেনের সাথে কৃত মৈত্রী চুক্তিতে উল্লেখকৃত সুবিধাগুলো বাতিল ঘোষণা করা হয়। তারপর ৮/৫/১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মন্ট্রেক্স চুক্তিতে সুবিধাগুলো বাতিল করা হয়। ১৪/১০/১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত একটি ক্রান্তিকালীন সময়ে বাতিল করে দেওয়া হয় বিশেষাধিকারগুলো। এই সময়ে সবগুলো বিশেষাধিকার পরিপূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায়।[১০৫৬]

❁ উসমানি যুগে ধর্মীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উসমানি যুগের ধর্মীয় কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। তারা ছিলেন মুফতি বা শাইখুল ইসলাম, সামরিক বিচারক, সাধারণ বিচারক এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধায়ক। বিচারের সাথে সম্পর্ক থাকায় আমরা কেবল প্রথম তিনজনের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

☑ ১. মুফতি বা শাইখুল ইসলাম পদটি সুলতান সুলাইমান আল-কানুনির শাসনামলে শুরু হয়েছিল। ইস্তাম্বুলের মুফতিকে সুলতান সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্মকর্তা এবং আলিমদের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করতেন। যাকে 'শাইখুল ইসলাম' উপাধি দেওয়া হতো। মুফতিকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণ ছিল, সে-সময় উসমানি সাম্রাজ্যের আইনের ওপর ভিত্তি করেই অধিক পরিমাণে ফতোয়া প্রদান করা হতো। বিপুল সংখ্যক প্রশাসনিক আইন প্রণয়নের কারণে সুলতান সুলাইমানকে 'আল-কানুনি' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

ইস্তাম্বুলের মুফতির এ অধিকার থাকত যে, তিনি সরাসরি সুলতানকে বরখাস্ত করার ব্যাপারেও ফতোয়া জারি করতে পারতেন। আবার বৃহৎ রাজ্যের কেন্দ্রগুলোতেও তিনি মুফতিদের নিয়োগ দিতেন। প্রদেশসমূহের বেশির ভাগ কেন্দ্রে সিনিয়র হানাফি বিচারক নিয়োগ দেওয়ার দায়িত্বও শাইখুল ইসলাম পালন করতেন। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে জোট এবং প্রগতিশীল দলের পক্ষ থেকে শাসনের দায়িত্ব নেওয়া হলে কেবল সামরিক অফিসারেরই প্রভাব থাকে। ১৯২৩ সালে শাইখুল ইসলামের পদ বাতিল ঘোষণা করা হয়।

☑ ২. ইস্তাম্বুলের পদমর্যাদায় শাইখুল ইসলামের পরেই আসে রুমিয়ার সামরিক বিচারক এবং আনাতোলিয়ায় সামরিক বিচারকের পদ। প্রথম মুরাদের শাসনামলে (১৩৬০-১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) এই পদটি চালু হয়। এই বিচারক উসমানি বাহিনীর সাথে থাকতেন বিধায় তাকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছিল। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রধান বিচারকের সমান

[১০৫৬] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৮১

পদমর্যাদার অধিকারী।

সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের শাসনামলে (১৪৫১-১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দে) সামরিক বিচারকের আরেকটি পদ চালু করা হয়। যার উপাধি দেওয়া হয় আনাতোলিয়ার সামরিক বিচারক। তিনি সাম্রাজ্যের পূর্ব দিক এবং এশিয়ার অংশ সামাল দিতেন। আর প্রথমজন দেখতেন রুমিয়া তথা ইউরোপের সামরিক দিক।

☑ ৩. প্রদেশসমূহের কেন্দ্রীয় বিচারক। এই বিচারকের উপাধি ছিল 'মুল্লা' বা 'মুনলা'। যার অর্থ ছিল সর্দার বা প্রধান। ১৮ শতকের বিচারের প্রশাসনিক বিভাগ অনুসারে সামরিক বিচারক এবং ইস্তাম্বুলের বিচারককে একই পদমর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য করা হতো। তার পরবর্তী স্তরেই ছিলেন মক্কা এবং মদীনার বিচারক। তারপর সাবেক দুই রাষ্ট্রের রাজধানী বুরসা এবং এডিরনার বিচারক। তার পরবর্তী স্তরে থাকতেন ইসলামি খিলাফতের দুই কেন্দ্র দামিস্ক এবং কায়রোর বিচারক। রাষ্ট্রের দাপ্তরিক বিচারক হতেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী। তবে পাশাপাশি অন্যান্য মাযহাবের স্বীকৃত বিচারকরাও থাকতেন।[১০৫৭]

উসমানি যুগে বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

ইসলামি বিচারব্যবস্থা সাধারণ কাঠামোতে আপন গতিতেই অব্যাহতভাবে চলছিল। তার মৌলিক ভিত্তিগুলো ছিল আগের মতোই। তবে উসমানি যুগে অনেক উন্নয়ন হওয়ার পাশাপাশি মৌলিক এবং আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। যা ইসলামি বিচারব্যবস্থাকে কয়েকদিক থেকে দিয়েছিল নতুন রূপ। এখানে সে দিকগুলো আমরা উপস্থাপন করব।

❁ বিচারক নিয়োগ

উসমানি যুগের শুরুতে বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া হতো সরাসরি সুলতানের মাধ্যমে। তারপর বিচারক নিয়োগের বিষয়টি রাজধানীর মুফতি শাইখুল ইসলামের এখতিয়ারে পরিণত হয়ে যায়। তবে তা-ও সুলতানের পরিপূর্ণ সম্মতি এবং সুস্পষ্ট ইচ্ছা অনুসারেই হতো। ৯৫১ হিজরিতে মুফতি আবুস সুউদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি মুস্তফা যখন ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন সুলতানের কাছে বিচারক নির্বাচনের ব্যাপারে নিজের পরিকল্পনা তুলে ধরে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের যুগের বিচারকদের এবং ইনসাফের মধ্যে সমতা সুস্পষ্টভাবে দেখা দিলে জনসাধারণ, ধর্ম ও ইনসাফের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া

[১০৫৭] বিলাদুশ শামি ওয়া মিশর মিনাল ফাতহিল উসমানি ইলা হামলাতি নাবিলিয়ুন, পৃ. ৮১

হবে।' এ থেকে বুঝে আসে যে, তিনি বিচারক নিয়োগ দেওয়ার জন্য কমিটি গঠন করার কথা বলছেন।[১০৫৮]

বিচারক নিয়োগের বিষয়টি বাস্তবায়িত হওয়ার পদ্ধতি ছিল এমন : রুমানিয়া বা আনাতোলিয়ায় সামরিক বিচারক যিনি হতেন, তিনি বিচারক মনোনীত করে বিষয়টি শাইখুল ইসলামের কাছে পেশ করতেন। শাইখুল ইসলাম অনুমোদন দিলে সেটা সুলতানের কাছে পেশ করা হতো। তখন সুলতান বিচারক নিয়োগ দিয়ে একটি ফরমান জারি করতেন। পক্ষান্তরে বিচারকের প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি সরাসরি সামরিক বিচারকের তরফ থেকে হতো।

বিভিন্ন প্রদেশ এবং থানা পর্যায়ের বিচারকদেরও ইস্তাম্বুলের প্রাসাদ থেকে নিয়োগ দেওয়া হতো। এরপর বিচারক নিয়োগের বিষয়টি আরও উন্নত হয়। প্রশাসক নিজেই বিচারক নিয়োগ দিতেন। তখন মিশরের প্রশাসক সাঈদ পাশা (১২৩২ হি.) ইস্তাম্বুল সরকারের সাথে একমত হন যে, তিনি মিশরে প্রাদেশিক বিচারক নিয়োগ করবেন। আর মিশরের বিচারক নিয়োগ দেওয়া হবে ইস্তাম্বুল থেকে। নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচারক তুর্কি হওয়ার শর্ত ছিল। এরপর মিশরের অন্যান্য অঞ্চলে বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব পালন করতেন।[১০৫৯]

পরবর্তীকালে উসমানি খিলাফতের সময় মিশরে আদালতের প্রস্তাবনাতে থাকা নির্ধারিত শর্তাবলি অনুসারে বিচারক বাছাই করা এবং সে অনুযায়ী তাদের নিয়োগের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

যাচাই-বাছাইয়ের পর ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে আদালতের যে প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছিল, তদনুযায়ী শারঈ বিচারক নির্বাচনের পর খেদিভ (মিশরের শাসক)-এর আদেশ দ্বারা নিয়োগ চূড়ান্ত হতো। চূড়ান্তকরণ বৈঠকে মিশরের গ্র্যান্ড শারঈ আদালতের বিচারক, শাইখুল আজহার, হানাফি নেতৃবৃন্দের মুফতি, নাজির আল-হাক্কানিয়্যাহ তথা আইনমন্ত্রী বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতেন। সাধ্যানুসারে আলিমগণও সেখানে একত্র হতেন।[১০৬০]

১৮৯৭ সালের আদালতের প্রস্তাবনায় হাক্কানিয়্যাহ তথা আইন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠনের শর্ত দেওয়া হয়েছিল। যা-তে আদালতের তত্ত্বাবধায়ক বা তার প্রতিনিধি, শাইখুল আজহার, মিশরের মুফতি, আল-হাক্কানিয়্যাহর মুফতি

[১০৫৮] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২১২

[১০৫৯] উসমানি যুগে মামলুকরা মিশরের ক্ষমতায় এলে তারা তুর্কি সুলতানের পক্ষ থেকে বিচারক নিয়োগ দানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করত না। তারা নিজেদের বিচার-সংক্রান্ত মোকদ্দমা শাইখুল আজহারের কাছে তুলে ধরত। শাইখুল আজহার সাধারণত শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারী হতেন। আবার হাম্বলি বা মালিকি মাযহাবের অনুসারী হতেও দেখা গেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তারা চারজন বিচারকের রীতি পুনরায় চালু করেছিল। (আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৭৩)

[১০৬০] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১০৯ এবং ২১৩

এবং শারঈ আদালতের দুজন পরিদর্শকের কথা বলা হয়।[১০৬১]

১৮৫৫ সালে শারঈ বিচারকদের স্নাতক করার জন্য রাজধানী ইস্তাম্বুলে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই থেকে এ ইনস্টিটিউটের স্নাতকদের মধ্য থেকেই বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া হতো।

তারপর মিশরে ১৯০৯ সালের ২৫ নং আইন জারি করা হয়। যা-তে বিচারক, সদস্য এবং মুফতিদের নির্বাচন এবং নিয়োগ পদ্ধতির ব্যাপারে ১০-১৪ অনুচ্ছেদটি সুস্পষ্ট করার পাশাপাশি এটি কার্যকরও করা হয়েছিল।[১০৬২]

মিশর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কি নির্ভরতা থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়। ফলে সংবিধান অনুসারে মিশরে সমস্ত বিচারক নিয়োগের অধিকার কেবল মিশরের রাজার জন্য সংরক্ষিত হয়ে যায়।

বিচারক হওয়ার শর্তাবলি

উসমানি প্রশাসন বিচারক নিয়োগে যেসব শর্তের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিত সেগুলো হচ্ছে :

- ☑ ১. বিচারকের বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হতে হবে।
- ☑ ২. ব্যক্তিকে অবশ্যই যে-কোনো ধরনের আইনি অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ তাকে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আইনি বাধা থাকা চলবে না।
- ☑ ৩. সাধারণ অপরাধ করার কারণে প্রার্থী যেন এক সপ্তাহের বেশি কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হয়।
- ☑ ৪. ব্যক্তিটিকে অবশ্যই বুঝমান, ন্যায়পরায়ণ, সৎ, দক্ষ এবং জ্ঞান আর কাজের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হতে হবে।
- ☑ ৫. মামলা, জটিল বিষয় এবং সমস্যার সমাধান পূর্ণরূপে পার্থক্য করতে সক্ষম হতে হবে।
- ☑ ৬. প্রার্থীকে অবশ্যই বিচারকদের প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমোদিত হতে হবে। কিংবা একটি পরীক্ষা দিয়ে বিচারকদের প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে হবে।
- ☑ ৭. বিচারককে অবশ্যই হানাফি মাযহাবের অনুসারী হতে হবে। তবে বিচারকের নায়েবের জন্য এটা শর্ত নয়।

১৮৯৭ প্রস্তাবনার ১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিচারক বা শারঈ আদালতের সদস্য নিযুক্ত হতে চাইলে শরীয়তের বিধানাবলি সম্পর্কে তার পূর্ণ জ্ঞান থাকতে

[১০৬১] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২১৩
[১০৬২] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২১২

হবে। সচ্চরিত্র হতে হবে; অসম্মানজনক রায়ে দোষী সাব্যস্ত হতে পারবে না। তার বয়স কমপক্ষে ২৫ বছর পূর্ণ হতে হবে।

কেন্দ্রীয় আদালতের বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হতে হলে প্রার্থীকে আল-আজহার থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের সনদ লাভ করতে হবে। নয়তো শাইখুল আজহার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো জায়গা থেকে সনদ পেতে হবে। দারুল উলূম থেকে বিচারকার্য পরিচালনা এবং ফতোয়া প্রদান করার উপযুক্ত হওয়ার সনদ থাকতে হবে।[১০৬৩]

প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় বিচারক পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য তুর্কি বংশোদ্ভূত হওয়া শর্ত। তবে অন্যান্য বিচারক এবং বিচারকের নায়েব হওয়ার জন্য এটা শর্ত নয়। তারা মিশরীয় বা অন্য যে-কোনো বংশোদ্ভূত হতে পারবে।[১০৬৪]

হানাফি মাযহাব অনুসারে বিচার করা এবং ফতোয়া প্রদান করার ব্যাপারে উসমানি খলিফা কর্তৃক জারিকৃত ফরমানটি আমরা সামনে উল্লেখ করব। এতে শর্ত ছিল যে, বিচারককে হানাফি মাযহাবের অনুসারী হতে হবে। আর এই বিচারক চার মাযহাবের পক্ষ থেকে চারজন নায়েব নিয়োগ প্রদান করবেন।[১০৬৫]

উসমানি যুগে বিচার পদ্ধতি

উসমানি যুগে বিচার পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছিল। যা ছিল নিম্নলিখিত শ্রেণিগুলোর সমন্বয়ে গঠিত।

☑ ১. শাইখুল ইসলাম বা রাজধানীর মুফতি। তিনি একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা তার মতামতের অপেক্ষা করত। তার দায়িত্ব ছিল ফতোয়ার উত্তর প্রদান এবং বিচারক নিয়োগ দেওয়া। বিচার বিভাগের সাধারণ তত্ত্বাবধানও ছিল তার পরিধিভুক্ত।

☑ ২. সামরিক বিচারক। তিনি প্রধান বিচারকের সমপর্যায়ের পদের অধিকারী ছিলেন। রাষ্ট্রে তার অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিচারকদের নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে প্রথমে সম্ভাব্য প্রার্থীদের যাচাই করে তারপর শাইখুল ইসলামের কাছে তাদের নাম পেশ করতেন। উসমানি সালতানাতে সামরিক বিচারক ছিলেন দুজন। উসমানি রাষ্ট্রের সামরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাকে 'সামরিক বিচারক' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছিল। সামরিক বিচারক মূলত নিজে সামরিক ছিলেন না। সামরিক বিচারকের দুজনের একজন ছিলেন ইউরোপের রুমেলিয়ার সামরিক বিচারক এবং অপরজন ছিলেন এশিয়ার

[১০৬৩] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২১২
[১০৬৪] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৭২; তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১০৯
[১০৬৫] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১০৮

আনাতোলিয়ার সামরিক বিচারক। সুলতান প্রথম মুরাদ (৭২৬ হি. মোতাবেক ১৩২৬ ঈ.) সর্বপ্রথম সামরিক বিচারকের পদ চালু করেন। সমাজে সামরিক বিচারকের অনেক প্রভাব এবং সামাজিক নৈতিক মর্যাদা থাকত। ইতিপূর্বে কোনো প্রধান বিচারপতি তেমনটা অর্জন করতে পারেনি। নিজের প্রাদেশিক আদালতের তত্ত্বাবধান করা, নিয়োগ দানের জন্য বিচারকের নাম প্রস্তাব করা এবং বিচারকের নায়েব মনোনীত করা ছিল তার দায়িত্ব।

☑ ৩. তখত বা সিংহাসনের বিচারক। এরা ছিলেন ইস্তাম্বুলের বিচারক। সংখ্যায় চারজন এই বিচারকদের একজন ছিলেন রাজধানীতে এবং বাকি তিনজন ছিলেন ইস্তাম্বুলের শহরতলিতে। অন্যান্য প্রাদেশিক রাজধানীর বিচারকরা ছিলেন তাদের সমপর্যায়ের।

☑ ৪. প্রধান শ্রেণির বিচারক। তাদের 'শহরের বিচারক' বলা হতো। রাজধানী ছাড়া অন্যান্য প্রাদেশিক শহরগুলোতে তারাই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। সংখ্যায় তারা ছিলেন ১৭জন।

☑ ৫. পরিদর্শক বা তদন্ত বিচারক।

☑ ৬. ছোট বিভাগের বিচারক। তারা ছোট এবং দ্বিতীয় স্তরের প্রাদেশিক শহরের বিচারক ছিলেন।

☑ ৭. সাধারণ বিচারক। উসমানি ব্যবস্থাপনায় তাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিল। তাদের থাকত বিরাট ক্ষমতা। প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলোতে প্রশাসকের পরই ছিল তাদের স্থান।

☑ ৯. উচ্চ আদালতে মোকদ্দমা আপিল এবং মামলা রেফার করা। সুলতান আবদুল আজিজ খানের শাসনামলে মামলা রেফারের একটি বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। যার কাজ ছিল মামলা এবং রায় রেফার করা। তবে সুলতান আবদুল হামিদের শাসনামলে এ আদালত বিলুপ্ত করে ফতোয়া বিভাগের অধীনে 'মাজলিসুত তাওফিকাতিশ শারইয়্যাহ' তথা শারঈ সমঝোতা পরিষদ চালু করা হয়। যা মামলা রেফার সংক্রান্ত আদালতের মতোই ছিল।[১০৬৬]

এই বিচারকরা ছিলেন কয়েক স্তরের। প্রথম স্তরে ছিলেন সামরিক বিচারক। বিচার বিভাগের শীর্ষ পর্যায়ে তিনিই ছিলেন। তার পরবর্তী স্তরে ছিলেন 'মাওলা' তথা প্রধান শ্রেণির বিচারকগণ। সংখ্যায় তারা ছিলেন ১৭জন। পদমর্যাদার ক্ষেত্রে তারা ছিলেন সামরিক বিচারকের পরবর্তী স্তরের। রুমেলিয়া, আনাতোলিয়া, মক্কা, মদীনা, বুরুসা, এডিরন, দামিস্ক, কায়রো, আল-কুদস, ইজমির, আলেপ্পো, লারিসা এবং সালুনিয়কে তারা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

[১০৬৬] সুরিয়্যাহ ওয়াল আহদুল উসমানি, পৃ. ৩০

'পাশা'দের মতো বিশেষ সুবিধা তাদের দেওয়া হতো। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব প্রশাসন এবং বিশেষ অঞ্চল ছিল। সুলতান সিংহাসনে আরোহণের সময় তারা সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন। তাদের পর আসতেন ছোট ছোট শহরের বিচারকগণ এবং সর্বোচ্চ শ্রেণির তদন্ত বিচারকগণ। যাদের বিচার বিভাগীয় কিছু পরিধি ছিল। সুলতান কর্তৃক ওয়াকফকৃত সম্পদ এবং ওয়াকফ প্রশাসন দেখাশোনার দায়িত্ব তারা পালন করতেন।

❁ বেসামরিক আদালত প্রতিষ্ঠা

উসমানি যুগ ছিল পূর্ণাঙ্গ শারঈ বিচার বিভাগ থেকে আদালত এবং বিচারব্যবস্থার দ্বৈত ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তিত হওয়ার সন্ধিক্ষণ। এ সময় শারঈ বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি বেসামরিক বিচারব্যবস্থা চালু হয়। এটা হয়েছিল সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদান এবং ফাঁসির বিধান রহিত করার নির্দেশনা সংক্রান্ত হুমায়ুনলিপি জারি করার পর। উক্ত ফরমান জারি করার পরে ভিনদেশি আইন এবং ব্যবস্থাপনা চালু হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় শারঈ আদালত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বতন্ত্র বেসামরিক আদালত। ইসলামি শরীয়তের পাশাপাশি মানব-রচিত আইন প্রণয়ন করে ফরমান জারির উদ্যোক্তা ছিলেন সুলতান আবদুল মাজিদ। এসব আইন বাস্তবায়নের জন্য আদালত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিলে এর পরপরই বেসামরিক আদালতগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামনে ধারাবাহিকভাবে এর আলোচনা পেশ করা হলো।

- ☑ ১. আপোস আদালত। যা ১৩২৯ হিজরিতে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের পর প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০৬৭] এটি ছিল ভ্রাম্যমাণ আদালত। গ্রাম এবং জেলা পর্যায়ের কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগে এবং উপজেলায় এ আদালত পরিচালিত হতো। এ আদালত পরিচালনা করতেন একজন বিচারক। তার অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে দায়িত্ব থাকত।
- ☑ ২. প্রাথমিক আদালত। প্রতিটি বিচারের কেন্দ্রে, জেলায় এবং প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলোতে এই আদালত পরিচালিত হতো। যা গঠিত হতো একজন প্রধান বিচারপতি এবং চারজন সদস্য নিয়ে। এটি ছিল আপোস আদালতের সর্বোচ্চ স্তর।
- ☑ ৩. ব্যবসার আদালত। ১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে একজন প্রধান বিচারপতি, দুজন স্থায়ী সদস্য এবং চারজন অস্থায়ী সদস্য থাকতেন।
- ☑ ৪. আপিল আদালত। প্রতিটি প্রদেশের কেন্দ্রে একটি করে আপিল আদালত থাকত। যা-তে দুটি বিভাগ থাকত। একটি হতো আইনি (তথা দেওয়ানি এবং অর্থ-সংক্রান্ত), আর অপরটি হতো দণ্ড-সংক্রান্ত। প্রতিটি বিভাগে পাঁচজন করে

[১০৬৭] আপোসের বিচার আইন ১১/৪/১৩২৯ হিজরিতে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রণয়ন করা হয়েছিল।

বিচারক থাকতেন। একজন হতেন প্রধান বিচারক এবং চারজন হতেন সদস্য। এই চার সদস্যের দুজন হতেন মুসলিম এবং দুজন হতেন অমুসলিম। এই সদস্যপদ দুই বছর মেয়াদি হতো। আপিল আদালত ছিল প্রাথমিক আদালতের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের।

☑ ৫. মামলা রেফার আদালত। যার সদর দফতর ছিল রাজধানী ইস্তাম্বুলে। এতে চারটি বিভাগ ছিল। আইনি, দণ্ড-সংক্রান্ত, বাণিজ্যিক এবং শারঈ। ১২৯৬ হিজরিতে সুলতান আবদুল হামিদ কর্তৃক জারিকৃত 'আদালত গঠনবিধি'-এর অধীনে 'মামলা রেফার আদালত' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আদালত ছিল একজন প্রধান বিচারক এবং ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত। যা ছিল সর্বোচ্চ আদালত।

☑ ৬. বাণিজ্যিক আদালত। এটি ছিল বাণিজ্যিক মামলার শুনানি এবং বাণিজ্য আইন বিষয়ক বিশেষত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রাথমিক আদালত।

☑ ৭. বিশেষ আদালত। এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমী আদালত। ভিনদেশিদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দুই ধরনের হতো।

প্রথমত: দূতাবাস-সম্বন্ধীয় আদালত। এই আদালতগুলো বিদেশি রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে নাগরিকদের স্বার্থ আছে এমন বিষয়গুলো বিচার করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একজন বিদেশি সেখানে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। অর্থাৎ যে দেশ এ আদালত প্রতিষ্ঠা করেছে, তার কোনো একজন নাগরিক এই আদালতের বিচারক হিসেবে থাকত।

দ্বিতীয়ত: আধ্যাত্মিক আদালত। অমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মাধ্যমে এই আদালতগুলো পরিচালিত হতো। যার কাজ ছিল অমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করা। তবে অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো শারঈ আদালতেও মামলা দায়ের করত। কেননা মুসলিম আইনবিদগণের ঐকমত্য অনুসারে, মুসলিমদের মাঝে অমুসলিম বিচারককে বিচারের দায়িত্ব প্রদান বৈধ নয়। অধিকাংশ মুসলিম আইনবিদ মুসলিমদের মাঝে তো বটেই, এমনকি অমুসলিমদের মাঝেও অমুসলিমকে বিচারের দায়িত্ব প্রদান বৈধ মনে করেন না। তবে হানাফি মতাবলম্বী আইনবিদগণ অমুসলিমকে অমুসলিমদের মাঝে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দানের অনুমতি দিয়েছেন।

☑ ৮. শারঈ আদালত। মৌলিকভাবেই পূর্ববর্তী আদালতের সাথে শারঈ আদালতের সম্পর্ক থাকলেও তার পরিধি সীমিত হয়ে পড়েছিল। এমনকি মুসলিমদের মধ্যকার ব্যক্তিগত, আর্থিক, বিবেচনামূলক শাস্তি এবং অপরাধ-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি বিষয়ের বিচারেই তা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অনন্তর এসব পরিধি কমিয়ে কেবল মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া

হয়।[১০৬৮]

☑ ৯. মামলার আদালত। নেপোলিয়ন মিশরে আসার পর আদালতে নানাধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসেন। 'কোর্ট অব কেস' তথা মামলার আদালত নামে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। যা-তে ১২জন বণিক ছিল। এদের অর্ধেক আবার ছিল কিবতি বা কপ্টিক। আর অবশিষ্ট অর্ধেক ছিল মুসলিম। প্রধান বিচারক কিবতি বা কপ্টিক ছিল। বণিক এবং জনসাধারণের বিষয় দেখাশোনা করা ছিল এই দপ্তরের কাজ। উসমানি বিচারকদের পরিবর্তে মিশরের কোনো শাইখকে বিচারক হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য নেপোলিয়ন আদেশ করেন। তিনি শতকরা আড়াই শতাংশ বিচারিক ফি নির্ধারণ করেন, যা বিচারক এবং মুনশিদের মাঝে বিতরণ করা হতো।[১০৬৯]

❁ মিশরে আদালত এবং দ্বৈত বিচার বিভাগ

১২৯১ হিজরিতে উসমানি সাম্রাজ্য থেকে বিচারিক এবং প্রশাসনিকভাবে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর খেদিভ ইসমাঈল মিশরে বেশ কয়েকটি বিচার বিভাগীয় পরিষদ গঠন করেন, যেগুলো অনেকটা উসমানি আদালতের মতোই ছিল। সেগুলো হচ্ছে,

☑ ১. মামলা রেজিস্ট্রি কাউন্সিল : এর পরিধি ছিল ১৫০০ পিয়াস্টার অপেক্ষা কম মূল্যের সাধারণ দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করা।

☑ ২. ছোট ছোট শহরের মামলা পরিষদ : এর পরিধি ছিল ৫০০ পিয়াস্টার থেকে কম মূল্যের নাগরিক অধিকার। আবার কিছু কিছু কৃষি বিষয়ের তত্ত্বাবধানও করা হতো।

☑ ৩. কেন্দ্রীয় পরিষদ : শহরের আপিলকৃত মামলাসমূহের রায় পরিচালনা করা ছিল এ পরিষদের কাজ। যা প্রাথমিকভাবে ৫০০ পিয়াস্টার মূল্যমানের মামলাগুলোর বিচার করত। তবে ২৫০০ পিয়াস্টারের বেশি মূল্যমানের কখনোই হতো না।

☑ ৪. জেলা এবং উপজেলা শহরগুলোতে থাকা প্রাথমিক পরিষদ। যা ২৫০০ পিয়াস্টার মূল্যমানেরও বেশি এমন ফৌজদারি মামলা এবং দেওয়ানি মামলার বিচার করত।

☑ ৫. প্রাথমিক আদালত থেকে জারি করা রায়গুলোর আপিল পরিষদ।

☑ ৬. কায়রোর বিচার পরিষদ। এর কাজ ছিল আপিল পরিষদের রায়গুলো দেখাশোনা করা। কার্যত এটি রেফার আদালতের মতো ছিল।

[১০৬৮] আল-আওদ্বাউত তাশরীইয়্যাহ, পৃ. ১৮৭; উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ ওয়াল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ৯৫
[১০৬৯] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৭৩; মুহাদ্বারাত ফী মাবাদিইত তানযীমিল কাদ্বাঈ ফিল ইরাক, পৃ. ৩২

☑ ৭. বাণিজ্যিক পরিষদ।

☑ ৮. দেশের শাইখ তথা প্রবীণদের পরিষদ।

এই পরিষদগুলো শারঈ বিচারকের অধিকাংশ পরিধি দখল করে নিয়েছিল। পূর্বোল্লেখিত পরিষদগুলোর অব্যবহিত পরই মিশরীয় এবং ভিনদেশিদের মিশ্রণে ১৮৭৫ সালে 'মিশ্র আদালত' প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৮৮৩ সালে পূর্বোক্ত পরিষদগুলো বাতিল করে কেবল মিশরীয়দের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্থানীয় আদালত'।[১০৭০]

❁ একাধিক বিচারক

উসমানি শাসনামলে পূর্বোল্লেখিত নতুন নতুন আদালত, দেওয়ানি, স্থানীয় এবং মিশ্র আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবাদে দলবদ্ধ বিচারক পদ্ধতি চালু হয়। প্রতিটি আদালতেই তখন মামলা শুনানির জন্য একাধিক বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো।

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রস্তাবনার ২ নং ধারায় আছে, প্রতিটি কেন্দ্রীয় আদালতে একজন বিচারক থাকবেন। ৬ নং ধারায় আছে, মিশরীয় আদালত একজন বিচারক এবং পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। তাদের মধ্যে রায় জারি করা হবে তিনজনের পক্ষ থেকে। তাদের একজন হবেন প্রধান বিচারক বা তার প্রতিনিধি। আলেকজান্দ্রিয়ার আদালত গঠিত হবে একজন বিচারক এবং তিনজন সদস্য নিয়ে। যাদের একজন হবেন এই অঞ্চলের প্রধান মুফতি বা তার প্রতিনিধি। জেলার প্রতিটি আদালতে থাকবেন একজন বিচারক এবং দুজন সদস্য। যাদের একজন হবেন আদালত অঞ্চলের মুফতি। আর তিনজনের পক্ষ থেকে রায় জারি করা হবে। আর ৮ নং অনুচ্ছেদে আছে, মিশরের আদালতে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ আদালত গঠন করা হবে। যার একজন হবেন মিশরের প্রধান বিচারক, একজন হবেন মিশরের মুফতি, একজন হবেন আল-হাক্কানিয়্যাহ তথা আইন মন্ত্রণালয়ের মুফতি এবং অবশিষ্ট দুজন সদস্যকে আইনমন্ত্রীর প্রস্তাবে নিয়োগ দেওয়া হবে। পাঁচজনের পক্ষ থেকেই রায় জারি করা হবে।[১০৭১]

❁ বিচারের একাধিক ধাপ

বিচারের নিত্যনতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, নতুন নতুন সংশোধনী, নতুন সব আইন এবং ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতিতে আপিল বিভাগ চালু হয়। যা আপোস আদালত এবং প্রাথমিক আদালত থেকে রায় জারি করার পর পরিপূর্ণভাবে মামলা শুনানির দ্বিতীয় পর্যায়ের আদালত হিসেবে কাজ করত। ১৮৮০ সালের মিশরের প্রস্তাবনায় ছিল, তিন ধাপে তিন পরিষদের সামনে মামলার শুনানি হবে। প্রথম শুনানি হবে

[১০৭০] তারীখুল কাদা, পৃ. ১৯৮

[১০৭১] তারীখুল কাদা, পৃ. ২১০

শরীয়াহ পরিষদের সামনে। এরপর বাদী-বিবাদী পক্ষ যদি ফয়সালায় সন্তুষ্ট না হয়, অথবা যদি তাদের একজন সন্তুষ্ট না হয়, তাদের মধ্য থেকে কারও অভিযোগ থাকলে মিশরের আদালতে শরীয়াহ পরিষদের সামনে দ্বিতীয়বারের মতো মামলার শুনানি হবে। উল্লিখিত পরিষদ থেকে জারিকৃত ফয়সালায় কারও সন্দেহ থাকলে এই মোকদ্দমা শাইখুল আজহার এবং হানাফিদের মুফতির কাছে পেশ করা হবে।[১০৭২]

মিশরের স্থানীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করার পর দ্বিতীয় ধাপের নীতি তথা আপিল আদালত প্রয়োগ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ১৮৯৭ সালের প্রস্তাবনা অনুসারে শারঈ আদালতের ওপর এই নীতি প্রয়োগ করা হয়। ১৮৯৭ সালের ৮ নং অনুচ্ছেদে মিশরে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ আদালত গঠন করার কথা বলা হয়েছে। যা-তে একজন হবেন মিশরের প্রধান বিচারক, আরেকজন হবেন মিশরের মুফতি, আরেকজন হবেন হাক্কানিয়্যাহ তথা আইন মন্ত্রণালয়ের মুফতি। অবশিষ্ট দুজন সদস্যকে আইনমন্ত্রীর প্রস্তাবানুসারে নিয়োগ দেওয়া হবে। পাঁচজনের পক্ষ থেকেই রায় জারি করা হবে।[১০৭৩]

পরবর্তীকালে ৫/২/১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কমিটি গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়। যা-তে বলা হয়, পাঁচ সদস্যের কমিটির একজন হবেন মিশরের বিচারক, একজন হবেন হাক্কানিয়্যাহ মন্ত্রণালয়ের মুফতি এবং অবশিষ্ট তিনজন হবেন সদস্য। এরপর কমিটি থেকে মুফতিকে দেওয়া হয়। তারপর ১০/৪/১৮৯৯ সালে শারঈ উচ্চ আদালতের সদস্যপদে স্থানীয় আপিল আদালতের পক্ষ থেকে দুজন উপদেষ্টা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু মিশরের শারঈ বিচারক এবং মুফতির বিরোধিতার কারণে দ্বিতীয় নির্দেশ বাস্তবায়ন বন্ধ করে পূর্বোল্লেখিত প্রথম নির্দেশনাটি জারি করা হয়। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বারবার চেষ্টা করা হলে পুনরায় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১০৭৪] ১৮৯৭ সালের প্রস্তাবনার ১৭ নং ধারায় ফৌজদারি আদালতে মামলার আপিলের পদ্ধতি উল্লেখ আছে।

❁ বিচারকার্য পরিচালনার স্থান

মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য বিচারকরা মসজিদে বা বিশেষ কোনো জায়গাতে কিংবা অন্য কোনো স্থানে বসতেন। মিশরের গ্রামীণ বিচারকরা বিচারের জন্য নিজেদের বাসভবনেই বসতেন। এরপর বিচারের জায়গা নির্ধারিত হয়ে গেলে আদালতের নিজস্ব জায়গা অথবা ভাড়া করা জায়গায় বিচারের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

[১০৭২] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২১৫

[১০৭৩] প্রাগুক্ত

[১০৭৪] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২১৬

তিউনিসিয়ায় মুফতি এবং অভিজাত শ্রেণির তত্ত্বাবধায়কদের উপস্থিতিতে পাশা অথবা খিলাফতের কার্যালয়ে বিচারের কার্যক্রম চলত। এরপর বিচারের জন্য স্থান নির্ধারিত হলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানেই বিচারের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।[১০৭৫]

❁ বিচারকার্য হানাফি মাযহাবের মাঝে সীমাবদ্ধকরণ

উসমানিরা সবাই ছিলেন ইমাম আবু হানিফার অনুসারী। তারা হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের থেকেই শাইখুল ইসলাম নিয়োগ দিতেন। যিনি হানাফি মাযহাব অনুসারেই ফতোয়া দিতেন। সুলতান সুলাইমান ক্ষমতায় এসে একটি রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করেন। যা-তে এ কথা বলা হয়, বিচারব্যবস্থা এবং ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবই হচ্ছে রাষ্ট্রের আবশ্যকীয় মাযহাব। সুতরাং শাইখুল ইসলাম, সমস্ত মুফতি এবং যাবতীয় বিচারক হানাফি মাযহাব অনুসারে ফতোয়া প্রদান এবং বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

এরপর উসমানি সালতানাত লেনদেন-সংক্রান্ত হানাফি মাযহাবের বিধানাবলি সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে উসমানি খিলাফতের আদালতে হানাফি মাযহাব আবশ্যকীয় কার্যকর আইনে পরিণত হয়। এই সংকলনটির নাম দেওয়া হয়েছিল *'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ'* তথা আদালতের বিধিবিধানের সংকলন।

১৮৫৫ সালে হানাফি মাযহাবের আইন নিয়ে গবেষণার জন্য একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো।

৯২৭ হিজরির রজব মাসের ১০ তারিখে তুর্কি সামরিক বিচারক সাইদি শালাবি মিশরে আগমন করেন। তার হাতে উসমানি সুলতানের পক্ষ থেকে একটি ফরমান ছিল। যা-তে শালাবিকে সুলতানের প্রধান বিচারক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তা-তে এ কথাও বলা হয়েছিল, সুলতান মিশরের চার মাযহাবের বিচারক নীতি বাতিল করে কেবল একজন তুর্কি বিচারককে নিয়োগ দিয়েছেন। তুর্কি বিচারকের অধীনে চার মাযহাব অনুসারে চারজন নায়েব থাকবেন। মিশরকে সুলতান ৩৬টি বিচার-সম্বন্ধীয় প্রদেশে ভাগ করেছেন। সুলতান কয়েকজন বিচারক নিয়োগ দেবেন। অবশিষ্ট বিচারকদের নিয়োগ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবেন প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত সামরিক বিচারক।

এ ফরমান শুনে মিশরের চার মাযহাবের বিচারকগণ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। আদালতে উপস্থিত হওয়া বর্জন করে তারা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান শুরু করলেন। কেননা

[১০৭৫] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১২৬

তারা ধরেই নিয়েছিলেন, এ ফরমান অনুযায়ী কাজ করা মানে বিচারব্যবস্থাকে শুধু হানাফি মাযহাবের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলা।[১০৭৬]

বিভিন্ন মাযহাবের বিচারকরা তখনো দায়িত্ব পালন করছিলেন। একপর্যায়ে মিশরে মুহাম্মাদ আলি পাশার শাসনামলের প্রাথমিক দিকে কেবল হানাফি মাযহাব অনুসারেই বিচারকদের বিচার করার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যায়। খলিফা ফরমান জারি করে বিচারকার্য পরিচালনা এবং ফতোয়া প্রদান কেবল হানাফি মাযহাব অনুসারেই সীমাবদ্ধ করে দেন। এই ফরমান মিশরের আলিম-উলামা, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সরকারি ব্যক্তিদের সামনে পড়ে শোনানো হয়। মুহাম্মাদ আলি পাশার শাসনামলের শেষ দিকে এই ফরমান অনুসারে কাজ করার ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়ে স্পষ্ট সরকারি ফরমান জারি হয়। এরপর থেকেই মিশরের বিচারব্যবস্থা হানাফি মাযহাব অনুসারে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অথচ এর আগে মিশরে শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারীরাই মিশরে ধর্মীয় নেতৃত্ব দিত। আফ্রিকাতেও বিচারব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের ওপর নির্ভর করা শুরু হয়ে যায়। এমনকি উত্তর আফ্রিকাতেও হানাফি মাযহাব পৌঁছে যায়। অথচ সেখানে কেবল মালিকি মাযহাবেরই প্রচলন ছিল।[১০৭৭]

আলি হায়দার বলেন, 'উসমানি সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বিচারকদের প্রতি এ আদেশ দেওয়া ছিল, তারা যতক্ষণ উসমানি আদালতে থাকবেন ততক্ষণ অবধি হানাফি মাযহাব অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করতে তারা বাধ্য। অন্য মাযহাবের অনুসারী হলেও এ আদেশ তাদের মানতেই হবে।'

আলি হায়দার আরও বলেন, 'এখানে চিন্তাভাবনা করার মতো একটি বিষয় রয়েছে। তা হচ্ছে প্রশাসনিকভাবে হানাফি মাযহাবকে অন্য মাযহাবের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এই মাযহাবকে অনুধাবন করা। যা ভবিষ্যতে লেনদেনের ক্ষেত্রে সমকালীন যুগের চাহিদার সাথে সবচেয়ে অধিক সংগতিপূর্ণ হবে।'[১০৭৮]

মিশরের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে শাইখ মাহমুদ আরনুস বলেন, 'বিচারব্যবস্থাকে হানাফি মাযহাবের মাঝে সীমাবদ্ধ করার পর তার উৎসগুলো কমে যায়। কারণ হানাফি মাযহাবের অধিকাংশ অনুসারী ছিলেন শামের অধিবাসী। শামেই আবু হানিফার মাযহাব সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়েছিল। ওই সময় বিচারকদের এমনভাবে অধঃপতন হয়েছিল, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের অন্তরে বিচারকদের প্রতি ধর্মীয় মূল্যবোধ না থাকলে তাদের সমস্ত প্রভাব নিশ্চিহ্ন

[১০৭৬] তরীখুল কাদ্বা, পৃ. ১০৭; আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৭২
[১০৭৭] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১০৭-১০৮; শাজারাতুন নূরিয যাকিয়্যাহ, পৃ. ১২৯
[১০৭৮] দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম, পৃ. ৪১৬-৪১৭

হয়ে যেত।'[১০৭৯]

উসমানি যুগে গঠনমূলক বিচারব্যবস্থা

মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং মিশর-সহ অন্যান্য রাষ্ট্রে তাতারিয় আইন ইয়াশার মতো অন্যান্য বিদেশি আইন বাস্তবায়ন করার কারণে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর যে অধঃপতন হয়েছিল, তা দূর করে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ন এবং যাবতীয় শারঈ বিষয় যথাযথ স্থানে প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্যে উসমানি খিলাফত ইসলামের মৌলিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সুলতান প্রথম সালিম ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া এবং মিশরকে উসমানি সালতানাতের অধীনে আনার পর শারঈ বিচারকের কাছে পুনরায় তার মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। উসমানি খিলাফতের ঘোষণা দেওয়া হলে অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র উসমানি খিলাফতের ছায়াতলে চলে আসে। বিচারের বিধিবিধান, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং শরীয়তের নীতিমালা মেনে চলার ক্ষেত্রে উসমানি খিলাফতের বিচারব্যবস্থা তখন ছিল পরিপূর্ণ শারঈ আর ইসলামসম্মত।

কিন্তু রাজনৈতিক দুর্বলতা, সৃজনশীলতায় স্থবিরতা, বিদেশি হস্তক্ষেপ, বিদেশিদের ব্যাপক সুবিধা প্রদান, শারঈ বিচারব্যবস্থায় পশ্চিমা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং পশ্চিমা আইনের অনুপ্রবেশ ঘটানো, দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠা, শারঈ বিচারকের এখতিয়ার কমিয়ে দেওয়া এবং ইসলামি শরীয়তের প্রভাব একটি সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার মতো নানান কারণবশত উসমানি সালতানাত একটি কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ সময় অতিক্রম করছিল। এখানে আমরা এ সংক্রান্ত আলোচনা করব।

এভাবেই উসমানি সালতানাত আইন এবং বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইউরোপের অনুসরণ শুরু করে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিরোধিতা এবং শারঈ আইনকে তারা সরাসরি উপেক্ষা না করে এই যুক্তি পেশ করে, এগুলো উসমানি আইনকানুন এবং প্রশাসনিক সংশোধনী। আসলে তারা বাধ্য হয়ে ইসলামি আইনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করত এবং কঠিনভাবে শরীয়ত আঁকড়ে ধরার কথা বলত।

ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, উসমানি সালতানাত বেশ কিছু নতুন আইন জারি করে এবং উসমানি সালতানাতের অধীনস্থ আরব রাষ্ট্রগুলোতে সেসব প্রয়োগ করে।

❁ পশ্চিমাদের থেকে গৃহীত উসমানি আইন

উসমানি সালতানাত পশ্চিমা প্রভাবের শৃঙ্খলে আটকা পড়েছিল। তারা চেয়েছিল পশ্চিমা সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে। আধুনিক উন্নয়ন এবং

[১০৭৯] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২২৩

অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পশ্চিমা আইন গ্রহণ না করে উপায় নেই—এমনটাই ছিল ভিনদেশি ক্ষমতা এবং বিদেশি সুবিধার বার্তা। উসমানি খিলাফতের কর্মকর্তাদের মাঝেও এই মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তারা অন্ধ এবং বধিরের মতো ইউরোপের পেছনে ছুটে চলে। পর্যায়ক্রমে এবং ধাপে ধাপে পশ্চিমা নীতি এবং আইন গ্রহণ করে। এমন কয়েকটি আইন এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

☑ ১. ১২৫৬ হিজরিতে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে উসমানি ফৌজদারি আইনটি ছিল ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে জারিকৃত এমনই একটি ফরাসি আইন থেকে গৃহীত। স্থানীয় এবং ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

☑ ২. ১২৬৭ হিজরিতে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের বাণিজ্যিক আইনটি ছিল ফরাসি আইনের একটি আক্ষরিক রূপ।

☑ ৩. ১২৬৭ হিজরিতে ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের আরেকটি ফৌজদারি আইন ইউরোপীয় আইন থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

☑ ৪. দাতব্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন। এটি ১২৭৩ হিজরিতে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান আবদুল মাজিদের 'কুলখানা ফরমান' নিশ্চিতকরণার্থে জারি করা হয়েছিল।

☑ ৫. ১২৭৫ হিজরিতে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ভূমি আইন। যা খাস, পরিত্যক্ত এবং অনাবাদি জমিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য চালু করা হয়েছিল।

☑ ৬. ১২৭৮ হিজরিতে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের বাণিজ্য আইনের পরিশিষ্ট।

☑ ৭. ১২৭৮ হিজরিতে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের বাণিজ্যিক মামলা পদ্ধতি আইন।

☑ ৮. ১২৮০ হিজরিতে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের সামুদ্রিক বাণিজ্য আইনটি তার অনুরূপ একটি ফরাসি আইন থেকে গৃহীত।

☑ ৯. ১২৯৬ হিজরিতে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত আদালত গঠন আইন।

☑ ১০. ১২৯৬ হিজরিতে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের বেসামরিক আদালতের মূলনীতি-সংক্রান্ত আইন।

☑ ১১. ১৩২৯ হিজরিতে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের আপোস বিচারক সংক্রান্ত আইন।

☑ ১২. ১৩৩০ হিজরিতে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের মামলা পদ্ধতি আইন।

☑ ১৩. স্থাবর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত আইন। ১৩৩১ হিজরির ৫ই জুমাদাল উলায় এটা জারি করা হয়েছিল।

☑ ১৪. ১২৮০ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ৬ তারিখ জারিকৃত সামুদ্রিক বাণিজ্য আইন।

এসব আইনের অধিকাংশই ছিল ফরাসি আইন থেকে আমদানিকৃত। যা অক্ষরে অক্ষরে তুর্কি ভাষায় ভাষান্তরিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কখনো-বা আরবিতেও অনুবাদ করা হয়। জীবনের যাবতীয় অঙ্গনে প্রয়োজন পূরণের জন্য উসমানি সালতানাতে আইন প্রণয়নের জোয়ার এসেছিল। এসব আইন আমদানির ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় একাধিক বেসামরিক আদালত।[১০৮০]

❁ উসমানি যুগে ইসলামি আইন

উসমানি ভূখণ্ডে চলমান শরীয়তের বিধানগুলো স্বতন্ত্র আইন এবং ব্যবস্থাপনা হওয়ায় উসমানি সালতানাত তা আইনিকরণে সচেষ্ট ছিল। তা ছাড়া এসব বিধান ছিল ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত আইন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সমসাময়িক। উসমানি সালতানাতে যেসব ইসলামি আইন জারি করা হয়েছিল, সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

- ☑ ১. ১২৮৬-১২৯৩ হিজরিতে ১৮৬৯-১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ বা লেনদেন ও নাগরিক আইন। প্রণীত আইনসমূহের মাঝে এগুলো ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শারঈ বিধানাবলি এভাবেই সর্বপ্রথম আইনিকরণ হয় এবং প্রশাসনিক রূপ পায়। এজন্য এগুলো নিয়ে বিশেষভাবে এবং সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।
- ☑ ২. ১৩৩৬ হিজরিতে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে পারিবারিক অধিকার আইন।
- ☑ ৩. ১৩৩৬ হিজরিতে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের শারঈ মামলা পদ্ধতি আইন।

❁ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ

এগুলো হচ্ছে হানাফি মাযহাবের লেনদেন এবং নাগরিক আইনের সমষ্টি। উসমানি সালতানাতে বেসামরিক আদালত প্রতিষ্ঠার পর তাতে শারঈ বিচারকদের পরিবর্তে কেবল আইনি বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। শারঈ আদালত এবং শারঈ বিচারক সমাধান করতে পারে এমন কিছু লেনদেন-সংক্রান্ত মামলা তখন আইনি বিচারকদের পরিধিভুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ফিকহি বিধানাবলি সহজে পুনঃনিরীক্ষণ করা এবং হানাফি মাযহাবের গ্রহণযোগ্য এবং আমলযোগ্য মতামতের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য বেসামরিক আদালতের বিচারকদের সহযোগিতার প্রয়োজন হতে থাকে। এ কারণে আদালতে যেসব শারঈ বিধিবিধান বেশি বেশি

[১০৮০] আল-মাদখালুল ফিকহিল আম : ১/১৭৭; জুহুদু তাকনীনিল ফিকহিল ইসলামি, পৃ. ৫৩; উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ ওয়াল মাদানিয়্যাহ, ৯৫; আল-ওয়াজিয ফিল হুকুকিল মাদানিয়্যাহ : ১/৬১; মুহাব্বারাত ফিত তানযীমিল কাদ্বাঈ, পৃ. ৩১; বুহূসুন ওয়া দিরাসাতুন ফী কানুনিল মুরাফাআতিল মাদানিয়্যাহ আল-ইরাকি, পৃ. ১২

উত্থাপিত হয়, সেগুলো সংকলনের জন্য একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশনা দিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি হলো।

১২৮৬ হিজরিতে ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে এই কমিটি লেনদেন-সংক্রান্ত বিধানগুলোর একটা সংকলন তৈরি করে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাছে হানাফি মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মতামতগুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি জনস্বার্থ এবং সময়ের পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রহণযোগ্য মতামতগুলোও উল্লেখ করা হয়।

কমিটি এই বিধানগুলোকে আমদানিকৃত ভিনদেশি আইনের পদ্ধতিতে ক্রমিক নম্বরের ভিত্তিতে সাজিয়েছে। এতে পুনঃনিরীক্ষণ করা সহজ হয়ে গেছে। এ-তে সর্বসাকুল্যে ১৮৫১টি ধারা আছে। এই সংকলনটির নাম রাখা হয়েছে 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ' তথা আদালতের বিধিবিধানের সংকলন (Journal of Judicial Rulings)। অর্থাৎ লেনদেন ও নাগরিক আইন। 'লা-ইহাতুল আসবাবিল মুজিবাহ' তথা আবশ্যকীয় কিছু কারণের প্রস্তাবনা নামে ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপির একটি প্রতিবেদনও এর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই সংকলনে দুটি ভূমিকা রয়েছে। যার একটি ইসলামি আইনের সংজ্ঞা আর প্রকার সম্পর্কে এবং অন্যটি ৯৯টি ধারার ইসলামি ফিকহ বা আইনের মূলনীতি সম্পর্কে।

১৬৯৩ হিজরির শাবান মাসে মোতাবেক ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে এই সংকলন অনুসারে রায় প্রদান আবশ্যক এবং আইনগুলো যেন রাষ্ট্রের যাবতীয় আদালতে বাস্তবায়ন করা হয়—এ মর্মে নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আবদুল আজিজ খান ইবনু দ্বিতীয় মাহমুদের পক্ষ থেকে একটি ফরমান জারি করা হয়। এভাবে এই সংকলনটি হানাফি মাযহাবের আইন থেকে গৃহীত নাগরিক আইন হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত এবং সমাদৃত হয়ে ওঠে।[১০৮১]

এই সংকলনের প্রতিবেদনে এসেছে, 'মুসলিম ইমাম তথা শাসক যদি ইজতিহাদি তথা গবেষণামূলক মাসআলাগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটির ওপর নির্দিষ্টভাবে আমল করার নির্দেশ দেন, তাহলে সে মাসআলা নির্ধারিত হয়ে যাবে। মুসলিম শাসকের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা তখন আবশ্যক হবে।'

এই সংকলনের ১৮০১ নং ধারায় আছে, 'সুনির্দিষ্ট কোনো মাসআলার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো মুজতাহিদের রায় অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কোনো নির্দেশ জারি হলে তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। কেননা মুজতাহিদের রায়টিই মানুষের জন্য সবচেয়ে সহজ এবং যুগের প্রেক্ষিতে সর্বাধিক উপযুক্ত। উপর্যুক্ত মুজতাহিদের রায় বাদ দিয়ে অন্য মুজতাহিদ প্রদত্ত বিপরীত কোনো রায় অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়ার অধিকার বিচারকের নেই। বিপরীত ফয়সালা দিলেও সেটা

[১০৮১] সংকলনটির পরিচিতি জানতে মারজিউল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৯৭; আল-মাদখালুল ফিকহিল আম : ১/১৭৪ এবং তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৬৭ ও ১০৭ দেখুন।

কার্যকর করা হবে না।'

ব্যাখ্যা হিসেবে ফিকহ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা হিসেবে আইনের মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে এই সংকলনের অনন্য সুবিধা। কিছু শাখাগত এবং মৌলিক আলোচনা আপন আপন জায়গাতে বর্ণনা করার পর তা একটি বেসামরিক আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফলে ভিনদেশি আইনের সমর্থকদের সামনে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের মৌলিক এবং শাখাগত মাসআলাগুলো বিষয়ভিত্তিক আকারে বিভক্ত। প্রয়োজনের খাতিরে মাযহাবের অগ্রহণযোগ্য মতামতকেও গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ফিকহের অতিরঞ্জিত ইখতিলাফ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা হয়েছে।

তবে এই সংকলনটি ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা এ-তে ব্যাখ্যামূলক অনেক উদাহরণ যেমন আছে, তেমনি অনেক সংজ্ঞা আছে। আবার কিছু দুর্বল মামলা বিষয়ক নীতিও এ-তে পাওয়া যায়। চুক্তি এবং বাধ্যবাধকতা (দায়বদ্ধতা) সম্পর্কে কোনো সাধারণ তত্ত্ব এতে নেই। সর্বোপরি অন্যান্য মাযহাবের আইনশাস্ত্রের থেকে উপকৃত না হয়ে কেবল হানাফি মাযহাবের চিন্তাধারা মেনে চলেছে।[১০৮২]

❁ আদালত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় দ্বৈত পরিস্থিতি

আমদানিকৃত ভিনদেশি আইনকানুন প্রচলনের ফলে আদালত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় দ্বৈত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এর প্রধান কারণ ছিল ১৮ শতকে উসমানি সালতানাতের ওপর সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া এবং পশ্চিমা দেশগুলোর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়া। ১৯ শতকে এই আক্রমণ আরও দ্বিগুণ হয়। ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা চূড়ান্ত ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে। তাদের অবস্থা ছিল একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে খতম করার নেশায় মেতে ওঠার মতো। বিভিন্ন বহির্যুদ্ধ, উসমানি সালতানাতের ভেতরকার নানান বিদেশি চুক্তি, বিদেশি সুযোগ-সুবিধা, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ চাপ এবং হুমকি-ধমকিকে তারা এর মাধ্যম হিসেবে নিয়েছিল।

চতুর্দিক থেকে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং শাসনব্যবস্থায় সংস্কারের আওয়াজ উঠতে থাকে। রোগ নির্ণয় না করেই ঐশী প্রতিষেধক গ্রহণের মাধ্যমে চিকিৎসা করার মতো ইসলামি আইন এবং শরীয়তের সুস্পষ্ট এবং সঠিক বাস্তবায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করার পরিবর্তে পশ্চিমা সভ্যতা এবং জীবনযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রতি তাদের সংস্কার পদ্ধতি ঝুঁকে পড়ে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলো চাপ সৃষ্টি-সহ সাম্রাজ্যবাদী নানাধরনের নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

উসমানি সালতানাতের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। যার ফলশ্রুতিতে ২৬শে শাবান ১২৫৫ হিজরিতে ৩০/১১/১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে

[১০৮২] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৬৭ এবং ১০৭; আল-মাদখালুল ফিকহিল আম : ১/১৬৯, ১/১৭৪ এবং ১/১৭৭

সুলতান আবদুল মাজিদ 'কুলখানার ফরমান' নামে পরিচিত প্রথম সংস্কারমূলক ফরমান জারি করতে বাধ্য হন। এরপর ১২৭৩ হিজরিতে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আসে 'হুমায়ুনলিপি'। তারপর আপোস আদালত, প্রাথমিক আদালত, আপিল আদালত, ফৌজদারি আদালত, মামলা রেফার আদালত, প্রশাসনিক মামলার বিচারের জন্য শূরা তথা উপদেষ্টা পরিষদ এবং সাম্প্রদায়িক আদালতের মতো একাধিক বেসামরিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিনদেশি আদালত বা দূতাবাস-সম্বন্ধীয় আদালতগুলো উসমানি সালতানাত তার নাগরিকদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করত। যা সাধারণত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আরোপিত হয়ে থাকে।[১০৮৩]

ওপরোক্ত আদালতগুলো ধীরে ধীরে শারঈ আদালত থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং শারঈ আদালতের পরিধিগুলো ছিনিয়ে নিতে থাকে। সামনে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এসব আদালত ছিল আমদানিকৃত ভিনদেশি আইন এবং ভিনদেশি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করতে বাধ্য।

উসতায আয-যারকা বলেন, 'উসমানি সালতানাত এবং পরবর্তীকালে তা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া দেশগুলোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভিনদেশি আইনগুলো ঢুকে গিয়েছিল। যেমন সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং ইরাক। উভয় ধারার আইনের মাঝে হওয়া সংঘর্ষ এতটাই ব্যাপক ছিল যে, ইসলামি আইনের সব অঙ্গনেই কম-বেশি পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে। এমনকি অনেক আইন তো বাদ দেওয়াও হয়।'[১০৮৪]

ইংরেজ আর ফরাসিদের সাথে থাকা সম্পর্কের কারণে মুহাম্মাদ আলি পাশা মিশরে শারঈ আদালত ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিচারিক পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেগুলো শারঈ আদালতের সকল পরিধি কেড়ে নিয়েছিল। আমদানিকৃত এবং অনূদিত কিছু আইনও তিনি জারি করেছিলেন। কৃষিখাত নিয়ন্ত্রণ, জমি দখল রোধ, সীমানা সরানো এবং মালিকের সম্মতি ছাড়া অন্য লোকের গবাদিপশু ব্যবহার এবং সবজি, ফল-ফসল আর ঘরবাড়ি চুরি রোধে 'হালুল ফাল্লাহ' তথা কৃষকের অবস্থা নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছিলেন তিনি। মুহাম্মাদ আলির পর সাঈদও এমনটা করেছিলেন। এরপর আসে ইসমাঈল পাশার যুগ। মিশর তখন উসমানি সালতানাত থেকে বিচারিক এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতা লাভ করে ইউরোপীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং আইনের কাছে নতি স্বীকার করে নেয়। ১২/৫/১২৯১ হিজরিতে একটি ফরমান জারি করে তারা বেশ কয়েকটি পরিষদ এবং বিচার-সংক্রান্ত আদালত প্রতিষ্ঠা করে। এর বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৮৫]

ইসমাঈলের যুগে মিশর কেবল নামে উসমানি সালতানাতের অধীনস্থ ছিল।

[১০৮৩] উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ ওয়াল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ৯৫

[১০৮৪] আল-মাদখালুল ফিকহিল আম : ১/১৭৮

[১০৮৫] তারীখুল কাদা, পৃ. ১৯৭

তথাপি রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণে 'মাজাল্লাহ আইন' প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ফরাসি বেসামরিক আইন আরবিতে অনূদিত হওয়ার পর মিশর সেটা গ্রহণ করে নেয়। যা 'পুরোনো মিশরীয় নাগরিক আইন' নামে পরিচিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে মিশরে প্রয়োগকৃত আইনটি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 'নতুন মিশরীয় নাগরিক আইন' নামে প্রণীত সেখানকার আইনটি আজও বিদ্যমান আছে।[১০৮৬]

❁ উসমানি যুগে শারঈ বিচারকের পরিধি

মিশর উসমানি সালতানাতের অধীনে আসার পর বিজয়ী সুলতান সালিম ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে শারঈ বিচারকের মৌলিক পরিধি আবার ফিরিয়ে আনেন। অন্যান্য দেশেও এমনটা হয়েছিল। এ সময় শারঈ বিচারকই দেওয়ানি, ফৌজদারি, ব্যক্তিগত যাবতীয় বিষয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন করা-সহ চুক্তি-সংক্রান্ত বিভিন্ন লেনদেন, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর এবং ওয়াকফ মন্ত্রণালয় পরিচালনা ছিল তারই দায়িত্ব।[১০৮৭]

সুলতান আবদুল মাজিদ কর্তৃক জারিকৃত সংশোধনীর ফলে বেসামরিক এবং মিশ্র আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। শারঈ বিচারব্যবস্থা তখন কেবল শারঈ আদালত এবং নাগরিক (আইনি) আদালতের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ আদালত দুটিই 'মাজাল্লাহ আইন' অনুসারে পরিচালিত হতো।[১০৮৮]

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, আইন এবং সংশোধনীগুলো ইস্তাম্বুল এবং মিশরে একই নীতি অনুসরণ করে চলত। যাবতীয় শারঈ বিষয় পরিচালনা এবং বিচার করার জন্য ৫৩ নং ধারায় মিশরে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের প্রস্তাবনাটি শারঈ আদালতের পরিধি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। ব্যক্তিগত এবং শাখাগত বিভিন্ন বিষয়ের আইন সম্পর্কিত বিষয়গুলো ছিল এর সাথে জড়িত। এগুলোর সাথে মার্ডার কেসের ধারাও যুক্ত করা হয়। জেলা ও থানার আদালতগুলো দেওয়ানি আদালত থেকে পরিবর্তনের পরে একচেটিয়াভাবে মিশর এবং আলেকজান্দ্রিয়ার তত্ত্বাবধান করত।[১০৮৯]

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের দ্বিতীয় প্রস্তাবনাটি পূর্ববর্তী প্রস্তাবনার মতো ১৬ এবং ১৮ নং ধারা অনুসারে শারঈ আদালতের পরিধি নিশ্চিত করে দেয়। স্থানীয় আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রস্তাবনার ১৬ নং ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, শারঈ আদালত কিছু কিছু বিষয়ের বিচার করতে পারবে না। সেগুলোর একটি

[১০৮৬] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৯৭
[১০৮৭] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৭২
[১০৮৮] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৯৭
[১০৮৯] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৯৮

হচ্ছে 'ব্যক্তিগত বিষয়'।[১০৯০]

তারপর ১৯০৯ সালে ২৫ নং আইনে শারঈ আদালত একটি প্রস্তাবনা প্রকাশ করা হয়। যা আগের মতোই ৫, ৬ এবং ৭ নং ধারায় শারঈ আদালতের পরিধি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়। এর আগেও ১৮৮৯ সালে সরকার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল। ১৮৮৪ সালে হাক্কানিয়্যাহ মন্ত্রণালয়ও একটি ফরমান জারি করে। এই প্রজ্ঞাপন দুটিতে শারঈ বিচারকের সামনে বিদেশি জমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলার শুনানি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। শারঈ আদালতও এর ওপর আর নির্ভর করে থাকেনি। ... এর পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে এবং ধীরগতিতে শারঈ আদালতের পরিধিগুলো কেড়ে নেওয়া হতে থাকে। একপর্যায়ে শারঈ আদালতের পরিধিগুলো শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমনটা হয়ে থাকে খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের ধর্মীয় আর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগত আদালতের মধ্যে। সর্বশেষ ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্কে শারঈ আদালতকে বাতিল ঘোষণা দিয়ে শারঈ আদালতের পরিধিগুলো বেসামরিক আদালতের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

মিশরীয় সরকার মুসলিমদের অনুভূতির জন্য শারঈ আদালতের পরিধি সুনির্দিষ্টভাবে সীমাবদ্ধ করার সাহস করেনি। আবার শারঈ আইন প্রয়োগ বাতিল করার জন্য ভিনদেশি আইন ও বিচারব্যবস্থা গ্রহণের প্রকৃত ব্যাখ্যাও দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত শারঈ আদালতগুলো বুঝতে পারে, অন্যান্য আদালতের পরিধিভুক্ত নয় কেবল এমন বিষয়েই তাদের পরিধি সীমাবদ্ধ। কারণ স্বরাষ্ট্র এবং অর্থ মন্ত্রণালয় শারঈ আদালতের সেসব রায় বাস্তবায়ন করে না, যেগুলো স্থানীয় এবং মিশ্র আদালতের পরিধির মধ্যে পড়ে। এই আদালতগুলো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কখনোই শারঈ আদালতের রায়কে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেনি।

একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার, 'ব্যক্তিগত বিষয়' এই শব্দটি ইউরোপের ব্যবহৃত শব্দ। যার নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই। ইউরোপের মধ্যে এর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক যাবতীয় বিষয়ে এ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা আছে। ওয়াকফ শব্দটিও এমন। এটা নিয়েও শারঈ আদালত, বেসামরিক আদালত এবং মিশ্র আদালতের মাঝে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। শারঈ বিচারকের পরিধিগুলো যেসব বিষয়ে বিভক্ত ছিল, সেগুলো হচ্ছে: ১. শারঈ আদালত, ২. স্থানীয় আদালত, ৩. মিশ্র আদালত, ৪. দূতাবাস-সম্বন্ধীয় আদালত, ৫. হিসবাহ পরিষদ এবং ৬. ধর্মীয় আদালত।

অভিজাত শ্রেণি এবং শাসক পরিবারের মোকদ্দমা পরিচালনা করার ব্যাপারেও শারঈ বিচারককে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল।[১০৯১] রায় কার্যকর করার বিষয়টি

[১০৯০] ব্যক্তিগত অবস্থা বলে কী বোঝানো হয় সেটা জানতে আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ১৯৬-১৯৭ এবং আল-মুরাফাতুল মাদানিয়্যাহ ওয়াত তিজারিয়্যাহ, পৃ. ৩২৩ দেখুন।

[১০৯১] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২০২

বিচারক এবং আদালত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এটি হাক্কানিয়্যাহ (আইন) মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত। এই কাজটি বিভিন্ন ধাপে এবং একাধিক পদক্ষেপে সম্পন্ন হতো।[১০৯২]

তারপর ৮/১/১৩৩৬ হিজরিতে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে শারঈ বিচারকের পরিধি আনুষ্ঠানিকভাবে উসমানি শারঈ আদালতের কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করে আইন জারি করা হয়। যা ছিল ৭ এবং ৮ নং ধারায় সীমাবদ্ধ। সেগুলো হচ্ছে :

☑ ১. ব্যক্তিগত অবস্থা। বংশ, বিবাহ, তালাক, অভিভাবকত্ব, নিষেধাজ্ঞা, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করা, নাবালকের জন্য অভিভাবক নিয়োগ, তাকে অপসারণ এবং নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদ দেখাশোনা করা ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

☑ ২. মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তান্তর নিয়ে বিরোধ। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টন।

☑ ৩. প্রশাসনিক কাজ। যেমন অভিভাবকত্ব, উইল এবং ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচালককে এমন কাজ করার জন্য অনুমোদন করা—যা বিচারকের অনুমতি এবং উইলের নিবন্ধন, ওয়াকফকৃত সম্পদ এবং প্রতিনিধির সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল। (ধারা : ৮)

☑ ৪. ওয়াকফকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা।

☑ ৫. শারঈ দলিল অনুসারে ওয়াকফের সম্পত্তি এবং ইয়াতিমদের সম্পত্তি থেকে ঋণ গ্রহণ ।

☑ ৬. মুক্তিপণ মামলা।

শারঈ বিচারব্যবস্থার জন্য নির্ধারিত এই পরিধিগুলো বর্তমানেও অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রে শারঈ আদালতের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বহাল আছে।

উসমানি যুগে বিচারের উৎস

উসমানি সালতানাতে আইন প্রণয়নের প্রথম যুগে বিচারের একমাত্র উৎস ছিল শারঈ আইন। কেবল শরীয়ত থেকে এবং বিশেষভাবে হানাফি মাযহাব থেকে তারা সহায়তা গ্রহণ করতেন।

আইন প্রণয়নের দ্বিতীয় যুগে ভিনদেশি আইন আমদানি করা এবং বেসামরিক আদালত প্রতিষ্ঠার পর একাধিক উৎস থেকে বিচারব্যবস্থা এবং বিধিবিধান গ্রহণ করা হতে থাকে। সেই উৎসগুলোর বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

☑ ১. ফিকহি মাযহাব। লেনদেন এবং ব্যক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে শারঈ

[১০৯২] তারীখুল কাযা, পৃ. ২০৩

বিচারব্যবস্থার বিবেচনায় বিভিন্ন মাযহাবের প্রতিনিধিরা থাকলেও বিচারকার্য পরিচালনা এবং ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবই ছিল উসমানি সালতানাত কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃত। হানাফি মতাবলম্বী বিচারকরা তো সাধারণভাবেই বিচারের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাব মেনে চলত। আর জেলা পর্যায়ের এবং প্রাদেশিক বিচারকরা বিশেষভাবে হানাফি মাযহাব মেনে চলত। এটা হতো ব্যক্তিগত বিষয় এবং শারঈ আদালতের পরিধির সীমায় থেকে মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মতামত অনুসারে।

☑ ২. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ তথা আদালতের বিধিবিধানের সংকলন। উসমানি খিলাফতের অধীনে থাকা প্রায় সবগুলো রাষ্ট্রেই এ আইন কার্যকর ছিল। এর অধীনেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দিক এবং দেওয়ানি (আইনি) লেনদেন।[১০৯৩]

☑ ৩. আমদানিকৃত ভিনদেশি আইন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা। উসমানি খিলাফত এবং মিশরের সুলতান আর প্রশাসকরা যার প্রচলন করেছিলেন। ইতিপূর্বে এগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

☑ ৪. ভিনদেশি আদালত বা দূতাবাস ইত্যাদিতে থাকা বিদেশি আইন।

☑ ৫. ধর্মীয় আদালতের জন্য প্রযোজ্য অনৈসলামি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধান।

বিচারের একাধিক উৎসের ফল এই হয় যে, জীবনের অনেক অঙ্গন থেকেই শরীয়তের অনুশাসন খতম হয়ে যায়। শারঈ বিধানের প্রয়োগ কেবল সংকীর্ণ কিছু ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট কিছু পরিধির মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

❁ বিদেশি সুযোগ-সুবিধার প্রভাব

উসমানি সালতানাতের পক্ষ থেকে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোকে প্রদত্ত সুবিধা দেওয়ায় ভিনদেশি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো অনেক সুবিধা এবং বিচার সংশ্লিষ্ট অনেক পরিধি উপভোগ করছিল। শারঈ বিচারব্যবস্থা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বিচার-সংক্রান্ত এসব পরিধির বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

☑ ১. বিরোধ একই দেশের নাগরিক দুজন ভিনদেশির মধ্যে হয়, তাহলে মামলাটির শুনানি সে দেশের দূতাবাস-সম্বন্ধীয় আদালতে হবে। পক্ষান্তরে একাধিক দেশের নাগরিকদের মধ্যে বিরোধ হলে শুনানি হবে আসামি পক্ষের দূতাবাসে।

☑ ২. আইনি এবং বাণিজ্যিক মামলা একজন নাগরিক এবং একজন ভিনদেশির মাঝে হলে বাণিজ্য আদালতে দোভাষীর উপস্থিতিতে মামলাটির শুনানি হবে।

[১০৯৩] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ৬৭, ১০৭-১১০

সেই বাণিজ্য আদালতটি একজন সভাপতি এবং দুজন নাগরিক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে। তাদের সাথে যুক্ত হবে আরও দুজন ভিনদেশি সদস্য। বিদেশি প্রতিপক্ষ দেশের রাষ্ট্রদূত একজন দোভাষী-সহ তাদেরকে পাঠাবে। রায়ের ক্ষেত্রে কোনো রকম রেফার ছাড়াই রাজধানীস্থ কাউন্সিল অফ কমার্স তথা সম্মিলিত বাণিজ্যিক পরিষদে তারা আপিল করতে পারবে।

☑ ৩. স্থাবর সম্পত্তির কোনো মামলায় রাষ্ট্রদূতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই জাতীয় আদালতে শুনানি হতো। কোনো দেশ এই শর্ত মেনে না নিলে তার নাগরিকদের উসমানি সালতানাতে সম্পত্তির মালিকানার অনুমতি দেওয়া হতো না।

☑ ৪. একজন বিদেশির পক্ষে বা বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাগুলো দোভাষীর উপস্থিতিতে জাতীয় দণ্ড আদালতে শুনানি হতো। এই আদালতগুলো হতো ফরাসি। যারা উসমানি ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করত।

☑ ৫. কোনো প্রদেশে যদি প্রতিপক্ষ দেশের কোনো দূতাবাস না থাকত, কিংবা থাকলেও মামলার আদালত থেকে দূতাবাস যদি নয় ঘণ্টার দূরত্বে থাকত, অথবা ওই প্রদেশে যদি কোনো বাণিজ্যিক আদালত না থাকত, তাহলে রাষ্ট্রদূতের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়া জাতীয় আদালতে উক্ত মামলার শুনানি হতো।

☑ ৬. একজন ভিনদেশিকে গ্রেপ্তার করা, তার বাড়িতে প্রবেশ করা, তাকে বিচারিক কাগজপত্র দিয়ে পরিবেশন করা, তাকে বিচারের আওতায় আনা বা জারিকৃত রায় তার ওপর কার্যকর করা বৈধ হওয়ার জন্য তার দেশের রাষ্ট্রদূতের মধ্যস্থতা আবশ্যক। অন্যথায় তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

☑ ৭. কোনো ভিনদেশির বিরুদ্ধে জারিকৃত সিদ্ধান্ত বা রায় কার্যকর হওয়ার জন্য তা-তে রাষ্ট্রদূত এবং দোভাষীর স্বাক্ষর থাকতে হতো।

☑ ৮. কোনো ভিনদেশির বিরুদ্ধে দেউলিয়াত্বের মামলার শুনানি কেবল তার দেশের দূতাবাস-সম্বন্ধীয় আদালতেই হতো এবং সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো।

❁ বিচারব্যবস্থার অধঃপতন

সূচনাকালে উসমানি খিলাফত ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী। এই অবস্থায় তারা সদর্পে দুই শতকেরও বেশি সময় ধরে শাসন করেছে। এরপর তারা দুর্বলতা, অবসন্নতা এবং রুগ্নতায় আক্রান্ত হয়। বার্ধক্য তাদের পেয়ে বসে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আইনগত ক্ষেত্রে এবং বিচারের অঙ্গনে অস্থিরতা শুরু হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, দাঙ্গা, বিদ্রোহ এবং ব্যাপক বহির্যুদ্ধের কারণে উসমানি সালতানাতভুক্ত

অধিকাংশ দেশে মূর্খতা এবং দারিদ্র্য মহামারির আকার ধারণ করে। সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে ইউরোপের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তারা একযোগে উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। যেমন ক্রিমিয়ান এবং বলকান যুদ্ধ। শুরু হয় উসমানি সালতানাতের অধীন ভূখণ্ডগুলো বিভক্ত করে ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপ এবং মিশরে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিচারব্যবস্থা এবং আলিমদের কোনো শক্তি ছিল না। উসমানি সালতানাতের শেষ সময়গুলোতে যোগ্য আলিম বা সংস্কারক নেতা ছিলেন না।

অশান্তি, বিশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতি ক্রমান্বয়ে উসমানি সালতানাতের যাবতীয় অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। এ অঙ্গনের অন্যতম ছিল বিচারব্যবস্থা। বিচার বিভাগের দায়িত্ব প্রকাশ্যে বিক্রয় করা হতো। ইস্তাম্বুল প্রশাসনের উচ্চ বিভাগ দুই বছরের বেশি সময়ের জন্য একজন প্রধান বিচারক বা সামরিক বিচারক নিয়োগ করত। বিনিময়ে তার কাছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য একটি বৃহৎ পরিমাণ অর্থ বন্ধক রাখার দাবি জানাত। নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারককে বাধ্য হয়ে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হতো। তারপর নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক এই পরিমাণ অর্থ কিংবা তার চেয়ে বেশ বেশি পরিমাণ উপার্জনের লোভে রাষ্ট্রে এবং প্রদেশে বিচারকদের পদ বিক্রি করত। বিচারের অযোগ্য ব্যক্তিরাও অনেক সময় মরিয়া হয়ে এই পদ নিত। পরে তারাও আবার সেই পদগুলো বিক্রি করে দিত। এভাবে বিচার বিভাগ বিক্রির বিষয়টি প্রকাশ্যে নিলামে উঠত। নিলামে জয়ী হওয়া ব্যক্তি এটি পুনরায় বিক্রি করে দিত। অথবা বিনিময় গ্রহণ করে কিছু জায়গা বা পরিধি ছেড়ে দিত। বিচারক মোকদ্দমা দায়েরকারীর ওপর উচ্চ ফি ধার্য করার পাশাপাশি ট্যাক্স আদায় এবং বেতনের চুক্তি করত।[১০৯৪]

তবে সর্বত্রই যে এই চিত্র চালু ছিল, তা নয়। বিচারকের পদের সম্মানার্থে বিচিত্র রীতি প্রচলিত ছিল। বেশির ভাগ সময় এভাবে বিচারক নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো না বা বিচারকের পদ বিক্রি করা হতো না। বরং মামলা, ডিভিশন ইত্যাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার নিয়ম ছিল।[১০৯৫]

শাইখ মাহমুদ আরনুস লিখেন, 'উসমানি যুগে বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের এমনভাবে অধঃপতন হয়েছিল, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের অন্তরে বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতি ধর্মীয় মূল্যবোধ না থাকলে তাদের কোনো প্রভাবই আর অবশিষ্ট থাকত না।'[১০৯৬]

[১০৯৪] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ৭২; আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ: ১/৩০৬, ১/৩০৮, ১/৩১২ এবং ১/৩১৪

[১০৯৫] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২২৬

[১০৯৬] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২২৩

এরপর শাইখ এই পতনের একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তা হলো বিচারব্যবস্থা কেবল হানাফি মাযহাবের মাঝেই সীমাবদ্ধ করে ফেলা। কেননা হানাফি মাযহাবই বিচারব্যবস্থার উৎস কমিয়ে ফেলেছিল।

উসমানি সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা দেখা দেয়। প্রশাসন বিভিন্নমুখী হয়ে যায়। দুর্নীতি এবং জুলুম ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিচারব্যবস্থা উত্তাল হয়ে শাসনব্যবস্থার সাথে টক্কর দিতে থাকে। চলমান পরিস্থিতির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে চলে। একেক শহরের বিচারব্যবস্থা একেক রকম হয়ে যায়। অবশ্য কিছু কিছু অঞ্চল এবং আদালত কিছু কিছু বিচারকের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থার খ্যাতি এবং গৌরব বজায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে বিচারব্যবস্থার চরম অবনতি হয়েছিল। বিচার বিভাগ ছিল আইনশাস্ত্রে একেবারেই আনাড়ি, অজ্ঞ এবং ভাড়াটেদের হাতে।[১০৯৭]

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহুর বর্ণনামতে বিচারব্যবস্থার এই দুর্বলতা, অবনতি এবং অধঃপতন কেবল অযোগ্য এবং দুর্বলচিত্তের বিচারকদের কারণে পতনের শিকার হওয়া শারঈ আদালতগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং বেসামরিক আদালতের অধিকাংশ বিচারকই এমন ছিল। এদের সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য এবং অনেক সমালোচনা আছে।[১০৯৮]

শাইখ মাহমুদ আরনুস বলেন, 'এসব অবশিষ্ট বিচারকদের সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি। সত্যি বলতে কী, আসলেই তারা ছিল বিচারব্যবস্থার আবর্জনা, গণ্ডমূর্খ, কুপ্রবৃত্তির অনুসারী এবং নীচ মানসিকতাসম্পন্ন।'[১০৯৯]

সংস্কারের ডাক এবং বিচার-বিভাগীয় একাডেমি

বিচারব্যবস্থার ওপর নেমে আসা ভয়ংকর দুর্দশা এবং আদালতের মধ্যে সংক্রামিত মরণব্যাধির বিষয়টি আলিম এবং সংস্কারকরা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। মানুষের অধিকার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জানের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। শারঈ বিধিবিধান বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে আলিমরা সংস্কারের ডাক দিতে শুরু করেন।

এমতাবস্থায় শারঈ বিচারব্যবস্থা সংশোধনের একটাই উপায় ছিল। সেটা হলো দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী বিচারক তৈরি করা। যাদের জ্ঞান হবে গভীর, ব্যক্তিত্ব হবে শক্তিশালী এবং তারা হবে আধ্যাত্মিক দীক্ষার অধিকারী। এটা সম্ভব হবে বিচারকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে। যার জন্য প্রয়োজন

[১০৯৭] উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ ওয়াল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ৯৪
[১০৯৮] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২২৩
[১০৯৯] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২১১

একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৫৫ সালে রাজধানী ইস্তাম্বুলে শারঈ বিচারকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে এই একাডেমির গ্রাজুয়েটদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো।[১১০০]

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহু ছিলেন তৎকালীন মিশর অঞ্চলের একজন মুফতি।[১১০১] ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিশর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব হিসেবে শারঈ আদালতগুলো পরিদর্শন করেন। এ সময় তার লেখা মূল্যবান প্রতিবেদনটিতে তিনি বিচারক এবং আদালতের রোগ শনাক্ত করার পাশাপাশি নিরাময়ের পদ্ধতি বর্ণনা করে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। সর্বোপরি তার লিখিত প্রতিবেদনটিতে শারঈ বিচারব্যবস্থা সংস্কারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।[১১০২]

আলি মুবারক ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংস্কারক। খেদিভ শাসনামলে তিনি ইসমাঈলকে 'দারুল উলূম' নামে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যাতে হানাফি আইনশাস্ত্রে আলিমদের স্নাতকোত্তর করার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ তৈরি করা হয়। এই বিশেষ বিভাগ থেকে যে বিশেষ সনদ দেওয়া হতো, সেটাকে 'শাহাদাতুল লিয়াকাতিল কাদ্বাইয়্যাহ' তথা বিচার-সংক্রান্ত যোগ্যতার সনদ বলা হতো। এ বিভাগ থেকে উত্তীর্ণদের মাধ্যমে বিচার বিভাগের শূন্যতা পূরণ করার জন্যই মূলত এ পদ্ধতিটি চালু করা হয়েছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রস্তাবনার ১৩ নং ধারায় এটি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এই বিভাগটির বিরোধিতা করলে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মিশরের তৎকালীন সরকার শারঈ বিচারব্যবস্থার সংস্কারের কথা চিন্তা করে শারঈ আদালতের বিচারক এবং মুনশিদের স্নাতকোত্তর করার জন্য 'মাদরাসাতুল কাদ্বা আশ-শারঈ' নামে একটি বিশেষ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই একাডেমির সংবিধান রচনা করতে শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটি একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করে এবং তার সদস্যরা সে বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দেয়। তা-তে পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপারে পরিবর্তন সংবলিত কিছু দিকনির্দেশনাও ছিল। অবশেষে ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি সর্বোচ্চ ফরমান জারি করা হয়। যা-তে বলা হয়, এই একাডেমিটি আল-আজহারের

[১১০০] সূরিয়্যাতু ফিল আহদিল উসমানি, পৃ. ৩০

[১১০১] শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহু ইবনু হাসান খাইরুল্লাহ ছিলেন তুর্কুমান পরিবারের সন্তান। মিশর অঞ্চলের মুফতি হওয়ার পাশাপাশি তিনি বর্তমান যুগের সংস্কার ও নবজাগরণের অগ্রপথিক ছিলেন। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত হন। সুফি প্রকৃতির হওয়ার পাশাপাশি দার্শনিকও ছিলেন তিনি। ইংরেজ শাসনামলে আরব আন্দোলনের কর্মী হওয়ায় কারাবরণ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তাকে শামে নির্বাসন দেওয়া হয়। তিনি প্যারিসে গিয়ে আল-আফগানির সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রথমে বিচারক ছিলেন। পরবর্তীকালে আপিল বিভাগের সদস্য মনোনীত হন। ১৩২৩ হিজরিতে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। (আল-আ'লাম : ৭/১৩১)

[১১০২] প্রতিবেদনটির একাংশ জানতে তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২২৩ দেখুন।

বিভাগ হয়ে থাকবে—এটাই তার প্রতিষ্ঠার শর্ত। এর একটি বিশেষ স্থান থাকবে এবং তা দুটি অংশে বিভক্ত হবে। প্রথম অংশটি শারঈ আদালতের মুনশিদের স্নাতকোত্তর করার জন্য এবং দ্বিতীয় অংশটি বিচারকদের স্নাতকোত্তর করার জন্য। প্রথমে এটাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত করা হলেও পরবর্তীকালে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়। সর্বশেষ হাক্কানিয়্যাহ তথা আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে এই বিভাগটির সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়।[১১০৩]

১৯২৩ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি চালু ছিল। ১৩৪২ হিজরির ১৩ই মুহাররম মোতাবেক ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে আগস্ট আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিশেষ স্নাতকোত্তরের জন্য কিছু বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য ২৩ নং আইন জারি করা হয়। এই আইন তখন বিচারব্যবস্থায় স্নাতকোত্তর করার জন্য একাডেমিটিকে আল-আজহারের একটি বিভাগ হিসেবে নির্ধারণ করে। পরবর্তীকালে এই একাডেমির কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়।

গবেষকরা এই একাডেমির অবদান স্বীকার করেন। তারা এ কথাও স্বীকার করেন যে, একাডেমিটি ছিল শারঈ বিচারব্যবস্থায় সংস্কার এবং উন্নতি আর অগ্রগতির যুগের প্রতিনিধি। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে এই একাডেমি থেকে উত্তীর্ণরাই বিচার বিভাগে বেশি অংশ নিয়েছিল। তারা ছিল নির্বাচিত উৎকৃষ্ট বিচারক। নিজেদের কাঁধে অর্পিত দায়িত্বের গুরুত্ব তারা অনুধাবন করত। বিচার বিভাগ ধ্বংস এবং অধঃপতনের যে গহ্বরে পৌঁছে গিয়েছিল, সেখান থেকে বিচার বিভাগকে তারা উদ্ধার করে। শারঈ বিচারকদের যথাযথ অবস্থান তারা পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিল। তারা ছিল এক উত্তম এবং উৎকৃষ্ট প্রজন্ম। বিচারব্যবস্থা মুক্ত করার ক্ষেত্রে তারা অগ্রসেনানীর ভূমিকা পালন করে।[১১০৪]

উসমানি যুগের বিচারকগণ

চার শতকেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা উসমানি খিলাফতের অধীনে এশিয়া মাইনর, পূর্ব ইউরোপ এবং অধিকাংশ আরব দেশ চলে এসেছিল। এ কারণেই তাদের বিচারক সংখ্যা ছিল অনেক। যা গুনে হিসাব করা সম্ভব নয়। এই বিচারকরা আবার দুই ধরনের ছিলেন। একদল ছিলেন সত্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং স্বচ্ছতার প্রতীক। বিচারকার্য পরিচালনায় তারা পূর্ববর্তী ইসলামি বিচারকদের চরিত্র অনুসরণ করেছিলেন। ফলে তাদের নাম-ডাক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। দুনিয়া-আখিরাত—উভয় জগতেই তারা বিশেষ সম্মাননার উপযুক্ত হন। আরেকদল ছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক। তাদের লক্ষ্যই ছিল বেতন-ভাতা প্রাপ্তি, সম্পদ সঞ্চয় এবং উৎকোচ

[১১০৩] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২৩৩-২৩৪
[১১০৪] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ২৩৫

গ্রহণ। যাদের অধিকাংশই ছিল মূর্খ এবং ভাড়াটে। এদের কারণেই বিচারকদের বদনাম হয়। খিলাফতের বিভিন্ন জায়গায় বিচারকদের অবস্থার অবনতি ঘটে। মুখ থুবড়ে পড়তে থাকে বিচারব্যবস্থা। উসমানি খিলাফতের ক্রান্তিলগ্নে এমনটা ঘটেছিল।

▪ যাইনুল আবিদিন ইবনুল ফানরি

উসমানি যুগে দামিস্কের প্রথম বিচারক ছিলেন যাইনুল আবিদিন ইবনুল ফানরি আর-রুমি আল-হানাফি। সুলতান সালিম দামিস্ক জয়ের পর তাকে সেখানে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। সেখানকার শাফিয়ি বিচারক আল-উলুবি ইবনুল ফুরফুরকে বরখাস্ত করা হলেও তিনি উমাইয়া জামে মসজিদের খতিব হিসেবে বহাল ছিলেন। আগের হানাফি বিচারক আল-মুহিউবি ইবনু ইউনুস, মালিকি বিচারক খায়রুদ্দিন আল-গাযযি এবং হাম্বলি বিচারক শারাফুদ্দিন ইবনু মুফলিহকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। বিচারব্যবস্থা এক মাযহাব কেন্দ্রিক করার ফলে পরিস্থিতি ৬৬৪ হিজরির আগের মতো হয়ে যায়। তবে পরবর্তীকালে এই বিচারকরা দ্বিতীয়বারের মতো দামিস্ক এবং আলেপ্পো নগরীর বিচার বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[১১০৫]

▪ সাইদি শালাবি

উসমানি যুগে মিশরের প্রথম বিচারক ছিলেন সাইদি শালাবি। তিনি মিশরে চারজন বিচারক নিয়োগ দেওয়ার পদ্ধতি বাতিল ঘোষণা করে চার মাযহাব থেকে চারজন স্থলবর্তী নিয়োগ দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। এ ঘোষণা শুনে মিশরের বিচারক চারজন নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। বিচারক চারজন হলেন শাফিয়ি বিচারপতি কামালুদ্দিন ইবনুত ত্বাবিল, মালিকি বিচারপতি মুহিউদ্দিন আদ-দিময়ারি, হানাফি বিচারপতি আলি আত-তরাবলুসি এবং হাম্বলি বিচারপতি শিহাবুদ্দিন আত-তানুখি।[১১০৬]

▪ মুফতি আবুস সুউদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ

মুফতি আবুস সুউদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি মুস্তফা (৮৯৬-৯৮২ হি.) ছিলেন উসমানি যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ বিচারক। এই হানাফি আলিম ছিলেন সুলতান সুলাইমানের সমকালীন। ৯৪৪ হিজরিতে তিনি সামরিক বাহিনীর বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি সুলতানকে সম্বোধন করতেন। পরবর্তীকালে ৯৫১ হিজরিতে তিনি ফতোয়া

[১১০৫] কুদ্বাতু দিমাশক, পৃ. ৩১০। ১০০০ হিজরি পর্যন্ত উসমানি যুগে দায়িত্ব পালনকারী দামিস্কের অন্যান্য বিচারকদের নাম জানতে তারীখু দিমাশক গ্রন্থের ৩১১-৩৩৬ এবং ৩৫২-৩৫৩ নং পৃষ্ঠা দেখুন।

[১১০৬] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১০৭-১০৮

প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ফতোয়া প্রদান এবং অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মহান অগ্রপথিক।[১১০৭]

▪ জালালুদ্দিন

সুলতান সুলাইমানের আরেকজন বিচারক ছিলেন মহান আলিম জালালুদ্দিন। একাধিক শহরে বিচারকের দায়িত্ব পালনের পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী গবেষক। আল্লাহভীরু এবং নির্মল হৃদয়ের অধিকারী। তার অন্তর-বাহির—উভয়ই ছিল পবিত্র। চালচলন ছিল বিনয় আর নম্রতাপূর্ণ। আপাদমস্তক শুভ্রতায় পরিপূর্ণ এই ব্যক্তিটি ছিলেন নেককার পূর্বসূরিদের প্রজ্জ্বল নমুনা। তিনি চমৎকার জীবনচরিত এবং প্রশংসনীয় বিচারকার্যের অধিকারী ছিলেন।[১১০৮]

▪ মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান

আরেকজন বিচারক ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান আল-হালবি। তিনিও একাধিক শহরে বিচারক ছিলেন। বিচারক অবস্থায়ই তার ইন্তেকাল হয়। অনন্য ধী শক্তির অধিকারী এই ব্যক্তিটি ছিলেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণায় পারদর্শী। সমসাময়িকদের মাঝে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ছিল। অত্যন্ত সহনশীল নির্মল চরিত্রবান এই মানুষটির প্রকৃতি ছিল খুবই শান্ত, সহিষ্ণু, বিনয়ী এবং অল্পেতুষ্ট।[১১০৯]

▪ আল-কারমিয়ানি

বিচারকার্য পরিচালনায় নিযুক্ত এমন আরেকজন ব্যক্তি মাওলা ইবনুল কাতখুদা আল-কারমিয়ানি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বেশিদিন দায়িত্ব পালন না করলেও এ অঙ্গনে অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন তিনি। দায়িত্ব পরিত্যাগ করে তিনি হজে গমন করেন। এরপর ৯৪০ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়।[১১১০]

উসমানি যুগের বিচারব্যবস্থার গুণাবলি

১৩শ শতকের অর্ধেক মোতাবেক ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্ধেক পর্যন্ত বহাল থাকা উসমানি যুগে বিচারব্যবস্থার গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যের মাঝে ক্রমেই পরিবর্তন হতে থাকে। ফলত উসমানি যুগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই অংশ দুটি তথা আইনগত বা বিচার-সংক্রান্ত যুগের মধ্যকার পার্থক্য আমাদের ভালোমতো বুঝে নেওয়া দরকার।

[১১০৭] তারীখুল কান্বা, পৃ. ২১২; আশ-শাকাইকুন নু'মানিয়্যাহ, পৃ. ৪৩৯

[১১০৮] আশ-শাকাইকুন নু'মানিয়্যাহ, পৃ. ২৭৯

[১১০৯] আশ-শাকাইকুন নু'মানিয়্যাহ, পৃ. ২৮০

[১১১০] প্রাগুক্ত

প্রথম অংশের বিচারব্যবস্থা ইসলাম-সম্মত ছিল। রায় প্রদান এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা আব্বাসি যুগের অনুসরণ করত। তবে এ ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সরল পার্থক্য ছিল। যেমন বিচারব্যবস্থা কেবল হানাফি মাযহাবেই সীমাবদ্ধ থাকত। যা ছিল সাম্রাজ্যের দাপ্তরিক মাযহাব হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। সর্বস্তরের নাগরিকের ওপরই শারঈ বিচারকের পরিধি ছিল সমানভাবে প্রযোজ্য। যাবতীয় বিধান, অধিকার এবং মোকদ্দমার ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। গোটা সাম্রাজ্যে ভিন্ন কোনো বিচারব্যবস্থা ছিল না। তবে ভিনদেশি অমুসলিম জনগণের জন্য থাকা বিদেশি বিচারব্যবস্থার বিষয়টি ছিল ব্যতিক্রম। তাদের জন্য বিদেশি দূতাবাসের অধীনে থাকা বিচারালয়, গির্জা সংশ্লিষ্ট বিচারালয় এবং সাম্প্রদায়িক আদালতের ব্যবস্থা ছিল। শেষোক্ত পরিধিটি ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে থাকা অমুসলিম নাগরিকদের ব্যক্তিগত অবস্থার মাঝে সীমাবদ্ধ।

উসমানি যুগের দ্বিতীয় অংশ তথা আইনগত পশ্চাৎপদতার যুগে বিচারব্যবস্থার লক্ষ্যই পালটে গিয়েছিল। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দ্বীন ও শরীয়তের বিধান থেকে বের হয়ে বেসামরিক আদালত (Civil Court) প্রতিষ্ঠা করা। ভিনদেশ থেকে আমদানিকৃত আইন প্রণয়ন করাই ছিল এ অংশের মূল অবলম্বন। যা এখন পর্যন্ত অধিকাংশ আরব দেশের পাশাপাশি তুরস্কেও বহাল আছে। ভিনদেশি আইন জারিকরণ এবং সাম্রাজ্যের ওপর তা চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ১২৫৫ হিজরিতে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে শত্রুর সৃষ্ট ফাটল বড় হয়। মানব-রচিত আইনের দরজা খুলে যায়। দ্বৈতবাদ এবং বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়।

উসমানি যুগের দ্বিতীয় অংশের বিচারব্যবস্থার বিবরণ এবং বৈশিষ্ট্যাবলি আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

☑ ১. দ্বৈত বিচারালয়। শারঈ আদালতের পাশাপাশি বেসামরিক আদালতের কথা জানা যায়। আপোস আদালত, প্রাথমিক আদালত, আপিল কোর্ট, মামলা রেফার করার আদালত, বাণিজ্যিক আদালত, দূতাবাস-সম্বন্ধীয় আদালত (Consular Court), মিশ্র আদালত, স্থানীয় আদালত, আধ্যাত্মিক এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক আদালত, ফৌজদারি আদালত তথা সামরিক বিচার বিভাগ ছিল বেসামরিক বিচারালয়ের অন্তর্ভুক্ত।

☑ ২. দ্বৈত আইন প্রণয়ন। হানাফি ফিকহ, মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ ও ইসলামি শরীয়তের পাশাপাশি মানব-রচিত ব্যবস্থাপনা আর ভিনদেশ থেকে আমদানিকৃত এবং ভাষান্তরিত আইনের দেখা মিলে। বিচার-সংক্রান্ত সিংহভাগ পরিধিই ছিল মানব-রচিত ব্যবস্থাপনার অধীনে। শারঈ বিচারব্যবস্থার পরিধি ছিল সীমিত পরিসরে থাকা ব্যক্তিগত অবস্থা এবং কিছু নাগরিক লেনদেনের মাঝেই সীমাবদ্ধ। তবে ভিনদেশি সুবিধার মাঝে ভিনদেশি আইনও ছিল।

☑ ৩. অনেক বেসামরিক আদালতে একাধিক বিচারক থাকা বা দলবদ্ধভাবে বিচারকার্য পরিচালনার কথা জানা যায়।

☑ ৪. রায়ের ওপর আপত্তি উত্থাপন করে দ্বিতীয় ধাপে নতুন করে বিচারকার্য পরিচালনার পদ্ধতি চালু হয়। এটা ছিল আপিল বিচার।

☑ ৫. বিচারকদের শিক্ষাদান এবং বরখাস্ত করার জন্য পরিষদ গঠন করা হয়। আগেকার ইসলামি শাসনামলে এ ধরনের পরিষদ থাকার কথা জানা যায় না। তখন অবশ্য এর প্রয়োজনও ছিল না। বিচারব্যবস্থা এবং বিচারকরা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণেই উসমানি যুগে এ পদ্ধতি চালু করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

☑ ৬. শারঈ বিচারকদের দুর্বলতা। সাধারণ বিচারালয়ের বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফিকহ এবং শরীয়ত সংক্রান্ত জ্ঞানের দৈন্য দশা। পরবর্তীদের হাতে ফিকহ স্থবির হতে হতে প্রায় অকার্যকরই হয়ে পড়েছিল। নিত্যনতুন মাসআলাগুলো নিয়ে ইজতিহাদ তথা গবেষণা করা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা থেকে ইসলামি আইন এবং বিচারব্যবস্থা পিছিয়ে পড়ে।

☑ ৭. উসমানি যুগের প্রথম অংশে শুরু হওয়া ভিনদেশি সুবিধাগুলো দ্বিতীয় অংশে চালু হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পরিণতিতে দূতাবাস-সম্বন্ধীয় আদালত অস্তিত্বে আসে। শারঈ বিচারব্যবস্থার পরিধি সংকুচিত হয়ে পড়ে। অমুসলিমদের জন্য চালু হয় আধ্যাত্মিক এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক আদালত।

☑ ৮. ঊনবিংশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বিচারব্যবস্থার অধঃপতন হয়। বিচারকদের সুখ্যাতি নষ্ট হয়ে যায়। অযোগ্য লোকেরা দায়িত্ব গ্রহণ করে। শুরু হয় ইয়াতিম এবং বিধবাদের সম্পদ লুট করা। উৎকোচের প্রচলন ঘটে। বিচারব্যবস্থা নিলামে উঠে। বিচার-সংক্রান্ত নীতি-রেওয়াজ মুছে যায়। চলতে থাকে বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ প্রদান। দায়িত্বগুলো কেনাবেচার পণ্য হয়ে যায়। শারঈ বিচারব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে অনেক দেশেই বাতিল হয়ে যায়।

☑ ৯. কাযিউল কুযাত তথা প্রধান বিচারপতিকে 'সামরিক বিচারক' নামে নতুন উপাধি দেওয়া হয়। উসমানি খিলাফতের উভয় যুগে এবং উভয় ধাপেই এর সংখ্যা একাধিক ছিল।

☑ ১০. শারঈ বিচারকার্য পরিচালনায় পারদর্শী বিচারক নিয়োগ দানের সুবিধার্থে কায়রো এবং ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথক পৃথক শারঈ বিচার একাডেমি।

☑ ১১. শারঈ আদালত এবং বেসামরিক আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা এবং মোকদ্দমা দায়ের করার নিয়ম চালু হয়। এসব পদক্ষেপ ছিল আগের তুলনায়

অধিক সুবিন্যস্ত এবং যথার্থ। বিচারকের সামনে মোকদ্দমা উত্থাপন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাদী-বিবাদীর মাঝে বিচারকার্য পরিচালনার নীতিও বিন্যস্ত হয়।

☑ আবার মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ তথা আদালতের বিধিবিধানের সংকলনও প্রকাশিত হয়। যা-তে হানাফি মাযহাবের আইনের ধারাসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। উসমানি আইনে তার অন্তর্ভুক্তি ঘটে।

☑ ১২. বেসামরিক আদালতে মুসলিমদের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য অমুসলিম বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়।

☑ ১৩. শারঈ বিচারকের ক্ষমতা ক্রমেই খর্ব হতে থাকে। অপরাপর আদালতগুলো শারঈ আদালতের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে থাকে।

☑ ১৪. জমি রেজিস্ট্রির জন্য 'ত্বাবু' দপ্তরের প্রচলন ঘটে। স্থাবর সম্পত্তির নিবন্ধনকে এই নামে অভিহিত করা হতো। 'কাতিবুল আদল' নামে এক ধরনের মুনশির প্রচলন তারা করেছিলেন, যার কাজ ছিল মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে দিওয়ানে সুবিন্যস্ত করার সময় বাণিজ্যিক লেনদেন এবং চুক্তিপত্র নথিভুক্ত করা। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তখন আদালত এবং বিচার সংশ্লিষ্ট পরিষদের দ্বারস্থ হতো।

শাইখ মাহমুদ আরনুস মিশরে তৃতীয় ধাপের বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। যা ১২৫৫ হিজরিতে শুরু হওয়ার পর থেকে শাইখের যুগেও বহাল ছিল। এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশই ছিল মিশরের শারঈ আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা উসমানিদের অধীনতা থেকে কিছু দেশ বেরিয়ে যাওয়ায় এই ধাপে ইসলামি দেশগুলোর মাঝে অনেক ব্যবধান তৈরি হয়েছিল। এই ধাপে মিশরের বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল এমন :

☑ ১. বিচারকের পরিধি কমিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বিচারব্যবস্থাকে একটি সংকীর্ণ বৃত্তে সীমাবদ্ধ করে ফেলা।

☑ ২. রায় বাস্তবায়ন বিভাগকে বিচার সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে পৃথক করে ফেলা।

☑ ৩. একাধিক বিচারকের পক্ষ থেকে রায় ঘোষণা করা।

☑ ৪. রায়ের ওপর আপত্তি উত্থাপনের পরিধি ব্যাপক করা।

☑ ৫. বিচারকদের প্রশিক্ষণ এবং অপসারণের জন্য বেসামরিক পরিষদ গঠন।

☑ ৬. বিচার বিভাগের লোকদের জ্ঞানের দৈন্য দশা।

☑ ৭. শারঈ বিচারক হিসেবে পারদর্শী হওয়ার জন্য একাডেমি প্রতিষ্ঠা।[১১১১]

[১১১১] তারীখুল কাদ্বা, পৃ. ১৯৬

০৯

বর্তমান যুগে শারঈ বিচারব্যবস্থা

বর্তমানে বেশির ভাগ আরব দেশে যে শারঈ ব্যবস্থা চালু আছে, সেগুলো অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। উসমানি যুগের শেষ দিকে যে শারঈ বিচারব্যবস্থা চালু ছিল, তার সাথে বর্তমানের এসব শারঈ ব্যবস্থার পার্থক্য নেই।

বর্তমানের এসব শারঈ বিচারব্যবস্থা ভিন্ন হওয়ার কারণ হলো পূর্ববর্তী ইসলামি যুগের শারঈ বিচারব্যবস্থা এবং শরীয়ত অনুমোদিত ইসলামি ফিকহকেন্দ্রিক বিচারব্যবস্থার মাঝে থাকা মৌলিক ভিন্নতা। আগের যুগে আরব দেশগুলোর শারঈ বিচারব্যবস্থার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিটি আরব দেশই অপরাপর দেশ থেকে ভিন্ন রাজনৈতিক, আইনগত এবং বিচার সংশ্লিষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করত। অবশ্য কিছু কিছু আরব দেশ যে অন্য দেশের বিচার এবং আইন দ্বারা প্রভাবিত হতো না, তা কিন্তু নয়। অপর দেশের কিছু বৈশিষ্ট্য তারা ধারণ করত বটে। তা সত্ত্বেও প্রতিটি দেশের বিচার বিভাগ হতো সম্পূর্ণ স্বাধীন।

আরব এবং ইসলামি রাষ্ট্রের বিচার রীতি পশ্চিমা এবং বৈশ্বিক বিচার রীতির সাথে অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ। তুরস্ক এবং মিশরের মতো দেশে তো শারঈ বিচারব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়ে তার ওপর নাগরিক বৈশিষ্ট্য এবং পশ্চিমা সভ্যতার রং প্রলেপ করে দিয়েছে। বেশির ভাগ আরব রাষ্ট্রে ঘটেছে শারঈ এবং বেসামরিক বিচারব্যবস্থার সংমিশ্রণ। এমনকি ইসলামি রাষ্ট্র বলে পরিচিত কিংবা ইসলামি আকীদা এবং শরীয়ত আঁকড়ে ধরার ঘোষণাদাতা রাষ্ট্রগুলোও এ অবস্থার বাইরে নয়।

সামনে নমুনাস্বরূপ কিছু আরব রাষ্ট্রে প্রচলিত শারঈ বিচারব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমানের শারঈ বিচারব্যবস্থার সাথে উসমানি যুগের বিচারব্যবস্থার সম্পর্কও চিহ্নিত করে দেওয়া থাকবে। পাশাপাশি আরব ইতিহাসে সমকালীন ঐতিহাসিক চিন্তার কথাও থাকবে। বাদ যাবে না আরব রাষ্ট্রগুলো প্রতিষ্ঠা

এবং আরব লীগ হওয়ার কথা।

উসমানি যুগের সাথে বর্তমান যুগের সম্পর্ক

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। জাপানের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ থাকা উসমানি সালতানাতের পরাজয় ঘটে। অবশেষে আরব রাষ্ট্রগুলো তুর্কি অধীনতা থেকে বেরিয়ে আসে।

যুদ্ধের সময় পশ্চিমা ষড়যন্ত্র পূর্ণতা পায়। উসমানি সালতানাতের অধীনস্থ দেশগুলো বিভক্ত করার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর মাঝে গোপন সমঝোতা হয়। সংঘটিত হয় সাইকস পিকো-সহ অন্যান্য চুক্তি। আরব রাষ্ট্রগুলো তুর্কি থেকে পৃথক হওয়া মাত্রই পশ্চিমা বেনিয়া আর সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের শিকার হয়ে যায়।

মিশর, সুদান, ইরাক, জর্ডান, ফিলিস্তিন, কুয়েত, আরব আমিরাত, দক্ষিণ ইয়ামান, ওমান, মাস্কাট, কাতার, বাহরাইন এবং সোমালিয়ার একাংশে ইংল্যান্ড উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৯ শতকের শুরু থেকেই ইংল্যান্ড এসব রাষ্ট্র দখল করে রেখেছিল।

সিরিয়া, লেবানন, তিউনিসিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, জিবুতি (আফার এবং ইসা) এবং সোমালিয়ার কিছু অংশ ফ্রান্স দখল করে নেয়। এ রাষ্ট্রগুলোর ওপর ফরাসি আধিপত্য আগে থেকেই বিস্তৃত ছিল। ইতালি দখল করে লিবিয়া, ইরিত্রিয়া এবং সোমালিয়ার কিছু অংশ। পর্তুগাল, হল্যান্ড এবং বেলজিয়াম অন্যান্য দখলে নিয়েছিল। রাশিয়ার দক্ষিণে থাকা ইসলামি দেশগুলো ছিল রাশিয়ার দখলে।[১১১২] পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বাহিনী সৌদি এবং উত্তর ইয়ামান ছাড়া কোনো মুসলিম দেশ নিস্তার পায়নি।

উসতায মুহাম্মাদ কুর্দ আলি উপনিবেশ স্থাপনের সময়কার চিত্র তুলে ধরে বলেছেন, 'সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের করতলে চলে আসা অঞ্চলগুলো বিচারের বিশৃঙ্খলা থেকে রেহাই পেয়েছিল। সামগ্রিকভাবে শৃঙ্খলা এবং সুন্দর ব্যবস্থাপনায় তারা প্রবেশ করেছিল।'[১১১৩]

কিন্তু এটা ছিল পশ্চিমা এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাপনা। পশ্চিমা এবং ভিনদেশি এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল ইসলামের বিধান, বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং মুসলিমদের ঐক্যের পরিপন্থি। এ কারণেই মুহাম্মাদ কুর্দ আলি বলেন, 'সাম্রাজ্যবাদীরা সব জায়গায় বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছিল। মুসলিম কি খ্রিষ্টান, মুসলিম কি মূর্তিপূজারি এবং ব্রাহ্মণ কাউকেই তারা ছাড় দেয়নি। ভাইয়ে ভাইয়ে, পিতা-পুত্রের মাঝে তারা যুদ্ধ

[১১১২] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ১/৩১৭। আরব ভূমিতে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের মানচিত্র দেখতে আতলাসুত তারীখিল আরাবি, পৃ. ৮৭ দেখুন।

[১১১৩] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ১/৩২৯

বাঁধিয়েছিল। লাল-কালো এবং কালো-সাদার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল।'[১১১৪]

ভিনদেশি উপনিবেশ স্থাপনকারীরা আরব দেশগুলো তছনছ করে ফেলে। ইসলামি সভ্যতার নিদর্শনগুলো তারা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আরব বিশ্ব অপবিত্র করে। ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে লোকদের তাড়িয়ে দেয়। নির্বিচারে হত্যা করে আলিম-উলামা, দাঈ, সংস্কারক এবং আন্দোলনকারীদের। জনপদের পর জনপদ বিরান করে। ভীতি এবং অরাজকতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তারা। নিজ রাষ্ট্রের কুকীর্তি সম্পর্কে কয়েকজন বিদেশি ঐতিহাসিকের বর্ণনার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

রাশিয়ান ইতিহাসবিদ কাস্টেলনাউ উসমানিদের থেকে আলেকজান্ডার প্রথম কর্তৃক ক্রিমিয়া ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। রাশিয়ানদের আক্রমণ সম্পর্কে তিনি লিখেন, 'এই আক্রমণ রাশিয়াকে কোনো সম্মান দেয়নি। এই হামলায় ক্রিমিয়া জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তছনছ করে দেওয়া হয়েছে সেখানকার সবকিছু। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের এই কাজ তো চরম মূর্খ বর্বর জাতির যুগকেও হার মানিয়েছিল। ১৮ শতকে শহরগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ মিল-ফ্যাক্টরি, কলকারখানা এবং নিদর্শনাবলি বিরান করে দেওয়া হয়। উপাসনালয় হয়ে যায় লণ্ডভণ্ড। সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সমূলে ধ্বংস করা হয়। যেসব গ্রন্থের মাধ্যমে এই অঞ্চলের জাতিগুলো নিজেদের চিন্তা-চেতনা আলোকিত করত, যা থেকে তারা উপকৃত হতো, সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীকে মূর্খতার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অসহায় নারী-বৃদ্ধ, শিশুকে আগুনের ইন্ধন বানানো এটা যুদ্ধ হতে পারে না। বরং এটা হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠীকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।'[১১১৫]

আরবের ইসলামি দেশগুলোতে অনুপ্রবেশকারী সাম্রাজ্যবাদ তাদের ওপর নিজেদের রাজনৈতিক, সামরিক এবং আইনি ব্যবস্থাপনা চাপিয়ে দিয়েছিল। মুসলিমদের ওপর বিদেশি ব্যবস্থাপনা এবং আইনকানুন তারা প্রয়োগ করে। উসমানি যুগে পশ্চিমাদের থেকে ধার করে আনা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন মজবুত করে নিয়েছিল।

মোটকথা, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সময়টি ছিল উসমানি যুগের বিচারিক পরিস্থিতি এবং বর্তমানের রাজনৈতিক ও সামরিক স্বাধীনতা লাভের মাঝামাঝি একটি ক্রান্তিকাল। সিরিয়ার মতো আরও কিছু রাষ্ট্র এই পরিস্থিতির শিকার হয়ে 'মিশ্র আদালত' প্রতিষ্ঠায় বাধ্য হয়। মিশরে পশ্চিমা আধিপত্য বিস্তারের পর এই পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল।

[১১১৪] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ১/৩৩১

[১১১৫] আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ : ১/৩৩৭

কিন্তু আরব এবং মুসলিম জনগণ দখলদার এবং লুটেরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় একের পর এক বিদ্রোহ। অনেক রক্ত ঝরে। একপর্যায়ে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে আরব রাষ্ট্রগুলো শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আরব ভূমি থেকে বিদেশিদের উৎখাত করা। এ আন্দোলন এবং বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে বর্তমান আরব রাষ্ট্রগুলো অস্তিত্বে আসে। এমন রাষ্ট্রের সংখ্যা ২২টি। এসব রাষ্ট্রের প্রত্যেকটিই স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সামগ্রিকভাবে এসব রাষ্ট্র নিয়ে 'আরব লীগ' গঠিত হয়। তবে আন্তর্জাতিক এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং সম্মেলনে পশ্চিমাদের আঁকা নীল নকশার কারণে আরব দেশগুলো প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দক্ষিণ ইয়ামান একমাত্র রাষ্ট্র, যা এ ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তারা উত্তর ইয়ামানের সাথে যুক্ত হয়। ১৯৯০ সালে তারা একটি রাষ্ট্ররূপে ইয়ামানি জনগোষ্ঠীর ঐক্য ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়। এর বিপরীত দেশও আছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা চলে যাওয়ার পরও সে দেশের জনগণ বন্দি এবং দখলদারদের হাতে রক্তাক্ত হয়ে আসছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ফিলিস্তিন ভূমিকে জায়নবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিয়েছে। যারা এই ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। আজকে মুসলিম জাতির শরীরে তারা একটি বিষফোঁড়ার মতো। বর্তমানে তারা এই অঞ্চলে পশ্চিমাদের জন্য দুর্নীতি এবং অস্থিরতা তৈরির কেন্দ্রস্থল।

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে বের হয়ে গেলেও নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, চিন্তা-চেতনা এবং আইনের প্রভাব ছেড়ে গেছে। মানবতা, সংস্কৃতি এবং আইনে তাদের ব্যর্থতার ছাপ রেখে গেলেও নিজেদের প্রতিষ্ঠান, তাদের মূল্যবোধ, তাদের ঐতিহ্য এবং ব্যবস্থাপনার সংরক্ষণের জন্য তারা ব্যক্তি, প্রজন্ম এবং জাতি গঠন করে গেছে। এজন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বেসামরিক আদালত খোলা এবং তাদের রচিত আইন অনুমোদন করার শর্তারোপ করত।

সিরিয়ায় শারঈ বিচারব্যবস্থা

সিরিয়া ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উসমানি সালতানাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘৃণ্য ফরাসি প্রতিনিধির অধীনতা গ্রহণ করে। তথাপি তুরস্কের পূর্ববর্তী বিচারব্যবস্থাই সিরিয়ায় চলতে থাকে। ফরাসি হাই কমিশনার ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে মিশ্র আদালত প্রতিষ্ঠা করে। এই আদালতগুলোকে দেওয়া উচ্চতর ক্ষমতা এবং পরিধি ছিল সিরিয়ার দূতাবাস-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা এবং পরিধি থেকে বেশি। পরবর্তী সময়ে ফরাসি প্রতিনিধির অবসানের সাথে সাথে মিশ্র আদালত পদ্ধতিরও অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশিষ্ট আদালতগুলো সিরিয়ায় আপন

অবস্থাতেই চলছিল। এরপর ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ৭৪ নং আইন এবং ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে জুন ৮৫ নং সংশোধিত আইন অনুসারে 'সিভিল প্রসিডিউর কোড' জারি করা হয়। ১৯৫৩ সালের ৮ই অক্টোবরে আরও জারি করা হয় বিচার বিভাগের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট আইন। এই আইন দুটিই সিরিয়ার বর্তমান বিচারব্যবস্থা পরিচালিত করছে।[১১১৬] সাধারণ বিচারব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে শারঈ বিচারব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সামনে উপস্থাপন করা হবে।

❁ সিরিয়ার আইন প্রণয়নে বিচার বিভাগ

বর্তমানে বৈশ্বিক আইন রাষ্ট্রের ক্ষমতা তিন ভাগে বিভক্ত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকে। বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগ তথা আইন প্রণয়ন বিভাগ, রায় কার্যকর বিভাগ এবং বিচার সংশ্লিষ্ট বিভাগের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের বিভাগগুলো ভিন্ন করার প্রতি গুরুত্বের খাতিরে প্রথমে সংবিধানের কথা, তারপর বলা হয়েছে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা। বর্তমান সিরিয়া এই নীতির ওপরই চলেছে। সিরিয়ার প্রকাশিত সংবিধানগুলো এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে যে, বিচারব্যবস্থা এবং একটি স্বতন্ত্র বিভাগ।[১১১৭] বিচারকরা স্বাধীন; তাদের বিচারের ব্যাপারে আইন ভিন্ন কোনো কর্তৃত্ব নেই। বিচারকদের সম্মান, বিবেক এবং নিরপেক্ষতা মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতার নিশ্চয়তার জিম্মাদার।[১১১৮]

❁ সাধারণ বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

সিরিয়ায় সাধারণ বিচার বিভাগের অবকাঠামো চারটি বিভাগ নিয়ে গঠিত।

☑ ১. সাধারণ বিচার বিভাগ : যা আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত ছিল। দেওয়ানি এবং বাণিজ্যিক আইনের নীতি, ফৌজদারি আইনের নীতি, বিচার সংশ্লিষ্ট ক্ষমতার আইন, নিত্যনতুন এবং অন্যান্য মামলার নীতি, সিরিয়ান প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারিকৃত আইন এবং রায় বাস্তবায়নের অধীনে ছিল। যেমন বেসামরিক আইন, বাণিজ্যিক আইন, সাজা-সংক্রান্ত আইন, ব্যক্তিগত বিষয় এবং অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি।[১১১৯]

☑ ২. প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থা। মন্ত্রীসভার সাথে এই বিচার-সংস্থার সরাসরি সম্পর্ক। ১৯৫৯ সালের ৫৫ নং আইন অনুসারে রাষ্ট্রীয় পরিষদের ব্যবস্থাপনা এ সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণাধীন। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সামনে এ সংস্থাটি মামলার নীতি, রাষ্ট্রীয় ফরমান, আইন এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে থাকে।

[১১১৬] উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ ওয়াল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ৯৬

[১১১৭] ১৯৫০ সালের সিরিয়ান সংবিধানের ১০৪ নং ধারা; ১৯৭৩ সালের সিরিয়ান সংবিধানের ১৩১ নং ধারা।

[১১১৮] ১৯৫০ সালের সিরিয়ান সংবিধানের ১০৫ নং ধারা; ১৯৭৩ সালের সিরিয়ান সংবিধানের ১৩৩ নং ধারা।

[১১১৯] মাজমুআতু তাকনীনি উসূলিল মুহাকামাত দ্রষ্টব্য

☑ বিচার বিভাগ, ফতোয়া এবং আইন-উপদেষ্টা বিভাগ নিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত। (ধারা নং: ২।) আর বিচার বিভাগ গঠিত হয় সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত, প্রশাসনিক আদালত, রাজ্য পরিচালনা কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য পরিচালনা পরিষদ নিয়ে। (রাজ্যের পরিষদের আইন, ধারা নং: ৩।) প্রতিটি আদালতেরই নির্ধারিত ক্ষমতা এবং পরিধি আছে। (৮ নং এবং তার পরবর্তী ধারাগুলো।)[১১২০]

☑ ৩. সামরিক বিচার বিভাগ। এটি সাজা-সংক্রান্ত আইন এবং সামরিক মামলা নীতির অধীন। যা ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৬১ নং আইন অনুসারে জারি করা হয়েছিল। সামরিক বিচার বিভাগ আবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনেও ছিল। সামরিক বিচার বিভাগের আদালতগুলো একক বিচারকের আদালত এবং সামরিক আদালত (ধারা নং: ১) নিয়ে গঠিত হতো। এই আদালত দুটির প্রতিটিরই নিজস্ব পরিধি ছিল। (ধারা নং: ৩ এবং তার পরবর্তী ধারাগুলো।)[১১২১]

☑ ৪. বিশেষ আদালত। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এই আদালত বসাত। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয় বা আইন ইস্যুকারী নির্দিষ্ট সংস্থার অনুগত থাকত। যেমন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আদালত। এগুলো ৮ আগস্ট ১৯৭৭ সালে জারিকৃত ৪৬ নং আইন অনুসারে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় আইন প্রয়োগ করত। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা আদালত-সহ অন্যান্য আদালত ছিল বিশেষ আদালতের অন্তর্ভুক্ত। যার মধ্যে কিছু সাধারণ বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর কিছু ছিল পরিধি অনুযায়ী বিশেষ বিষয়ে নির্ধারিত। যেমন ট্রাফিক আদালত, কিশোর-সংক্রান্ত আদালত এবং শ্রমিক আদালত ইত্যাদি।[১১২২]

শারঈ বিচার বিভাগ ছিল আইন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ বিচার বিভাগের কাজ ছিল 'সিভিল প্রসিডিউর কোড' এবং 'জুডিশিয়াল অথরিটি আইন' প্রয়োগ করা। তাই এই আলোচনা সাধারণ বিচার বিভাগের মাঝেই সীমাবদ্ধ।

❁ সিরিয়ার সাধারণ বিচার বিভাগের আদালত

মূলত সাধারণ বিচার বিভাগের আদালত ছিল নিম্নের আদালতগুলো নিয়ে গঠিত।

[১১২০] মাজমুআতু তাকনীনি উসূলিল মুহাকামাত দ্রষ্টব্য। কানুনু তানযীমি মাজলিসিদ দাওলাহ, পৃ. ৪৪৯

[১১২১] মাজমুআতু তাকনীনি উসূলিল মুহাকামাত দ্রষ্টব্য। কানুনুল উকুবাত ওয়া উসূলুল মুহাকামাতিল আসকারি, পৃ. ৩৪৫

[১১২২] উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ, পৃ. ১০২

▪ ১. ব্যক্তিগত অবস্থার আদালত :

এই আদালতের দায়িত্ব ছিল পরিবারের বিবাহ, তালাক, মিরাস, বংশ, ভরণপোষণ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের মামলা শুনানি।

ব্যক্তিগত অবস্থার আদালত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। (ধারা নং : ৩৩।)

ক. শারঈ আদালত : একজন বিচারক নিয়ে এ আদালত গঠিত হতো। যাকে শারঈ বিচারক বলা হতো। কোনো এলাকায় একাধিক শারঈ আদালত থাকলে সর্বোচ্চ বিচারক বা প্রবীণ বিচারক আদালতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতেন। (ধারা নং : ৩৪।) দামিস্কে বিশেষভাবে প্রথম শারঈ বিচারকের দায়িত্ব ছিল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা। পূর্ববর্তী আলোচনায় যাকে 'কাযিউল কুযাত' বা প্রধান বিচারপতি বলা হতো।

খ. মতাদর্শিক আদালত : এই আদালত দ্রুজ সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষ থেকে একজন শারঈ বিচারক নিয়ে গঠিত হতো। উল্লিখিত সম্প্রদায়ের পারিবারিক বিভিন্ন মামলা শুনানির দায়িত্ব পালন করত এই আদালত। আইনমন্ত্রীর মতামত এবং বিচার বিভাগের উচ্চ পরিষদের সম্মতি গ্রহণের পর একটি ফরমানের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩৫ নং ধারা অনুযায়ী বিচারক নিয়োগের সকল শর্ত পরিপূর্ণভাবে দেখা হতো। মতাদর্শিক আদালত ৩০৭ নং ধারার প্রতি লক্ষ রেখে সিরিয়ান পারিবারিক আইন প্রয়োগ করত। বিশেষভাবে দ্রুজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ কিছু আইন ছিল এই ধারার অন্তর্ভুক্ত।

গ. আধ্যাত্মিক আদালত : এই আদালত বিধর্মী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারিবারিক মামলার শুনানির দায়িত্ব পালন করত। রেজোলিউশন নং ৬০ L.R (১৩ই মার্চ ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩৬ নং ধারা এই আদালত নিয়ন্ত্রণ করে তার পরিধি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করত। লেবাননের মতো সিরিয়াতেও এই রেজোলিউশন বিধর্মী সম্প্রদায়ের একটি পরিসংখ্যান করেছিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে লেবাননের মতো সিরিয়ার অমুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা গণনা করা হয়েছিল। তারা ছিল—১. ম্যারোনাইটস, ২. গ্রিক অর্থোডক্স, ৩. রোমান ক্যাথলিক, ৪. আর্মেনিয়ান অর্থোডক্স, ৫. আর্মেনিয়ান ক্যাথলিক, ৬. সিরিয়ান অর্থোডক্স, ৭. সিরিয়ান ক্যাথলিক, ৮. অ্যাসিরিয়ান ক্যালডক্স, ৯. ক্যালদিয়ান, ১০. ল্যাটিন, ১১. প্রোটেস্ট্যান্ট, ১২. দামিস্ক সিনাগগের ইহুদি এবং ১৩. আলেপ্পো সিনাগগের ইহুদি। এই রেজুলেশন এখনো কার্যকর।[১১২৩]

সিরিয়ান পারিবারিক আইনের ৩০৮ নং ধারাটি পারিবারিক অবস্থা ধারণ করে। খ্রিষ্টান এবং ইহুদি আধ্যাত্মিক আদালতগুলো পারিবারিক মামলাগুলোর শুনানি দেখার দায়িত্ব পালন করত। এই ধারাটির মধ্যে বলা হয়েছে, খ্রিষ্টান এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ধর্মীয় যে

[১১২৩] তানযীমুল আহওয়ালিশ শাখসিয়্যাহ, লিগায়রিল মুসলিমিন, পৃ. ৩৭, ৬১, ৬২ এবং ৬৫

আইনকানুন এবং বিধিবিধান রয়েছে—সেগুলো পালন করতে হবে। বিবাহের প্রস্তাব, বিবাহের শর্ত এবং বিবাহ সম্পাদন, বিবাহের পরে তাদের খোঁজখবর রাখা, স্ত্রীর ভরণপোষণ, ছোটদের ভরণপোষণ, বিবাহ বাতিল এবং বিবাহের বৈধতা, বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, তালাকে বায়িনের ক্ষেত্রে যৌতুক এবং লালনপালনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিষয়—এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত হবে। এসব ছাড়া আরও যে আইনকানুন রয়েছে, সেগুলো শারঈ আদালতের মধ্যে সকল সিরিয়াবাসীর ওপর কার্যকর করা হতো।

■ ২. কিশোর আদালত

অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাথে জড়িত সমস্ত মামলার শুনানি করত। ৩০শে মার্চ ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ৩৬ নং ধারায় জারি করা কিশোর আইন বাস্তবায়ন করা হয়।

■ ৩. আপোস আদালত

একজন বিচারক নিয়ে গঠিত হতো। যাকে 'ম্যাজিস্ট্রেট জজ' বলা হতো। (ধারা নং: ৩৮।) এই আদালত ১০ হাজার সিরিয়ান পাউন্ডের কম মূল্যমানের মামলার মীমাংসা করত। দেওয়ানি, বাণিজ্যিক এবং ফৌজদারি বিষয়গুলো ছিল যার নির্ধারিত কার্যবিধি। ফৌজদারি আইন যেগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। (ধারা নং: ৬২ এবং তার পরবর্তী ধারাসমূহ। ধারা নং: ৩৯। বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আইন থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল।)

■ ৪. প্রাথমিক আদালত

একজন বিচারক নিয়ে এই আদালত গঠিত হতো। যাকে প্রাথমিক বিচারক বলা হতো। (বিচার বিভাগ আইনের ৪০ নং ধারা।) এই আদালতগুলো এমন সব মামলার নিষ্পত্তি করত, যার জন্য কোনো বিশেষ বিচারিক কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়নি। (ধারা নং ৪০-এর ২ নং দফা।) মামলা নীতি আইন প্রাথমিক আদালতের পরিধি নির্ধারণ করে দিত। (ধারা নং: ৭৭।)

■ ৫. ফৌজদারি আদালত

এটি সিরিয়ার দেওয়ানি বিচার বিভাগের একটি অংশ। ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলো ছোটখাটো লঙ্ঘন এবং অপরাধের বিচার করত। ফৌজদারি প্রাথমিক আদালতগুলোর শুধু অপরাধের বিচার করত। তারপর আপিল আদালত প্রাথমিক অপরাধের বিচার করত। ফৌজদারি আদালত ছিল আপিল বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত। যা সবচেয়ে গুরুতর অপরাধগুলোর বিচার করত। ফৌজদারি আদালতে থাকত আপিল আদালতের তিনজন উপদেষ্টা। এই আদালতের রায়গুলো কোনো আপিল গ্রহণ করত না। তবে রেফার আদালতের সামনে রেফারের মাধ্যমে

আদালতের রায়গুলো নিয়ে আলোচনা করার বৈধতা ছিল। ফৌজদারি আদালতের সহযোগী ছিল সাধারণ প্রতিনিধি পাবলিক প্রসিকিউশনের মাধ্যমে। আর তদন্ত বিচারক মামলার তদন্ত করত। তদন্ত করার পরে ফৌজদারি আদালত মামলার শুনানি শুরু করত। সিরিয়ার এই আদালতগুলো ছিল স্বাধীন ফৌজদারি মামলা আইনের অধীনে।[১১২৪]

▪ ৬. আপিল আদালত

এটি একজন প্রধান বিচারক এবং দুইজন উপদেষ্টা নিয়ে গঠিত ছিল। ফৌজদারি মামলা এবং যেসব মামলা আপিল গ্রহণ করত, এই আদালত সেসব মামলার মীমাংসা করত। (বিচার বিভাগীয় আইনের ৪১ নং ধারা এবং দেওয়ানি মামলা নীতির ৭৯ নং ধারা।)

▪ ৭. রেফার আদালত

এর মূল কেন্দ্র ছিল দামিস্কে। একজন প্রধান বিচারক, প্রধান বিচারকের কয়েকজন প্রতিনিধি এবং দুইজন উপদেষ্টা নিয়ে এই আদালত গঠিত হতো। এই আদালত ছিল তিন ভাগে বিভক্ত। যথা: ১. দেওয়ানি এবং বাণিজ্যিক মামলা বিভাগ, ২. ফৌজদারি মামলা বিভাগ এবং ৩. ব্যক্তিগত মামলা বিভাগ। তিনজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে রেফার আদালত তার সিদ্ধান্ত জারি করত। (বিচার বিভাগের ৪৪ নং ধারা এবং তার পরবর্তী ধারাগুলো।)

❁ শারঈ আদালতের পরিধি

সিরিয়ার শারঈ আদালত একদিক থেকে একটি স্বাধীন আদালত হিসেবে বিবেচিত হতো। অন্যদিক থেকে সেটি ছিল একটি বিশেষ আদালত। এই আদালত কেবলমাত্র নির্ধারিত মামলাগুলোর শুনানি করত।

এরপর আসে সিরিয়ান কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর। এই আইন শারঈ আদালত সম্পর্কে কথা বলার জন্য ৪ নং বই নির্দিষ্ট করে দেয়। এ আইন এ-কথাও স্পষ্ট করে দেয় যে, শারঈ আদালতের পরিধি দুটি মৌলিক অংশে বিভক্ত।

☑ ১. সাধারণ পরিধি : শারঈ আদালতের পরিধি ছিল মতাদর্শিক। চিন্তা-চেতনার ভিন্নতা সত্ত্বেও সমস্ত সিরিয়াবাসীর কিছু বিষয়ের মামলার শুনানির নির্ধারিত দায়িত্ব। এমনকি সিরিয়ায় বসবাসকারী সিরিয়ান নয় বিদেশিদের জন্যও তা প্রযোজ্য হতো। ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক রায়ের ক্ষেত্রে তারা ইসলামি শরীয়তের বিধান অনুসরণ করত। অভিভাবকত্ব, উইল বা ওসিয়ত, আইনি

[১১২৪] উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ ওয়াল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ১০৮; মাজমুআতু তাকনীনি উসূলিল মুহাকামাত, পৃ. ১৮১

প্রতিনিধিত্ব, মৃত্যু প্রমাণ করা, উত্তরাধিকারীদের জন্য উত্তরাধিকারের ভাগ নির্ধারণ করা, বংশ, স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তান ব্যতীত আত্মীয়দের ভরণপোষণ, নিষেধাজ্ঞা, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, প্রাপ্তবয়স্কতা প্রমাণ করা এবং নিখোঁজ ব্যক্তির দায়িত্ব ছিল সাধারণ পরিধির অন্তর্ভুক্ত। (ধারা নং : ৫৫৩। আই.এম.)

☑ ২. বিশেষ পরিধি : শারঈ আদালতের নির্ধারিত দায়িত্ব ছিল কেবল মুসলিমদের পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত মামলাগুলোর দেখাশোনা করা। বিবাহ-শাদি, বিবাহ বিচ্ছেদ, দেনমোহর, যৌতুক, শিশুর লালনপালন, স্তন্যপান করানো, স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে ভরণপোষণ, শারঈ হুকুম, প্রয়োজনীয়তা ও শর্তসাপেক্ষে জনকল্যাণমূলক দাতব্য ওয়াকফ ছিল এই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। (ধারা নং : ৫৩৬। আই.এম) আরও ছিল ওসিয়ত, জনকল্যাণমূলক দাতব্য ওয়াকফের সমস্ত অধিকার নিয়ন্ত্রণ, বিবাহ চুক্তি এবং সেটাকে নিশ্চিতকরণ, তালাক তথা বিবাহ বিচ্ছেদ, আইনি উত্তরাধিকার নির্ধারণ নথিপত্র, শারঈ আইনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করা, ভরণপোষণ আরোপ করা, পরস্পর সন্তুষ্টির মাধ্যমে ভরণপোষণ রহিত করা, বাবা-মায়ের অনুমোদনের সাথে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত করা এবং নতুন চাঁদ সাব্যস্ত করা। (ধারা নং: ৫৩৮। আই. এম)[১১২৫]

❁ সিরিয়ার শারঈ বিচারকের শর্তাবলি

সিরিয়ায় সাধারণভাবে বিচার বিভাগ, পাবলিক প্রসিকিউশন এবং বিশেষভাবে শারঈ আদালতে যে দায়িত্ব পালন করত, তার ক্ষেত্রে যেসব শর্ত প্রযোজ্য ছিল সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো।

☑ ১. ব্যক্তিটির কমপক্ষে পাঁচ বছর সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্রের নাগরিকত্ব থাকতে হবে। তার ধর্ম বা বর্ণ যা-ই হোক না কেন।

☑ ২. তাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ যোগ্য হতে হবে এবং নাগরিক অধিকার ভোগ করতে হবে।

☑ ৩. তাকে অবশ্যই সংক্রামক রোগ এবং এমন অক্ষমতা থেকে মুক্ত হতে হবে, যা তাকে দায়িত্ব পালন করতে বাধা দেয়।

☑ ৪. বয়স। একজন সহকারী শারঈ বিচারক বা একজন প্রসিকিউটর পদে নিয়োগ হলে তার বয়স ২২ হতে হবে। আর আপিল আদালতের সভাপতি এবং রেফার আদালতের উপদেষ্টা পদের জন্য বয়স কমপক্ষে ৩৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বোচ্চ বয়স হলো ৫০।

[১১২৫] উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ ওয়াল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ১১২

☑ ৫. প্রার্থী যেন কোনোভাবেই গুরুতর বা জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত না হয়। কিংবা এক বছর মেয়াদের বেশি সময় যেন কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হয়।

☑ ৬. প্রার্থীকে অবশ্যই আইনের ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রযোজ্য আইনে নির্ধারিত এবং নিরপেক্ষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এ ক্ষেত্রে শারঈ বিচার বিভাগের সনদও গৃহীত হবে না।

☑ ৭. সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল তথা সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ অবশ্যই তার মনোনয়ন গ্রহণে সম্মত হতে হবে।[১১২৬]

মিশরে শারঈ বিচারব্যবস্থা

মিশর প্রথম থেকেই উসমানি সালতানাতের অধীন থেকে নিজের সার্বভৌমত্ব এবং কর্তৃত্ব ফিরে পেতে চেষ্টা করে আসছিল। তবে মিশর ইংরেজ এবং ফরাসিদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের হামলার কারণে মিশর বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, আইন প্রণয়ন এবং সামরিক প্রভাবের শিকার হয়। এরপর মুহাম্মাদ আলি পাশা এবং তার পরবর্তীদের নেতৃত্বে আসে নতুন মামলুক শাসন। উসমানি সালতানাত থেকে মিশর প্রায় স্বায়ত্তশাসিত হয়েছিল। মিশরের অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি প্রভাবের মধ্যে ভারসাম্য ছিল এই শাসনের কর্তৃত্ব। এই শাসন উসমানি খিলাফতের সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে চলত। এরপর ইংরেজরা মিশরে হস্তক্ষেপ করে। আইন ও বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা ফরাসি আইন এবং ইংরেজি ব্যবস্থা আরোপ করে। এ সময় মিশ্র বিচারব্যবস্থা এবং বেসামরিক বিচারব্যবস্থা চালু হয়। একপর্যায়ে ইংরেজরা মিশর এবং সুদানে তাদের আধিপত্য, নিয়ন্ত্রণ এবং দখলদারিত্ব পাকাপোক্ত করে নেয়। কিন্তু এ সময় মিশরের বিচারব্যবস্থা উসমানি সালতানাত থেকে খুব বেশি ভিন্ন ছিল না। তবে শারঈ আদালতের পরিধি ব্যক্তিগত অবস্থার আদালতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। উত্তরাধিকার, বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের আইন প্রণয়ন করা হয়। আগাগোড়া ফরাসি এবং ভিনদেশি আইনের নীতির পাশাপাশি শারঈ আদালতের প্রস্তাবনাগুলো প্রকাশ পায়।

এভাবে চলতে থাকে মিশরের পরিস্থিতি। একসময় মিশর স্বাধীন হয়।[১১২৭] মিশর ভূমি থেকে ইংরেজদের উৎখাত করা হয়। মিশর একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার তিনটি বিভাগ থাকে। এর মধ্যে স্বাধীন আর স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ ছিল। যেমনটা ইতঃপূর্বে সিরিয়া অংশে আলোচনা হয়েছে।[১১২৮]

[১১২৬] উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ ওয়াল মাদানিয়্যাহ, পৃ. ১০২ এবং ১০৩

[১১২৭] ১৯৪৯ সালে মিশরে মিশ্র আদালত নিষ্ক্রিয় করে বিচারব্যবস্থা একীভূত করা হয়। (কাওয়াইদুল মুরাফাআত, পৃ. ১৮ দ্রষ্টব্য।)

[১১২৮] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ ফিদ দুওয়ালিল আরাবিয়্যাহ, পৃ. ১৩৬

শারঈ আদালতের বিলুপ্তি

আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পর মিশরীয় সরকার হৃদয়বিদারক এবং দুঃখজনক কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সকল বিষয় আপন আপন জায়গায় ফিরিয়ে আনা, মিশরীয় জাতির দ্বীন, জনগণের আকীদা-বিশ্বাস, আসমানি পবিত্র আইন আঁকড়ে ধরা, শারঈ আইন বাস্তবায়ন, শারঈ বিচারব্যবস্থায় ন্যায় এবং ইনসাফ আর সত্য এবং প্রাণ ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে শারঈ আদালতকে তারা একেবারেই বিলুপ্ত করে দেয়।

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ৪৬২ নং আইন জারি করা হয়। যা-তে শারঈ আদালত এবং ধর্মীয় কাউন্সিলের বিলুপ্তির কথা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা-তে এটাও ছিল, ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে এ আইন কার্যকর হবে। এর ফলে শারঈ আদালত এবং ধর্মীয় পরিষদগুলোতে নোটারাইজেশন কলম বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। মিশরীয় বিধায়ক ১৯৫৫ সালে ৬২৯ নং একটি বিশেষ আইন জারি করেন। ১৯৪৭ সালের প্রমাণিকরণ আইনের কিছু বিধান সংশোধন করে এবং শারঈ আদালত ও ধর্মীয় কাউন্সিলের নোটারাইজেশন কলমগুলো বাতিল করে দেয়। শারঈ আদালতে পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্য এ আইনটি শারঈ বিচারকদের দেওয়ানি আদালতের সাথে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা অবসরের বয়সে পৌঁছলে অন্য কোনো শারঈ আলিম নিয়োগ দেওয়া হবে না।[১১২৯]

তারপর মিশরের ভূমি থেকে শারঈ আদালতের অস্তিত্ব মুছে যায়। এরপর ১৫ই অক্টোবর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মিশরে বসবাসরত যাবতীয় মিশরীয়র প্রতি লক্ষ্য রেখে বাণিজ্যিক এবং দেওয়ানি সমস্যার সমাধানে পারিবারিক বিচারব্যবস্থার পরিধি শুধু বিশেষ দেওয়ানি আদালতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেসব আদালত দেওয়ানি এবং বাণিজ্যিক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করত, দেওয়ানি আদালত সেসব আদালতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এমনটা বিশেষভাবে তখনই হতো, যদি বিচারপ্রার্থীদের কোনো এক পক্ষ ভিনদেশি হতো।

শারঈ আদালত বিলুপ্ত করার পর ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সকল মিশরীয়র পারিবারিক মামলা পরিচালনার দায়িত্ব চলে যায় দেওয়ানি আদালতের কাছে। দেওয়ানি প্রাথমিক আদালত একাধিক বিভাগ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে কিছু বাণিজ্যিক এবং দেওয়ানি বিষয়গুলোর শুনানি করত। আর কিছু পরিচালনা করত ফৌজদারি আইন। আবার কিছু শুধু ব্যক্তিগত অবস্থার দায়িত্ব পালন করত।[১১৩০]

[১১২৯] আল-মুরাফাআতুল মাদানিয়্যাহ ওয়াত তিজারিয়্যাহ, পৃ. ৩২১

[১১৩০] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ১৪৬ এবং ১৬৬

❁ বিভিন্ন শ্রেণির আদালত

মিশরের বিচারব্যবস্থা সাধারণ বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনিক বিচার বিভাগ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এগুলোর পাশাপাশি সিরিয়ার মতো সামরিক বিচার বিভাগ এবং বিশেষ আদালতও ছিল। যেমন সামরিক আদেশ পরিচালিত সর্বোচ্চ এবং আংশিক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আদালত ১৯৫৮ সালের ৪০ নং আইন।

মিশরের সাধারণ বিচারব্যবস্থা যেসব আদালত নিয়ে গঠিত হয়েছিল, সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো।

১. রেফার আদালত: ১৯৩১ সাল থেকে এটা চলে আসছিল। এই আদালত একজন প্রধান বিচারক, তিনজন প্রতিনিধি এবং একাধিক উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এ আদালতে মৌলিক তিনটি বিভাগ ছিল। যথা: (ক) ফৌজদারি বিভাগ, (খ) নগর আর বাণিজ্য বিভাগ এবং (গ) পারিবারিক বিভাগ। এই আদালতে পাঁচজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে রায় জারি করা হতো। ফৌজদারি বিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন মামলার ত্রুটি তদন্ত করার জন্য আরও কিছু বিভাগ ছিল। যার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হতো তিনজন উপদেষ্টার পক্ষ থেকে।

২. আপিল আদালত: এই আদালতের অধীনে দুই শ্রেণির আদালত ছিল। (ক) দেওয়ানি মামলাগুলোর প্রাথমিক রায় আপিল এবং শুনানির জন্য উচ্চ আপিল আদালত। (খ) ফৌজদারি আদালত। এটা ছিল দুই শ্রেণির। সাধারণ ফৌজদারি আদালত তিনজন উপদেষ্টা নিয়ে গঠিত হতো। দণ্ডবিধি এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ আইনের নিবন্ধন ৫১ আর ৪২০ অনুসারে একজন স্বতন্ত্র উপদেষ্টা থাকতেন। যার দায়িত্ব ছিল চুরি, স্থায়ী অক্ষমতা, এবং লাইসেন্স ছাড়া অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহনের অপরাধগুলো দেখা।

৩. প্রাথমিক আদালত: অপরাধমূলক আপিল, দেওয়ানি, বাণিজ্যিক, জরুরি আপিল এবং পারিবারিক আপিল বিভাগ ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। ফৌজদারি আদালতের রায়গুলোর জমা দেওয়া আপিল শুনানির জন্য একক বিচারক বিভাগ এবং জরুরি আদালত বিভাগ—এই আপিল বিভাগ দুটি কাজ করত। একক বিচারকের আদালত ছাড়াও এই আদালত তিনজন বিচারক নিয়ে গঠিত হতো। কারণ একক বিচারকের আদালতে কেবল একজন বিচারক থাকতেন।[১১৩১]

৪. আংশিক আদালত: এটা কেবল একজন বিচারক নিয়ে গঠিত হতো। দেওয়ানি, বাণিজ্যিক এবং পারিবারিক মামলাগুলোর শুনানি করা ছিল এর পরিধি। আংশিক আদালত থাকত প্রাথমিক আদালতের অধীনে।[১১৩২]

আর প্রশাসনিক বিচার বিভাগ ছিল রাজ্য পরিষদের অধীনে। যা ১৯৪৬ সালের

[১১৩১] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ১৪৬

[১১৩২] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ১৫০

১১২ নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫৯ সালের ১৫৫ নং আইনে এর পরিধি বর্ণনা করা হয়েছে। রাজ্য কাউন্সিল গঠিত ছিল একটি বিচার বিভাগ এবং একটি উপদেষ্টা বিভাগ নিয়ে। আর বিচার বিভাগটি গঠিত ছিল নিম্নোক্ত আদালতগুলো নিয়ে।

(ক) প্রশাসনিক উচ্চ আদালত : ১৯৫৫ সালের ১৫৫ নং আইনের অধীনে এই আদালতটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আদালত প্রশাসনিক আদালত বা প্রশাসনিক বিচার বিভাগীয় আদালত কর্তৃক জারি করা সমস্ত রায়ের ওপর মন্তব্য করার দায়িত্ব পালন করত। রাজ্য পরিষদের সভাপতি এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক উপদেষ্টা নিয়ে এই আদালতটি গঠিত ছিল। পাঁচজন উপদেষ্টা নিয়ে এর রায়গুলো জারি করা হতো। মামলা এবং রায়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি তদন্ত করার জন্য থাকত এক বা একাধিক বিভাগ। যা তিনজন উপদেষ্টা নিয়ে গঠন করা হতো।

(খ) প্রশাসনিক বিচার আদালত : রাজ্য পরিষদ-চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি এর পরিচালনায় থাকতেন। এই আদালতের রায়গুলো তিনজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে জারি করা হতো। এই আদালতের আরও কিছু বিভাগীয় সংস্থা ছিল। এই সংস্থাগুলোর কাছে প্রথমে বিশেষভাবে মামলাগুলো উপস্থাপন করা হতো।

(গ) প্রশাসনিক আদালত : একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং দুজন সদস্য নিয়ে এই আদালত গঠিত হতো। সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর শুনানির জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয় অথবা প্রতিটি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য থাকত এক বা একাধিক প্রশাসনিক আদালত।

(ঘ) রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ : এতে একজন প্রধান, বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা, সহকারী উপদেষ্টা, নায়েব এবং প্রতিনিধিরা থাকতেন। এটিকে রাজ্য পরিষদের বিচার বিভাগীয় অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এটা পূর্বে উল্লেখিত তিনটি বিভাগের প্রতিটি প্রশাসনিক আদালতে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করত। যার লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক বিচার বিভাগকে সহায়তা করা। মামলার প্রস্তুতির বোঝা অপসারণ এবং বিভিন্ন দিক থেকে তাদের সমস্যাগুলো যাচাই করার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা এবং অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট করার কাজ তারা করতেন।[১১৩৩]

❁ ব্যক্তিগত অবস্থার সমাধানে নগর-আদালতের পরিধি

১৯৫৪ সালের ৪৬২ নং আইন ব্যক্তিগত অবস্থার পরিধিগুলো একীভূত করেছে। নগর-আদালতই তখন বিশেষভাবে ব্যক্তিগত যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তি করত।

কিন্তু বিচারক যে আইন অনুযায়ী বিচার করবেন, মিশরীয় প্রশাসন সে

[১১৩৩] আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ১৫৬

আইনকে একীভূত করতে পারেনি। সুতরাং মোকদ্দমা দায়েরকারীরা অমুসলিম হলে তাদের ধর্ম, চিন্তা-চেতনা এবং সম্প্রদায় এক হলে এমতাবস্থায় তাদের নিজস্ব ধর্মীয় সুশৃঙ্খল কোনো বিচারব্যবস্থা থাকলে রায় জারির সময় তাদের মতাদর্শ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। পক্ষান্তরে মিশরীয় মুসলিম এবং অমুসলিমদের মাঝে যদি বিবাদ হতো এবং ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা, মাযহাব ও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন হলে ১৯৩১ সালের ২৮০ নং প্রস্তাবনাতে বর্ণিত ইসলামি শারঈ রায় বাস্তবায়ন করা হতো। এই রায় বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত এবং এ ব্যাপারে জারি করা বিভিন্ন মতামতের মধ্য থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত মতামত বেছে নেওয়া হতো। মিশরীয় এসকর্ট আইনে নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতি এবং ১৯৩১ সালের শারঈ আদালতের প্রস্তাবনায় থাকা বিশেষ বিধি এবং তার পরিপূরক আইন প্রয়োগ করা হতো।[১১৩৪]

সাধারণ বিচার বিভাগের আদালত হচ্ছে নগর-আদালত। আরও নির্দিষ্ট করে বললে আংশিক আদালত সামনে উল্লেখিত প্রস্তাবনার ৫ এবং ৬ নং ধারার শারঈ মামলাগুলোর দেখাশোনা করত।

☑ ১. আংশিক আদালতের প্রাথমিক পরিধি ছিল সন্তান লালনপালন এবং দেখাশোনা করা, ছোট বাচ্চাকে লালনপালনকারী নারী ছোট বাচ্চা নিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তরিত হওয়া, স্ত্রী এবং ছোট সন্তানের সব ধরনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা, আত্মীয়দের ভরণপোষণ, মোহর এবং যৌতুক, সব ধরনের উত্তরাধিকার মামলা, বিবাহের সাথে এবং স্ত্রীর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়, এবং উল্লেখিত বিষয়গুলোতে দুই বাদী-বিবাদীর কারও পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে।

☑ ২. আংশিক আদালতের সর্বশেষ পরিধি হলো—স্ত্রী অথবা সন্তানের ভরণপোষণ-সংক্রান্ত রায় (মাসিক ১০০ পিয়াস্টারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে), মোহর (১০ হাজার পিয়াস্টারের কম হলে)। সর্বোপরি শরীয়াহ-সম্মত কোনো বিষয়ে বাদী-বিবাদীর মাঝে সমাধান করার ক্ষেত্রে দাবিকৃত অধিকার সম্পর্কে কোনো বিরোধ না থাকলে।

☑ ৩. শারঈ ইস্যুতে প্রাথমিক আদালতের পরিধি : এটা আংশিক আদালতের পরিধির মধ্যে ছিল না। আইন প্রণেতা বিরোধের অনুমোদন দিয়ে ২০০ মিশরীয় পাউন্ডের বেশি ঋণের জন্য অনুরোধ করে ওয়াকফ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপে তাদের পরিধি চূড়ান্ত করেছেন। ঋণের জন্য অনুরোধ এবং একচেটিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা, এবং সম্পত্তির মূল্য ২০০ মিশরীয় পাউন্ডের বেশি না হলে দীর্ঘ সময়ের জন্য লিজ দেওয়া হতো। প্রাথমিক

[১১৩৪] আল-মুরাফাআত, পৃ. ৩৩২; আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ২০৫; কাওয়াইদুল মুরাফাআত, পৃ. ৪২৬

আদালতের সিদ্ধান্ত প্রাথমিক এবং বিষয়টি আপিলযোগ্য হতে হবে।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মিশরে পারিবারিক মামলার বিষয়গুলো প্রাথমিক বিচার বিভাগ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আপিলের অধীনস্থ হতো। আংশিক আদালতে একজন বিচারক এবং প্রাথমিক আদালতে তিনজন বিচারক দ্বারা শুনানি হতো। তবে পূর্বের শারঈ বিচারকদের একজনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।[১১৩৫]

❁ ব্যক্তিগত অবস্থার উদ্দেশ্য

ব্যক্তিগত অবস্থা যে একটি বিদেশি পরিভাষা—তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ব্যক্তিগত অবস্থা বলতে কী বোঝায় এবং এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য—এর সংজ্ঞা নিয়ে ব্যাখ্যাকার এবং আদালতের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য আছে। ১৯৩৪ সালে মিশরের আপিল আদালত এর সংজ্ঞা পেশ করেছে। যেমন ১৯৪৭ সালে মিশ্র বিচারব্যবস্থার প্রশাসনিক ধারা ব্যক্তিগত অবস্থা গণনা করেছে। তারপর ১৯৪৭ সালের ৯১ নং আইনের মধ্যেও রাষ্ট্রীয় ফরমান এই কেইসগুলো গণনা করেছে। এভাবে বিচারব্যবস্থার আইনের ১৩ নং প্রস্তাবনায় এ সংক্রান্ত যত রায় জারি করা হয়েছে, সেগুলোর আলোকে ব্যক্তিগত অবস্থাগুলো গণনা করা হয়েছে। আমরা এখানে এই পরিভাষার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা সমীচীন মনে করছি। তবে এ ক্ষেত্রে কেবল আপিল আদালতের সিদ্ধান্ত এবং বিচারব্যবস্থার আইন উল্লেখ করেই আমরা ক্ষান্ত থাকব।

আপিল আদালতের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত অবস্থা বলে মানুষের এমন সব বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্য, যা তাকে অপর থেকে আলাদা করে রাখে। যেমন প্রাকৃতিক এবং পারিবারিক গুণাবলি। যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে তার সামাজিক জীবনে আইনকানুনের প্রভাব সৃষ্টি হয়। যেমন একজন মানুষ নারী বা পুরুষ হওয়া, স্বামী বা স্ত্রী হওয়া, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত হওয়া, বাবা কিংবা আইনগত সন্তান হওয়া, পরিপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া বা না হওয়া। এই অযোগ্যতা বয়স কম হওয়ার কারণে, কিংবা অক্ষম বা পাগল হওয়ার কারণেও হতে পারে। স্বাধীন যোগ্যতার অধিকারীর হতে পারে অথবা আইনগত কারণে নির্ধারিত যোগ্যতার অধিকারীও হতে পারে।

আপিল আদালত আরও বলে, মিশরীয় প্রশাসনের মতে ওয়াকফ, উপহার এবং ওসিয়ত—সবগুলোই মুস্তাহাব অনুদানের নিয়তে অর্পণ করা হয়। তাই এগুলোকে ব্যক্তিগত অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও এগুলো দেওয়ানি আদালতের পরিধি অনুসারেই সম্পাদন করা হয়ে থাকে। অথচ ধর্মীয় ইস্যু সংবলিত এমন সমস্যাগুলো সমাধান করা দেওয়ানি আদালতের দায়িত্ব নয়।

[১১৩৫] আল-মুরাফাআত, পৃ. ৩৪১; আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ২০৫; কাওয়াইদুল মুরাফাআত, পৃ. ৪২৯

মিশরের বিচারব্যবস্থা আইনের ১৩ নং ধারা মানুষের অবস্থা এবং যোগ্যতা বা পরিবার-ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিরোধ এবং সমস্যা ব্যক্তিগত অবস্থা হিসেবে গণ্য করেছে। যেমন বিবাহের প্রস্তাব, বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, তাদের পারস্পরিক কর্তব্য, মোহর এবং যৌতুক (যা বিবাহের প্রস্তাবদাতা দিয়ে থাকে), স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, তালাক প্রদান করা এবং তালাক চাওয়া, বিচ্ছেদ, সন্তান গ্রহণ, স্বামীর পক্ষ থেকে বাবার স্বীকৃতি, পূর্বসূরি এবং উত্তরসূরিদের মাঝে সম্পর্ক, আত্মীয়স্বজন এবং মেয়ের জামাতাদের প্রতি খরচ করার নীতি ধরে রাখা, বংশ সংশোধন, ওসিয়ত করা, অভিভাবকত্ব, নিষেধাজ্ঞা, পরিচালনার অনুমতি, অনুপস্থিতি এবং নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত বিবেচনা করা। এগুলো ছাড়া আরও আছে উত্তরাধিকার, ওসিয়ত এবং মৃত্যুর পরবর্তী আরও অন্যান্য ইস্যু সংক্রান্ত বিরোধ এবং সমস্যা।

ব্যক্তিগত ইস্যু বিষয়ে বিচারব্যবস্থার আইন লঙ্ঘন করা হয়নি। তবে হেবা বা উপহার আর অনুদান ইস্যু এর ব্যতিক্রম। এটা নগর-আইনের অধীনে রয়েছে।[১১৩৬]

ইরাকে শারঈ বিচারব্যবস্থা

অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মতো ইরাকও উসমানি শাসনাধীনে ছিল। উসমানি যুগের আইনকানুন তারা প্রয়োগ করত। যেমনটা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং উসমানি সালতানাতের আধিপত্য শেষ হয়ে গেলে ১৯১৭ সালে ইরাক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে চলে যায়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইরাক স্বাধীনতা লাভ করে। নতুন নতুন আইন জারি করতে শুরু করে। সামুদ্রিক বাণিজ্য আইন এবং দেউলিয়া আইন ছাড়া অন্যান্য উসমানি আইনগুলো বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা এবং বিপ্লবের পরও এই দুটি আইন বাকি ছিল। ১৯৫৬ সালের ৮৮ নং পরিচ্ছেদে জারি করা হয় সিভিল এবং বাণিজ্যিক পদ্ধতি আইন। যা 'অটোমান সিভিল প্রসিডিউর কোড' আইনের স্থান দখল করে নিয়েছিল। তারপরও ১৯৬৯ সালের ৮৩ নং ধারায় নতুন আইনের মাধ্যমে উল্লিখিত আইনকে বাতিল করে দেওয়া হয়। এ নতুন আইন এখনো ইরাকে কার্যকর আছে।[১১৩৭]

❁ বিচারব্যবস্থা এবং একক বিচার বিভাগ

ইরাকে পৃথক পৃথক তিনটি বিভাগ পাওয়া যায়। তার মধ্য থেকে একটি হলো

[১১৩৬] আল-মুরাফাআতুল মাদানিয়্যাহ ওয়াত তিজারিয়্যাহ, পৃ. ৪৩৪; আন-নুযুমুল কাদ্বাইয়্যাহ, পৃ. ১৯৬

[১১৩৭] মুহাদ্বারাত ফী মাবাদিইত তানযীমিল কাদ্বাঈ ফিল ইরাক, পৃ. ৩১; বুহূসুন ওয়া দিরাসাত, পৃ. ১৩; আত-তাতবীকাতুশ শারইয়্যাহ, পৃ. ১৭

বিচার বিভাগ। বিরোধ মীমাংসা এবং নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করার মাধ্যমে যা আইনি বিধানগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। অস্থায়ী সংবিধান এবং বিচার বিভাগের আইন অনুসারে বিচারব্যবস্থা ছিল একটি স্বতন্ত্র বিভাগ।[১১৩৮]

স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা-নীতির ওপর ইরাক চলে। তার নীতি হচ্ছে দেওয়ানি আদালতগুলো ব্যক্তি, সরকার এবং মন্ত্রণালয়ের মাঝে সকল বিরোধ মীমাংসা করার দায়িত্ব পালন করবে। সুতরাং দেওয়ানি আদালতগুলো কেবল প্রশাসনিক বিষয়গুলো এবং দেওয়ানি মামলাগুলো পরিচালনা করত। কিন্তু ইরাকে রাজ্য পরিষদ অথবা প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থা পাওয়া যায় না। যেমনটি সিরিয়াতে এবং বর্তমান মিশরে আছে।[১১৩৯]

দেওয়ানি বিচারব্যবস্থার বহির্ভূত দায়িত্ব ছিল সার্বভৌমত্বের আইন (তথা নির্বাহী কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন দায়িত্ব), কূটনৈতিক নিরাপত্তার অধিকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনা মামলা এবং যখন কোনো আইনি প্রক্রিয়া বিচার বিভাগকে কিছু কিছু বিরোধ মীমাংসা করতে বাধা দিত।[১১৪০]

❁ আদালতের বিন্যাস

ইরাকের নগর-আদালতগুলো যেসব আদালত নিয়ে গঠিত ছিল, সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. রেফার আদালত : যা সমস্ত আদালতের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগ। এটি সমস্ত দেওয়ানি আদালতের প্রধান। দেওয়ানি, শারঈ এবং ফৌজদারি আদালতে আইনের সঠিক প্রয়োগের তত্ত্বাবধান করে এবং রায় অনুমোদন বা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এই আদালত সমস্ত আদালতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটি স্তর—এমন নয়। বরং তা বিভিন্ন বিভাগীয় সংস্থা এবং বিভাগ নিয়ে গঠিত। সেই বিভাগগুলো হচ্ছে রেফার আদালতের সাধারণ বিভাগ, দেওয়ানি এবং বাণিজ্যিক বিভাগ, ব্যক্তিগত আইনি বিভাগ এবং ফৌজদারি বিভাগ।

২. আপিল আদালত :[১১৪১] ইরাকে একাধিক আপিল আদালতের কথা জানা যায়। একজন প্রধান এবং দুজন বিচারকের সদস্যপদ নিয়ে এই আদালত গঠিত ছিল। দেওয়ানি, বাণিজ্যিক এবং বিভিন্ন বিষয়ের মামলার আপিলযোগ্য রায়, প্রাথমিক আদালত থেকে প্রকাশিত রায় এবং সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরিচালনার

[১১৩৮] মুহাদ্বারাত, পৃ. ৩৭ এবং ৪০

[১১৩৯] মুহাদ্বারাত, পৃ. ১০২; বুহূসুন ওয়া দিরাসাত, পৃ. ১০২

[১১৪০] মুহাদ্বারাত, পৃ. ১২৪; বুহূসুন ওয়া দিরাসাত, পৃ. ৯৫

[১১৪১] আপিল আদালতের নাম একেক দেশে একেক রকম ছিল। এ বিষয়টি আমরা সামনে লক্ষ করব। মুহাদ্বারাত, পৃ. ৯১

দায়িত্ব এই আদালত পালন করত।

৩. **প্রাথমিক আদালত :** এ আদালত ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) প্রাথমিক নির্ধারিত আদালত। (খ) প্রাথমিক অনির্ধারিত আদালত। এই আদালত দুটির দায়িত্ব ছিল বাণিজ্যিক এবং দেওয়ানি মামলাগুলো দেখাশোনা করা। যেসব মামলার ক্ষেত্রে কোনো রেফারেন্স পাওয়া যেত না, সেসব মামলার ক্ষেত্রে এ আদালত দুটির সাধারণ পরিধি ছিল। প্রাথমিক আদালতের একজন বিচারক নিয়ে এই আদালত গঠিত হতো। শারঈ আদালতের কোনো বিচারক না থাকলে প্রাথমিক আদালতের মুসলিম বিচারক শারঈ আদালতের বিচারক হতেন। বিচারকের অনুপস্থিতিতে তিনি হতেন আপোস বিচারক। অনুরূপভাবে অমুসলিমদের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ের মামলার বিচারকও তিনি হতেন। এরপর আসে নতুন আপিল আইন। এই আইন প্রাথমিক নির্ধারিত আদালত এবং প্রাথমিক অনির্ধারিত আদালতের মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত করে দেয়। প্রাথমিক আদালত এবং আপোস আদালত—উভয়টির জন্যই এই আইন পরিধি নির্ধারণ করে দেয়।[১১৪২]

৪. **আপোস আদালত :** এ আদালতকে আবার আংশিক আপোস আদালত বলা হতো। এ আদালত একজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হতো। ইরাকের বাণিজ্যিক এবং দেওয়ানি আপিল আইনের ২১ নং ধারা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পরিধি নির্ধারন করে দিয়েছে।

৫. **ব্যক্তিগত বিষয়ের আদালত :** এই আদালত একজন বিচারক নিয়ে গঠিত হতো। যিনি ইরাকের অধিবাসী। খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের যদি ধর্মীয় আধ্যাত্মিক বিচার পরিষদ না থাকত তাহলে তাদের ব্যক্তিগত মোকদ্দমা তুর্কি মুসলিমদের মতো যেসব বিদেশিদের তাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয়ে নগর-আইন ছিল সে-সকল বিদেশিদের মামলার মতো পরিচালনা করতেন। আর যদি কোনো বিদেশির ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আইন শারঈ আইন থাকত, তাহলে এই বিদেশির মামলা শারঈ আদালতের পরিধিতে পরিচালিত হতো। যেমন সৌদি, কুয়েত এবং সিরিয়ার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয়ের মামলা।

ব্যক্তিগত আদালত থেকে প্রকাশিত সিদ্ধান্ত রেফার এবং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নেয়া আলোচনা পর্যালোচনার অধীনে হতো। কিন্তু আপিলের মাধ্যমে আলোচনা-পর্যালোচনার কোনো পন্থাকে গ্রহণ করা হতো না। বিবাহ-শাদি, মোহর, তালাক, স্ত্রীর ভরণপোষণের মামলার ক্ষেত্রে ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আদালত তাদের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক পণ্ডিতের সাথে পরামর্শের পর তাদের ধর্মীয় রায়গুলো কার্যকর করা হতো। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন মিরাস,

[১১৪২] বুহুসুন ওয়া দিরাসাত, পৃ. ১৮ এবং ১০৬

ওসিয়ত তাদের ব্যক্তিগত আইনের রায় প্রয়োগ করা হতো।[১১৪৩]

এরপর ১৯৬৯ সালে নতুন আপিল আইন আসে। এই আইন ইরাকে বসবাসরত সকল অমুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়ে মামলা পরিচালনা করাকে প্রাথমিক আদালতের পরিধির অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সকল অমুসলিমদের নিজস্ব ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক কোনো পরিষদ ছিল না। সে-সকল বিদেশিদের মামলা পরিচালনাও এই আদালতের পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, যাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে নগর-আইন প্রয়োগ করা হতো।[১১৪৪]

৬. শারঈ আদালত : শারঈ আদালত একজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হতো। এমন প্রত্যেক জায়গায় শারঈ আদালত দেখা যেত, যেখানে প্রাথমিক আদালত থাকত। শারঈ আদালতের কোনো বিচারক না থাকলে প্রাথমিক আদালতের মুসলিম বিচারক শারঈ আদালতের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। শারঈ আদালতের পরিধি নিয়ে আমরা একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ আলোচনা করব।

৭. খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় আদালত : ১৯৫৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারিতে 'হুমায়ুনলিপি' জারি করার পর থেকেই উসমানি সালতানাতে এই আদালত চলে আসছে। রোমান, আর্মেনিয়ান এবং ইহুদিদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কাউন্সিল গঠন করা হয়। ১৯১৭ সালে ইংরেজরা ইরাক দখল করলে ১৯১৮ সালে আদালতের ফরমান জারি হয়। যে ফরমানের মধ্যে বিধর্মীদের আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের আদালতের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করা হয়। এরপর ১৯২৫ সালে ইরাকের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মধ্যে এই আইনকে নিশ্চিত করা হয়। তারপর ১৯৪৭ সালের ৩২ নং আইনের মাধ্যমে এই আদালত সুগঠিত হয়। ইরাকি প্রশাসন আগত সম্প্রদায়গুলোর প্রত্যেকের জন্য এক বা একাধিক ধর্মীয় আধ্যাত্মিক আদালত এবং রেফার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করে দেয়। সেই সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে : ১. সব ধরনের ক্যাথলিক, ২. আর্মেনিয়ান অর্থোডক্স, ৩. সিরিয়ান অর্থোডক্স এবং ৪. ইসরায়েলিরা।

নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ব্যক্তিদের তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো আধ্যাত্মিক সাম্প্রদায়িক এই আদালত। আদালতের প্রধান এবং সদস্যদের তিন বছরের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিযুক্ত করা হতো। যা হতো সম্প্রদায়ের কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রধান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মনোনয়নের তালিকা থেকে।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আদালতের পরিধি ছিল বিবাহ-শাদি, মোহর, তালাক, বিচ্ছেদ এবং স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষেত্রে। মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের ১০ নং ধারা অনুযায়ী ইহুদি এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মামলা পদ্ধতিতে আইন প্রয়োগ

[১১৪৩] মুহাদ্বারাত, পৃ. ৯১; বুহুসুন ওয়া দিরাসাত, পৃ. ১১১

[১১৪৪] বুহুসুন ওয়া দিরাসাত, পৃ. ১৯ এবং ১১১

করা হতো। ক্যাথলিকদের মামলার রায় দিতে সাম্প্রদায়িক আদালতের অস্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৮ সালের ১১ জুলাই ৪৮১ নং ধারা অনুযায়ী ক্যাথলিক দলগুলোর সাম্প্রদায়িক আদালত বিলুপ্ত করার ব্যাপারে ইরাকি রাষ্ট্রীয় একটি ফরমান জারি করা হয়। তখন থেকে এই সকল সম্প্রদায়ের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ের মামলাগুলো ব্যক্তিগত বিষয়ের মামলার আদালতের পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারপর ১৯৫১ সালের মার্চের ৪ তারিখ ১৫৫ নং অনুচ্ছেদে মুসাভি সাম্প্রদায়িক আদালত বিলুপ্তির ফরমান জারি করা হয়। তাই মুসাভি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বিষয়ের মামলাগুলো ব্যক্তিগত বিষয়ের আদালতের পরিধিতে পরিণত হয়ে যায়।

১৯৬৩ সালের ৮৭ নং ধারার মধ্যে আর্মেনিয়ান অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রশাসনিক আইনের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে : নগর-আদালতগুলোর এ পরিধি রয়েছে যে, এই আদালত আর্মেনিয়ান অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত বিষয়ের মামলাগুলো পরিচালনা করবে। এরপর থেকে এ সম্প্রদায়ের মামলা দেখাশোনা করার পরিধি ব্যক্তিগত বিষয়ে আদালতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের ৩২ নং আইনের পর মুসাভি এবং খ্রিষ্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আদালতের কোনো সুগঠিত আইন বাকি থাকেনি। তবে সিরিয়ান অর্থোডক্সদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কিছু আইন বাকি ছিল। কেননা বাগদাদে তাদের বিশেষ আধ্যাত্মিক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আদালত ছিল।[১১৪৫]

৮. ফৌজদারি আদালত : লঙ্ঘন, অপকর্ম আর অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এই আদালতের পরিধি ছিল। ফৌজদারি মামলার আইন অনুযায়ী এই আদালত কাজ করত। প্রাথমিক স্তর, দ্বিতীয় স্তর এবং তৃতীয় স্তরের রায়ের আদালতের মতো কয়েকটি বড় বড় ভাগে এই আদালতটি বিভক্ত ছিল।[১১৪৬]

❁ শারঈ আদালতের পরিধি

১৯৬৩ সালের ৪০ নং অনুচ্ছেদে ইরাকি মামলা উত্থাপন তালিকায় শারঈ আদালতের যেসব পরিধি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে, সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

☑ ১. বিবাহ এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো। যেমন : মোহর, বংশ, সন্তান লালনপালন, বিচ্ছেদ, তালাক-সহ যাবতীয় বৈবাহিক সম্পর্কিত বিষয়। (ধারা :

[১১৪৫] মুহাদ্বারাত ফী মাবাদিইত তানযীমিল কাদ্বাঈ ফিল ইরাক, পৃ. ১০৬-১১৫; বুহূসুন ওয়া দিরাসাত, পৃ. ১১৪; আত-তাতবীকাতুশ শারইয়্যাহ, পৃ. ১৯

[১১৪৬] মুহাদ্বারাত, পৃ. ১৩৩

২-এর দফা : ১)

☑ ২. অভিভাবকত্ব, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা, ওসিয়ত, পরিচালক আর দায়িত্বশীল নিয়োগ, তাদের বরখাস্ত করা এবং তাদের কাছে জবাবদিহি তলব করা, বৈধ আর আইনগত পদক্ষেপের অনুমোদন দেওয়া। (ধারা : ২-এর দফা : ২)

☑ ৩. বংশীয় উইলের দায়িত্বশীল নিয়োগ, পরিচালক নিয়োগ, বরখাস্ত ও তার কাছে জবাবদিহি চাওয়া, জনকল্যাণমূলক ওয়াকফের মধ্যে দায়িত্বশীল নিয়োগের প্রস্তাবনা পেশ করা। (ধারা : ২-এর দফা : ৩)

☑ ৪. নিষেধাজ্ঞা, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং প্রাপ্তবয়স্কতা প্রমাণ করা। (ধারা : ২-এর দফা : ৪)

☑ ৫. মৃত্যুর প্রমাণ, উত্তরাধিকার সম্পত্তি লিখে রাখা, ওয়ারিশদের জন্য উত্তরাধিকার সম্পত্তির অংশ নির্ধারণ করা, উত্তরাধিকার সম্পত্তি তাদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া এবং জন্ম-মৃত্যুর প্রমাণ সরকারি রেজিস্টারে লিখে রাখা।

☑ ৬. নিখোঁজ ব্যক্তি এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো।

☑ ৭. শারঈ আদালতের আরও কিছু বিষয় পরিচালনার পরিধি ছিল। সেগুলো হলো : ক. ওসিয়তের দলিল-প্রমাণ, খ. উইলের দলিল-প্রমাণ এবং শারঈ দলিল-প্রমাণের রেজিস্টার খাতায় সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখা এবং গ. দায়ের করা মামলাগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অনুমোদন দেওয়া।

☑ ৮. শারঈ আদালতের এই পরিধিও ছিল যে, তিনি মৃত ব্যক্তির শারঈ বরাদ্দকৃত অংশের ব্যাপারে রায় জারি করতে পারবেন এবং সম্পদের বরাদ্দকৃত অংশের রেজিস্টার খাতায় তা লিখে রাখবেন।

শারঈ আদালত ইরাকের পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত আইন প্রয়োগ করত। আইনি কোনো দলিল পাওয়া না গেলে তখন ব্যক্তিগত আইনের সাথে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ইসলামি মূলনীতিগুলো প্রয়োগ করত। এই সকল ক্ষেত্রে ইরাকি আদালতগুলো ইরাকে স্বীকৃত ইসলামি আইন এবং বিচার ব্যবস্থার সমর্থিত এবং অন্যান্য ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর যে আইনগুলো ইরাকি আইনের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে, সেগুলোর দিকনির্দেশনা গ্রহণ করত। (ব্যক্তিগত আইনের ১ নং ধারা।)

শারঈ আদালতকে সকল ইরাকির ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর মামলা দেখাশোনার জন্য ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী আদালত মনে করা হতো। আর যদি শারঈ আদালতের রায়ের বিপরীতে কোনো বিধান পাওয়া যেত, তাহলে ব্যক্তিগত বিষয়ের আদালত এবং খ্রিষ্টানদের সাম্প্রদায়িক পরিষদগুলো বিকল্প আদালত হিসেবে বিবেচিত হতো। কেননা যায়দিয়্যা এবং সায়েবা সম্প্রদায় শারঈ আদালত অনুসরণ

করে চলত। নিজেদের ওপর তারা ইরাকের ব্যক্তিগত আইন প্রয়োগ করত।[১১৪৭]

নগর-বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব শর্তগুলো ছিল, হুবহু সেই শর্তগুলো শারঈ বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো। তবে আরেকটি অতিরিক্ত শর্ত ছিল যে, বিচারককে অবশ্যই আইন কলেজ অথবা শারঈ অনুষদ থেকে কিংবা এগুলোর সমমানের কোনো কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হতে হবে।[১১৪৮]

জর্ডানে শারঈ বিচারব্যবস্থা

দীর্ঘ ইতিহাসে জর্ডানের কোনো স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কাঠামো বা পূর্ণাঙ্গ কোনো রাষ্ট্র ছিল না। জর্ডানের রাষ্ট্র কাঠামো শুরু হয় বৃহৎ আরব বিদ্রোহের পর। সে-সময় ১৯১৬ সালে মক্কায় শরিফ হুসাইন বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১১৪৯] ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানি সালতানাতকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন চুক্তি এবং বিদেশিদের গোপন ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সাল থেকে নিয়ে ১৯২০ সাল পর্যন্ত জর্ডান আরব সিরিয়ার অধীনে চলে। এরপর ফরাসিরা সিরিয়া দখল করলে ১৯২০ সালের ২৫শে এপ্রিল সান রেমো সম্মেলন অনুসারে পূর্ব জর্ডান ব্রিটিশ বেনিয়াদের অধীনতা গ্রহণ করে। ১৯২১ সালের ১১ই এপ্রিল সর্বপ্রথম জর্ডান সরকার গঠিত হয়। ওই সময় জর্ডানের জনসংখ্যা ছিল আড়াই লাখ। ১৯২৮ এবং ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় দেশটির কিছু সংবিধান। স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কাঠামো লাভ করার পর ১৯৫২ সালের সংবিধানটি ছিল সর্বশেষ। জর্ডানের ইমারত ১৯৪৬ সালে রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালের বিপ্লবের পর, ১৯৪৯ সালের আরিহা সম্মেলনের পর, তারপর ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল মোতাবেক ১৩৬৯ হিজরির ৭ই রজব জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত জারি করার পর জর্ডান ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের সাথে এক হয়ে যায়। তারপর ১৯৬৭ সালে হাজিরান পরাজয়ের পর জায়োনিস্টরা পশ্চিম তীর দখল করে নেয়। তখন জর্ডান প্রশাসন পশ্চিম তীরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়।[১১৫০]

❁ আদালতের ধরন

[১১৪৭] মুহাদ্বারাত ফী মাবাদিইত তানযীমিল কাদ্বাঈ ফিল ইরাক, পৃ. ১০৬; বুহূসুন ওয়া দিরাসাত, পৃ. ১১৪

[১১৪৮] মুহাদ্বারাত, পৃ. ৪৯

[১১৪৯] ৯ই শাবান ১৩৩৪ হিজরিতে ১০ই জুন ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার তৎকালীন শরিফ হুসাইন ইবনু আলি উসমানি সালতানাতের বিরুদ্ধে বৃহৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যা পূর্ব জর্ডান, সিরিয়া এবং ইরাকে ছড়িয়ে পড়ে।

[১১৫০] আল-কাদ্বাউশ শারঈ আল-উরদুন্নি, পৃ. ৪২; নিযামুল কাদ্বায়িশ শারঈ, পৃ. ৫৫; উসুসুত তাশরীয়ি ওয়ান নিযামিল কাদ্বাঈ ফিল উরদুন, পৃ. ৭

জর্ডানের বিচারব্যবস্থায় উসমানি আইন চালু ছিল। শারঈ বিধান এবং গোত্রভিত্তিক বিভিন্ন রীতিনীতির ওপর তারা নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তীকালে গোত্রভিত্তিক আদালত বিলুপ্ত করে এর কার্যক্রম ফৌজদারি আদালতের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।[১১৫১] এই ফৌজদারি আদালত তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। আদালতের বিভিন্ন ফৌজদারি পরিধি ছিল। জর্ডানে একক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালের জর্ডানের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, বিচারকরা হলো স্বাধীন। (৯৭ নং ধারা।) বিচারক নিয়োগ প্রদান এবং বরখাস্ত করার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পরিধিভুক্ত। (৯৮ নং ধারা।) সংবিধানে এটাও আছে যে, আদালত তিন ধরনের হবে। দেওয়ানি, ধর্মীয় এবং বিশেষ। (৯৯ নং ধারা।) এ ধরনের আদালতগুলোর পরিধি যেখানে ছিল :

ক. নিয়মিত আদালত বা বেসামরিক আদালত : ধর্মীয় আদালত বা বেসরকারি আদালতে যে সকল মামলা উত্থাপন করা হয়—তা ছাড়া সরকারি মামলা (প্রশাসনিক বিচার বিভাগ)-সহ সমস্ত নাগরিক, বাণিজ্যিক এবং ফৌজদারি বিষয়ে বিচার করার অধিকার প্রয়োগ করার পরিধি এই আদালত রাখে। এ আদালত দুটি স্তরের হয়। প্রথম স্তরে ২৫০ দিনারের কম মামলার জন্য আপোস আদালত। যা পরবর্তীকালে ৭৫০ দিনার পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আর প্রাথমিক আদালতের মামলাগুলো এই পরিমাণ মূল্যের চেয়ে বেশি ছিল। প্রাথমিক স্তরের আদালতগুলোতে একজন বিচারক বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে আপিল বিভাগ। এটি তিনজন বিচারক নিয়ে গঠিত। তারপরে আসে রেফার আদালত। যা মূলত কোনো বিচারিক স্তর নয়; বরং বিচারিক রায়গুলোতে আইন প্রয়োগের ওপর নজরদারি করে। প্রশাসনিক হিসাবে এই বিচারের সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদা রয়েছে। এই আদালত বিচার বিভাগে এবং এ ক্ষেত্রে-এটি একজন প্রধান বিচারক এবং চারজন সাধারণ বিচারক নিয়ে গঠিত। এরপর সর্বোচ্চ আদালত স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হয়ে যায়। একজন বিচারক নিয়ে একটি স্বাধীন প্রশাসনিক আদালতে পরিণত হয়।[১১৫২]

খ. ধর্মীয় আদালত : এটা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমত : শারঈ আদালত। শারঈ আদালত সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয়ত : অন্যান্য সম্প্রদায়ের পরিষদ। (১৯৫২ সালের সংবিধানের ১০৪ নং ধারা।) ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর পরিষদ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। (১৯৫২ সালের সংবিধানের ১০৮ নং ধারা।)

[১১৫১] এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য নিযামুল কাদ্বায়িশ শারঈ, পৃ. ৬২ দেখুন।

[১১৫২] নিযামুল কাদ্বায়িশ শারঈ, পৃ. ৬২; আল-কাদ্বাউশ শারঈ আল-উরদুন্নি, পৃ. ৪৭; উসুসুত তাশরী, পৃ. ৮৮, ৯৭ এবং ১১৪

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক পরিষদের আইন জারি করা হয়। ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত ও পারিবারিক এবং সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াকফকৃত সম্পদের বিষয়ে তাদের পরিধি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। তবে কিছু আদালত থেকে এসব পরিধি বাদ দেওয়া হয়েছিল।

১৯৫৮ সালের ৪৬ নং রায় জারি করা হয়। যা-তে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর পরিসংখ্যান করা হয়েছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে : ১. গ্রিক অর্থোডক্স, ২. রোমান ক্যাথলিক, ৩. আর্মেনিয়ান, ৪. ল্যাটিন, ৫. আসকাফি আরব ইনজেলিয়া, ৬. মারোনিয়া, ৭. ইনজেলিয়া লুথেরান চার্চ, ৮. সিরিয়ান অর্থোডক্স এবং ৯. সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট।[১১৫৩]

গ. বিশেষ আদালত : এমন আদালতের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে : ১. রাজ্য নিরাপত্তা আদালত, ২. মার্শাল কোর্ট, ৩. সামরিক পরিষদ, ৪. পুলিশ আদালত, ৫. কাস্টমস, ৬. মন্ত্রীদের বিচারের জন্য সুপ্রিম কাউন্সিল তথা প্রশাসনিক আদালত, ৭. প্রধান প্রধান অপরাধ, ৮. প্রশাসনিক শাসক এবং ৯. রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি।[১১৫৪]

❁ শারঈ বিচার বিভাগ

শারঈ আদালতগুলো শারঈ বিচার বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করত। যাকে প্রধান বিচারপতি বিভাগ বলা হতো। এটি বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল না; বরং এটি ছিল মন্ত্রণালয়ের মতো একটি স্বাধীন বিভাগ। প্রধান বিচারপতি মন্ত্রীর মতো এই বিচার বিভাগের নেতৃত্বে থাকতেন।

প্রধান বিচারপতির বিভাগটি প্রধান বিচারপতি এবং প্রতিটি জেলার কিছু আদালত নিয়ে গঠিত। প্রধান বিচারপতির বিভাগে থাকত একজন প্রধান বিচারক এবং প্রত্যেক জেলায় কয়েকটি করে আদালত। প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ে তিনজন কর্মচারী এবং শারঈ আদালত থাকত। যার প্রত্যেকটিতে একজন বিচারক, একজন মুনশি, একজন আদালতের পেশকার এবং একজন ঘোষক ছিল।

পরবর্তী সময়ে প্রধান বিচারপতির বিভাগটিতে থাকতেন প্রধান বিচারপতি নিজে, শারঈ আদালতের পরিচালক, অডিট বোর্ড, শারঈ আদালতের প্রধান বিচারপতি, ইয়াতিম ফাউন্ডেশন এবং উইল বিভাগের পরিচালক। শারঈ আদালতের পরিচালক তার দায়িত্বের পাশাপাশি রাজধানীর মূল বিচারক ছিলেন।

[১১৫৩] নিযামুল কাদ্বায়িশ শারঈ, পৃ. ৬৫; আল-কাদ্বাউশ শারঈ আল-উরদুন্নি, পৃ. ৪৮; উসুসুত তাশরী, পৃ. ১২০

[১১৫৪] নিযামুল কাদ্বায়িশ শারঈ, পৃ. ৬৬; আল-কাদ্বাউশ শারঈ আল-উরদুন্নি, পৃ. ৪৯; উসুসুত তাশরী, পৃ. ১২৪

পরবর্তী প্রধান বিচারপতির বিভাগটি পঞ্চম দশকে স্থিতিশীল হয়ে আরও সম্প্রসারিত আকারে এবং নিম্নোক্ত বিভাগগুলো নিয়ে গঠিত হয়।

ক. প্রধান বিচারপতি : যাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা এবং একজন মন্ত্রীর বেতন-ভাতায় নিয়োগ দেয়া হতো। প্রধান বিচারপতির প্রধানমন্ত্রীর সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকত। একজন মন্ত্রীর ক্ষমতা তিনি রাখতেন। কিন্তু মন্ত্রীপরিষদের সাথে তিনি একত্র হতেন না। রাজ্যে শারঈ বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করলেও বিচারকের ক্ষমতা তার হাতে থাকত না। তারপর ছিল বেসামরিক আদালতের আইনমন্ত্রীর সমপর্যায়ের পদ। মন্ত্রীদের সাথে সম্পৃক্ত প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজ যিনি পরিচালনা করতেন। তার দায়িত্ব ছিল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। বিচার বিভাগের দায়িত্ব তার ছিল না।

যেসব ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির পরিধি ছিল, সেগুলো হচ্ছে :

☑ ১. রাজকীয় উইল জারি করার জন্য বিচারিক পরিষদের সিদ্ধান্ত জমা দেওয়া।

☑ ২. প্রয়োজনে বিচারকদের ডাকা।

☑ ৩. জুডিশিয়াল কাউন্সিল আহ্বান করা।

☑ ৪. জুডিশিয়াল কাউন্সিলে বিচারকদের পক্ষ থেকে পদত্যাগের অনুরোধ জমা দেওয়া।

☑ ৫. সমস্ত শারঈ আদালত এবং তাদের বিচারকদের তত্ত্বাবধান করা। এ ক্ষেত্রে শারঈ পরিচালক এবং শারঈ আদালতের পরিদর্শক তাকে সহায়তা করত।

☑ ৬. বিচারকদের সতর্ক করা।

☑ ৭. শারঈ কর্মকর্তাদের কাজের বিষয়ে নির্দেশনা জারি করা এবং তাদের নিয়োগ অনুমোদন করা।

☑ ৮. শারঈ আইনজীবীদের সার্টিফিকেট প্রদান মঞ্জুর করা, এবং আদালতের রেজিস্টার খাতায় তাদের রেজিস্ট্রেশন করে রাখা।

☑ ৯. ১৯৫৫ সালের ২ নং ধারায় বিচারিক ক্ষমতার একটি ব্যবস্থাপনা জারি করা হয়েছিল। ২১শে এপ্রিল ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এ ধারা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি কাজ শুরু করেন।[১১৫৫]

খ. শারঈ পরিচালক : প্রধান বিচারপতির পরেই ছিল তার পদ। তিনিই প্রথম শারঈ বিচারকের অবস্থানে থাকতেন। কিন্তু মৌলিকভাবে তিনি হতেন একজন বিচারক। শারঈ আদালতের সাথে সম্পৃক্ত প্রশাসনিক দায়িত্বগুলো তিনি পালন

[১১৫৫] নিযামুল কাদ্বায়িল উরদুন্নি, পৃ. ৮০; আল-কাদ্বাউশ শারঈ আল-উরদুন্নি, পৃ. ৬৩; উসুসুত তাশরী, পৃ. ১১৪

করতেন।

গ. শারঈ আদালতের পরিদর্শক : তিনি মৌলিকভাবে একজন বিচারক হতেন। আদালতগুলো পরিদর্শন করার সাথে সাথে আদালত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য আদালতের রেজিস্টার খাতা থেকে সংগ্রহ করতেন।

ঘ. শারঈ আপিল আদালতের চেয়ারম্যান : এই আদালতটি ছিল রেফার কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের মতো।

ঙ. আপিল আদালতের সদস্য : একজন চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন সদস্য নিয়ে শারঈ আপিল আদালত গঠিত হতো। এই আদালতের বৈঠক শুরু হতো একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের মাধ্যমে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অকাট্যভাবে আদালতের সিদ্ধান্ত এবং রায়গুলো জারি করা হতো। (শারঈ আদালত গঠন আইনের সংশোধিত ২১ নং ধারা।)

প্রাথমিক শারঈ আদালতের পক্ষ থেকে উত্থাপিত মামলাগুলো পরিচালনার জন্য এই আদালত ছিল সর্বোচ্চ আদালতের পর্যায়ে। যেমনটা এই আদালতে উল্লেখিত ১৯৭৭ সালের ২০ নং ধারায় এবং ১৩৫-১৫২ নং ধারায়, ১৯৫৯ সালের ৩১ নং ধারায় আপিল আদালতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাথে জারি করা হয়েছে।[১১৫৬] শারঈ মামলা পদ্ধতির আইনের ধারায় আপিল মামলা শুনানির পদ্ধতির স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আপিল আদালত ছিল দুটি। একটি ওমানে, আরেকটি আল-কুদসে। প্রয়োজনের সময় তৃতীয় কোনো আদালত গঠন করার অধিকার মন্ত্রীপরিষদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

চ. শারঈ আদালত : প্রয়োজন অনুপাতে কখনো কখনো একই আদালতে একাধিক বিচারক থাকতেন। প্রত্যেক বিচারক স্বাধীনভাবে তার মামলা শুনানি করতেন। ব্যক্তিগত মোকদ্দমা, ওয়াকফকৃত সম্পদ এবং মুক্তিপণের ক্ষেত্রে ছিল শারঈ আদালতের পরিধি। এটা সবিস্তারে সামনে বর্ণনা করা হবে।[১১৫৭] শারঈ বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত ছিল, শারঈ বিচারকের অবশ্যই শারঈ বিচারের সনদ বা শারঈ অনুষদ এবং আইনে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রশাসনিক অনুমোদনে এবং শারঈ বিচার বিভাগের কাউন্সিল কর্তৃক তাকে নিয়োগ দেওয়া হতো।

ছ. ব্যুরো : এটি একজন প্রধান, একজন সচিব, একজন আর্থিক পরিচালক এবং একজন নথি-মুনশি নিয়ে গঠিত।[১১৫৮]

[১১৫৬] আল-কারারাতুল কাদ্বইয়্যাহ ফী উসূলিল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ,পৃ. ৩৩৯ এবং ৩৮০; নিযামুল কাদ্বায়িল উরদুন্নি, পৃ. ৬৫ এবং ১৬৫; উসুসুত তাশরী, পৃ. ১১৯

[১১৫৭] নিযামুল কাদ্বায়িল উরদুন্নি, পৃ. ৬৪; আল-কাদ্বাউশ শারঈ আল-উরদুন্নি, পৃ. ৬৪

[১১৫৮] আল-কাদ্বাউশ শারঈ আল-উরদুন্নি, পৃ. ৫১

❁ শারঈ আদালত গঠন

জর্ডানে ১৯৭২ সালের ১৯ নং ধারায় শারঈ আদালত গঠন আইন জারি হয়। এরপর ১৯৭৩ সালের ১৮ নং আইন, ১৯৭৯ সালের ৮ নং আইন, ১৯৮৯ সালের ২৫ নং আইন এবং ১৯৮৩ সালের ২৫ নং আইনে শারঈ আদালত গঠন আইনের প্রয়োজনীয় সংযোজন এবং সংশোধনী জারি করা হয়।

শারঈ আদালত গঠন এবং এর সংশোধনী সংক্রান্ত আইনের ২ নং ধারাটি শারঈ বিচারক কারা হবে—এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। তারা হলেন :

☑ ১. প্রাথমিক শারঈ আদালতের বিচারক

☑ ২. শারঈ আপিল আদালতের প্রধান আর সদস্য

☑ ৩. শারঈ আদালতের পরিদর্শক

☑ ৪. শারঈ আদালতের মহাপরিচালক

☑ ৫. প্রধান বিচারপতির জন্য বিচার বিভাগের উপদেষ্টা[১১৫৯]

১৪ নং ধারা অনুযায়ী গঠিত শারঈ আদালত আইন উল্লেখ করেছে যে, নিম্নোক্ত পদগুলোর সমন্বয়ে শারঈ বিচার কাউন্সিল গঠন করা হবে। যথা :

☑ ১. শারঈ আপিল আদালতের প্রধান

☑ ২. শারঈ পরিচালক

☑ ৩. শারঈ আপিল আদালতের বিচারক দুজনের মাঝে যিনি সবচেয়ে প্রবীণ

☑ ৪. শারঈ আদালতের পরিদর্শক

এই পরিষদ ছিল আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন আদালতের ক্ষেত্রে দেওয়ানি বিচারক নিয়োগ দেওয়ার জন্য বিশেষ বিচারিক পরিষদের মতোই। বিচারিক প্রতিযোগিতায় অগ্রগামীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে শারঈ বিচার বিভাগ পরিষদ নির্বাচন করত। তারপর নিয়োগের ক্ষেত্রে মহামান্য রাজকীয় প্রশাসনের অনুমোদন জারি করার জন্য প্রধান বিচারকের কাছে এসব অগ্রগামীর নাম পেশ করা হতো।

❁ শারঈ আদালতের পরিধি

১৯৫২ সালে জর্ডানের সংবিধানের ১০৬ নং ধারায় এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, যে-কয়েকটি বিষয়ে শারঈ আদালতের বিশেষ আইন অনুযায়ী শারঈ আদালতের বিচারকার্য পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে—সেগুলো হচ্ছে :

☑ ১. মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়ে

[১১৫৯] নিযামুল কাদ্বায়িল উরদুন্নি, পৃ. ৭১

- ☑ ২. মুসলিমদের মাঝে রক্তপণের বিষয়ে। যদি দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষ মুসলিম হয় আর দুই পক্ষই শারঈ আদালত মেনে নেয়।
- ☑ ৩. ওয়াকফকৃত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত মামলার ক্ষেত্রে।

এরপর ১৯৫৯ সালের ৩১ নং আইন আসে। সেটা হলো শারঈ মামলা পদ্ধতি আইন। এর ২ নং ধারায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার বিষয় ছিল শারঈ আদালতের পরিধি। এই আলোচনার মধ্যে উল্লেখ ছিল যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শারঈ আদালত দেখাশোনা করবে।

- ☑ ১. ওয়াকফ করা, মুসলিমদের দ্বারা এর বাস্তবায়ন করা, এর শর্ত, এর ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেয়া, পরিবর্তন, ব্যবস্থাপনা এবং স্থানান্তর।
- ☑ ২. দুই ওয়াকফের মাঝে বিরোধ, এবং ওয়াকফের বৈধতা-সংক্রান্ত মামলা।
- ☑ ৩. শারঈ দলিলভিত্তিক উইলের সম্পত্তি এবং ইয়াতিমদের সম্পত্তির ঋণ তহবিল।
- ☑ ৪. অভিভাবকত্ব, ওসিয়ত এবং উত্তরাধিকার।
- ☑ ৫. নিষেধাজ্ঞা, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষী।
- ☑ ৬. পরিচালক ও ওসি নিয়োগ এবং তাদের বরখাস্ত করা।
- ☑ ৭. নিখোঁজ ব্যক্তি।
- ☑ ৮. বিবাহ-শাদি, বিবাহ বিচ্ছেদ, মোহর, যৌতুক, মোহর হিসেবে যা পরিশোধ করা হয়, ভরণপোষণ, বংশ এবং লালনপালন।
- ☑ ৯. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঘটে যাওয়া বিষয় এবং যার মূল কারণ হয় বিবাহের সময়ের চুক্তি।
- ☑ ১০. উত্তরাধিকার সম্পত্তি লিখে রাখা, উত্তরাধিকার স্থাবর সম্পত্তির দাবি ও তার মীমাংসা করা।
- ☑ ১১. দুপক্ষ মুসলিম হলে মুক্তিপণের দাবি। অনুরূপভাবে দুই পক্ষের এক পক্ষ যদি অমুসলিম হয় আর তারা এ ব্যাপারে সম্মতি দেয়, যে ব্যাপারে শারঈ আদালত বিচার করতে পারবে।
- ☑ ১২. স্থাবর সম্পত্তি এবং অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সম্পত্তির সকল বিনিয়োগ।
- ☑ ১৩. মৃত্যুশয্যায় দান এবং ওসিয়ত।
- ☑ ১৪. অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক এবং পরিচালককে অনুমোদন দেয়া, তাদের জবাবদিহির মুখোমুখি করা এবং এই জবাবদিহি অনুসারে ফয়সালা করা।

☑ ১৫. শারঈ আদালতের কাছে রেকর্ডকৃত উইল সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা। যদি ওয়াকফকারী অমুসলিম হয় এবং দুপক্ষ এ ব্যাপারে সম্মতি দেয়।

☑ ১৬. মুসলিমদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সকল বিষয়।

☑ ১৭. শারঈ আদালতের কাছে অথবা শারঈ আদালত সমর্থিত অন্য কোনো আদালতের কাছে রেজিস্ট্রেশন করা বৈবাহিক সকল চুক্তি।[১১৬০]

❁ শারঈ বিচারব্যবস্থার রায়ের উৎস

১৯৫২ সালের জর্ডানের সংবিধানের ১০৬ নং ধারায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শারঈ আদালত দ্বীনের সঠিক বিধান বাস্তবায়ন করবে। পাশাপাশি নিম্নোক্ত আইনগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারেও শারঈ আদালত দায়িত্বশীল।

১. শারঈ মামলা-নীতির আইন। (১৯৬৯ সালের ৩১ নং আইন।)

২. সাময়িক ব্যক্তিগত আইন। (১৯৭৬ সালের ৬১ নং আইন।)

৩. জর্ডানের অস্থায়ী দেওয়ানি আইন। (১৯৭৬ সালের ৪৩ নং আইন।)

৪. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ বা লেনদেন ও নাগরিকত্ব আইন। যা ১২৯৩ হিজরিতে উসমানি সালতানাতে জারি করা হয়েছিল। জর্ডানের নাগরিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক মাজাল্লার আইনকে বিলুপ্ত করার নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। শপথ এবং প্রমাণের মতো অন্যান্য আইনগুলো মাজাল্লা অনুসারে পরিচালিত হতো।

❁ শারঈ বিচারকদের সহকারী

শারঈ বিচারকদের সাথে বেশ কয়েকজন সহকারী নিয়োগ করা হয়। যাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে: ১. মুনশি, ২. পেশকার, ৩. দোভাষী, ৪. বিশেষজ্ঞ, ৫. শারঈ আইনজীবী এবং ৬. ঘোষক।

ফিলিস্তিনে আদালত গঠন

পরিশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময় ১৯৩৪ সালের আদালত আইন অনুযায়ী ফিলিস্তিনে আদালত গঠনের কথা উল্লেখ করা হবে। সেগুলো হচ্ছে: ১. সুপ্রিম কোর্ট, ২. ফৌজদারি আদালত, ৩. কেন্দ্রীয় আদালত, ৪. ভূমি আদালত, ৫. আপোস আদালত, ৬. উপজাতীয় আদালত, ৭. শারঈ আদালত, ৮. খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের আদালত, ৯. ইহুদি ধর্মযাজকদের আদালত, ১০. বিশেষ আদালত এবং

[১১৬০] আল-কারারাতুল কাদ্বাইয়্যাহ ফী উসূলিল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ,পৃ. ৩৪০; আল-কাদ্বাউশ শারঈ আল-উরদুন্নি, পৃ. ৬৪; উসুসুত তাশরী, পৃ. ১১৬

১১. প্রাদেশিক আদালত।

আদালতে ব্রিটিশ বিচারকরা থাকত। সুপ্রিম কোর্টের পরিচালক ছিল প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রথম বিচারক তার প্রতিনিধিত্ব করত। এটা তখন হতো, যখন আইন-সংক্রান্ত উচ্চ আদালত বসত। আর ফৌজদারি আপিল আদালত বসলে সেটা হতো তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে। তিনজনের মধ্য থেকে দুজন থাকত ব্রিটিশ বিচারক। ফিলিস্তিনে শারঈ আদালত ছিল প্রাথমিক আদালত এবং আপিল আদালত। অর্থাৎ রেফার আদালতের মতো উচ্চ আদালত। ফিলিস্তিন আজও শারঈ আইন এবং মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ-এর নীতি বাস্তবায়ন করে আসছে।[১১৬১]

সৌদি আরবে শারঈ বিচারব্যবস্থা

নাজদ এবং রিয়াদে বাদশাহ আবদুল আজিজ আধিপত্য বিস্তার করার পর এই অঞ্চলগুলোতে উসমানি শাসনের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। তখন প্রতিষ্ঠিত হয় 'সৌদি আরব রাজ্য'। এরপর রাষ্ট্র বিস্তার হতে হতে হিজাজ-সহ আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এর আগে সমস্ত অঞ্চলের বিচারব্যবস্থা তিন ধরনে বিভক্ত ছিল।

- ☑ **প্রথম** ধরনটি ছিল হিজাজে। এখানকার বিচারব্যবস্থা হিজাজের অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক উন্নত এবং আধুনিক ছিল। কেননা হিজাজ উসমানি সাম্রাজ্যের চালু করা দেওয়ানি বিচারব্যবস্থার সংশোধনীগুলোর পাশাপাশি ইসলামি শরীয়ত বাস্তবায়ন করে আসছিল। বিশেষত ১৮৩৯, ১৮৫৬ এবং ১৮৭৬ সালের সংশোধনী আইন উল্লেখযোগ্য। এসব নতুন ব্যবস্থাপনা হিজাজের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। কিন্তু বৃহৎ আরব বিদ্রোহের পর শরিফ হুসাইন এসকল নতুন নতুন ব্যবস্থাপনা বিলুপ্ত করে দেন। এরপর আদালত শুধু শারঈ ব্যবস্থাপনার ওপরে বাকি থাকে। মক্কায় একটি বৃহৎ এবং প্রধানতম আদালত ছিল। যা-তে একজন প্রধান বিচারক এবং তিনজন প্রতিনিধি ছিলেন। তারা ছিলেন আদালতের সদস্য পর্যায়ের। এদের প্রত্যেকে ইসলামের প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর কোনো একটি মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করতেন। প্রত্যেক বিচারকের কাছে ওসিয়ত এবং বিবাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন মামলা উত্থাপন করা হতো।
- ☑ **দ্বিতীয়** ধরন হলো নাজদের বিচারব্যবস্থা। এই বিচারব্যবস্থায় বিচার-সংক্রান্ত সংশোধনীর কোনো প্রভাব ছিল না। প্রচলিত রীতিনীতি, ইসলামি শরীয়ত

[১১৬১] নিযামুল কাদায়িশ শারঈ, পৃ. ৫৮

অনুযায়ী বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারী বিচারব্যবস্থা অনুসারে এই অঞ্চলের বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছিল। বিচারব্যবস্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করত বিচারক এবং আমির। আমির প্রথমে চেষ্টা করতেন দুই পক্ষের মাঝে সমঝোতা করে দিতে। দুই পক্ষের মাঝে সমঝোতা না হলে বিচারকের কাছে মামলা রেফার করে দিতেন। বিচারক রায় জারি করার সময় রায় বাস্তবায়নের জন্য সেটা আমিরের কাছে পেশ করতেন। বিচারের এখানে মৌলিক উৎস ছিল আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ। বিচারের উৎসকে 'আশ-শারউ' তথা বিচার পরিষদ বলা হতো।

☑ **তৃতীয়** ধরন তথা গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। বিভিন্ন গোত্র এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করত। এ ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি ছিল প্রচলিত রীতিনীতি এবং পূর্বসূরিদের বিচারাচার। সর্বজনস্বীকৃত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবং প্রজ্ঞার অধিকারীরা এই বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। গোত্রের রীতিনীতি সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা থাকত। দুই গোত্রের মাঝে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তারা সালিশের আশ্রয় নিতেন।

১৩৪৩ সালে হিজাজ নাজদের অধীনস্থ এলাকাগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং 'সৌদি আরব রাজ্য' ঘোষিত হয়। আদালত ও বিচার বিভাগে আগের অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। উসমানি সালতানাতের ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে যেমনটি ২৭/১২/১৩৪৫ হিজরির ১১৬৬ নং স্পষ্ট পাবলিক প্রসিকিউশনে এসেছে। এরপর ধীরে ধীরে আরব রাজ্যের সকল প্রান্তে একই পদ্ধতিতে বিচারব্যবস্থা চালু হয় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা একীভূত করা হয়।

❁ বিচারের আইনি ব্যবস্থাপনা

১৩৪৬ হিজরিতে স্বাধীনতার পর সৌদিতে বিচারে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়। ১৩৪৬ হিজরির সফর মাসের ৪ তারিখ মোতাবেক ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে শারঈ আদালত এবং তার গঠনপ্রণালি সংক্রান্ত রাজকীয় ফরমান জারি করা হয়। আর এটা 'শারঈ আদালত গঠন নীতি' নামে ২৪ নং ধারায় এসেছে। এর পরপর সম্পন্ন হয় আদালত ব্যবস্থাপনা, আদালতের বিন্যাস এবং আদালতের পরিধি নির্ধারণ।[১১৬২] তারপর ১৩৫৭ হিজরির মুহাররম মাসের ৪ তারিখে রাজকীয় নির্দেশে শারঈ বিচার বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্ব প্রণয়নের নীতি প্রকাশিত হয়। এই ব্যবস্থা ছিল ২৮২টি ধারা এবং ৮টি অধ্যায় সংবলিত। আরব রাজ্যের ইতিহাসে বিচার বিভাগের এটাই

[১১৬২] সৌদি আরব 'কানুন' তথা আইন শব্দের পরিবর্তে 'নিযাম' তথা পদ্ধতি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। এ সংক্রান্ত আলোচনা পড়তে আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ১১১-১১৪ দেখুন।

ছিল সবচেয়ে বৃহৎ ব্যবস্থাপনা।[১১৬৩]

এরপর ১৯/৮/১৩৬৪ হিজরিতে 'নিযামু কিতাবিল আদল' নামে আরেকটি ব্যবস্থাপনা জারি করা হয়। ১৩৭২ হিজরিতে 'নিযামু তারকীযি মাসউলিয়্যাতিল কাদ্বায়িশ শারঈ' নামে আরেকটি ব্যবস্থাপনা জারি করা হয়। আগের মতো এতেও ৮টি অধ্যায় এবং ২৫৮টি ধারা ছিল। তুলনামূলকভাবে এ ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কার্যকরী ব্যবস্থাপনা হিসেবে চলে আসছে।[১১৬৪]

সর্বশেষ ১৩৯৫ হিজরিতে ২০২টি ধারা সংবলিত 'নিযামুল কাদ্বা' নামে একটি ব্যবস্থাপনা জারি করা হয়। যা অনুসারে আজও পরিচালনা করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থাপনাটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১৪/১০/১৩৯৫ হিজরিতে ৭২ নং ধারা অনুসারে এ ব্যবস্থাপনাকে তিনটি ধারায় সংশোধন করা হয়। ধারাগুলো এই : ১. বিচারের সর্বোচ্চ পরিষদ গঠন, ২. বিচার বিভাগীয় কর্পস এবং ৩. বিচারের সর্বোচ্চ পরিষদ প্রধানের পদমর্যাদা। তারপর ১/৩/১৪০১ হিজরিতে ৪ নং ধারা অনুসারে আরেকটি সংশোধনী জারি করা হয়।[১১৬৫]

রাজ্যে আবেদন এবং মামলা নীতির ব্যবস্থাপনাও জারি করা হয়। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৪৬ হিজরিতে প্রথমবারের মতো এই ব্যবস্থাপনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৫০ হিজরিতে 'নিযামু সায়রিল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ' তথা শারঈ মামলা পরিচালনা নীতি নতুনভাবে জারি করা হয়। তারপর ১৯৩৮ সালে আবার সংশোধনী করা হয়। তারপর ১৩৫৫ হিজরিতে 'নিযামুল মুরাফাআতিশ শারইয়্যাহ' নামে আরেকটি ব্যবস্থাপনা জারি করা হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৭২ হিজরিতে 'তানযীমুল আমালিল ইদারিয়্যাহ ফিদ দাওয়াইরিশ শারইয়্যাহ' নামক ব্যবস্থাপনাটি জারি করা হয়। পরবর্তীকালে ১২/১/১৩৮৭ হিজরিতে বিচারকদের অসংলগ্নতা এবং তাদের পদমর্যাদা স্পষ্ট করে একটি রাজকীয় ফরমান জারি হয়।[১১৬৬]

বিচারব্যবস্থার প্রথম ধারায় এ-কথা উল্লেখ করা হয় যে, বিচারকরা স্বাধীন। ইসলামি শরীয়ত-সহ অন্যান্য বিচারের ক্ষেত্রে তাদের ওপর কোনো কর্তৃত্ব চলবে না। তাদের পরিচালিত বিচারকার্যের ক্ষেত্রে কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ

সৌদি আরবের বিচারব্যবস্থা প্রধান তিনটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। এ বিভাগ

[১১৬৩] আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ১১৫

[১১৬৪] আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ১১৫

[১১৬৫] আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ১১৬

[১১৬৬] আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ১৭৩

তিনটি একটি থেকে আরেকটি স্বতন্ত্র। সেগুলো এই :

১. শারঈ বিচারব্যবস্থা এবং শারঈ আদালত : শারঈ আদালত মূলত বিচারব্যবস্থার অনুগত। এটা ছিল মৌলিক বিচারব্যবস্থা। যার সাধারণ পরিধি ছিল বিভিন্ন বিরোধ এবং অপরাধের ক্ষেত্রে। এই বিচার বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগগুলোকে আলাদা মনে করা হয়। শারঈ বিচারব্যবস্থা আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলত। আরও কিছু আধা বিচারিক সংস্থা আইন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

২. দুর্নীতি বিভাগ : এটি একটি স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ। এই বিভাগের সম্পর্ক সরাসরি বাদশাহর সাথে। এ বিভাগের সর্বশেষ ক্ষমতা বাদশাহর জন্য সংরক্ষিত। (ধারা নং : ১।) বাদশাহ এ বিভাগকে বিশেষ ক্ষমতা এবং পরিধি দিয়েছেন। এ বিভাগে তিনটি প্রধান কমিটি আছে। যথা : ক. তদন্ত কমিটি, খ. উপদেষ্টা কমিটি এবং গ. অডিট কমিটি। ১/১১/১৩৭৯ হিজরির ৩৫৭০/১ নং ধারায় দুর্নীতি বিভাগের প্রধান একটি সিদ্ধান্ত জারি করা হয়। এ সিদ্ধান্তে দুর্নীতি বিভাগের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।[১১৬৭]

তুলনামূলকভাবে দুর্নীতি দমন বিভাগের ব্যাপক ক্ষমতা ছিল। এ বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অথবা রাষ্ট্রীয় অন্য কোনো বিভাগ থেকে এই বিভাগে রেফার করা সকল মামলা পরিচালনার অধিকার এই বিভাগের ছিল। যেসব বিরোধের ক্ষেত্রে প্রশাসন একটি পক্ষ হতো, সেসব বিরোধ মীমাংসা করার ব্যাপক পরিধি এই আদালতের থাকত। শৃঙ্খলামূলক বা সতর্কতামূলক মামলা-কর্মীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে নিয়ন্ত্রণ ও তদন্ত কমিশনের পক্ষ থেকে যে সকল মামলা উত্থাপন করা হতো, সেসব মামলার নিষ্পত্তি এই বিভাগ করত। কিছু কিছু ফৌজদারি মামলা যেমন জালিয়াতি অপরাধ, ঘুস লেনদেন, জনসাধারণের তহবিল পরিচালনার অপরাধ এবং অন্যান্য অপরাধের মামলা পরিচালনাও এ বিভাগ করত। এ বিভাগটি ভিনদেশি রায় বাস্তবায়নের অনুরোধ, প্রাদেশিক ব্যবস্থা লঙ্ঘনের মামলা, এবং অন্যান্য বিষয় যেগুলো এই বিভাগের মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত, বা রাজকীয় ফরমান, মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত এবং রাজকীয় আদেশে নির্ধারিত থাকত। বিশদ অধ্যয়নের তুলনায় এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এখানে যথেষ্ট।[১১৬৮]

স্বাধীন বিচার বিভাগের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান

এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিচার সংশ্লিষ্ট এবং প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান। এগুলো বিচারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। প্রতিষ্ঠানগুলোর বিচারের বিভিন্ন পরিধি থাকলেও

[১১৬৭] আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ১২০
[১১৬৮] আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ১২৩

এগুলো আইন মন্ত্রণালয় থেকে ভিন্ন। বিভিন্ন বিচার-সংক্রান্ত আদালত থেকে এগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন। এ ধরনের অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছে: ১. মন্ত্রীদের বিচার বিভাগ, ২. বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি সংস্থা, ৩. বাণিজ্যিক প্রতারণা প্রতিরক্ষা কমিটি, ৪. বাণিজ্যিক সংস্থা আইনে নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করার জন্য বিশেষ সংস্থা, ৫. বাণিজ্যিক কাগজপত্র কমিটি, ৬. মান এবং পরিমাণ লঙ্ঘন পর্যালোচনা করার জন্য দায়বদ্ধ কমিটি, ৭. রসদ জোগানোর জন্য বিচার বিভাগীয় কমিটি, ৮. বাণিজ্যিক আদালত, ৯. চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ১০. ওয়ার্ক কমিটি এবং শ্রমিকদের বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি, ১১. সামরিক বাহিনীর জন্য শৃঙ্খলা পরিষদ, ১২. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর শৃঙ্খলা পরিষদ এবং ১৩. প্রশাসনিক আদালত হিসেবে কাস্টমস কমিটি।

এই স্বাধীন বা অর্ধ-বিচারিক সংস্থাগুলো একাধিক মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত ছিল। বিশেষ প্রক্রিয়ার অধীনে থাকত সংস্থাগুলো। এই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবস্থাপনা এর নীতিগুলো বাস্তবায়ন করত। এসব সংস্থা শারঈ বিচারক এবং শারঈ আদালতের বোঝা লাঘব করে দিত। তবে এই বিভাগ বিচারিক স্থিতিশীলতা উপভোগ করতে পারে না। কেননা মূলত এই আদালত প্রয়োজনের সময় গঠিত হতো। বা যারা এই বিচার বিভাগের পূর্ণ-সময়ের সদস্য নয়, তাদের নিয়ে গঠিত হতো এই বিভাগ। যা শারঈ আদালতের কর্তৃত্ব দুর্বল করে দিত। বিচার মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বও দুর্বল করে দিত। আবার বিশেষ ব্যবস্থাপনা এবং বিধি প্রয়োগের পথও খুলে দিত। তবে সাধারণ শরীয়ত বাস্তবায়ন করত না।[১১৬৯]

বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলোর বহুবিধতা একটি অবাঞ্ছিত বিষয়। যা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাই আদালত এবং বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলোকে একটি সংস্থায় একীভূত করতে ৩/২১/১৩৯৮ হিজরিতে মন্ত্রীসভার ২৩৬ নং রেজোলিউশন জারি করা হয়। যাতে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এরপর ১৪/৯/১৪০১ হিজরিতে মন্ত্রীসভার ১৭৬ নং রেজোলিউশন জারি করা হয়। যাতে আদালত গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেই আদালতগুলো হবে আইন মন্ত্রণালয়ের অনুগত। আদালতগুলোর দায়িত্ব হলো শাসকের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দেশনাবলি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা অনুসারে বিভিন্ন ট্রাফিক মামলা, বাণিজ্যিক বিরোধ এবং শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা। যেগুলো কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমার দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বিভিন্ন শারঈ আদালতে কর্মরত বিচারকদের মধ্য থেকে এই আদালতগুলোতে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো। রিয়াদ এবং মক্কা মুকাররমায় দুই রেফার আদালতের মধ্যে বিশেষ দুটি বিভাগ রাখা হয় বাণিজ্যিক আদালত, শ্রমিক আদালত এবং ট্রাফিক আদালতের পক্ষ থেকে

[১১৬৯] আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ১১৭

জারি করা রায়গুলো রেফার করার জন্য। এ ব্যবস্থাপনা উচ্চতর বিচার বিভাগের ইনস্টিটিউট এবং শারঈ কলেজগুলোতে পড়ানো হবে—এই শর্তে দুটি বিভাগকে বিশেষভাবে রাখা হয়। এসব ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশাসনিক নিয়ম এবং বিচারিক ও প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়।[১১৭০]

শারঈ আদালত

নতুন বিচারব্যবস্থা চার ধরনের আদালত (৫ নং ধারা) নিয়ে শারঈ আদালত সাজিয়েছে।

১. বিচারের সর্বোচ্চ পরিষদ : এই পরিষদটি ১১জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই পরিষদটি মামলা যাচাই-বাছাই করার পাশাপাশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর, অঙ্গচ্ছেদ বা রজম বিষয়ে জারি করা রায়গুলো পর্যালোচনা করে থাকে।

২. রেফার আদালত : এই আদালত তিনটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান বা তার প্রতিনিধি এটা পরিচালনা করে। বিভাগ তিনটি হচ্ছে : (ক) ফৌজদারি মামলার শুনানি বিভাগ, (খ) ব্যক্তিগত মামলা শুনানি বিভাগ এবং (গ) অন্যান্য মামলা শুনানি বিভাগ। ১০ নং ধারা অনুসারে রেফার আদালতে প্রয়োজনের সময় একাধিক বিচারক থাকতে পারে। তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে বিচারের সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশ করা হয়। তবে মৃত্যুদণ্ড, হাত কাটা এবং রজমের ক্ষেত্রে ৫জন বিচারকের সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত জারি করা হয়। সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তগুলো জারি করা হয়। (ধারা নং : ১৩।)

৩. সাধারণ আদালত : এই আদালত এক বা একাধিক বিচারক নিয়ে গঠিত। আদালতের মধ্যে একজন বিচারকের পক্ষ থেকে রায় জারি করা হয়। তবে হত্যা, রজম এবং হাত কাটার মামলার ক্ষেত্রে তিনজন বিচারকের পক্ষ থেকে রায় জারি করা হয়। (ধারা নং : ২৩।)

৪. আংশিক আদালত : এ আদালত এক বা একাধিক বিচারক নিয়ে গঠিত। একজন বিচারকের পক্ষ থেকে আদালতের রায়গুলো প্রকাশ করা হয়। (ধারা নং : ২৪-১৫।)

নতুন বিচারব্যবস্থা এই আদালতের প্রতিটির ধরনের পরিধি নির্ধারণ করে দেয়নি। বিচারের সর্বোচ্চ পরিষদের প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে আইনমন্ত্রী কর্তৃক সিদ্ধান্ত জারির ওপর পরিধি নির্ধারণের বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২০/১/১৩৯৭ হিজরিতে মামলা দায়ের ব্যবস্থা, ফৌজদারি পদ্ধতি এবং আইনমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এ আদালতের পরিধি নির্ধারণ করা হয়।[১১৭১] (ধারা নং : ১২-১৩।)

[১১৭০] আলে শাইখ, আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ২৩-২৪

[১১৭১] আল শাইখ, আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ৫৫ এবং ৫৭

বিচারব্যবস্থা সাধারণভাবে শারঈ আদালতের পরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটাও নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, শারঈ আদালত সকল বিরোধ এবং সকল অপরাধের বিচার করবে। তবে বিচার বিভাগ যে সমস্ত বিচারকে পৃথক করবে, সেগুলো করতে পারবে না। বিচারের সর্বোচ্চ পরিষদের প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে রাজকীয় আদেশে বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করা যাবে। শারঈ আদালত সাধারণ পরিধির অধিকারী। এ ছাড়া অন্যান্য আদালতগুলোকে ব্যতিক্রমধর্মী বিচার বিভাগ মনে করা হয়। যেমন অপ্রাপ্তবয়স্কদের মামলা-সংক্রান্ত আদালত, বিবাহ এবং জরিমানা সংক্রান্ত আদালত।[১১৭২]

বিচারক হিসেবে নিয়োগের শর্ত হলো প্রার্থীকে অবশ্যই সৌদি রাজ্যের কোনো শারঈ অনুষদ থেকে সনদ অর্জন করতে হবে। বিচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। জরুরি অবস্থায় কাঙ্ক্ষিত সনদ অর্জন ছাড়াও ইলমে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কাউকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে।[১১৭৩] (ধারা নং: ৩৭)।

শারঈ আদালত নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসরণ না করে সরাসরি কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে গৃহীত শারঈ বিধান আঁকড়ে ধরার ওপর নির্ভরশীল। ৭/১/১৩৪৭ হিজরির ৩ নং ধারায় বিচার সংস্থার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয় এবং ২৪/৩/১৩৪৭ হিজরিতে সৌদি উচ্চ প্রশাসনের সমর্থনে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সকল আদালতের মধ্যে বিচারের রায় যেন হাম্বলি মাযহাবের মুফতির ওপর ভিত্তি করে হয়। তবে জনস্বার্থে অন্যান্য মাযহাবের মতামতও গ্রহণ করা যাবে। ফসলের জমি, স্থাবর সম্পত্তি এবং ওয়াকফের বিরোধের ক্ষেত্রে ওই জায়গায় প্রচলিত মাযহাব অনুসারে বিচার করা হবে।[১১৭৪]

বিভিন্ন আরব দেশে শারঈ বিচারব্যবস্থা

ইতিপূর্বে সিরিয়া, মিশর, ইরাক এবং সৌদি আরবের মতো কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের আধুনিককালের শারঈ বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা করা হয়েছে। আলোচিত এসব রাষ্ট্র হচ্ছে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত। ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাকৃত এই বিচারব্যবস্থার পরিষদ থেকে অপরাপর আরব রাষ্ট্রের অবস্থায় ভিন্নতা নেই। এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কয়েকটি রাষ্ট্র তো শারঈ বিচারব্যবস্থা একেবারেই বিলুপ্ত করে দিয়েছে। যেমন, মিশর-সহ আরও কিছু রাষ্ট্র। আবার সিরিয়া এবং ইরাকের মতো কিছু রাষ্ট্র শারঈ বিচারব্যবস্থাকে সাধারণ বিচারব্যবস্থার

[১১৭২] আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ১৫৬; আল শাইখ, আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ৪৩ এবং ৪৯
[১১৭৩] আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ১৬১
[১১৭৪] আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ, পৃ. ১৭০

অধীনে রেখে দিয়েছে। এসব রাষ্ট্রের অর্ধ-স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। জর্ডানের মতো কোনো কোনো রাষ্ট্র শারঈ বিচারব্যবস্থাকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র বিচারব্যবস্থা হিসেবে এবং দেওয়ানি বিচারব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে রেখেছে। আবার সৌদির মতো রাষ্ট্র শারঈ বিচারব্যবস্থাকে মৌলিক, ভিত্তিমূলক এবং সাধারণ ক্ষমতার অধিকারী একটি ব্যবস্থাপনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেই বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি আধা বিচারিক এবং স্বতন্ত্র আদালত রয়েছে, যা শারঈ বিচারব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে অন্যান্য কিছু রাষ্ট্রের নমুনা উল্লেখ করা হবে।

❀ লিবিয়ায় শারঈ বিচারব্যবস্থা

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত বিচারব্যবস্থার আইন অনুসারে লিবিয়ার আদালত এক ও অভিন্ন ছিল। আদালতগুলোর পরিধি ছিল দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং ব্যক্তিগত মামলা দেখাশোনা করা। তারপর এই আইনের সংশোধন করে ১৯৫৮ সালের ২৮শে অক্টোবর নতুন বিচারব্যবস্থার আইন প্রকাশিত হয়। এ আইন শারঈ আদালতকে বেসামরিক আদালত থেকে পৃথক করে দেয়। এরপর লিবিয়ার বিচারব্যবস্থা বেসামরিক এবং শারঈ—এ দুই বিভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

বেসামরিক আদালত যেসব আদালত নিয়ে গঠিত হয়েছিল, সেগুলো হলো : ১. সর্বোচ্চ আদালত, ২. আপিল আদালত, ৩. প্রাথমিক আদালত এবং ৪. আংশিক আদালত। প্রত্যেক বেসামরিক আপিল আদালতে এক বা একাধিক অপরাধ বিভাগ থাকত। প্রতিটি আদালত আবার তিনজন উপদেষ্টা নিয়ে গঠিত হতো। এই আদালতকে ফৌজদারি আদালত বলা হয়।

আংশিক আদালত একজন বিচারক নিয়ে গঠিত হতো। অনুরূপভাবে প্রাথমিক আদালতেও একজন বিচারক থাকত। তবে অপরাধ, আপিল লঙ্ঘন, কিংবা আংশিক মামলাগুলো আপিল করার জন্য কোনো আপিল বিভাগ গঠিত হলে তাতে তিনজন বিচারক থাকত।

আর শারঈ আদালত গঠিত হতো শারঈ আপিল আদালত এবং শারঈ প্রাথমিক আদালত নিয়ে।

লিবিয়ান বিচারব্যবস্থা আইন আদালতের পরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে। বেসামরিক আদালতকে সাধারণ আইন আদালত বানিয়েছে। সব ধরনের বিরোধ, দেওয়ানি আর বাণিজ্যিক মামলা, ব্যক্তিগত মামলা এবং সকল অপরাধের ক্ষেত্রে বেসামরিক আদালতের পরিধি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তবে বিশেষভাবে কোনো পরিধি বাদ দেয়া হলে সেটা ভিন্ন কথা। লিবিয়ান বিচারব্যবস্থা আইন আরও নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ব্যক্তিগত এবং ওয়াকফের সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে শারঈ আদালতের পরিধি কার্যকর হবে। এই আইন লিবিয়ান

মুসলিমদের বিবেচনায়। অনুরূপভাবে বিদেশিদের ক্ষেত্রেও এই আইনগুলোর ব্যাপারে শারঈ আদালতের পরিধি রয়েছে। যদি বিদেশিদের স্বদেশ শারঈ আইন মেনে চলে তবেই; নচেৎ নয়।[১১৭৫]

শারঈ আদালত মালিকি মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রহণযোগ্য মতামতের ক্ষেত্রে শারঈ আইনকে বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে এই শর্তে যে, আইন যদি শরীয়তের নির্দিষ্ট বিধানের ওপর নির্দেশ করে তাহলে সে বিধান মেনে চলতে হবে।[১১৭৬]

১৯৮৪ সালে লিবিয়াতে বিবাহ এবং তালাকের বিধান সংবলিত ১০ নং আইন প্রকাশিত হয়। তবে মিরাস এবং ওসিয়তের ক্ষেত্রে কোনো আইন জারি করা হয়নি। এই ক্ষেত্র দুটিতে আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন ১৯৭৯ সালের ৫১ নং ধারায় বিচারব্যবস্থা আইনে এটা প্রকাশিত হয়। ১৫৯ নং ধারায় আদালতগুলোর ওপর আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে যে, মালিকি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত অনুসারে ওয়াকফের সাথে সম্পৃক্ত, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মামলাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে শারঈ আইন বাস্তবায়ন করতে হবে। তারপর বিচারব্যবস্থার ৬০ নং ধারায় ব্যক্তিগত মামলাগুলো নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

- ☑ ১. ব্যক্তির অবস্থা এবং তার যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়।
- ☑ ২. পরিবার-নীতির সাথে সম্পৃক্ত মামলাগুলো। যেমন বিবাহের প্রস্তাব, বিবাহ-শাদি, মোহর, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, পরস্পরের দায়িত্ব, তালাক প্রদান, ডিভোর্স এবং বিচ্ছেদ।
- ☑ ৩. সন্তানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়, পিতার স্বীকৃতি, পিতৃত্বেরও স্বীকৃতি, পূর্বসূরি এবং উত্তরসূরিদের মাঝে সম্পর্ক, সন্তান লালনপালন, বংশের যাচাই-বাছাই।
- ☑ ৪. আত্মীয়স্বজনের পেছনে খরচের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।
- ☑ ৫. অভিভাবকত্ব, ওসিয়ত, দায়িত্বশীলতা, নিষেধাজ্ঞা, পরিচালনার অনুমোদন, অনুপস্থিত, নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত বিবেচনা।
- ☑ ৬. মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন মিরাস এবং ওসিয়তের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো।[১১৭৭]

লিবিয়ান মামলা আইনের অনুসরণীয় পদ্ধতিগুলো নাগরিক আদালতের ক্ষেত্রে মেনে চলত। শারঈ আদালতের মামলাপদ্ধতির জন্য বিশেষ একটি ধারা প্রণয়ন

[১১৭৫] আন-নিযামুল কাদ্বাঈ ওয়াল হায়াকাতুত তাশরীইয়্যাহ ফি লিবিয়া, পৃ, ৫০ এবং ৬২

[১১৭৬] আন-নিযামুল কাদ্বাঈ, পৃ. ৬৩; আহকামুল মীরাছি ওয়াল ওয়াসিয়্যাহ, পৃ. ২২

[১১৭৭] আহকামুল মীরাছি ওয়াল ওয়াসিয়্যাহ, পৃ. ২২-২৩

করা হয়েছিল। যার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সহজতা এবং মামলাপদ্ধতি আইনে স্বীকৃত শর্তগুলো এবং প্রযোজ্য পদ্ধতিগুলো লঘু করা।[১১৭৮]

পরবর্তীকালে লিবিয়ায় শারঈ বিচারব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দেয়া হলে তা বেসামরিক আদালতের একটি বিভাগ হয়ে যায়। ফলে তা প্রথম স্তরের বিচারব্যবস্থা এবং আপিল বিচারব্যবস্থার অধীনে চলে আসে। তবে সর্বোচ্চ আদালতে শারঈ বিচারব্যবস্থার একটি বিভাগ ছিল।[১১৭৯]

❁ কাতারের শারঈ বিচারব্যবস্থা

কাতার হচ্ছে আরব সাগরের একটি উপদ্বীপ। যার আয়তন ১১,৪৩৭ বর্গ কিলোমিটার। এর জনসংখ্যা হলো ৩ লাখ ৬৯ হাজার। এখানকার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। ইসলামি শরীয়ত কাতারের আইনের মূল উৎস। উত্তরাধিকার সূত্রে 'সানি' পরিবারের মধ্যেই কাতারের শাসন ক্ষমতা চলে আসছে। সানি পরিবারের মূল এবং প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন সানি ইবনু মুহাম্মাদ। যিনি ১৮৬৮ সালে কাতার শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৩/১১/১৯৭১ সালে কাতার স্বাধীনতা লাভ করে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাতারের বিচারব্যবস্থা বিশেষ পদ্ধতিতে দ্বৈত এবং মিশ্র ব্যবস্থাপনা। কাতারের বেসামরিক আদালত আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। আর শারঈ আদালত পরিচালিত হয় সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনে। এই বিচারব্যবস্থাপনা ব্রিটিশদের সাথে অঙ্গীকারকৃত স্বাধীনতার শর্তের অন্তর্ভুক্ত। বেসামরিক ব্যবস্থাপনার আদালত একটি ক্ষুদ্র ফৌজদারি আদালত, একটি বৃহৎ ফৌজদারি আদালত এবং একটি আপিল আদালতের সমন্বয়ে গঠিত। কাতারে কোনো রেফার আদালত নেই।

শারঈ বিচার বিভাগটি শারঈ আদালতের প্রেসিডেন্সি নামে একটি বিভাগের সাথে সংযুক্ত। ১ মুহাররম ১৩৭৮ হিজরিতে ১৯৫৮ সালে শারঈ আদালতের প্রেসিডেন্সি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৩৯২ হিজরিতে ১৯৭২ সালে এই বিভাগের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। ১৩৯৩ হিজরিতে ১৯৭৩ সালে বিভাগটির নাম শারঈ আদালত এবং ধর্মীয় বিষয়ক প্রেসিডেন্সি রাখা হয়। শারঈ আদালত এবং ধর্মীয় বিষয়ক প্রেসিডেন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৮৭ সালে ৮ নং আইন জারি করা হয়। এই বিভাগটি সরাসরি আমিরের অনুগামী একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভাগটিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ১৯৮৭ সালের ২ নং আইনে একটি নির্দেশ জারি হয়। যা-তে শাইখ আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদকে একজন মন্ত্রীর

[১১৭৮] আন-নিযামুল কাদ্বাঈ, পৃ. ৬৫

[১১৭৯] ত্রিপোলিস্থ কুল্লিয়্যাতুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়্যাহর একজন অধ্যাপক আমাকে এসব জানিয়েছেন। তিনি একজন প্রাক্তন বিচারক।

পদমর্যাদায় শারঈ আদালত ও ধর্মীয় বিষয়ের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।[১১৮০]

এই প্রেসিডেন্সিতে ছয়টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

☑ (১) শারঈ আদালত।

☑ (২) ওয়াকফ বিষয়ক বিভাগ।

☑ (৩) ইসলামি বিষয় পরিচালনা বিভাগ।

☑ (৪) উত্তরাধিকার সম্পদ এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

☑ (৫) অর্থনীতি এবং প্রশাসনিক বিভাগ।

☑ (৬) গবেষণা ও তথ্য কেন্দ্র।

শারঈ আদালতের অধীনে কয়েকটি আদালত আছে। সেগুলো হচ্ছে:

☑ ১. সর্বোচ্চ শারঈ আদালত।

☑ ২. প্রথম শারঈ আদালত।

☑ ৩. দ্বিতীয় শারঈ আদালত।

☑ ৪. প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত অফিস।

☑ ৫. নির্বাহী বিভাগ।

☑ ৬. স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা কমিটির অফিস।

☑ ৭. বৈবাহিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অফিস।

শারঈ আদালতের পরিচালক সর্বোচ্চ শারঈ আদালতের প্রধান। উত্তরাধিকার সম্পত্তি বিষয় আদালত পরিচালনার জন্য শারঈ বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়। এই আদালত অনেকটা রেফার আদালতের মতো।

প্রথম এবং দ্বিতীয় আদালতের রায়ের জন্য নিরীক্ষণ এবং অডিটের ক্ষেত্রে এই আদালত অনেকটা আপিল আদালতের মতো। শারঈ বিষয়গুলো পরিচালনার দায়িত্ব না থাকায় প্রথমবারের মতো এই আদালতটি কিসাস, হাত কাটার শাস্তি এবং রক্তপণের মামলাগুলো পরিচালনা করে। প্রথম শারঈ আদালত চারজন বিচারক নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয় শারঈ আদালত দুজন বিচারক নিয়ে গঠিত। হাম্বলি মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মতামত অনুসারে একজন বিচারকের পক্ষ থেকে রায় জারি করা হয়।

[১১৮০] ১২৮৫ হিজরি মোতাবেক ১৮৬৮ সালে কাতারের প্রথম বিচারক ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু হামদান। এরপর তার পরিবর্তে সানিকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারপর ১৩৩২ হিজরি মোতাবেক ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে বাহরাইন থেকে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল আজিজ আল-মানি'কে নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর ১৩৫৯ হিজরি মোতাবেক ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা থেকে আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি বিচার বিভাগ এবং আদালত প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কাতারে প্রথম শারঈ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে বিচারক যদি অন্য কোনো মাযহাবের কোনো মতকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন তাহলে ভিন্ন কথা। মামলা আপিলের সময় অথবা গুরুত্বপূর্ণ মামলা শুনানির জন্য প্রথম আদালতের বিচারকের নেতৃত্বে বিচারকরা সম্মিলিত এজলাসে বসেন।

শারঈ আদালতের পরিধি কেবল মুসলিমদের ব্যক্তিগত মামলা ও অপরাধ, ফৌজদারি অপরাধ, কিসাস, পুলিশ কর্তৃক উত্থাপিত শাস্তি, ইসলাম এবং বিবাহ ঘোষণার ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে। হাত কাটার শাস্তি শারঈ আদালতের পরিধি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। হাত কাটার বিধান বেসামরিক আদালতে রেফার করে দেয়া হয়েছে যে, এই শাস্তির ক্ষেত্রে হাত কাটা হবে না। মাদক এবং ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের মামলাও শারঈ আদালত থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

শারঈ আদালতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, পরিধি নির্ধারণ এবং তার পদ্ধতি সম্পর্কে একটি বিশেষ আইনের খসড়া প্রস্তুত করে প্রকাশের ক্ষেত্রে গবেষণা ও পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রীপরিষদে পেশ করা হয়েছে।[১১৮১]

❁ লেবাননের শারঈ বিচারব্যবস্থা

লেবানন হলো শাম অঞ্চল এবং সাধারণ সিরিয়ার একটি অংশ। বর্তমান যুগের আগে লেবাননের স্বাধীন কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তা সিরিয়ার সাথে মিলে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্থানীয়, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণে এই অঞ্চলে একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন রয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লেবানন ছিল ফরাসি আধিপত্যের করতলে। ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে তা ফরাসিদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করে একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে ধর্মীয় এবং মতাদর্শ ভিত্তিক অনেকগুলো সম্প্রদায় আছে। তারা হলো :

☑ ১. সুন্নি,

☑ ২. শিয়া,

☑ ৩. দ্রুজ,

☑ ৪. ম্যারোনাইট ক্যাথলিক,

☑ ৫. রোমান ক্যাথলিক,

☑ ৬. আর্মেনিয়ান ক্যাথলিক,

☑ ৭. সিরিয়ান ক্যাথলিক,

☑ ৮. গ্রিক অর্থোডক্স,

[১১৮১] রিআসাতুল মাহাকিমিশ শারইয়্যাহ ওয়াশ শুউনিদ দীনিয়্যাহ বি কাতার, পৃ. ১০

☑ ৯. আর্মেনিয়ান অর্থোডক্স,

☑ ১০. সিরিয়ান অর্থোডক্স,

☑ ১১. ইভানজেলিকালস,

☑ ১২. ক্যালডীয় অ্যাসিরিয়ান,

☑ ১৩. ইহুদি।

প্রতিটি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয়ের একটি বিশেষ বিচারব্যবস্থা রয়েছে। ধর্ম এবং বিচার বিভাগের প্রতিটি সাম্প্রদায়িক ও আধ্যাত্মিক আদালতের দায়িত্বে রয়েছে বিশেষ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক এবং বিশেষায়িত ডিগ্রিধারী বিচারক। সুন্নি এবং শিয়া সম্প্রদায়গুলো আইনশাস্ত্রের চিন্তাধারায় পৃথক ছিল না। তবে ফরাসি আধিপত্যের সময় একটি আধ্যাত্মিক দ্রুজ সম্প্রদায়ের সাথে তারা আলাদা হয়ে ওঠে।

লেবাননের বিচার বিভাগ দ্বৈত। তা একটি সাধারণ বিচার বিভাগ। যা আইন মন্ত্রণালয় এবং একটি ধর্মীয় বিচার বিভাগের সাথে যুক্ত। সাধারণ বিচার বিভাগটি দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং প্রশাসনিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সাধারণ আদালত তিনটি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। যথা : ১. প্রাথমিক আদালত, ২. আপিল আদালত এবং ৩. বিচার সংশ্লিষ্ট আদালত।

লেবাননে শূরা কাউন্সিল বা উপদেষ্টা পরিষদ, অডিট ব্যুরো (হিসাব ও কর্মচারীদের বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে) এবং সামরিক আদালত আছে। সেখানে একাধিক ধর্মীয় আদালত আছে। এর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

▪ ১. ইসলামি শারঈ আদালত

এটা দুই রকম। একটি হানাফি মাযহাব অনুসারে বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করে। উসমানি সালতানাতে যে মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মাঝে এই মাযহাবই এখনো আমলযোগ্য রয়েছে। তবে পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। আরেকটি বিচারব্যবস্থা শিয়াদের ইমাম জাফারের মাযহাব অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করে। শারঈ আদালত দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত :

☑ একটি প্রাথমিক আদালত। ব্যক্তিগত, ইসলামি ওয়াকফ, অভিভাবক নির্ধারণ, পরিচালক নির্ধারণ, তাদের বরখাস্ত করা, তাদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া—এ সকল শারঈ মামলার ক্ষেত্রে এই আদালতের পরিধি আছে।

☑ আরেকটি হলো শারঈ সর্বোচ্চ আদালত। প্রাথমিক আদালত থেকে সরাসরি

প্রকাশিত রায়কে এই আদালতে আপিল করা হয়। অথবা আপিল করা ছাড়াই এই আদালতের অধীনে প্রাথমিক আদালত থেকে প্রকাশিত রায়গুলোকে রেফার করা হয়। যেমন, শারঈ সর্বোচ্চ আদালত প্রাথমিক আদালতের বিচারগুলোকেও পর্যবেক্ষণ করে থাকে। প্রাথমিক আদালতের রায় যদি আইনভিত্তিক হয়, তাহলে সেগুলোকে অনুমোদন দেয়। অন্যথায় এগুলো আবার উত্থাপন করা হয়।

▪ ২. দ্রুত ধর্মীয় বিচার আদালত

১৯৫৯ সালে এই বিচারব্যবস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। দুটি বিভাগ নিয়ে এটি গঠিত। একটি হলো প্রাথমিক আদালত। আরেকটি হলো সর্বোচ্চ আপিল আদালত। এই আদালত দ্রুজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ মামলা, দ্রুজ রীতিনীতি এবং তাদের প্রণয়ন করা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনের সাথে সম্পৃক্ত লেনদেন এবং বিভিন্ন মামলার দেখাশোনা করে থাকে। সুতরাং তারা যদি কোনো ডকুমেন্ট বা কোনো রীতিনীতি না পায়, তাহলে শারঈ আদালতে গৃহীত মামলা নীতি অথবা দেওয়ানি আইন অনুসারে যেগুলো তাদের ধর্মীয় মত এবং রীতিনীতির সাথে খাপ খায় সেগুলোতে প্রয়োগ করে। তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগ করা হয়। তাদের আদালত দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। প্রাথমিক আদালতটি একজন বিচারক নিয়ে গঠিত এবং সর্বোচ্চ আপিল আদালতটি তিনজন বিচারক নিয়ে গঠিত।

▪ ৩. গির্জাভিত্তিক আদালত অথবা আধ্যাত্মিক আদালত

এই আদালতগুলো বিভিন্ন ধর্মীয় এবং খ্রিষ্টান ধর্মের মতাবলম্বীদের জন্য। যার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। এই আদালতগুলো ইতিহাসজুড়ে সংঘটিত খ্রিষ্টান কাউন্সিলের আইন প্রয়োগ করে। তারপর ইস্টার্ন চার্চের বিচার আইন জারি করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চল ও ডায়োসিসে অনেকগুলো প্রাথমিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। আদালত এমন সব নির্দেশ এবং শিক্ষা বাস্তবায়ন করত, যেগুলো খ্রিষ্টধর্মের আইনবহির্ভূত নয়। তবে প্রমাণ সংগ্রহ, বিবাদী ও সাক্ষীদের উপস্থিত করা এবং ধর্মের সাথে সম্পর্ক নেই এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের সহযোগিতা নেয়ার অনুমোদন ছিল।[১১৮২]

আধুনিক যুগে শারঈ বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে আরব দেশগুলোর

[১১৮২] আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ ফী লুবনান মিনান নাহিয়াতাইন আল-কানুনিয়্যাহ ওয়াশ শারইয়্যাহ, পৃ. ৩৪ এবং তানযীমুল আহওয়ালিশ শাখসিয়্যাহ লিগায়রিল মুসলিমিন ফী সুরিয়্যাহ ওয়া লুবনান, পৃ. ৬৮ দ্রষ্টব্য

বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো এমন :

☑ ১. অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র বেসামরিক এবং শারঈ—উভয় বিচারব্যবস্থাই গ্রহণ করে নিয়েছে। কিছু কিছু দেশ একটি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন বিচারব্যবস্থা হিসেবে শারঈ আদালতকে বিলুপ্ত করে দিলেও বেসামরিক বিচারব্যবস্থার ছত্রছায়ায় শারঈ বিচারব্যবস্থার কিছু অস্তিত্ব এখনো রয়েছে। কোনো কোনো আরব দেশ শারঈ বিচারব্যবস্থাকে মৌলিক এবং প্রচলিত বিচারব্যবস্থা মনে করে। কিন্তু শারঈ বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি কিছু অর্ধ বিচারিক সংস্থা পাওয়া যায়, কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যেগুলো শারঈ বিচারব্যবস্থার অংশীদার।

☑ ২. বেসামরিক বিচারব্যবস্থাকে মৌলিক এবং সাধারণ এখতিয়ারের অধিকারী বিচারব্যবস্থা মনে করা হয়। এই বিচারব্যবস্থার বিরাট প্রভাব আছে। আরব রাষ্ট্রগুলোয় এই বিচারব্যবস্থার একাধিক আদালত আছে। বেসামরিক বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি কিংবা তার ভেতরে নির্দিষ্ট পরিসরে শারঈ বিচারব্যবস্থা পাওয়া যায়। সাধারণভাবে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আদালতের ক্ষেত্রে শারঈ বিচারব্যবস্থার সীমাবদ্ধ পরিধি থাকে। আর শারঈ বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ প্রভাব পাওয়া যায়।

☑ ৩. আরব রাষ্ট্রগুলোতে বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে অংশীদারিত্ব মূলক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু এসব ব্যবস্থাপনার মাঝে ভীষণ বৈপরীত্য থাকে। এর চেয়েও ভয়ংকর কথা হলো, আরব রাষ্ট্রগুলোর মাঝে আইন এবং বিচার নীতির ক্ষেত্রেও এই বৈপরীত্যের দেখা মিলে। এগুলো আরব বিশ্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, দাসত্ব এবং আঞ্চলিকতাকে আরও দৃঢ় করে। এসবের মাধ্যমে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো থেকে আমদানিকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং আইনের মাধ্যমে আইনি সাম্রাজ্যবাদকে নিশ্চিত হয়। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়া ইসলামি আইনের কোনো প্রভাব বাকি নেই।

☑ ৪. বর্তমান অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রে কেবল ব্যক্তিগত বিষয়ে শারঈ আদালতের পরিধি আছে। এর পাশাপাশি বেসামরিক এবং দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিষয়ে শারঈ আদালত সামান্য পরিধিই রেখে থাকে। অথচ বিচারের ক্ষেত্রে শারঈ আদালতই সাধারণ পরিধি এবং ব্যাপক ক্ষমতার দাবিদার।

☑ ৫. ধর্ম এবং মতাদর্শের অনুসারীদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তি ধর্মীয় আধ্যাত্মিক, সাম্প্রদায়িক এবং মতাদর্শিক আদালতের বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। বেসামরিক আদালতের মধ্যে অমুসলিমরা যেমন বিচারের দায়িত্ব পালন করে। কখনো কখনো অমুসলিমরা মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়ে আইনত বা কার্যত বিচারের দায়িত্ব পালন করে।

☑ ৬. অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে শারঈ বিচারব্যবস্থায় মামলা পরিচালনা করে। তারপর তদন্ত এবং যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সর্বোচ্চ আদালতে মামলাগুলো পেশ করা হয়। জর্ডানে এই কোর্টকে আপিল কোর্ট বলা হয়। অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেফার আদালতের একটি বিভাগ আছে। অথচ কিছু কিছু আরব রাষ্ট্র দুই বিভাগের ব্যবস্থাপনাই শরীয়তের ওপর বাস্তবায়ন করতে চায়। ফলে শারঈ আদালত গঠিত হয় প্রাথমিক আদালত দিয়ে। তারপর পর্যায়ক্রমে আপিল এবং রেফার আদালত আসে।

পরিশিষ্ট

এতক্ষণ বিভিন্ন যুগের ইসলামি বিচারব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নবি-যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন কিছু পয়েন্টের মাধ্যমে দীর্ঘ আলোচনার সংক্ষিপ্ত ফলাফল উল্লেখ করা হচ্ছে।

☑ ১. নবি-যুগে ইসলামি বিচারব্যবস্থার সূচনা হয়েছে। রাশিদুন যুগে তা বেড়ে উঠে পূর্ণাঙ্গতা পায়, স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উমাইয়া যুগে এবং আব্বাসি যুগের প্রথম ভাগে ইসলামি বিচারব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। এরপর আব্বাসি যুগের শেষে, তারপর মামলুক যুগে, এরপর উসমানি যুগে বিচারব্যবস্থায় ক্ষয় ধরে। ধীরে ধীরে বর্তমান যুগে এসে তা নিশ্চিহ্নপ্রায় হয়ে গেছে। কিছু কিছু আরব রাষ্ট্রে ইসলামি বিচারব্যবস্থার অস্তিত্ব এখনো টিকে আছে। অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রেই ইসলামি বিচারব্যবস্থাকে কেবল ব্যক্তিগত বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে।

☑ ২. ইসলামি বিচারব্যবস্থা হলো ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের প্রতিনিধি। নৈপুণ্য, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা আর নীতির সংরক্ষণ, মানুষের অধিকার, জান ও মাল সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে তা একটি দৃষ্টান্ত।

☑ ৩. দীর্ঘ ইতিহাসে এক ঝাঁক শ্রেষ্ঠ বিচারকের নমুনা পাওয়া যায়। যারা ন্যায় এবং ইনসাফের সাথে বিচার করতেন। সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো ক্ষমতা, প্রভাব, কোনো শাসককে ভয় করতেন না। আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তাঁদের ছিল না।

☑ ৪. ইতিহাসের অধিকাংশ সময় ইসলামি বিচারব্যবস্থায় একতা ছিল। শারঈ বিচারক ছিলেন রাষ্ট্রের একমাত্র বিচারের আশ্রয়। এ অবস্থা ছিল উসমানি শাসনের দ্বিতীয় যুগ পর্যন্ত। এরপর বিচারব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করে দ্বৈত নীতি। শারঈ আদালতের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয় বেসামরিক আদালত।

জীবনের সমস্ত অঙ্গনে বেসামরিক আদালত শারঈ আদালতের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে।

☑ ৫. অধিকাংশ ক্ষেত্রে শারঈ বিচারব্যবস্থা প্রথম স্তরের একজন বিচারকের বিচারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকমই হতো। পক্ষান্তরে আপিল আদালত এবং রেফার আদালত একটি দলের বিচারের ওপর নির্ভরশীল। যা তিন বা ততোধিক উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত হতো।

☑ ৬. ইসলামি বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পরিপূর্ণ সুস্পষ্ট। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে তা এভাবেই চলে আসা প্রমাণিত। ইতিহাসের দীর্ঘ সময় একইভাবে ইসলামি বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, মানুষের অধিকার সংরক্ষণ, জান-মাল এবং ইজ্জত-আবরুর সংরক্ষণ, জুলুম আর সীমালঙ্ঘনের প্রতিরোধ, হকদারদের কাছে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, শরীয়তের বিধিবিধান সঠিকভাবে বাস্তবায়ন, শাশ্বত দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসলামি আইনের উৎস থেকে গৃহীত ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করার একমাত্র দায়িত্বশীল হলো ইসলামি বিচারব্যবস্থা।

☑ ৭. ইসলামি বিচারব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থা সুস্পষ্ট এবং সুসাব্যস্ত। তবে মানুষের প্রয়োজন, ইসলামের বিজয়ধারা, সম্প্রসারণ এবং সমাজ, রাষ্ট্র আর ব্যক্তির অবস্থা পরিবর্তনে এসব বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার পদ্ধতি পরিবর্তিত হতে থাকে। এ কারণেই দেখা যায়, অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। বিচারকের পরিধি স্থান এবং কাল ভেদে সম্প্রসারিত হয়েছে। তাকে এমন দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে, যা বিচার সংশ্লিষ্ট নয়। আবার বিচারব্যবস্থার স্থান এবং কালও বদলেছে। প্রয়োজনবোধে একাধিক বিচারক এবং বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এত পরিবর্তন সত্ত্বেও ইসলামি বিচারব্যবস্থা সগৌরবে মাথা উঁচু করে ছিল।

☑ ৮. ইসলামি বিচারব্যবস্থার প্রথম যুগ থেকে নিয়ে আব্বাসি যুগের মাঝামাঝি কাল অবধি—এ সময়ের বিচারকরা ছিলেন মুজতাহিদ তথা গবেষকদের অন্তর্ভুক্ত। তার পরবর্তী বিচারকরা প্রসিদ্ধ এবং স্বীকৃত মাযহাবের অনুসরণ করেছেন।

☑ ৯. সরাসরি ইসলামি আইন তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ইত্যাদির মাঝেই ইসলামি বিচারব্যবস্থার উৎস ছিল সীমাবদ্ধ। তারপর ফতোয়া এবং বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিই ভরসা হয়ে যায়। এরপর ধীরে ধীরে আসে সাম্রাজ্যবাদী আইন। ভিনদেশ থেকে আমদানি করা হয় আইন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা। উসমানি সালতানাতের দ্বিতীয় যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এভাবেই চলে আসছে।

☑ ১০. নবি-যুগেই অন্যায়ের বিচারব্যবস্থার বীজ বপন করা হয়েছিল। উমাইয়া যুগে তা বেড়ে উঠে এবং ডালপালা ছড়ায়। ইসলামের ইতিহাসে অন্যায়ের বিচার অন্যতম স্থান তৈরি করে নেয়। কিন্তু আস্তে আস্তে আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে তা প্রায় বিদায়ই নিয়েছে। এর জায়গা দখল করেছে প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থাপনা অথবা রাষ্ট্র পরিষদ। এক সৌদি আরব ছাড়া অন্যায়ের বিচারের কার্যত অস্তিত্ব কোথাও নেই। বিচার বিভাগের এই নামটাই কেবল ব্যবহার করা হয়। একই অবস্থা হয়েছে হিসবাহ বিচারের ক্ষেত্রেও। ইতিহাসের অলিগলি পেরিয়ে বর্তমানে তা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন বিভাগ এর কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করলেও সমকালীন বিচারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় হিসবাহ বিচারের পরিধি একদমই নেই।

☑ ১১. উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং প্রয়োজনের পাশাপাশি একাধিক বিচার পদ্ধতি চালু হয়েছে। প্রয়োজন, জনস্বার্থ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দরকারে ইসলামি দেশগুলোতে চালু হয়েছে বিচারকের একাধিক সহযোগী।

☑ ১২. আলিম, ফকিহ আর মুজতাহিদদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগ দেয়া হতো। তারপর প্রত্যেক শহরে প্রচলিত মাযহাব অনুসারীদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগ দেওয়ার পদ্ধতি চালু হয়। উসমানি যুগে হানাফি মাযহাব প্রাধান্য পায়। বর্তমান যুগে আরব রাষ্ট্রগুলোতে অন্যান্য বিচারকদের মাধ্যমে শারঈ বিচারকদের নিয়োগ দেয়া হয়। বিচারক নিয়োগের বিষয়টি অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রে বা আইন ইনস্টিটিউট থেকে গ্রাজুয়েটদের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিছু কিছু আরব রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়, শরীয়াহ অনুষদ, বিচার বিভাগের উচ্চতর ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতকোত্তরদের নিয়োগ দেওয়া হয়। শেষ যুগে কিছু কিছু বিচারকের মাঝে দুর্বলতা আর দুর্নীতি দেখা দেয়।

☑ ১৩. নবি-যুগে বিচারের দায়িত্বে ছিল শক্তিশালী ভিত্তি। ইসলামি বিচার বিভাগের ব্যবস্থা ছিল সামগ্রিক এবং পরিপূর্ণ। এ যুগেই গতিশীল বিচারব্যবস্থার সূচনা ঘটে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে যা ছিল গতিশীল। প্রশাসনিকভাবে এবং গঠনমূলকভাবে নবি-যুগের বিচার সর্বজনীন ইসলামি বিচারব্যবস্থার উৎস। রাশিদুন যুগের বিচারব্যবস্থাও পরবর্তী ইসলামি বিচারব্যবস্থার উৎস। প্রত্যেক যুগেই তার পূর্ববর্তীদের বিচারব্যবস্থা হলো দৃষ্টি এবং নির্ভরতার কেন্দ্রবিন্দু।

☑ ১৪. আব্বাসি যুগের শেষ সময়ে বিচারব্যবস্থায় দুর্বলতা সংক্রমিত হতে থাকে। ধেয়ে আসতে থাকে পতন। অনিবার্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। মামলুক এবং উসমানি যুগেও যা অব্যাহত ছিল। শেষে উসমানি যুগে এসে বিচারব্যবস্থায় সত্য আর মিথ্যা মিশে যায়। অবিচলতা আর শক্তির সাথে দুর্বলতা আর অবসন্নতার সংমিশ্রণ ঘটে। তারপরও উসমানি যুগ ছিল ইসলাম আর

ইসলামের আইন থেকে বেরিয়ে আসা ও পরিবর্তন হওয়ার টার্নিং পয়েন্ট। এ সময় জারি করা হয় অনেক ভিনদেশি আইন এবং ব্যবস্থাপনা। প্রতিষ্ঠিত হয় বেসামরিক এবং নাগরিক আদালত। যা শরীয়ত মেনে চলা তো দূরের কথা, শাশ্বত শরীয়ত থেকে অনেক দূরে ছিল তার অবস্থান।

☑ ১৫. বর্তমান যুগে শারঈ বিচারব্যবস্থা কেবল বিবাহ-শাদি, তালাক, ব্যক্তিগত বিভিন্ন বিষয়ের গণ্ডির ভেতর এক সংকীর্ণ আঙিনায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রে তার অস্তিত্ব এবং স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে বেসামরিক বিচারব্যবস্থার একটি অংশে পরিণত হয়েছে। কিছু কিছু আরব রাষ্ট্রে তো নানা ধরনের চাপের প্রভাবে শারঈ বিচারব্যবস্থা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কিছু সুপারিশ এবং আবেদন

পরিশেষে কোনো কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে আমাদের কিছু সুপারিশ এবং আবেদন করছি।

☑ ১. আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে মহান শরীয়তের চৌহদ্দিতে। আবারও আঁকড়ে ধরতে হবে আল্লাহর দ্বীন এবং আইন। যা তিনি বিশ্ববাসীদের জন্য হিদায়াতস্বরূপ নাযিল করেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে যে দ্বীন সফলতা অর্জন করেছিল। শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় আরোহণ করে আর উন্নতির শিখরে উঠে যার সাফল্য বাস্তবায়িত হয়েছিল।

☑ ২. শরীয়ত এবং ইসলামি বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফিকহকেন্দ্রিক মাযহাবগুলো থেকে উপকৃত হতে হবে। সঠিকভাবে বিবেচনা করে গ্রহণ করতে হবে চলমান উন্নতি আর আধুনিক আবিষ্কার। কেননা দ্বীন ও শরীয়ত তথা ইসলাম প্রত্যেক যুগ এবং সময়ের জন্য সমান উপযুক্ত।

☑ ৩. উম্মতকে আকীদাগত এবং আইনগতভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর আইন এবং বিচারের ব্যবস্থাপনা এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে। তবেই ভবিষ্যৎ মুসলিম উম্মত অতীতের ইজ্জতপূর্ণ এবং গৌরবপূর্ণ অবস্থানে ফিরে যেতে পারবে।

☑ ৪. এ যুগে কেবল শরীয়াহ অনুষদ অথবা উচ্চতর বিচার ইনস্টিটিউট থেকে গ্রাজুয়েটদের মধ্য হতে বিচারক নিয়োগ দিতে হবে। শারঈ বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারীদের মাঝে পারস্পরিক তথ্য আর জ্ঞান আদান-প্রদানের সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

সবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্য বাণীর মাধ্যমে আমাদের আলোচনার এখানেই ইতি টানছি। তিনি বলেন,

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

আর এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে তোমরা চলো; অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেগুলো তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। তিনি এ নির্দেশ তোমাদের দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।[১১৮৩]

সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীন ও শরীয়তের কাছে উত্তমভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

[১১৮৩] সূরা আনআম, ৬ : ১৫৩

সহায়ক গ্রন্থ

আল-মানাবী (১০৩১ হি.), আল-ইতহাফাতুস সুন্নিয়্যাহ বিশারহিল হাদিসিল কুদসিয়্যাহ, ব্যাখ্যা, শাইখ মুনির আদ-দিমাশকি, ইদারতুত তবাআতিল মুনিরিয়া, কায়রো

মুহাম্মাদ খুদারি বেগ, ইতমামুল ওয়াফা ফী সিয়ারিল খুলাফা, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, মিশর

আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাবিব আল-মাওয়ারদী (৪৫০ হি., আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, , মিশর, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি.

আলী তানতাভী এবং নাজি তানতাভী, আখবারু উমার ইবনিল খাত্তাব, দারুল ফিকর, দামেস্ক, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯২ হি./ ১৯৭৩ খ্রি.।

মুহাম্মাদ ইবনু খালাফ ইবনু হাইয়ান আল-ওয়াকী'(৩০৬ হি.), আখবারুল কুদ্বাহ, আলামুল কুতুবের ফটোকপি, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, বৈরুত

মুহাম্মাদ কুর্দ আলী, মাতবাআতু মিছর, আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ ফী ইযযিল আরব, কায়রো, ১৯৩৪ খ্রি.।

আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাবিব আল-মাওয়াদী (৪৫০ হি.), আদাবুল কাদ্বি, মাতবাআতুল ইরশাদ, বাগদাদ, ১৩৯১ হি./১৯৭১ খ্রি.।

ইব্রাহিম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবিদ দাম আল-হামাবী (৬৪২ হি.), আদাবুল কাদ্বা, দামেস্ক, ২য় সংস্করণ, ১৪০২ হি./ ১৯৮২ খ্রি.

আবুল হাসান আলী ইবনু আহমাদ আল-ওয়াহিদী আল-নায়সাবুরি (৪৬৮ হি./১০৭৬ খ্রি.), আসবাবুন নুযূল লিল ওয়াহিদি, দামেস্ক, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খ্রি.।

আবু উমর ইউসুফ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল বার আল-কুরতুবী (৪৬৩ হি.), আল-ইসতিআব ফী মারিফাতিল আসহাব, মাতবাআতুস সাআদাহ, কায়রো, ১৩২৮ হি.

ইযযুদদিন আলী ইবনু মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী, ইবনু আছীর আল-জাজারি (৬৩০ হি.), উসদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবা, দারুশ-শা'ব, কায়রো, ১৯৭০

খ্রি.

মুহাম্মাদ কুর্দ আলী, দারুল কুতুবিল মিছরিয়্যাহ, আল-ইসলামু ওয়াল হাদ্বারাতুল আরাবিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৩৪ খ্রি., ১৯৩৬ খ্রি.

আদিব আল-হিলসা, উসুসুত তাশরীয়ি ওয়ান নিযামিল কাদ্বাঈ ফিল উরদুন, মা'হাদুল বুহুসি ওয়াদ দিরাসাতিল আরাবিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৭১ খ্রি.।

হাফিজ আহমদ ইবনু হাজার আল-আসকালানী (৮৫২ হি.), আল-ইসাবা ফি তাময়ীযিস সাহাবাহ, মিশর, ১৩২৮ হিজরি।

ড. আবদুল করিম রফিক, বিলাদুশ শাম ওয়া মিছর মিনাল ফাতহিল উসমানী (১৫১৬-১৭৯৮),প্রথম সংস্করণ, দামেস্ক, ১৯৬৭ খ্রি.।

ড. মুহাম্মাদ আয-যুহাইলি, উসূলুল ফিকহিল ইসলামি, দামেস্ক, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.।

ড. মুহাম্মাদ আয-যুহাইলি, উসূলুল মুহাকামাতিশ শারইয়্যাহ, দামেস্ক, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.।

ড. শাওকি আবু খলিল, আতলাসুত তারীখিল আরাবি, দারুল ফিকর, দামেস্ক, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রি.।

ড. সাইদ মুহাম্মাদ আল-জুলাইদি, আহকামুল মীরাছি ওয়াল ওয়াসিয়্যাহ ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ,ত্রিপোলি, লিবিয়া, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.

খায়রুদদীন আয-যিরকলি, আল-আ'লাম, ৩য় সংস্করণ, বৈরুত, ১৩৮৯ হি./ ১৯৬৯ খ্রি.।

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (৭৫১ হি.),আ'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, আল-আযহার কলেজের গ্রন্থাগার। মিশর, ১৩৮৮ হি./ ১৯৬৮ খ্রি.

মুহাম্মাদ ইবনু ফারাজ আল-কুরতুবি, আকযিয়াতুর রাসুল সা., কাতার

আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সালাম (২২৪ হি.), আল-আমওয়াল, আল-আযহার কলেজের গ্রন্থাগার, কায়রো, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.।

যিয়া শিত খাত্তাব, বুহুসুন ওয়া দিরাসাতুন ফী কানুনিল মুরাফাআতিল মাদানিয়্যাহ আল-ইরাকি (১৯৬৯),

মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু রুশদ (৫৯৫ হি.), বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, কায়রো, ১৯৭০ খ্রি.

হাফিজ ইসমাইল ইবনু উমর ইবনু কাসির দিমাশকি (৭৭৪ হি.), আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৬ খ্রি.

শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু জাবের আল-ওয়াদি আশি আল-তুনিসি (৭৪৯ হি.), বারনামিজু ইবনি জাবির, মক্কা, ১৪০১ হি./ ১৯৮১ খ্রি.

আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু আহমাদ আল-যাবি (৫৯৯ হি.), বুগইয়াতুল মুলতামিস ফী তারীখি রিজালি আহলিল আন্দালুস, বাগদাদ, ১৮৮৪ খ্রি.

আল-জাহিজ আবু উসমান আমর ইবনু বাহর (২৫৫ হি.), আল-বায়ানু ওয়াত তাবয়ীন, দারুল ফিকর, বৈরুত

মুহাম্মাদ আল-খুদারী, তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৩ হিজরি ১৯৩৪ খ্রি.

আবু বকর আহমাদ ইবনু আলী আল-খতিব আল-বাগদাদী (৪৬৩ হি.), তারীখু বাগদাদ, কায়রো, ১৩৪৯ হি./ ১৯৩১ খ্রি.।

জালালুদ্দিন আব্দুর-রহমান আল-সুয়ুতি (৯১১ হি.), তারীখুল খুলাফা লিস সুয়ুতি, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৯ হি./ ১৯৬৯ খ্রি.।

মুহাম্মাদ ফরিদ বেগ, তারীখুদ দাওলাতিল উসমানীয়্যাতিল আলিয়্যাহ, বৈরুত, ১৩৯৭ হি.।

আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারির আল-তাবারী (৩১০ হি.), তারীখুত তাবারি, কায়রো, ১৩৫৭ হি./১৯৩৯ খ্রি.

ড. আহমাদ আবদুল মুনঈম আল-বাহী, তারীখুল কাদ্বাই ফিল ইসলাম, কায়রো, ১৯৬৫ খ্রি.

কাযি মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ আরনুস (১৯৫৫ খ্রি.), তারীখুল কাদ্বাই ফিল ইসলাম, কায়রো, ১৩৫২ হি./ ১৯৩৪ খ্রি.

আবুল হাসান আল-নাবাহী (৭৯৩ হি.), তারীখুল কুদ্বাতিল আন্দালুস, বৈরুত

শাইখ মুহাম্মাদ আবু জাহরা, তারীখুল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যাহ, কায়রো

ড. হামাদ আবদুল মুনঈম মুহাম্মাদ হুসাইন, তারীখুল মাগরিবি ওয়াল আন্দালুসি ফী আহদিল মুরাবিতিন, আলেকজান্দ্রিয়া, ১৯৮৬ খ্রি.

ড. আদিল যাইতুন, তারীখুল মামালিক, দামেস্ক, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.

ইব্রাহিম ইবনু আলী ইবনু ফারহুন আল-মালিকি আল-মাদানী (৭৯৯ হি.), তাবসিরাতুল হুক্কাম ফী উসূলিল আক্বযিয়াতি ওয়া মানাহিজিল আহকাম, বৈরুত, ১৩০১ হি.

সুবহী আল-মাহমাসানি, তুরাছুল খুলাফাইর রাশিদিন ফিল ফিকহি ওয়াল কাদ্বা, দারুল ইলম লিল মালায়িন, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.।

কাযী ইয়ায ইবনু মুসা আল-ইয়াহসবি (৫৪৪ হি./১১৪৯ খ্রি.), তারতীবুল মাদারিক লিমারিফাতি আ'লামি মাযহাবি মালিক, দারু মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরুত এবং দারু মাকতাবাতিল ফিকর, ত্রিপোলি, লিবিয়া, ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি.

কাযী মুহাম্মাদ আহমদ আল-উমর, আত-তাতবীকাতুশ শারইয়্যাহ ওয়াস সুকূক, মাতবা'আতু বাগদাদ, ১৩৭০ হি./১৯৫০ খ্রি.।

আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত-তাবারী (৩১০ হি.), জামিউল বায়ান আন তা'উয়ীলিল কুরআন, মিশর, ২য় সংস্করণ, ১৩৭৩ হি./ ১৯৫৪ খ্রি.।

মুহাম্মাদ জামালুদ্দিন কাসিমি (১৩৩২ হি./১৯১৪ খ্রি.), মাহাসিনুত তা'উয়ীল, মাতবাআতু মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, কায়রো, ১৩৭৬ হি./১৯৫৭ খ্রি.।

ড. ফুয়াদ শুবাত, তানযীমুল আহওয়ালিশ শাখসিয়্যাহ লিগায়রিল মুসলিমিন ফী সুরিয়্যাহ ওয়া লুবনান, কায়রো, ১৯৬৬ খ্রি.

ড. মুহাম্মাদ আয-যুহাইলি, আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ ফিল ফিকহিল ইসলামি ওয়া তাতবীকুহু ফিল মামলাকাতিল আরবিয়্যাতিস সাঊদিয়্যাহ, দামেস্ক, ১৪০০ হি./ ১৯৮০ খ্রি.।

ড. মুস্তাফা আল-রাফিয়ী,আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ ফী লুবনান, কায়রো, ১৯৬৯ খ্রি.

হাসান আবদুল্লাহ আলে-শাইখ, আত-তানযীমুল কাদ্বাঈ ফিল মামলাকাতিল আরবিয়্যাতিস সাঊদিয়্যাহ, তিহামা প্রকাশনা, জেদ্দা, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।

আল-ইদারাতুল মুনিরিয়া, তাহযীবুল আসমাই ওয়াল লুগাত, আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া ইবনু শরফ আল-নববী (৬৭৬ হি.),মিশরে; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত

মাজদুদ্দিন আবুস সাআদাত আল-মুবারক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আছীর আল-জাজারি (৬০৬ হি.), জামিউল উসুল ফী আহাদিসির রাসুল সা., দামেস্ক, ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ খ্রি.

মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী (৬৭১ হি.), আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন, কায়রো, ১৩৮৭ হি./ ১৯৬৭ খ্রি.

ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলি, জুহুদু তাক্বনীনিল ফিকহিল ইসলামি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./ ১৯৮৭ খ্রি.

ইব্রাহিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আইদমার আল-আলাই, ইবনু দুকমাক নামে পরিচিত (৮০৯ হি.), আল-জাওহারুস সামিন ফী সিয়ারিল খুলাফাই ওয়াল মুলুকি ওয়াস সালাতিন, মক্কার উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, ১৪০৩ হি./১৯৮২ খ্রি.

সুলাইমান আল-বুজাইরমি (১২২১ হি.), হাশিয়াতুল বুজাইরমি আলাল-ইকনাঈ লিল খতিব, মাতবা'আতুত তাকাদ্দুমিল ইলমিয়্যাহ, মিশর, ১৩৪৮ হি.

মুহাম্মাদ আরাফা আল-দাসুকি (১২৩০ হি.), হাশিয়াতুদ দাসুকি আলাশ

শারহিল কাবীরি লিদ দারদির, মাতবাআতু ঈসা আল-বাবি আল-হালাবি, মিশর

আবদুল্লাহ হিজাযী আশ-শারকাওয়ী(১২২৬ হি./১৮১৩ খ্রি.), হাশিয়াতুশ শারকাভি আলা শারহিত তাহরীর লিল আনসারী, ১৩৪৬ হি./ ১৯২৮ খ্রি.

হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন; রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার লিল হাসকাফি (১০৮৮ হি.) আলাত তানভীরিল আবসার লিত তামারতাশি (১০০৪ হি.), মুহাম্মাদ আমিন ইবনু আবিদিন শামী (১২৫২ হি.), কায়রো, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি.।

শাহাদা সাইদ সুওয়ারকি, হারাকাতুত তাক্বনীনিল ওদ্বঈয়্যি ওয়াত তানযীমিল কাদ্বাইয়্যি ফিদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ, শরিয়া অনুষদের মাস্টার্স থিসিস, জর্ডান, ১৪১১ হি./ ১৯৯০ খ্রি.।

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনু আবদুল হালিম ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি.), আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম আও ওয়াযীফতুল হুকুমাতিল ইসলামিয়্যাহ, মদিনা মুনাউওয়ারা

জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান আস সুয়ুতি (৯১১ হি.), হুসনুল মুহাদ্বারাহ ফী তারিখি মিছর ওয়াল কাহিরাহ, মাতবাআতু ঈসা আল-বাবি আল-হালাবি, কায়রো, ১৩৮৭ হি./১৯৬৮ খ্রি.।

আমির শাকিব আরসালান, আল-হুলালুস সুনদুসিয়্যাহ ফিল আখবারি ওয়াল আছারিল উন্দুলুসিয়্যাহ, মাতবাআতু ঈসা আল-বাবি আল-হালাবি, মিশর, ১৩৫৮ হি./ ১৯৩৯ খ্রি.।

হুসাইন আলী আশ-শিফায়ী, আল-হাক্কুল মুবীন ফী কাদ্বায়ি আমীরিল মুমিনিন, দারে কারাম, দামেস্ক, ১৯৬২

ইয়াকুব ইবনু ইব্রাহিম (১৮২ হি.), আল-খারাজ, কাযী আবু ইউসুফ, কায়রো, ১৩৮২ হি.

আহমদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-খাজরাজী (৯২৩ হিজরির পর/১৫১৭ খ্রি.), খুলাসাতু তাযহীবি তাহযীবিল কামাল, মাকতাবাতুল কাহিরাহ, মিশর, ১৩৯১ হি./১৯৭১ খ্রি.।

ড. ইউসুফ আল-আশ, আল-খিলাফাতুল আব্বাসিয়্যাহ, রিয়াদ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.

ড. আহমাদ বাদর, দিরাসাতুন ফী তারীখিল আন্দালুসি ওয়া হাদ্বারাতিহা, মিনাল ফাতহি ইলাল খিলাফাহ, মাতবাআতু আলিফ বা আল-আদিব, দামেস্ক, ১৯৬৯ খ্রি.

উসতায মুহাম্মাদ আল-মুবারক, আদ-দাওলাতু ওয়া নিযামুল হিসবাহ ইনদা ইবনি তাইমিয়্যাহ, দারুল ফিকর, দামেস্ক, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৭ হি./ ১৯৬৭ খ্রি.

কাযী বুরহানুদ্দিন ইব্রাহিম ইবনু আলী ইবনু ফারহুন আল-ইয়া'মুরি আল-মালিকি (৭৯৯ হি.), আদ-দীবাজুল মুযাহহাব ফী আ'ইয়ানিল মাযহাব, প্রথম সংস্করণ, মিশর, ১৩৫১ হি.

রিআসাতুল মাহাকিমিশ শারইয়্যাহ ওয়াশ শুউনিদ দীনিয়্যাহ বি কাতার, পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন, ১৪০৯-১৪১০ হি.

আবুল কাসিম আব্দুর রহমান ইবনু আবদুল্লাহ আল-সুহাইলি (৫৮১ হি./১১৮৫ খ্রি.), আর-রউদুল উনুফ ফী তাফসীরিস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ, আযহার গ্রন্থাগার, মিশর, ১৯৭২ খ্রি.

মনসুর ইবনু ইউনুস আল-বাহুতি (১০৫১ হি./১৬৪১ খ্রি.), আর-রউদুল মুরাব্বা' বিশারহি যাদুল-মুস্তাকনি' লিল-হিজ্জাভি, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৯২ হি.

মুহিউদ্দিন ইয়াহিয়া ইবনু শরফ আল-নব্ববী (৬৭৬ হি.), রওদ্বতুত তালিবীন, দামেস্ক

আবুল কাসিম আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আর-রাহবি আল-সামনানি (৪৯৯ হি.), রাওদ্বাতুল কুদ্বাহ ওয়া ত্বরিকুন কাজাহ, বাগদাদ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.।

শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (৭৫১ হি.), যাদুল মা'আদ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৯ হি./ ১৯৭৯ খ্রি.